শ্রীরায় রামানন্দ।

খাঁকুড়িয়ার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী বদান্য জমীদারপ্রবর

শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ সাউ

মহোদয়ের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত।

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা,

৮০।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, গোবর্দ্ধন প্রেস,

শ্রীগোবর্দ্ধন পান দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৭।

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা, বাঁধাই ৩৲ তিন টাকা।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও মানব-সমাজ।

এতল্লোক-সমাজ-মান-বিরহো যত্র স্থলে জায়তে।
দেয়স্তত্র সমাদরোঽবনিতলে যত্নেন সদ্ভিঃ সদা॥
সম্মানো ধনতো গুণেন কুলতো জ্ঞানেন বা লভ্যতে।
যেষ্বেতানি বসন্তি, মান-বিরহো নাস্ত্যেব তেষাং ক্বচিৎ॥১॥

যে নীচা ঘৃণিতাঃ কলঙ্কবহুলাঃ ক্ষুদ্রাঃ সমাজে নৃণাং।
তেষামাদরমানদানপূরতঃ কার্য্যাঽসতামুন্নতিঃ॥
উদ্ধারশ্চ বিধেয় এব সুপথে যেন প্রয়ান্তীহ তে।
ধৃত্বা পাদযুগং সুমিষ্টবচনৈঃ স্তুত্বা প্রণম্যাথবা॥ ২॥

পাষণ্ডান্ পতিতান্ বিলোক্য তু ঘৃণাঽবজ্ঞে বিধেয়ে ন হি।
তানাদৃত্য সহৈব তৈরিব মহামিত্রৈর্মিলিত্বা ভৃশম্॥
আনীয়েহ ভবাব্ধিতারভগবদ্ভক্ত্যধ্বনি স্থীয়তাং।
শ্রীগৌরাঙ্গমতং, ন কোঽপি পতিতস্তিষ্ঠেন্ন লোকে ক্বচিৎ॥৩॥

Where should we rather bestow our reverence than there, where it is most needed. While others bow before the shrines of riches, ranks and virtue, Oh let the heart which truly loves mankind, seek out the despised inmates of the work-house, the gaol and the brothel where his brotherly love and reverence can do so much more for the elevation of his fellow creatures. Let him prostrate himself before the eclipsed majesty of these ill-fated sons and daughters of man; and register an inward vow, never to join in the general contempt nor to desert them till they have been raised from their present abject condition and there is no member of the human society in the awful position of an out-cast in its bosom.

ভূমিকা।

———:০:———

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দের প্রেম-ভক্তিরসময় চরিতামৃত-আস্বাদনের নিমিত্ত অভিলাষ হয়। সেই সময় হইতেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারবাহিক ভাবে এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হই। সেই সকল প্রবন্ধের কিয়দংশে "শ্রীস্বরূপ দামোদর" ও "শ্রীমদ্দাস গোস্বামী" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব হইতে উক্ত শ্রীপত্রিকায় অকৈতব "কৃষ্ণপ্রেম প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল; তাহাই পরে শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় "শ্রীল রামরায়" নামে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। ইহাও অনেক দিনের কথা। "শ্রীরামানন্দ রায়" প্রবন্ধ অতীব বিস্তৃত হওয়ায় ইহা যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে এমন আশা ছিল না।

অধুনা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ধান্যকুড়িয়ানিবাসী স্বনামখ্যাত বিদ্যোৎসাহী ভগবৎপ্রেমানুরক্ত সুপ্রসিদ্ধসহৃদয় জমীদার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাউ মহোদয় এই প্রবন্ধের কথা শুনিয়া আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই গ্রন্থ-প্রণয়নের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হয়েন। প্রবন্ধটী এত সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত ছিল যে সমগ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে হইলে ৭০ ফরমাতেও সম্পূর্ণ হইত না। সুতরাং এই গ্রন্থে মূল প্রবন্ধের অনেক অংশ ত্যাগ করা হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে অনেক অভিনব বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, গ্রন্থখানি যে, কোনরূপে প্রকাশিত হইল—ইহা উপেন্দ্র বাবুর স্বভাবসুলভ ঔদার্য্য ও মহতী কৃপারই বিশিষ্ট নিদর্শন। এই গ্রন্থের আর কোন গুণ না-ই থাকুক, কিন্তু ইহার সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করা হইয়াছে—ইহাতে সর্ব্বত্রই নিষ্ঠাময়ী প্রেমভক্তির আলোচনা আছে। সুতরাং ভক্ত পাঠকগণ আমার সহিত

একবাক্যে এই কৃপাময় দাতৃপ্রবরের সুখ-সমৃদ্ধিময় এবং শান্তি ও ভক্তিময়:সুদীর্ঘ জীবনের নিমিত্ত শ্রীভগবৎসমীপে প্রার্থনা করুন, কৃপাময় পাঠকগণের সমীপে ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীভগবান্ যে জীবকে যতটুকু শক্তি প্রদান করেন, তিনি তাঁহার অধিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন না। শ্রীল রামানন্দ রায় মহানুভাবের রসময় চরিত্রসিন্ধুর কণা স্পর্শ করিতে এই জীবাধমের বলবতী স্পৃহা হইয়াছিল, কিন্তু যাহা বিশুদ্ধ ভক্তিসাধ্য, অভক্ত অধমের পক্ষে সে অধিকারলাভ যে অসম্ভব, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি—এত দিন বহু চেষ্টা করিয়াও শ্রীল রামানন্দ রায়ের চরিত্র-কণা স্পর্শ করিতে সমর্থ হইলাম না। উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় অনেক কথা বলিয়াছি, ভক্তগণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। অসংযত অধম লোকেরা আত্মক্ষমতা না বুঝিয়াও মনের ব্যাকুলতায় অনেক প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে, আমার এই প্রয়াসও তাদৃশ। তবে একটা কথা এই যে পরম প্রেমরসময় শ্রীল রায় মহাশয়ের চরিত্র চিন্তা করিলে লাভ ভিন্ন অলাভ নাই, ইহাই ভাবিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। কিন্তু ইহাতে সময়ে সময়ে সঙ্কোচিত ও ভীত হইয়াছি, কেন না অযোগ্যের এইরূপ দুঃসাহসজনিত কার্য্যের ফলে ভক্ত হৃদয় ক্লিষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। আমার অজ্ঞতায় ও প্রুফ-সংশোধনের দোষে অনেক প্রকার ভ্রমপ্রমাদ এই গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে। সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, রসাভাসদুষ্ট, ললিতমধুরপদবিন্যাস-বিবর্জ্জিত এবং কুপ্রণালীবদ্ধ বাক্যবিরচনে, রসগ্রাহী শ্রোতৃবর্গের পক্ষে ক্লেশের কারণই হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে হয় ত তাহারও অভাব নাই। তজ্জন্য এ অধম দয়াময় পাঠকগণের ক্ষমাভিখারী।

যাহাই হউক, আমি আত্মশোধনের নিমিত্তই এই গুরুতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম,—ছিলাম কেন—প্রবৃত্ত হইয়াছি। কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। যদিও শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয়ের চরিত্র সম্বন্ধীয় অতি অল্প

ঘটনাই এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তথাপি বর্ত্তমান প্রবন্ধের এইখানেই উপসংহার করা হইল। কিন্তু এই উপসংহারেই শ্রীল রামরায় মহাশয়ের চরিত্র-বর্ণনার পরিসমাপ্তি করা হইল না। শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরের চরিত্র আলোচনা করিতে বাসনা করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, শ্রীগৌরভগবানের প্রসাদাৎ তাহা একখানি গ্রন্থকারে মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। কিন্তু সে গ্রন্থখানি যে সকল কারণে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, এই গ্রন্থখানিও সেই সকল কারণেই অসম্পূর্ণ রহিল। অসম্পূর্ণতার বিবিধ কারণ রহিয়াছে, তন্মধ্যে আমার অজ্ঞতা ও অযোগ্যতাই সর্ব্বপ্রধান। শ্রীল রায় মহাশয়ের বাল্যচরিত্র, শিক্ষা, বিবাহ, রাজকার্য্য-পরিচালন ও বিষয়-ব্যবসায় ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনও ঘটনা বহু চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারিলাম না। তবে তিনি যে সমৃদ্ধিশালী রাজা ছিলেন, অতীব সুযোগ্য রাজমন্ত্রী ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় ও ভক্তিশাস্ত্রে অতীব সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের উক্তিতেই যথেষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভক্তচরিতাখ্যায়কগণ ভক্তগণের চরিত্র-বর্ণনে বহিরঙ্গ ঐতিহাসিকতথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত সচেষ্ট হইতেন না। ভক্তজীবনে ভক্তির কীদৃশ বিকাশ হয়, তৎপ্রদর্শনই এই শ্রেণীর চরিতাখ্যায়কদিগের প্রধানতম লক্ষ্যের বিষয় ছিল। সুতরাং অপরাপর বহির্বিষয়ের ঘটনা সংগ্রহ করিতে ইহারা অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। আমরাও এ সম্বন্ধে সবিশেষ কোন তথ্যসংগ্রহ করিতে পারি নাই।

ভক্ত পাঠকগণের অবিদিত নাই যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মহীয়সী গম্ভীরা-লীলার সহিত শ্রীপাদস্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের চরিত্র ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। সেই লীলাই এই দুই চরিত্রের পূর্ণ বিকাশস্থল,—সেই লীলাই এই দুই চরিত্র-বিকাশের পূর্ণ পরিণতি। তৎসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্রও আলোচিত হয় নাই। উক্ত

যে মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের ধারণার অতীত, তাহা আমি জানি, আমার ন্যায় অযোগ্যের ভাষায় এই লীলা যে বর্ণিত হইতে পারে না তাহাতেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু তথাপি হৃদয়ে কেমন এক আবেগ উপস্থিত হইয়াছে যে গম্ভীরা-লীলা সম্বন্ধে দুই একটী কথার উল্লেখ করিয়া এই দুই চরিত্র আলোচনার অনধিকার চর্চ্চা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব। এই ক্ষুদ্র-জনের হৃদয়ে ভক্ত পাঠক মহোদয়গণের কৃপাবিন্দু পতিত হইলে আশালতা অঙ্কুরিত ও ফলবতী হইতে পারে, ইহাই আমার ভরসা।

শ্রীপাদস্বরূপ দামোদর ও শ্রীপাদ রামরায় মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার নিত্য সহচর। মহাপ্রভুর সহিত ইহাঁরা যে অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের রসাস্বাদন করেন, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ না করিলে এই অসম্পূর্ণ চরিত আরও অধিকতর অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। প্রভুর কৃপা হইলে এবং তিনি কিঞ্চিৎ শক্তি দিলে "গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ" নামক অপর গ্রন্থে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার এই দুই সহচরের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমসুধা-রসাস্বাদন এক গ্রন্থে গ্রথিত করার বাসনা আছে। ভক্তগণ কৃপা করিয়া শক্তিদান করুন, যেন দরিদ্রের এই আশা ফলবতী হয়।

২৪শে আষাঢ়
১৩১৭ সাল।

শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা,
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

প্রামাণিক গ্রন্থের তালিকা।

—(:*:)—

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।
২। শ্রীচৈতন্য ভাগবত।
৩। শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য।
৪। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত।
৫। শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা।
৬। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা।
৭। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।
৮। শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটক।
৯। শ্রীসনাতন শিক্ষা।
১০। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।
১১। ষট্‌সন্দর্ভ।
১২। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত।
১৩। ভক্তিরত্নাকর।
১৪। উজ্জ্বলনীলমণি।
১৫। ভজন নির্ণয়।
১৬। মুরলী বিলাস।
১৭। বিদগ্ধমাধব।
১৭। ললিত মাধব।
১৯। চৈতন্য মঙ্গল।
২০। পদামৃত সমুদ্র।
২১। বৈষ্ণব বোধিনী।
২২। ভক্তিরসায়ন।
২৩। মাধুর্য্যকাদম্বিনী।
২৪। শিক্ষাষ্টক।
২৫। ভক্তিবিবেক।
২৬। গোবিন্দ লীলামৃত।
২৭। রস-সংগ্রহ।
২৮। শ্রীরূপ গোস্বামি কৃত স্তবমালা।
২৯। দিনমণি চন্দ্রোদয়।
৩০। অষ্টপদী।
৩১। পদরত্নাবলী।
৩২। চণ্ডীদাস পদাবলী।
৩৩। গোবিন্দদাস পদাবলী।
৩৪। লোচন দাস পদাবলী।
৩৫। গীত-গোবিন্দ।
৩৬। জয়দেব-চরিত।
৩৭। চৈতন্যলীলা নাটক।
৩৮। বৈষ্ণব তন্ত্র।
৩৯। কুবলয়ানন্দ কারিকা।
৪০। পরপক্ষ গিরিবজ্র।
৪১। সর্ব্বসংবাদিনী।
৪২। চন্দ্রালোক।
৪৩। যামুনাচার্য্য স্তোত্র।
৪৪। সহস্র নাম।
৪৫। শ্রীমদ্ভাগবত।
৪৬। লঘুভাগবতামৃত।
৪৭। শ্রীহরিভক্তি-বিলাস।
৪৮। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র।
৪৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
৫০। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।
৫১। বিষ্ণুপুরাণ।
৫২। পদ্মপুরাণ।
৫৩। কালিকা পুরাণ।
৫৪। স্কন্দ পুরাণ।
৫৫। ভবিষ্য পুরাণ।
৫৬। নৃসিংহ পুরাণ।
৫৭। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।
৫৮। গরুড় পুরাণ।
৫৯। নারদীয় পুরাণ।
৬০। বৃহন্নারদীয় পুরাণ

৬১। মহাকূর্ম্ম পুরাণ।
৬২। বহ্নি পুরাণ।
৬৩। মনুসংহিতা।
৬৪। বৃহস্পতি সংহিতা।
৬৫। অগস্ত্য সংহিতা।
৬৬। ব্রহ্ম সংহিতা।
৬৭। আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্র।
৬৮। সাঙ্খ্যায়ন শ্রৌত সূত্র।
৬৯। কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্র।
৭০। ব্রহ্ম সূত্র।
৭১। বেদান্ত সূত্র।
৭২। পাতঞ্জল সূত্র।
৭৩। কণাদ সূত্র।
৭৪। ন্যায় সূত্র।
৭৫। গৌতম সূত্র।
৭৬। শাণ্ডিল্য সূত্র।
৭৭। নারদ সূত্র।
৭৮। শৌঙ্কোষনি সূত্র।
৭৯। গৌতমীয় সূত্র।
৮০। সনৎকুমার সূত্র।
৮১। বেদান্তসার।
৮২। শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ।
৮৩। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।
৮৪। গোপাল তাপনী উপনিষৎ।
৮৫। ছান্দোগ্য উপনিষৎ।
৮৬। সূত্রকোপনিষৎ।
৮৭। বাসুদেবোপনিষৎ।
৮৮। মাঠর শ্রুতি।
৮৯। মীমাংসা দর্শন।
৯০। বৈশেষিক দর্শন।
৯১। ন্যায় কন্দলী।
৯২। সিদ্ধান্তরত্ন।
৯৩। বিবেক চূড়ামণি।
৯৪। সিদ্ধান্তপ্রদীপ।
৯৫। ব্রহ্ম যামল।
৯৬। শতপথ ব্রাহ্মণ।
৯৭। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।
৯৮। শাতাতপ স্মৃতি।
৯৯। চন্দ্রপ্রভা।
১০০। সারস্বতালঙ্কার টীকা।
১০১। ভাষাপরিচ্ছেদ।
১০২। সাহিত্য দর্পণ।
১০৩। বামনবৃত্তি।
১০৪। সরস্বতী কণ্ঠাভরণ।
১০৫। বাগ্‌ভট্টালঙ্কার।
১০৬। কাব্যকৌস্তুভ।
১০৭। কাশীখণ্ড।
১০৮। মহানাটক।
১০৯। রঘুবংশ।
১১০। কুমার সম্ভব।
১১১। উত্তর রামচরিত।
১১২। মহাভারত।
১১৩। পাণিনি।
১১৪। বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা।
১১৬। অমরকোষ।
১২৭। মেদিনীকোষ।
১১৮। চরকসংহিতা।
১১৯। রায় বংশাবলী।
১২০। জগন্নাথ মতম্।
১২১। মহিমভট্ট মতম্।
১২২। বল্লভ মিশ্র মতম্।
123. Psychology of Attention.
124. Mill's Subjection of women.
125. Ficte's Doctrine of Religion.
126. Herbert Spencer's First Principle.
127. Bible.
128. History of Bijoynagar.

শ্রীরায় রামানন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গোদাবরী তটে।

প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী কলকলতানে মৃদুল তরঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে। উহার তটপথে একজন নবীন সন্ন্যাসী আত্মহারা হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে" এই মধুময় নামের সুধামাধুরী ছড়াইতে ছড়াইতে বসন্তবিহগের ন্যায় আপন ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গমন করিতেছেন। তাঁহার কাঞ্চনকান্তিতে দশদিক্ যেন কনকিত হইয়া উঠিয়াছে, কমলনেত্রের করুণ চাহনির স্নিগ্ধচ্ছটায় মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতেছে। যাঁহারা তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন, তাঁহারাই তাঁহার সহচর হইতেছেন, যাঁহাদের কর্ণে তাঁহার সেই জলদ-গম্ভীর স্নিগ্ধবচনামৃত প্রবিষ্ট হইতেছে, তাঁহারা আরও স্পষ্টতররূপে তাঁহার শ্রীমুখের মধুর নামকীর্ত্তন-শ্রবণ করার জন্য উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইতেছেন। মানুষের এমন রূপ,—আর কেহ কখনও দেখে নাই, মানুষের কণ্ঠ এমন মধুর, ইহাও কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। এই কাঞ্চন-গিরিসদৃশ তরুণ সন্ন্যাসীটী যে একটী প্রাকৃত মনুষ্য, কাহারও এ ধারণা হইল না।

এইরূপে পুণ্যসলিলা গোদাবরীর পবিত্রতটে এক গোলকদৃশ্য লোক-লোচনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন। (১)

সন্ন্যাসীর চিত্ত ব্রজভাবে বিভাবিত। যৎসামান্য উদ্দীপক বস্তু দেখিলেই তাহার চিত্তে শ্রীবৃন্দাবনের স্ফূর্ত্তি প্রবলতর হইয়া উঠে। গোদাবরী-নদীতটে কুসুমিতকুঞ্জকানন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবনের মধুময়ী স্মৃতি জাগিয়া উঠিল ;—

গোদাবরী দেখি হল যমুনা-স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন॥
সেই বনে কথোক্ষণ করি নৃত্য গান।
গোদাবরী পার হৈয়া কৈলা তাহা স্নান॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

সন্ন্যাসী এই গোদাবরী নদীতটে একটী সমৃদ্ধিশালিনী নগরীর সীমাবর্ত্তী হইলেন। গমনগতি মন্থর হইল। তাঁহার অঙ্গগন্ধে দশদিক্ আমোদিত হইয়া উঠিল। তিনি নদীতে স্নান করিয়া শিশিরস্নাত সুকোমল কেতকী-কুসুমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং ঘাটের অদূরে বসিয়া আপন মনে নামজপে বিভোর হইলেন। ব্রাহ্মণাদি শত শত লোক আসিয়া

---

(১) কাঞ্চনাচলমরীচিবীচিভি-
গৌরয়ন্ কিমপি দক্ষিণাং দিশম্।
দর্শনেন করুণা-তরঙ্গিণা
দ্রাবয়ন্ জনমনাংসি সর্ব্বতঃ॥
ঈশমম্বুদবিকম্বরস্বর-
স্নিগ্ধমুগ্ধরসনামৃতদ্রবৈঃ।
হ্লাদয়ন্ শ্রুতিমতাং শ্রুতিদ্বয়ং
চিত্তমপ্যপহরন্ স জগ্মিবান্।

৭ম অঙ্কে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে।

তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাদের মধ্যে মন্ত্রাকৃষ্টের ন্যায়, গ্রহগৃহীতের ন্যায়, বিস্মিত-চমৎকৃতের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ও প্রেমবিহ্বল একজন মহাভক্ত মহারাজ (২) আসিয়া সাষ্টাঙ্গে সন্ন্যাসীর পাদমূলে ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় নিপতিত হইলেন। পাঠক বুঝিয়াছেন,—এই নবীন সন্ন্যাসী আমাদের সেই পতিতোদ্ধারণ প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ,—যে দেশে তাঁহার পদার্পণ হইয়াছে, তাহার নাম বিদ্যানগর (৩) আর তাঁহার শ্রীচরণে পতিত ভক্ত—বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীল রামানন্দ রায়।

মহাপ্রভু বলিলেন "ওহে, তুমিই সেই রামানন্দ রায়! বটে?" রামরায় বলিলেন "এ অধম আপনার সেই ক্ষুদ্র অধম শূদ্র দাস।" মহাপ্রভু রামরায়কে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন;

তবে প্রভু কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহে আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা॥

---

(২) হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবার আইলা—বাজনা বাজায়॥
তার সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমতে কৈলা তেঁহো স্নান তর্পণ॥
* * * *
সূর্য্য শত সমকান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমল লোচন॥
দেখিয়া তাহার মন হইল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

(৩) বিপুল বিদ্যানগর-সাম্রাজ্যের বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখেতে শুনি গদ্‌গদ কৃষ্ণবর্ণ॥

শ্রীচরিতামৃতে।

রায় রামানন্দ ইতঃপূর্ব্বে এজগতে মহাপ্রভুর নাম কখনও শুনেন নাই, সুতরাং আর কখনও উভয়ের আলাপ ছিল না। অথচ তিনি তাঁহার দর্শন-প্রাপ্তিমাত্রই তাঁহাকে চিরসুহৃদের ন্যায় মনে করিলেন। প্রেমের আবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমন হইলে পর মহাপ্রভু বলিলেন :—

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণ।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতন॥
তোমা মিলিবারে মোর হেথা আগমন।
ভাল হইল অনায়াসে পাইল দর্শন॥

সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। রামরায় সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই মুগ্ধ ও প্রেমবিহ্বল হইয়াছিলেন। তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে ভৃত্য বলিয়া মনে করেন, যাহাতে আমার হিত হয় ইহাই তাঁহার বাসনা। তাঁহার কৃপাতেই আজ আপনার দর্শন পাইলাম, আজ আমার মনুষ্যজন্ম সফল হইল। সার্ব্বভৌমের প্রতি যে আপনার যথেষ্ট কৃপা আছে, ইহাই তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন। তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্যই আপনি অস্পৃশ্য অধমকে স্পর্শ করিলেন। আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আর আমি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম। আমায় স্পর্শ করিতে কি আপনার ঘৃণা বোধ হইল না, এমন কি আমার ন্যায় পতিত অধম শূদ্রকে দর্শন করাও বেদনিষিদ্ধ (৩) আপনি বেদবিধিরও ভয় করিলেন না! ইহা কেবল আপনার কৃপারই পরিচয়। আপনার কৃপাগুণই আপনার এই সকল নিন্দ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতু। আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আপনার মর্ম্ম বুঝিতে জগতে কে সমর্থ?

---

(৩) শ্মশানমিব যত্নাৎ শূদ্রমন্ত্যং পরিবর্জ্জয়েৎ। শ্রুতিনির্গলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বচন।

আমি বুঝিয়াছি, কেবল আমার পরিত্রাণের নিমিত্তই এখানে আপনার শুভাগমন। আপনি পরম দয়াল—পতিতপাবন। শ্রীভাগবত বলেন :—

মহদ্বিচলনং নৃনাং গৃহিণাং দীনচেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥

শ্রীভাগবত ১০।৮।৩ শ্লোক।

অর্থাৎ দীনচিত্ত গৃহীদিগের মঙ্গলসাধনের নিমিত্তই সাধুগণ স্বীয় আশ্রম হইতে অন্যত্র গমন করেন, নিজের প্রয়োজনে কোথাও গমন করেন না। সুতরাং এ অধমের প্রতি কৃপা বিতরণের জন্যই যে আপনার এখানে আগমন, তাহার আর সন্দেহ কি?

আমার সহিত ব্রাহ্মণাদি নানাশ্রেণীর লোক। আপনাকে দেখিয়া সকলেরই চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছে। যাহারা কখনও কৃষ্ণনাম হরিনাম মুখে আনে না, আজ আপনার প্রভাবে তাহারাও হরিনাম কৃষ্ণনাম করিতেছে, আজ কৃষ্ণপ্রেমে তাহাদের অঙ্গ পুলকিত ও নয়নে অশ্রুধারা বহিতেছে। আপনার আকার প্রকার দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, জীবে কখনও এইরূপ অপ্রাকৃত গুণ-সম্ভব হয় না।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "তুমি মহাভাগবতোত্তম, তোমার প্রেম-বিকার দেখিয়াই সকলের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছে। অপরের কথা কি, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, প্রেম কি তাহা বুঝি না, ভক্তি জানি না, ভগবত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত আমার অজ্ঞাত; তোমার স্পর্শ করিয়া আমিও কৃষ্ণপ্রেমে প্রমত্ত হইয়াছি। সার্ব্বভৌম আমার অবস্থা জানিয়াই আমার চিত্তসংশোধনের জন্য তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন,—

অন্যের কি কথা—আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী,
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥
এই জানি, কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥

শ্রীচরিতামৃত।

এই বলিয়া মহাপ্রভু নীরব হইলেন, রামানন্দ বিস্মিত হইয়া মহাপ্রভুর চরণপানে চাহিয়া রহিলেন। তৃণাদপিনীচতাই বৈঁষ্ণবধর্ম্ম-মন্দিরে প্রবেশের প্রথম সোপান। প্রভু ও ভক্ত উভয়েই তাহার যথেষ্ট শিক্ষা প্রকাশ করিলেন।

এই সময় একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, ব্রাহ্মণটী বৈষ্ণব, তাঁহার নিমন্ত্রণে সম্মত হইলেন। প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ রামানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "রাম রায়, তোমার শ্রীমুখে কিছু কৃষ্ণ কথা শুনি, ইহাই আমার সাধ। আবার যেন তোমার দর্শন পাই।"

মহাপ্রভুর ভাষা স্বভাবতই সুমধুর; নয়ন যুগল স্নেহার্দ্র, সরল ও প্রীতি-মাখা দৃষ্টিপূর্ণ। রাম রায় এমন প্রেমের স্নিগ্ধ ভাষা আর কখনও শুনেন নাই, তাঁহার চিত্ত একবারে গলিয়া গেল। তিনি গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "দয়াময়, পতিত-পাবন, এ দীনহীন পামরের চিত্ত-শোধনের জন্যই যদি এখানে আগমন হইয়াছে, তবে কয়েক দিন এখানে থাকিতে হইবে,—আমার দুষ্ট চিত্ত শোধন করিতে হইবে"। এই বলিয়া রায় প্রণত হইলেন। দয়াময় রাম রায়কে ধরিয়া তুলিলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তথাস্তু"।

"রাম রায়, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমোজ্জ্বল-স্নিগ্ধ প্রতিচ্ছবি হৃদয়ে লইয়া স্বীয় আলয়ে গমন করিলেন। গৌরাঙ্গ সুন্দর ব্রাহ্মণের গৃহে স্বীয় পদরজে পবিত্র করিলেন।

রায় রামানন্দ ও সন্ন্যাসিবেশ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম মিলন,—প্রকৃতই এক অদ্ভুত দৃশ্য; অদ্ভুত বলিতেছি এই জন্য,—রামরায় রাজা, মহাবিষয়ী ও মহা আড়ম্বরশীল। এমন কি তিনি গোদাবরীতে যখন স্নান করিতে গমন করিতেন, তখনও তাঁহার সহিত বিবাহযাত্রার ন্যায় লোক সমাগম হইত,—

বাদকগণ বাদ্য বাজাইয়া তাঁহার সহিত গমন করিত। ব্রাহ্মণগণ স্তব স্তুতি পাঠ করিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেন।

এদিকে, প্রচ্ছন্নাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ,—বৈরাগ্যের প্রতিচ্ছবি, সুসংযত সন্ন্যাসী, নির্জ্জনতাপ্রিয় ও সম্পূর্ণরূপে বিষয়বিতৃষ্ণ। তাঁহার কলেবর তেজোদৃপ্ত অথচ স্নিগ্ধ-মধুর।—

সূর্য্য শত সমকান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ, কমল লোচন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

দৃশ্যতঃ পরস্পর-বিরুদ্ধ-ভাবসম্পন্ন এই বস্তুদ্বয়ের সহসা অদ্ভুত মিলন দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ, স্তম্ভিত, চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণের অধিকতর বিস্ময়ের কারণ,—সাত্ত্বিক বিকার-দর্শন। সন্ন্যাসী জ্ঞানী বলিয়াই মানব-সমাজে পরিচিত। সন্ন্যাসীতে স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক ও বৈবর্ণ্য প্রভৃতি সাত্ত্বিকবিকার তাঁহারা আর কখনও দেখেন নাই। অপর পক্ষে রায় রামানন্দও মহাপণ্ডিত এবং সমুদ্রবৎ গম্ভীর। তাঁহাতে এইরূপ চাঞ্চল্যও আর কখনও দেখা যায় নাই। এই ভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের বিস্ময়ের আর এক বিষয় এই যে সন্ন্যাসীই বা শূদ্র-স্পর্শ করেন কেন, এবং শূদ্র-স্পর্শ করিয়াই বা এরূপ বিহ্বল হয়েন কেন? আর মহারাজ রামানন্দ রায়ই বা সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রমত্ত হইলেন কেন?—

দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার॥
এই তো সন্ন্যাসী, তেজে দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন॥
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত, হইলা অস্থির॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

ব্রাহ্মণগণ রায় রামানন্দের বাহ্যভাবের অতিরিক্ত অন্তর্নিগূঢ় কোন ভাবের সংবাদ রাখিতেন না। প্রেমিকগণের হৃদয়ে হৃদয়ে যে একজাতীয় মহা-কর্ষণী শক্তি বিরাজিত, তাহা জনসাধারণের বুদ্ধির অধিগম্য নহে। সেই মহাকর্ষণে আপাতদৃষ্ট বিজাতীয় বিষম পদার্থসমূহও একীকৃত হয়। তাই সন্ন্যাসিবেশ শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র-গম্ভীর মহাপণ্ডিত রামরায়ের হৃদয় উথলিয়া উঠিল,—উভয়ের দর্শনে উভয়ের হৃদয়ে পরমানন্দময় সাত্ত্বিক বিকারের তরঙ্গ উছলিয়া উঠিল। আজ গোদাবরীর পবিত্রতটে মহা-বিষয়ীর হৃদয়নিহিত প্রেমের ঝরণা শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের মহার্ণবে মিলিয়া মিশিয়া এক হইল। উহারই অদ্ভুত অপূর্ব্ব উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া বহিরঙ্গ লোকেরা বিস্মিত, চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইলেন। এই দৃশ্য প্রকৃতই অদ্ভুত।

রায় রামানন্দ বিনয়ের খনি। বিনয় ভক্তির চির-সহচর। কৃপাময় প্রভু রামরায়কে দর্শন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া যে আনন্দের রস উচ্ছলিত করিয়াছিলেন, রাম রায় তাহাতে নিমজ্জিত হইলেন, বিভোর হইলেন; উভয়েই সে প্রেমতরঙ্গে অধীর হইলেন। কিন্তু প্রভু আত্মতন্ত্র। তিনি ডুবিতে জানেন, ডুবাইতে জানেন, ভাসিতে জানেন, ভাসাইতেও জানেন। যদিও উভয়েই সাত্ত্বিক বিকারে বাহ্যজ্ঞান হীন হইয়াছিলেন, কিন্তু বহিরঙ্গ লোকের সমক্ষে প্রেমের এরূপ প্রকাশ সুসঙ্গত নহে, এই মনে করিয়া প্রভু আনন্দবেগ সম্বরণ করিয়া সহসা রামরায়ের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন; জনৈক ব্রাহ্মণ ভক্তিপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে স্বীয় আলয়ে লইয়া গেলেন।

প্রেম অপার বারিধির ন্যায় মহান্ গম্ভীর ও বিশাল। কিন্তু তথাপি ইহাতে নিয়ম আছে। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জল উছলিয়া উঠে। পূর্ণিমার জোয়ার চিরদিনই উৎসেচনশীল। কিন্তু এই জোয়ারেরও হ্রাস বৃদ্ধি আছে। সকল স্থলে সকল সময়ে জোয়ার দেখা যায় না। প্রভু এই বিশাল

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা। প্রেমজগতেরও নিয়ম আছে। নিয়ন্তা সেই নিয়ম লঙ্ঘন করেন না। *

চরক বলেন, ভাব সামান্যই ভাব-বৃদ্ধির কারণ। বিশেষই হ্রাসের হেতু। যথা :—

সর্ব্বথা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণম্।
হ্রাসহেতু বিশেষশ্চ প্রবৃত্তিরুভয়স্য তু॥

জলধরের জলরাশি সমুদ্রবক্ষে নিপতিত হয়, কিন্তু সাহারার প্রতপ্তমরু তাহার বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে পারে না। এই দুর্জ্ঞেয় জগৎরহস্যের ব্যাখ্যা মানব বুদ্ধির অগম্য। রামানন্দ রায়ের সহচরগণের হৃদয় মরুসদৃশ উত্তপ্ত। তাহাদের হৃদয়ে প্রেমামৃত বর্ষণ হইলে জগতের একটা অভাব-পূর্ণ হইত। কিন্তু স্বয়ং প্রভুও তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রেমবেগ সম্বরণ করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, কৃষক যেমন যে-সে ভূমিতে সহসা বীজ বপন করে না, করিলেও কেহ তাহাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করে না, শ্রীভগবানও সেইরূপ অপ্রস্তুত হৃদয়ে সহসা প্রেমবারি বর্ষণ করেন না। শ্রীল রামরায়কে দর্শন দিয়া তিনি যে কৃপা করিলেন, জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া তিনি কি ঠিক তদ্রূপ কৃপা করিয়াছিলেন? জগাই মাধাই মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম তখনও তাঁহাদের দুর্নীরিক্ষ্য ছিলেন।

প্রভুর এই সকল লীলার তাৎপর্য্য বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। তথাপি বুঝিতে ইচ্ছা হয়। আমাদের মনে হয়, প্রভু যেন সর্ব্বদাই অধিকারিভেদে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন, অধিকারিভেদ-বিচারে স্বীয় গুণের বিকাশ বা সঙ্কোচ করিতেন। এই অধিকারভেদ-বিচার অবহেলিত ও উপেক্ষিত হওয়াতে বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজে অধুনা অনেক প্রকার গ্লানি-জনক কার্য্যের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

শ্রীল রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রাজা ও মহারাজ প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। যেরূপ সাজসজ্জায় ও আড়ম্বরে তিনি গোদাবরী তটে স্নানার্থ আগমন করিতেন, তাহাতে তিনি যে রাজা বা মহারাজ ছিলেন এইরূপই মনে করা যাইতে পারে। ফলতঃ উড়িষ্যার রাজা শ্রীল প্রতাপরুদ্র তখন সম্রাটের ন্যায় প্রতাপান্বিত ছিলেন। রামরায় এই প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী ছিলেন। রায় রামানন্দ শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্রের যে ঐতিহাসিক প্রতাপের কীর্ত্তন করিয়াছেন, এ বিষয়ে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আর কি হইতে পারে? প্রতাপরুদ্রের প্রবল প্রতাপের কথা শুনিয়া সুবিখ্যাত যবনকুলধুরন্ধর সেকেন্দর সাহ ভীতচিত্তে পলায়ন করিয়াছিলন, কলবর্গ নৃপতি সর্ব্বদাই ইঁহার নামে সশঙ্ক থাকিতেন, গুর্জ্জর দেশীয় ভূপতি ইঁহার ভয়ে নিজের নগরীকে জীর্ণ অরণ্যের ন্যায় বোধ করিতেন এবং গৌড়দেশীয় ভূপতি আপনাকে প্রবল বাত্যাবেগে পীড়িত সমুদ্রস্থ ঘূর্ণিত পোতের ন্যায় মনে করিতেন। ইঁহার কীর্ত্তিরাশি কৈলাস শৈলের কায়ব্যূহরূপ, হিমালয়ের নির্য্যাসস্বরূপ, ক্ষীরবারিধির ফেনস্বরূপ, শারদবারিদের সারসদৃশ এবং সুরতরঙ্গিণীর নীরের ন্যায় প্রভাবশীল হইয়া জগৎ নির্ম্মল করিত। ইনি পুণ্যকর্ম্মে ও দানে ধ্যানে অনুক্ষণ দেবতাদিগকেও বশীভূত করিয়া রাখিতেন। বিপক্ষ-রাজগণের কালাগ্নিরুদ্রস্বরূপ রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্রের মনোরঞ্জনার্থই রায় রামানন্দ জগন্নাথবল্লভ নাটক রচনা করেন *

---

* "যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবেশিতঃ সেকেন্দরঃ কন্দরম্
খংবর্গং কলবর্গ ভূমিতিলকঃ সাস্রং সমুদীক্ষ্যতে।

রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র একদিকে যেমন বিশাল বীরত্বের আদর্শ, অপর দিকে তেমনি আবার মহাপ্রেমিক ভক্ত। ইনি মহাপ্রভুর দর্শন লাভের জন্য কি প্রকার ব্যাকুল হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার পাঠে তাহা বুঝিতে পারা যায়, যথা :—

মেনে গুর্জ্জরভূপতি র্জরদিবারণ্যাং নিজং পত্তনং
বাতব্যগ্রপয়োধিপোতগমিব স্বং বেদ গৌড়েশ্বরঃ॥
কায়ব্যূহবিলাস ঈশ্বরগিরেদ্বৈ তং সুধাদীধিতে
নির্যাস স্তুহিনাচলস্য যমকং ক্ষীরাম্বুরাশে রসৌ।
সারঃ শারদ বারিদস্য কিমপি স্বর্ব্বাহিনী বারিণো
বৈরাজ্যং বিমলীকরোতি সততং যৎকীর্ত্তিরাশি র্জ্জগৎ॥
যদ্দানাম্বুকদম্বনির্ম্মিতনদীসংশ্লেষহর্ষাদসৌ
রিঙ্গত্তুঙ্গতরঙ্গনিস্বনমিষাং প্রস্তৌতি যং বারিধিঃ।
নিত্যপ্রস্তুত সপ্ত তন্তুভিরভিস্প্যৃতং মনোহনাকিনাং
যেনৈতৎ প্রতিমাচ্ছলেন যদমী মুঞ্চন্তি ন প্রাঙ্গণম্॥

তেন প্রতিভটনৃপঘটাকালাগ্নিরুদ্রেণ শ্রীমৎপ্রতাপরুদ্রেণ শ্রীহরিচণমধিকৃত্য কমপি প্রবন্ধমভিনেতুমাদিষ্টোঽস্মি।" শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে।

উড়িষ্যার সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের অনেকেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। প্রতাপরুদ্রের বহু পূর্ব্বে রাজা একবর্ত্তী কামদেব উড়িষ্যায় ৭৬ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তিনি বৈরাগ্যের আদর্শ ছিলেন, শ্রীগীতগোবিন্দ শ্রবণ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার রাজত্বের ৩০০ বৎসরের অনেক পরে খেরকা নৃসিংহদেব উড়িষ্যার রাজা হয়েন। ইহার পরেই রাজা প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। ইনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন, সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড ইনি স্বীয় শাসনাধীন করিয়াছিলেন। মিঃ এণ্ড্রু ষ্টারলিং উড়িষ্যার রাজাদের "বংশাবলীর" যে ইংরাজী অনুবাদ ১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এসিয়াটিক সোসাইটীর জারনালে প্রকাশ করেন, তাহাতে লিখিত আছে :—

Raja Pratab Rudder Deo (reigned) 36 years. He subjected to his dominion the whole country as far as Setaband Rameswar (the bridge of Ram.)

তা সভার প্রসাদে মিলেঁ। শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভু কৃপা বিনে মোর রাজ্য নাহি ভায়॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী॥

রামরায় এই রাজাধিরাজের অতীব প্রিয় ছিলেন। ইনি স্বাধীনভাবেই নিজের প্রাসাদে বসিয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। নিজেও আপনাকে "রাজসেবী" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা :—

কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥

সময়ে সময়ে মন্ত্রণাদির জন্য ইঁহাকে রাজধানীতে গমন করিতে হইত। শ্রীচৈতন্যচরিত পাঠে জনো যায় যে ইনি রাজমন্ত্রী ছিলেন :—

রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহার-নিপুণ।
রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় মহাপ্রভুর মন॥
১২ পরিচ্ছেদ মধ্যলীলা॥

রায় রামানন্দ সংস্কৃত ভাষায় যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকই তাহার প্রমাণ। টীপ্পনীতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পাঠেও পাঠক তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। শ্রীরূপের নাটকবিচারে রামরায় কাব্যশাস্ত্রের অনেক সূক্ষ্মতত্ত্বকথা তুলিয়া শ্রীরূপকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। যথা :—

রূপ কহে "কাঁহা তুমি সূর্য্যসমভাস।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র ?—যেন খদ্যোত-প্রকাশ॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখের ব্যাদন।"
এত বলি নান্দী শ্লোক করিল ব্যাখ্যান॥

রায় রামানন্দ রাজমন্ত্রী, তিনি অতি বুদ্ধিমান ও সুপণ্ডিত। সুতরাং রাজপণ্ডিত শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত তাঁহার সবিশেষ আলাপ

পরিচয় ছিল, উভয়েই যে অনেক সময়ে অনেক কথোপকথন হইত, তাহার আর সন্দেহ কি? এই উভয়ের মধ্যে সবিশেষ বান্ধবতাও ছিল। রামরায় যে রাধাকৃষ্ণরসে প্রমত্ত, রাজধানীতে ইহা কাহারও অবিদিত ছিল না। ইহার পিতা ভবানন্দ রায় মহাশয়ও সম্ভবতঃ এই রাজসরকারেই কার্য্য করিতেন। তিনিও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেন, কীর্ত্তন করার সময়ে পাঁচটী পুত্র সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণানন্দে নৃত্য করিতেন।

"পঞ্চপুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ।"

ভবানন্দের পাঁচ পুত্র। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে। মহাপ্রভু ভবানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন:—

তুমি পাণ্ডু, পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন।
রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ,
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণী নাথ॥
এই পঞ্চপুত্র তোমার প্রিয়,—মোর প্রিয় পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহভেদ মাত্র॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বৈষ্ণববংশের সবিশেষ পরিচয় জানিতেন। তাই রামরায়ের সহিত দেখা করিতে মহাপ্রভুকে অনুরোধ করেন। মহাপ্রভু এই অনুরোধ রক্ষা করিয়া বলেন:—

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণ।
তোমারে মিলিতে মোর করিল যতন॥

ইহার উত্তরে—রামরায় কহে, সার্ব্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান॥
তার কৃপায় পাইনু তোমার দর্শন।
আজি সফল হইল মোর মনুষ্য জনম॥

মহাপ্রভুর মহীয়সী লীলায় শাক্যসিংহের বৈরাগ্য, সরস্বতীর বিদ্যা, বৃহস্পতির বুদ্ধি, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য, ভীমার্জ্জুনের শৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রম, ভীষ্মের

প্রতিজ্ঞা ও যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা,—অথবা জগতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু গৌরবজনক—তৎসমস্তই যেন শ্রীরাধাপ্রেমে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে :—

কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব পরিকরে॥
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্ব পরিকর।
জন্মি লভিলেন সভে মানুষ ভিতর॥
কি অনন্ত কি শিব, বিরিঞ্চি, ঋষিগণ।
যত অবতারেব পারিষদ আপ্তগণ॥
ভাগবতরূপে জন্ম হইল সভার।
কৃষ্ণ সে জানেন, যার অংশে জন্ম যার॥

* * * * * *

যে যে দেশে গঙ্গা হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত॥
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার॥
শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সভারে করে ত্রাণ॥

মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই এদেশের সর্ব্বত্রই ভক্তিভূমি প্রস্তুত করিতেছিলেন। তিনি শোচ্য দেশে শোচ্য কুলে নিজের পার্ষদ বৈষ্ণবগণকে অবতারিত করিয়া নিজে অবতীর্ণ হয়েন। কলির পরম ধর্ম্ম—নাম

সঙ্কীর্ত্তন। এই সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করা সত্যাদি যুগের লোকেরও বাঞ্ছনীয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবতেঃ—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে॥
নহ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥
কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।

অর্থাৎ গুণজ্ঞ সারভাগী শ্রেষ্ঠ লোকেরা কলির সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিয়া থাকেন। কেবল সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা এই যুগে সকল পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। ইহসংসারে ভ্রমণশীল মনুষ্যদিগের ইহা অপেক্ষা পরম লাভ আর নাই। কারণ ইহা হইতে পরম শান্তি লাভ হয় এবং ইহা হইতেই সংসার বন্ধন মোচন হয়। রাজন্, সত্যাদি যুগের মনুষ্য সকল কলিতে জন্ম ইচ্ছা করেন।

সুতরাং এই সঙ্কীর্ত্তনানন্দে সিদ্ধ ও সাধক শ্রেষ্ঠগণ যে এই ধরাধামে শুভাগমন করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। বহু পূর্ব্ব হইতেই দ্রাবিড়াদি স্থলে মহাভাগবতগণ জন্মগ্রহণ করেন। মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যা অঞ্চল অনেক পূর্ব্ব হইতেই ভক্তির সুধাধারায় পরিপ্লুত হইয়া উঠে। শ্রীভাগবতেও এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভবিষ্যদ্বাণী দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ॥
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী॥ ৩৯॥
কাবেরীচ মহাপুণ্যা প্রতীচীচ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর॥
প্রায়োভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥ ৪০॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম অধ্যায় ১১শ স্কন্ধ।

মহাপুণ্যা তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, কাবেরী প্রতীচী ও মহানদী প্রবাহিত সেই দ্রাবিড়দেশে অনেক হরিভক্ত জন্মগ্রহণ করে না। হে লোকনাথ, যে সকল মানব ঐ সকল নদীর জল পান করেন তাঁহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় এবং তাঁহারা বাসুদেবে প্রায়শঃই ভক্তিমান হইয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়জনদিগকে কৃতার্থ করার জন্যই দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলেন।

ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয় যে মহাপ্রভুর অবতারের পূর্ব্ব হইতেই দক্ষিণাঞ্চলে রায় রামানন্দ প্রভৃতি প্রেমিক ভক্তগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৩০০ শকের শেষভাগে সম্ভবতঃ কটক অঞ্চলে রায় রামানন্দের জন্ম হয়।

রামানন্দ রায় জাতিতে কায়স্থ। তবে এ দেশীয় কায়স্থগণের যেমন ঘোষ, বসু প্রভৃতি আখ্যা আছে, রামানন্দের সেরূপ আখ্যা ছিল কিনা, তাহা জানিতে পারি নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলেন তিনি শূদ্র ছিলেন। যথা :—

এই ত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি সূর্য্যসম।
শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন॥

সে যাহা হউক, রামানন্দের পিতা ভবানন্দ রায় মহাশয় অতি প্রধান লোক ছিলেন। শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে রায় মহাশয় তাঁহার পিতার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"সর্ব্ববিদ্যানদীবিলাসগাম্ভীর্য্যমর্য্যাদাস্থৈর্য্যপ্রসাদাদিগুণরত্নাকরস্য সুরগুরুপ্রণীতনীতিকদম্বকরম্বিতমন্ত্রাপ্রবীকৃতপ্রগুণপৃথ্বীশ্বরস্য শ্রীভবানন্দ রায়স্য তনুজেন শ্রীহরিচরণমানসেন শ্রীরামানন্দ রায়েনকবিনা" ইত্যাদি।

তাঁহার বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও ভগবদ্ভক্তি তদীয় পুত্রে সহস্র গুণে বিবর্দ্ধিত হইয়া সঞ্চারিত হইয়াছিল। বিদ্যা বুদ্ধি গাম্ভীর্য্য মর্য্যাদাস্থৈর্য্য বিনয় ও ভক্তিতে রায় রামানন্দ সর্ব্বত্র সম্মানার্হ হইয়াছিলেন। সুবিশাল

বিস্তানগর-সাম্রাজ্যের শাসনভার রায় রামানন্দের উপর ন্যস্ত করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

অধুনা "দিনমণি-চন্দ্রোদয়" নামক একখানি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচয়িতার নাম মনোহর। ইনি উক্ত গ্রন্থে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে রামানন্দের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; উহা এইরূপ—

"জগন্নাথবল্লভ নাটক দেখি আনন্দ চরণ।
পর পিতামহ রামানন্দ রায় যেহ হন॥
বাণীনাথ পট্টনায়ক মহাশয়।
রামানন্দ ভ্রাতা তিঁহ মোর জ্ঞান হয়॥
বাণীনাথের হইল দুইটি তনয়।
গোকুলানন্দ হরিহর রায় মহাশয়॥
তাহার তনয় এক গোবিন্দানন্দ হইল।
মহা বিস্তাবান্ তিঁহ এই ত কহিল॥
তার দুই পুত্র হৈল নিত্যানন্দ মনোহর।
নিজগ্রাম ছাড়ি পিতা আইল কটক নগর॥
কটকে করিলা তিঁহ এক রাজধানী।
অল্পকাল কিছু নয় জুয়ারের পাণি॥
দুই পুত্র রাখি পিতা হইল অন্তর্ধান।
সকল লইল উড়িয়া রাজা করিয়া শাসন॥
কিঞ্চিৎ রাখিল নিজগ্রাম সাতখানি॥
আর সব লইল রাজা করিয়া সমানি॥" ইত্যাদি।

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, রামানন্দের ভ্রাতা বাণীনাথ পট্টনায়কের দুই পুত্র, গোকুলানন্দ ও হরিহর। হরিহরের এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম গোবিন্দানন্দ। গোবিন্দানন্দের দুই পুত্র,—নিত্যানন্দ ও মনোহর।

পিতৃবিয়োগ ও বিত্তনাশে দুঃখিত হইয়া, মনোহরের ভ্রাতা নিত্যানন্দ রায়, বর্দ্ধমানে আগমন করিয়া, তথায় বিষয়-কর্ম্মের উপলক্ষে বাস করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবসান্তে বর্দ্ধমানে তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মনোহরকেও আনয়ন করেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই তাঁহাদের মাতৃবিয়োগ ঘটে। যথা—

"দুঃখিত হইয়া ভ্রাতা সব ছাড়িয়া আসিল।
বিদ্যানগর গ্রামে পরিজন রাখিল॥
মাতার চরণে ভ্রাতা বিদায় মাগিয়া।
আইল উত্তর দেশে বিষয় লাগিয়া॥
আমিও বালক ভাল মন্দ নাহি জানি।
কতদিনে সমাচার পাঠান আপনি॥
বর্দ্ধমান পরগণা কহিল লিখনে।
আনাইল ভ্রাতা মোরে করিয়া যতনে॥
সেই হইতে রহি দূরে আনন্দ হরিষে।
মাতার অন্তর্ধান শুনিনু বিশেষে॥ ইত্যাদি॥

স্থানান্তরে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

"বিষয়ে আমার চিত্ত উচাটন হয়।
সদাকাল বিষয় মোর, অবকাশ নয়॥
ভ্রাতা মোর জ্যেষ্ঠ শ্রীনিত্যানন্দ দাস।
তাহার কনিষ্ঠ মুঞি মনোহর দাস॥
পিতৃহীন দুই ভাই থাকি সে বিষয়ে।
কেহ নাহি আর মোদের এ ভব-সংসারে॥
পূর্ব্বে ছিলা দক্ষিণ দেশে জাজপুর গ্রাম।
রামাই-আনন্দ-কোলেতে জন্ম এই নিজধাম॥
দক্ষিণে নিবাস হয়, আইনু গৌড় দেশে।
বর্দ্ধমানে রহি দুইজনে বিষয়কর্ম্ম-রসে॥"

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, (১) উড়িষ্যার অন্তঃর্গত জাজপুরের অধীন রামাই-আনন্দকোল নামক*গ্রামে ইহাদের পারিবারিক বাসস্থান ছিল।

(২) বাণীনাথের পৌত্র গোবিন্দানন্দ কটক নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ইহারা জমীদার ছিলেন।

(৩) গোবিন্দানন্দের মৃত্যুর পর, রাজা তাঁহার পুত্রদ্বয়কে সাতখানি গ্রাম দিয়া, অবশিষ্ট সম্পত্তি খাস করেন।

(৪) রাজা রামানন্দ রায়ের শাসনাধীন বিদ্যানগরেও এই কাল পর্য্যন্ত ইহাদের বাসভবন ছিল।

(৫) নিত্যানন্দ রায় পৈত্রিক সম্পত্তি হারা হইয়া পরিজনকে বিদ্যা-নগরের প্রাচীন বাটীতে রাখিয়া, বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি বর্দ্ধ-মান নগরে স্বীয় বিষয় কার্য্য করেন এবং এখানে এক বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া মনোহরের সহিত এই স্থলে বাস করেন। এই সময়েই তাঁহাদের মাতা পরলোক গমন করেন।

(৬) নিত্যানন্দ রায় বর্দ্ধমানে প্রচুর সম্পত্তি করিয়াছিলেন।

এই সকল বিবরণ যথার্থ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, আমি এমত বলিতে সাহসী নহি। মহদ্বংশ হইতে জাত বলিয়া নিজকে পরিচিত করিতে প্রয়াস পাওয়া মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। গ্রন্থখানি যে খুব প্রাচীন তাহাও মনে হয় না। তিন শত বৎসর পূর্ব্বের গ্রন্থেও বর্দ্ধমাননামক স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত গ্রন্থখানিতে যেরূপ লিখিত আছে এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করা হইল মাত্র।

যাহা হউক শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এক একটী অন্তরঙ্গ ভক্ত দ্বারা জগতে এক এক তত্ত্ব প্রকটন করেন। তিনি শ্রীল রায় রামানন্দ দ্বারা প্রেমভক্তি-তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

সন্ন্যাসি পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ॥

ভক্তি-তত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারায় নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারায় ভক্তিসিদ্ধান্তবিলাস॥
শ্রীরূপ দ্বারায় ব্রজের প্রেমরস-লীলা।
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা॥
চৈতন্যের লীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
ত্রিজগৎ ভাসাইতে পারে যার একবিন্দু॥

মহাপ্রভুর লীলার এই এক মহা বৈচিত্র্য যে, তিনি শতমুখে ভক্তের গুণ প্রকটন করিয়া ভক্ত-মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিতেন। তাই শ্রীচরিতামৃত-কার লিখিয়াছেন :—

ভক্ত প্রকাশিত গৌর ভাল জানে।
নানা ভঙ্গীতে গুণ প্রকাশি নিজ লাভ মানে॥

শ্রীল বল্লভ ভট্টের নিকট মহাপ্রভু বলেন :—

রামানন্দ রায় মহাভাগবত প্রধান।
তেঁহো জানাইল, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥
তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি।
রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাব আর।
দাস সখা গুরু কান্ত আশ্রয় যাহার॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানযুক্ত কেবলাভাব আর
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে না পাইল ব্রজেন্দ্র কুমার
শুদ্ধ ভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ
শুদ্ধ ভাবে ব্রজেশ্বরী করিল বন্ধন

"মোর সখা, মোর পুত্র" এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুক ব্যাস করে যারে প্রশংসন॥
ঐশ্বর্য্য দেখিলেহো শুদ্ধের নহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান।
অতএব ঐশ্বর্য্য হইতে কেবল ভাব প্রধান॥
এ সব শিখাইল মোরে রায় রামানন্দ।
অনর্গল রসবেত্তা,—প্রেমসুখানন্দ॥

রস কাহাকে বলে, অনর্গল বসই বা কি, মানুষের সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। রায় রামানন্দের সহিত যখন প্রভুর এই প্রেমতত্ত্বের ও রসতত্ত্বের আলাপ হয়, তখন রামরায় বলিয়াছিলেন :—

কৃষ্ণকে আহ্লাদে,—তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপে কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণ সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ—তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥

কৃষ্ণ-তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরাম রায়ের সিদ্ধান্ত কিরূপ গভীর এবং কীদৃশ দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ, এই কয়েকটী পংক্তি-পাঠেই তাহার যথেষ্ট আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কথিত উদ্ধৃত বাক্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে শ্রীরায় রামানন্দ প্রকৃতপক্ষেই "প্রেম-সুখানন্দ" এবং "অনর্গলরসবেত্তা"। লৌকিক রস, পরিণামবিরস, পঙ্কিল ও বিষয়দুষ্ট; কিন্তু প্রেমরূপ-আনন্দচিন্ময় রস অনর্গল। গোপীগণ এই আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা। সে রসের কথা এখন তুলিব না। সে এক মহাসাগর,—উহার কুল কিনারা নাই, বলিতে গেলে ভাসিয়া যাইব, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনও কথা এখন বলা হইবে না। যথাস্থানে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে। এস্থলে শ্রীল রামরায়ের সম্বন্ধে

আরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। শ্রীল রামরায়ের ব্যক্তিগত ঐতিহাসিক পরিচয় প্রদানের প্রয়াস ও উপাদান আমাদের অতি অল্প। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতি গভীর প্রেমরসতত্ত্বাদির জ্ঞান এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের উজ্জ্বলতম দার্শনিক তত্ত্বপ্রকাশ-গৌরব-বৈভবের যথেষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন আছে। শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন :—

রামানন্দ রায়ে মোর কোটী নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥

* * * * *

মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাবভক্তিপ্রেমসীমা॥

* * * * *

গৃহস্থ হইয়া রায় নহে ষড়্ বর্গের বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥

পাঠক মহোদয় অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন, এই সন্ন্যাসীটী কে? ইনি আমাদের স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। যিনি স্বয়ং জগৎগুরু, স্বয়ং ভগবান্ তিনি রামরায়ের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার প্রশ্নের ভঙ্গি শুনুন :—

কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা-স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব-প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বই কেহ ইহা নিরূপিতে নারে॥

* * * * *

সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হইল।
কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বকথা তাঁহারে পুছিল॥

তেঁহ কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে তিঁহ নাহি হেথা॥
তোমার ঠাই আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥

রায় রামানন্দ বস্তুটী কি, একবার ভাবিয়া দেখুন। অতঃপরে কৃপাময় পাঠক জানিতে পারিবেন, প্রদ্যুম্ন মিশ্রকেও প্রভু কিরূপ উপদেশ করিয়া কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করিতে রাম রায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রেমের ঠাকুর, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর রামরায়ের মুখে অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেমের অনর্গল চিন্ময়রসের যে মহাতত্ত্ব প্রকটন করেন, সে তত্ত্ব মানুষের পক্ষে এক অদ্বিতীয় শুভকর আশীর্ব্বাদ। সেই তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য। সেই সকল তত্ত্ব শুনিয়া—

"প্রভু কহে আইলাম শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন॥
যৈছে শুনিল, তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস-জ্ঞানের তুমি সীমা॥"

* * * * *

"নীলাচলে তুমি আমি রহিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥"

শেষ-লীলায় সত্যসঙ্কল্প মহাপ্রভু এই বাক্যের সার্থকতা করিয়াছিলেন। শ্রীল রামরায় নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সুখময়ী কৃষ্ণকথায় জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

আমার সেই প্রাণের স্বরূপ-দামোদর ও প্রাণের এই রামরায় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাকুল শ্রীগৌরাঙ্গের শেষ লীলায় নিত্য সহচর,—যেন কৃষ্ণবিরহিনী যোগিনী শ্রীমতী রাধিকার পার্শ্বে ললিতা ও বিশাখা।

শেষ লীলায় নীলাচলে কিরূপ কৃষ্ণকথা হইত, সেই কথা মনে হওয়ায় শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের একটী পদ মনে পড়িল ; পদটী এই ঃ—

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি॥
নিজ করোপরে রাখিয়া কপোল
মহা যোগিনীর পারা।
ও দুটী নয়নে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা॥
হেনকালে তথা আইল ললিতা
রাই দেখিবারে তরে।
সে দশা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া
তুলিয়া লইল কোলে॥
নিজ বাস দিয়া মুছিয়ে পুছয়ে
মধুর মধুর বাণী।
"আজু কেনে ধনি হয়েছ এমনি
কহনা কি লাগি শুনি॥
আজনম সুখী তুমি বিধুমুখী
কভু না হেরিয়া আন।
আজ কেন বল কান্দিয়া ব্যাকুল
কেমন করিছে প্রাণ॥

চাঁচর চিকুর কিছু না সম্বর
কেনে হইলে অগেয়ান।
চণ্ডীদাস কহে বেজেছে হৃদয়ে
শ্যামের পিরীতি বাণ॥

নীলাচলের কৃষ্ণকথা,—কেবল অবিরল অশ্রুজল! স্বরূপ-দামোদর ও রামরায় সেই অশ্রুজলের অংশী, সাক্ষী ও মর্ম্ম সখা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সকল কথা এখানে তুলিব না। শ্রীরামরায়ের পরিচয় সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে পারিলাম না। শ্রীচরিতামৃতকার এক স্থানে লিখিয়াছেন ঃ—

"অনন্ত চৈতন্য-কথা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খেয়ে তার করি টানাটানি॥"

ইহা শ্রীকৃষ্ণদাসের উক্তি,—ইহার পরে আর অন্যের কথা কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তত্ত্ব-কথা।

মহাপ্রভু শ্রীরাম রায়কে মহাভক্ত বলিয়া জানিয়াও লোকাচার-অনুরোধে তাঁহার আলয়ে গমন করিলেন না, কেননা তিনি বিষয়ী। প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে প্রভু, একজন ভক্ত ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণে তদ্‌গৃহে পদার্পণ করিয়া ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করিলেন। প্রভু ও তাঁহার প্রিয়ভক্ত উৎকণ্ঠায় দিবাযাম অতিবাহিত করেন। রায় রামানন্দ সায়াহ্নে ব্রাহ্মণ ভবনে উপস্থিত হইয়া প্রভুর শ্রীপদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। তিনি পরম ভক্ত রামরায়কে আলিঙ্গন করিয়া সাদরে সম্ভাষণ করিলেন। স্থান অতি নির্জ্জন। এই নির্জ্জন স্থানে সাক্ষাৎ জগৎপতির শ্রীচরণ-প্রান্তে তাঁহার পরম ভক্ত শ্রীরাম রায় দীনভাবে উপবেশন করিলেন। তখন ধর্ম্ম কথা আরম্ভ হইল।

ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত প্রকার আন্দোলন আলোচনা হইয়াছে, প্রভুর প্রশ্নে শ্রীরামরায়ের প্রত্যুত্তরে সেই তত্ত্ব যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, জগতের আর কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে উহার শতাংশের একাংশও দৃষ্ট হয় না। এতৎ সম্বন্ধে যতই আলোচনা হয়, জগতের পক্ষে ততই মঙ্গল। এই আলোচনা অসীম ও অনন্ত। এস্থলে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে দুই একটী কথার উল্লেখ করা যাইতেছে।

মহাপ্রভু বলিলেন "রাম রায়, তোমার মুখে তত্ত্ব-কথা শুনিব এই আশায় আসিয়াছি, সাধ্য-নির্ণয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।"

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

পরমপণ্ডিত শ্রীল রামরায় ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া তদুত্তরে বলিলেন—প্রভো' স্বধর্ম্মাচরণেই বিষ্ণুভক্তির উদয় হয়। এ বিষয়ে প্রমাণ এই যে;—

বর্ণাশ্রমচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তৎ তোষকারণম্॥

বিষ্ণুপুরাণ ৩।৮।৯

অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচারশীল পুরুষ দ্বারাই পরম পুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হয়েন। ইহাই তাঁহার পরিতুষ্টির কারণ। এতদ্ব্যতীত তাঁহার তুষ্টির আর দ্বিতীয় পথ নাই।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই স্বধর্ম্মাচরণ। সাধনে যাহা লভ্য হয়, তাহাই সাধ্য। বিষ্ণুভক্তিই সাধ্য। স্বধর্ম্মাচরণ ইহার বহিরঙ্গ সাধন।

সাধকের পক্ষে সর্ব্বপ্রথমে যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালনীয়, ইহাই এই শাস্ত্রীয় বাক্যের মর্ম্ম। বর্ণাশ্রম, ভক্তিরই সাধন। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তি-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন :—

যতো যশ্চ শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমাচারো বিধীয়তে তস্যাপ্যনুপম চরিতং ফলং,—ভক্তিরেব।

দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ
শ্রেয়োভি র্ব্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিপালন ভিন্ন দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি ঘটে না। অধিকার ভেদেই শাস্ত্রীয় বিধির প্রবর্ত্তন। পদ্মপুরাণেও লিখিত হইয়াছে :—

বর্ণাশ্রমানুরূপঞ্চ কর্ত্তব্যং বৈষ্ণবৈঃ শুভৈঃ।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিত্যমাচারমাচরেৎ॥
শ্রুতি-স্মৃত্যুক্তমাচারং যো ন সেবেত বৈষ্ণবঃ।
পঞ্চপাষণ্ড-মাপন্নো রৌরবে নরকে বসেৎ॥
তস্মাৎ স্মৃত্যুক্তমাচারং কুর্য্যাদ্বৈ মানবঃ সদা।
স্বাধিকারং নিরীক্ষ্যৈব কর্ম্মকুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥

শ্রীপদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড ৯৫ অধ্যায়।

"বর্ণাশ্রম প্রতিপালন ভিন্ন বিষ্ণুর পরিতোষের অন্য পন্থা নাই।" ইহা

প্রাথমিক সাধক সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। আমরা বিষয়ী। চিন্ময়রাজ্যের কোন তত্ত্বই আমাদের নিকট স্ফুট নহে। আমাদের জড়বৎ চিত্তে চিজ্জগতের সত্যরেখার উন্মেষের জন্য সর্ব্বপ্রথমে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অবশ্যই প্রতিপালনীয়। শাস্ত্রাকারগণের বিশ্বাস, অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে বর্ণাশ্রমাচার-পালনে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, তাহার ফলে চিত্তমালিন্যকর রজস্তমোগুণের হ্রাস হয়, অতঃপরে মহৎসঙ্গে ভক্তির উদয় হয়। শ্রীল রাম রায়ের মুখে মহাপ্রভু ধর্ম্মের সমস্ত তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়া জীবশিক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর ধর্ম্মই যথাযথরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীরামরায় যে উত্তর করিলেন, প্রভু তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া বলিলেন "ইহা ধর্ম্মের বাহ্য সাধন। বর্ণাশ্রমাচার সাধ্য নহে,—সাধন, অতি বহিরঙ্গ সাধন। যেহেতু—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
কায়ক্লেশফলং তাসাং স্বৈরিণীব্যভিচারবৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও লিখিত আছে—

কলৌ কলুষচিত্তানাং বৃথায়ুঃ প্রভৃতীনি চ।
ভবন্তি বর্ণাশ্রমিণাং ন তু মচ্ছরণার্থিনাম্॥

সুতরাং কেবল বর্ণাশ্রমাচার,—সাধ্য নহে, ইহার পরে আর কি আছে, বল।

কর্ম্মার্পণ।

রামরায় বলিলেন, "তাহা হইলে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণই সাধ্য।" শাস্ত্র এই যে—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥

গীতা (৯।২৭)

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কর, যাহা আহার কর, যাহা হবন কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর তৎসমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মে সকামতা আছে, কিন্তু কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণে সে সকামতা দোষ পরিহৃত হয়। কৃষ্ণপ্রীতির জন্য যে কর্ম্ম, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই নিষ্কাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ভূয়োভূয়ঃ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। চিত্তকে ভগবদুন্মুখ করার জন্য কেবল তাঁহার প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করা প্রাথমিক সাধন। এইরূপ কর্ম্মার্পণ "আরোপসিদ্ধা" ভক্তি নামে অভিহিত। আরোপ সিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা এবং জ্ঞানসিদ্ধাভেদে ভক্তি তিন প্রকার। স্বরূপতঃ ভক্তি না হইয়াও যাহাতে ভক্তিভাব আরোপিত হয় তাহাই আরোপসিদ্ধা ভক্তি। ভগবদর্পিত কর্ম্মাদিই ইহার উদাহরণ স্থল। স্বরূপতঃ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির পরিকররূপে নির্দ্দিষ্ট তদন্তঃপাতি জ্ঞান ও কর্ম্মাঙ্গভূত বৈরাগ্য দানাদি ভক্তির সঙ্গে থাকিলে উহারা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। শ্রীভগবানের নাম গুণলীলাদি শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণমননাদিই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। কর্ম্মত্যাগের অধিকার সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন :—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥

শ্রীভাগবতে (১১।২০।৯)

অর্থাৎ হে উদ্ধব যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নির্ব্বেদ না জন্মে এবং আমার কথা, শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে পর্য্যন্ত স্বাধিকারবিহিত বিবিধ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে কিন্তু ভগবদ্ভাব বিবর্জ্জিত কর্ম্ম ভক্তির সাধক নহে, সুতরাং কর্ম্ম ও কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করার বিধান স্বীকৃত হইয়াছে।

কিন্তু প্রভু ইহাও উপেক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন "ইহাও বাহ্য। ইহার পরে কি তাই বল।"

রায় মহাশয় বুঝিলেন, প্রভু সকাম নিষ্কাম সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকেই

বহিরঙ্গ বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। তখন তিনি বলিলেন "প্রভো বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম দুই প্রকার—এক সকাম, অপর নিষ্কাম। সকাম অপেক্ষা নিষ্কাম শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু আপনি এই দুইটীই বাহ্য বলিয়া উপদেশ করিলেন। আমার মনে হয় তবে বুঝি স্বধর্ম্মত্যাগই সাধ্যতত্ত্বের সার। যথা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

শরণাপত্তি

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

শ্রীভগবদ্গীতা ১৮।৬৬

ভক্তিশাস্ত্রে ইহাই শরণাপত্তি (৫) নামে অভিহিত। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি আরোপসিদ্ধা। শরণাপত্তি কর্ম্মমিশ্রা না হইলেও দুঃখপ্রতিষেধবাসনামূলা।

প্রভু বলিলেন, ইহাও বাহ্য; ইহার পরে আর কি, বল। শ্রীল রামরায় বলিলেন, প্রভো তাহা হইলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হউক। কেননা জ্ঞানিভক্তের আত্মা প্রসন্ন, তাঁহার সুখ দুঃখ নাই। শ্রীগীতা বলেন :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

১৮।৫৪

এতদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের সাধ্যত্ব কথিত হইল, কিন্তু প্রভু ব্রহ্মজ্ঞানকেও সাধ্য মনে করিলেন না। প্রভু বলিলেন ইহা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বটে। কিন্তু ইহা সাধ্য নহে। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। ইহার পর আর কি আছে তাহাই বল। প্রভু যখন

শুদ্ধভক্তি

---

(৫) শরণাপত্তির লক্ষণসম্বন্ধে বৈষ্ণবতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে :—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
আত্মনিক্ষেপঃ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

ব্রহ্মজ্ঞানকেও বাহ্য বলিলেন, তখন রামরায় জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা তুলিয়া বলিলেন :—

জ্ঞানেপ্রয়াস মুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোজিত জিতোঽপ্যসি তৈ স্ত্রিলোক্যাম্॥

শ্রীভাগবত (১০।১৪।৩)

অর্থাৎ হে ভগবন্, যাঁহারা নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানে প্রয়াস না পাইয়া ভক্তসঙ্গে বাস করেন এবং ভক্তমুখরিত ভবদীয় বার্ত্তা শ্রবণে দেহমন দ্বারা তাহাতেই জীবন অতিবাহিত করেন, হে প্রভো, তুমি ত্রিভুবনে অজিত হইয়াও তাঁহাদিগ দ্বারা জিত হইয়া থাক।

শ্রীল রামরায়ের প্রমুখাৎ প্রভু এই বিশুদ্ধ ভক্তির কথা শুনিয়া বলিলেন "রামরায়, সাধ্য-তত্ত্বের মধ্যে এই বিশুদ্ধ ভক্তি গ্রাহ্য বটে, কিন্তু ইহাই চরম নহে।"

প্রিয় পাঠক, বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধ্য-তত্ত্ব কত উচ্চে অবস্থিত, এখান হইতেই তাহার সোপান নিরীক্ষণ করুন। নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানীর যাহা চরম সাধ্য, বৈষ্ণবের সাধ্যের প্রথম সোপান তাহারও পরে। বিশুদ্ধ ভক্তি হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মের সাধ্যতত্ত্বের প্রথম সোপানারম্ভ। এই সোপান হইতে অনেক গুলি সোপান অতিক্রম করিলে সাধ্যতত্ত্বের নিগূঢ় প্রদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। সাধন ভক্তির পরেও যখন প্রভুর জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল না, তখন রামরায় বলিলেন, "প্রভো প্রেমভক্তিই সর্ব্ব-সাধ্যসার। এই বলিয়া তিনি স্বরচিত শ্লোক পাঠ করিলেন যথা :—

প্রেমভক্তি।

নানোপচারকৃতপূজন মার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্ত-হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।

যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নন্থ ভক্ষ্যপেয়ে॥

অর্থাৎ বিবিধ উপচার দ্বারা পূজা ব্যতীতও কেবল প্রেম দ্বারাই ভক্তহৃদয় সুখে দ্রবীভূত হয়। যে পর্য্যন্ত বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা বর্ত্তমান থাকে, সেই পর্য্যন্ত ভক্ষ্যপেয় সুখের কারণ হয়। (৬)

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রিয়তাম্ যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈ র্ন লভ্যতে॥

অর্থাৎ যদি কোথাও কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি পাওয়া যায়, তবে, তাহা তৎক্ষণাৎ ক্রয় কর। লোভই উহার একমাত্র মূল্য। কোটী

---

(৬) এই পদ্যটী টীকাতে বিবিধভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীচরিতামৃতের বৈষ্ণব সুখদা নাম্নী এক খানি টীকা আছে। সেই টীকাগ্রন্থে উক্ত শ্লোকের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়।

(৫) নানেতি—(১) ভক্তস্য হৃদয়ং মনঃ প্রেম্নৈব সুখবিক্রুতং সুখেন গলিতপ্রায়ং স্যাৎ। কীদৃশং হৃদয়ং—আর্ত্তবন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নানোপচারৈঃ কৃতং পূজনং যেন এতত্ত্তমপি।

(২) যদ্বা, হে ভক্ত আর্ত্তবন্ধো! হৃদয়ং নানোপচারৈঃ কৃতং পূজনং যস্য তাদৃশমপি প্রেম্নৈব সুখবিক্রুতং স্যাৎ।

(৩) যদ্বা, উপচারকৃতপূজনং, নানা, বিনা। (নানা—অনেকবিনার্থয়োরিতি—মোপালিতঃ)।

নিদর্শগর্ভঃ দৃষ্টান্তমাহ, যাবদিতি—যাবৎ জঠরে মহতী ক্ষুধা পিপাসা পানেচ্ছা তৃক্কেতি যাবৎ তাবৎ ভক্ষ্যপেয়ে সুখায় ভবতঃ।

(৪) কোন টীকাকার "আর্ত্তবন্ধোঃ কৃষ্ণস্য হৃদয়ং কিন্তু তং নানোপচারকৃতপূজনম্" এইরূপ ব্যাখ্যা করেন।

(৫) কোন টীকাকার "আর্ত্তবন্ধো" পদটীকে শ্রীকৃষ্ণের সম্বোধনরূপে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন।

জন্মের সুকৃতি দ্বারাও এই লোল্য প্রাপ্ত হওয়া সুদুষ্কর। এই শ্লোকটী প্রেমভক্তির উদাহরণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকটনের নিমিত্ত মহাপ্রভু শ্রীল রামরায় দ্বারা জগতে সাধ্যের সারতম তত্ত্ব প্রকাশিত করেন। রামরায় যতক্ষণ কর্ম্মাদির বিষয় বলিতেছিলেন, প্রভু তৎসমস্তই বহিরঙ্গ বলিয়া তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছিলেন। যখন প্রেমভক্তির কথা উপস্থাপিত করা হইল, প্রভু তখন তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন :—

"এহো হয়, আগে কহ আর।"

প্রেমভক্তির প্রথম সোপান—দাস্য। তাই রায় মহাশয় সর্ব্ব প্রথমে দাস্য প্রেমের মাহাত্ম্যসূচক একটী শ্লোক পাঠ করিয়া বলিলেন :—

দাস্যভাব

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে।"

শ্রীভাগবত (৯।৫।১৬)

অর্থাৎ যে তীর্থপদ শ্রীভগবানের নাম শ্রুতিবিষয়ে প্রবিষ্ট হইলেই লোক নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হইয়া যায়, এ জগতে তাঁহার দাসদের আর কি কোন সাধন অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ শ্রীভগবদ্দাসগণের পক্ষে সকল সিদ্ধিই করতলগত। তিনি আরও একটী শ্লোক দ্বারা দাস্যপ্রেমের মাহাত্ম্য প্রকটিত করেন তাহা এই যে—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথজীবিতম্॥

গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ।

অর্থাৎ হে নাথ, আমার এমন দিন কবে হবে যে আমি তোমার ঐকান্তিক নিত্য কিঙ্কর হইয়া সতত তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে প্রশান্তমনা হইয়া তোমার অনুচর হইব এবং অনাথ আমি সনাথ হইয়া পরমানন্দ লাভ করিব।

দাস্যপ্রেমের এই ভাব প্রাথমিক প্রেমভক্তি-সাধকের একান্ত উপযোগী। কিন্তু বলা বাহুল্য প্রেমভক্তি লাভের জন্য সর্ব্বপ্রথমে শাস্ত্রীয় বিধান প্রতিপালন অত্যাবশ্যক। প্রভু বর্ণাশ্রমাচারজনিত সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মকে বহিরঙ্গ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ সাধ্য-তত্ত্বের আলোচনায় এই সকল বিষয় যে বাহ্য তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিগণের দেহ শুদ্ধি হয় না। অশুদ্ধ দেহে কৃষ্ণভক্তির উদয় অসম্ভব। অসাত্ত্বিক আহার, গ্রাম্য কথায় কালযাপন, গ্রাম্য ভাবনায় মনের একাগ্রতা প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তির বাধক। সুতরাং আদৌ দেহ-শুদ্ধির জন্য শাস্ত্রীয় বিধান মত জীবনের কার্য্য নিয়মিত করা কর্ত্তব্য। জীবন যদি এইরূপে নিয়মিত না হয়, তবে ভক্তির সাধন-রাজ্যে প্রবেশ-পথ পাওয়াই অসম্ভব। প্রভু ঐ সকল কর্ম্মকে বহিরঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেও আমাদের ন্যায় বহিরঙ্গগণের সর্ব্ব প্রথমে ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য। একদিকে যেমন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে, অপর দিকে তেমনি আবার চিত্তকে বিশুদ্ধ ভক্তির দিকে অগ্রসর করিতে হইবে। প্রেমভক্তির প্রথম সঞ্চারে প্রাণ ভগবদ্দাস্যের জন্য আকুল হয়। তখন সততই শ্রীভগবানের শ্রীচরণান্তিকে থাকিয়া তাঁহার সেবা, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন প্রভৃতি করিয়া তাঁহার সন্তোষ জন্মাইতে ইচ্ছা হয় এবং তাঁহার সন্তোষেই নিজের চিত্তে পরমানন্দের উদয় হয়।

সাধক যখন প্রেমভক্তির সুখময় রাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন এ জগতে থাকিয়াও তাঁহার একটা জগৎছাড়া ভাব হয়, তখন সাধারণের অতীন্দ্রিয়, অভক্তের অদৃশ্য, প্রেমের ঠাকুর তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসেন। সাধক

তখন আপন হৃদয়ে তাঁহার প্রাণবল্লভের রূপরাশি প্রত্যক্ষ করিয়া বিভোর ও বিহ্বল হইয়া পড়েন। কুসুম-মধু-লুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় সাধক ভক্ত তখন শ্রীভগবৎপদারবিন্দমকরন্দলোভে সততই তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে চাহেন। তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান, বাহ্য তৃষ্ণার বিলোপ হয়।

ইহজগতের প্রভুদের সহিত সেই প্রেমের প্রভুর তুলনা হয় না। তিনি প্রভু অথচ প্রিয় সুহৃদ। সাধক ভক্ত তাঁহার দাস অথচ নিঃসঙ্কোচ দাস। সে রাজ্যে সুধুই মাধুর্য্যের প্রভুত্ব, সেখানে কঠোরতা নাই, ভ্রুভঙ্গি নাই, উচ্চবাক্য নাই। সেখানে প্রেমের প্রভু,—প্রেমের দাস। তাই গোপীরা বলিতেন "আমরা তোমার "অশুল্কদাসিকা" অর্থাৎ আমরা বিনা বেতনে তোমার পায়ে নিজদের জীবন সমর্পণ করিয়া দাসী হইয়াছি।" ইহা দাস্যপ্রেম ভক্তির আকর্ষণের ফল। দাস্য প্রেমভক্তির ক্রিয়া যতই বলবতী হয়, জীব ভগবৎ চরণান্তিকে ততই প্রবলবেগে আকৃষ্ট হইতে থাকে। সুতরাং প্রেমভক্তির রাজ্যে প্রবেশে দাস্যই প্রথম সোপান।

দাস্য-ভক্তি রস-বিশেষ। রসের বিষয় ও আশ্রয় থাকে। ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী সর্ব্বজ্ঞ ও ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ এই রসের বিষয়ালম্বন। তাঁহার শ্রীচরণসেবাপরায়ণ ভক্তই ইহার আশ্রয়ালম্বন। দাস্যসেবাপরায়ণ ভক্ত, মমতাযুক্ত, গৌরবভাবময়, শ্রীভগবন্নিষ্ঠ, ও জনসমাজের উপকারক। অধিকৃতভক্ত, আশ্রিতভক্ত, পারিষদ ও অনুগামী ভেদে এই রসের আশ্রয়ালম্বন চারিভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে ব্রহ্মশঙ্করাদি দেবতারা অধিকৃত ভক্ত। আশ্রিত ভক্ত ত্রিবিধ—শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ। কালিয়নাগ, মগধরাজ-জরাসন্ধ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও রুদ্ধ রাজগণ শরণ্য ভক্ত। যাঁহারা পূর্ব্বে জ্ঞানী ছিলেন, পরে ভক্তিরসের আস্বাদন পাইয়া দাস্য প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহারাই জ্ঞানিচর। সনকাদি মুনিগণ এই শ্রেণীর উদাহরণ।* যাঁহারা প্রথম হইতেই সেবানিষ্ঠ, তাঁহারা সেবানিষ্ঠ দাস্যাবলম্বী বলিয়া অভিহিত; চন্দ্রধ্বজ, হরিহর ও বহুলাশ্ব রাজগণ এই বিভাগের অন্তর্গত। উদ্ধব দারুক ও শ্রুতদেবাদি

ক্ষত্রিয়গণ এবং উপনন্দাদি গোপগণ—পারিষদ। চতুর্থ শ্রেণী—অনুগামী। অনুগামী দাস্যভক্তের বিবিধ বিভাগ আছে। পুরে সুচন্দ্র ও মণ্ডনাদি এবং ব্রজে রক্ত-পত্রক-মধুকণ্ঠাদি অনুগামী। এই অনুগামীদিগের মধ্যে যাঁহারা সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণসেবক, তাঁহারা ধূর্য্যভক্ত; যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গে অধিক আদরযুক্ত, তাঁহারা ধীরভক্ত, আর যাঁহারা কৃষ্ণের কৃপালাভে গর্ব্বিত, এবং নিরপেক্ষ, তাঁহারা বীরভক্ত। নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ ও সাধকভেদে এই শ্রেণীর ভক্ত ত্রিবিধ।

দাস্যরসের তিনটী অবস্থা,—প্রেম, স্নেহ ও রাগ; তন্মধ্যে অধিকৃত-ভক্তে ও আশ্রিতভক্তে প্রেম পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, পারিষদভক্তে স্নেহ পর্য্যন্ত এবং পরীক্ষিৎ দারুক ও উদ্ধবে রাগ পর্য্যন্ত প্রকট হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রজানুগ রক্তকাদিতে এবং পুরে প্রদ্যুম্নাদিতে সকল গুলি অবস্থাই দৃষ্ট হয়। দাস্য-রসে আযোগ, যোগ ও বিয়োগ এই তিন অবস্থাই থাকে। প্রথম দর্শনের পূর্ব্বের অবস্থার নাম—অযোগ; দর্শনের পর যে বিচ্ছেদ ঘটে তাহার নাম বিয়োগ; মধ্যাবস্থায় সঙ্গের নাম যোগ। দাস ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগে, অঙ্গ-তাপ, কৃশতা, জাগরণ, আলম্বনশূন্যতা, অধীরতা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যুতুল্য অবস্থা ঘটিয়া থাকে। অযোগে ঔৎসুক্যাদি এবং যোগে সিদ্ধিতুষ্টি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ দাস্যভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হৃদয়ের যে একটা প্রবল আকর্ষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এই সকল বিষয়ের বিচারে তাহা স্পষ্টতঃই অনুমিত হয়। এই নিমিত্তই রামরায় দাস্যভক্তিকে সাধ্য বলিয়া অভিহিত করিলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দাস্যপ্রেমের কথা শুনিয়া বলিলেন "সাধ্য তত্ত্বের মধ্যে দাস্যপ্রেম প্রেমসাধনের উপায় বটে। কিন্তু ইহা সাধ্য-তত্ত্বের সার নহে। ইহার পরে কি তাহাই বল।" শ্রীরাম রায় মহাশয় অতঃপরে সখ্যপ্রেমের

সখ্যভাব। কথা তুলিলেন। প্রেমের রাজ্য—জীবের আপন রাজ্য। বাহিরে বাহিরে দূরে দূরে থাকিলে আপনার হইতে আপন

যে শ্রীভগবান্,—তাঁহার প্রেমসেবা সম্ভবে না। তাই দাস্য, প্রেমসেবার উপায় হইলেও উহাতে যেন সাধককে একটুকু ভীত-ভীত, একটুকু ফাঁক-ফাঁক—একটুকু দূরে-দূরে রাখে। প্রেম চাহে মাখামাখি। সুতরাং দাস্য হইতে সখ্যপ্রেম অধিকতর মাখামাখিজনক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে ঃ—

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন।
তার প্রেমবশে আমি না হই অধীন॥

দাস্যপ্রেমে প্রেমের ভাব আছে, কিন্তু ইহাতে সম্ভ্রম ও ভক্তি প্রভৃতিজনিত সঙ্কোচতাও আছে। সুতরাং দাস্য প্রেমভক্তি, সাধ্যতত্ত্ব হইলেও প্রেম-রাজ্যে দাস্যপ্রেমের আদর অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কিন্তু আমাদের মত বহিরঙ্গগণ অনেক জন্মের তপস্যাতেও বোধ হয় দাস্য-প্রেমের অধিকার লাভ করিতে পারে না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত শ্রীরাম রায়ের যে আলাপ হইতেছে, উহা প্রেমের উচ্চতম বিকাশের কথা। উহা সাধারণ সাধকের দুষ্প্রেক্ষ্য। দাস্যপ্রেম অপেক্ষা সখ্যপ্রেম উচ্চতর। শ্রীচরিতামৃতের উক্ত অধ্যায়েই লিখিত আছে ঃ—

সখা শুদ্ধ সখ্যে কর স্কন্ধে আরোহণ।
"তুমি কোন বড়লোক" তুমি আমি সম॥

শ্রীভগবানকে সখা বলিয়া সম্বোধন করায়, তাঁহার সহিত সখ্যভাবে বিচরণ করায় যে অনন্ত মাধুর্য্যানন্দ সম্ভোগ করা যায়, তাহা কেবল ব্রজরাখাল-গণের লীলাতেই পরিলক্ষিত হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতকার বলেন ঃ—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।

ক্ষত্রিয়গণ এবং উপনন্দাদি গোপগণ—পারিষদ। চতুর্থ শ্রেণী—অনুগামী। অনুগামী দাস্যভক্তের বিবিধ বিভাগ আছে। পুরে সুচন্দ্র ও মণ্ডনাদি এবং ব্রজে রক্ত-পত্রক-মধুকণ্ঠাদি অনুগামী। এই অনুগামীদিগের মধ্যে যাঁহারা সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণসেবক, তাঁহারা ধূর্য্যভক্ত; যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গে অধিক আদরযুক্ত, তাঁহারা ধীরভক্ত, আর যাঁহারা কৃষ্ণের কৃপালাভে গর্ব্বিত, এবং নিরপেক্ষ, তাঁহারা বীরভক্ত। নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ ও সাধকভেদে এই শ্রেণীর ভক্ত ত্রিবিধ।

দাস্যরসের তিনটী অবস্থা,—প্রেম, স্নেহ ও রাগ; তন্মধ্যে অধিকৃত-ভক্তে ও আশ্রিতভক্তে প্রেম পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, পারিষদভক্তে স্নেহ পর্য্যন্ত এবং পরীক্ষিৎ দারুক ও উদ্ধবে রাগ পর্য্যন্ত প্রকট হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রজানুগ রক্তকাদিতে এবং পুরে প্রদ্যুম্নাদিতে সকল গুলি অবস্থাই দৃষ্ট হয়। দাস্য-রসে অযোগ, যোগ ও বিয়োগ এই তিন অবস্থাই থাকে। প্রথম দর্শনের পূর্ব্বের অবস্থার নাম—অযোগ; দর্শনের পর যে বিচ্ছেদ ঘটে তাহার নাম বিয়োগ; মধ্যাবস্থায় সঙ্গের নাম যোগ। দাস ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগে, অঙ্গ-তাপ, কৃশতা, জাগরণ, আলম্বনশূন্যতা, অধীরতা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যুতুল্য অবস্থা ঘটিয়া থাকে। অযোগে ঔৎসুক্যাদি এবং যোগে সিদ্ধিতুষ্টি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ দাস্যভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হৃদয়ের যে একটা প্রবল আকর্ষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এই সকল বিষয়ের বিচারে তাহা স্পষ্টতঃই অনুমিত হয়। এই নিমিত্তই রামরায় দাস্যভক্তিকে সাধ্য বলিয়া অভিহিত করিলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দাস্যপ্রেমের কথা শুনিয়া বলিলেন "সাধ্য তত্ত্বের মধ্যে দাস্যপ্রেম প্রেমসাধনের উপায় বটে। কিন্তু ইহা সাধ্য-তত্ত্বের সার নহে। ইহার পরে কি তাহাই বল।" শ্রীরাম রায় মহাশয় অতঃপরে সখ্যপ্রেমের কথা তুলিলেন। প্রেমের রাজ্য—জীবের আপন রাজ্য।

সখ্যভাব।

বাহিরে বাহিরে দূরে দূরে থাকিলে আপনার হইতে আপন

যে শ্রীভগবান্,—তাঁহার প্রেমসেবা সম্ভবে না। তাই দাস্য, প্রেমসেবার উপায় হইলেও উহাতে যেন সাধককে একটুকু ভীত-ভীত, একটুকু ফাঁক-ফাঁক—একটুকু দূরে-দূরে রাখে। প্রেম চাহে মাখামাখি। সুতরাং দাস্য হইতে সখ্যপ্রেম অধিকতর মাখামাখিজনক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে :—

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন।
তার প্রেমবশে আমি না হই অধীন॥

দাস্যপ্রেমে প্রেমের ভাব আছে, কিন্তু ইহাতে সম্ভ্রম ও ভক্তি প্রভৃতিজনিত সঙ্কোচতাও আছে। সুতরাং দাস্য প্রেমভক্তি, সাধ্যতত্ত্ব হইলেও প্রেম-রাজ্যে দাস্যপ্রেমের আদর অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কিন্তু আমাদের মত বহিরঙ্গগণ অনেক জন্মের তপস্যাতেও বোধ হয় দাস্য-প্রেমের অধিকার লাভ করিতে পারে না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত শ্রীরাম রায়ের যে আলাপ হইতেছে, উহা প্রেমের উচ্চতম বিকাশের কথা। উহা সাধারণ সাধকের দুষ্প্রেক্ষ্য। দাস্যপ্রেম অপেক্ষা সখ্যপ্রেম উচ্চতর। শ্রীচরিতামৃতের উক্ত অধ্যায়েই লিখিত আছে :—

সখা শুদ্ধ সখ্যে কর স্কন্ধে আরোহণ।
"তুমি কোন বড়লোক" তুমি আমি সম॥

শ্রীভগবানকে সখা বলিয়া সম্বোধন করায়, তাঁহার সহিত সখ্যভাবে বিচরণ করায় যে অনন্ত মাধুর্য্যানন্দ সম্ভোগ করা যায়, তাহা কেবল ব্রজরাখাল-গণের লীলাতেই পরিলক্ষিত হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতকার বলেন :—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥
শ্রীভাগবত (১০।১২।১১)

অর্থাৎ যিনি মায়াশ্রিতদিগের নিকট নরবালকরূপে, দাসভক্তগণের নিকট পরদেবতারূপে এবং জ্ঞানীদের নিকট পরব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়েন, সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যশীল স্বয়ং ভগবানের সহিত পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যশীল ব্রজরাখালগণ সানন্দে বিচরণ করেন।

সখায় সখায় প্রেমের যে এক বিচিত্র ভাব পরিলক্ষিত হয়, ইহজগতে আমরা অকৃত্রিম সখ্যভাবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেখিতে পাই। এখানে ভীতির জড়িমা ও সম্ভ্রমের সঙ্কোচন পরিলক্ষিত হয় না। সখ্যে,—এক আনন্দময়, আপন-আপন, মাখামাখি ভাব উভয় হৃদয়ে বিরাজ করে। দাস্যে যেন হৃদয় একটু ভীত-ভীতভাবে দূরে-দূরে থাকিতে চাহে, সখ্যে ইহার বিপরীত ভাব উপস্থিত হয়। ভীতির স্থলে নির্ভীকতা, সম্ভ্রমের স্থলে সমতা এবং দূরে থাকার স্থলে হাত ধরিয়া এবং গলা ধরিয়া বিচরণ প্রভৃতি,—অতি নৈকট্যের ভাবগুলি আবির্ভূত হইয়া থাকে। তথাপি মধুরাদি সেবাতেও দাস্য অন্তঃপ্রবিষ্ট।

চিত্তের সঙ্কোচন ও বিকাশ—ধর্ম্মাধর্ম্মের মাপকাটি। যাহাতে চিত্ত সঙ্কোচিত হয়, যাহাতে উহার অনন্ত প্রসারে ব্যাঘাত জন্মে, যাহাতে চিত্ত সঙ্কোচিত হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে তাহাই অধর্ম্ম; আবার অপর পক্ষে যাহাতে চিত্তের বিকাশ ঘটে, যাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে পরিণাম-সরস-ভাবে চিত্তপ্রীতিপ্রফুল্ল হয়, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের প্রকৃত নিবাস—বৈকুণ্ঠে। যেখানে কুণ্ঠা নাই, সেই স্থলই বৈকুণ্ঠ। এই জগতে এমন স্থল কোথায়, যেখানে কুণ্ঠা নাই? সর্ব্বত্রই ভয়, সর্ব্বত্রই পরিণাম-বিরসতার আশঙ্কা, সর্ব্বত্রই এক মহাস্বার্থের সঙ্কোচনী শক্তির দুরন্ত প্রভাব। মহারাজাধিরাজের চিত্তও সততই কুণ্ঠিত। প্রকৃত প্রেম-রাজ্যই বৈকুণ্ঠধাম।

বঙ্গের সুবিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাব্যগ্রন্থে সখ্যভাবের লালসাসূচক একটি পদ্য আছে। ব্রজের সখ্যময় রাখাল-জীবন কেমন সমুজ্জ্বল ও আনন্দময়, পাঠকগণ নিম্নোদ্ধৃত আধুনিক প্রসিদ্ধ কবির পদ্যেও তাহার আভাস পাইবেন, তদ্‌যথা :—

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাইনা হতে নব বঙ্গে নূতন যুগের চালক ;
আমি নাইবা গেলেম বিলেত নাইবা পেলেম রাজার খিলেত,
যদি পর জন্মে পাইরে হতে ব্রজের রাখাল বালক !
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে সুসভ্যতার আলোক ॥
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায় বংশী বটের তলে,
যারা গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে পরে পরায় গলে ;
যারা বৃন্দাবনের বনে সদাই শ্যামের বাঁশী শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শীতল কাল জলে !
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায় বংশী বটের তলে ॥
ওরে বিহান হল জাগরে ভাই— ডাকে পরস্পরে !
ওরে এই যে দধি-মন্থ ধ্বনি উঠ্‌ল ঘরে ঘরে !
হের মাঠের পথে ধেনু, চলে উড়িয়ে গোখুর-রেণু,
হের আঙ্গিনাতে ব্রজের বধূ—দুগ্ধ দোহন করে !
ওরে বিহান হল জাগরে ভাই ডাকে পরস্পরে।
ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে কালো তমাল মূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হল কালিন্দীরি কূলে !
যত গোপাঙ্গনা ভয়ে কাঁপে খেয়া তরীর পরে
হের কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর কলাপ খানি তুলে !
ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে কাল তমাল মূলে ॥
মোরা নব নবীন ফাগুন রাতে নীল নদীর তীরে,

কোথা যাব চলি অশোক বনে শিখিপুচ্ছ শিরে !
যবে দোলার ফুল রশি দিবে নীপ শাখায় কসি'
যবে দখিন বায়ে বাঁশীর ধ্বনি উঠ্‌বে আকাশ ঘিরে,
মোরা রাখাল মিলে করব খেলা নীল নদীর তীরে !
আমি হবনা ভাই, নববঙ্গে নব যুগের চালক,
আমি জ্বালাবনা আঁধার দেশে সুসভ্যতার আলোক ;
যদি ননী ছানার গাঁয়ে কোথাও অশোক নীপের ছায়ে
আমি কোন জন্মে পারি হতে ব্রজের রাখাল বালক।

ভক্ত পাঠক মহোদয়গণ, আপনারা কৃপা করিয়া এইরূপে সময়ে সময়ে এই ত্রিতাপসন্তপ্ত জীবগণকে ব্রজরাখালগণের নিত্যানন্দময়, প্রীতি-প্রফুল্লময়, মহাসখ্যভাবময় পরমোজ্জ্বল ভাবচ্ছবি অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়া দিন। আপনারা সরস ভক্তিময়ী ভাষায় এই সখ্য-প্রেমের প্রোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করিয়া চিরসন্তপ্ত জীবগণের হৃদয়প্রাচীরে আলম্বিত করিয়া দিতে পারিলে এই ভীষণ বিষাদ ও অবসাদের সংসারেও জীবগণ কিয়ৎ-ক্ষণ আনন্দময় ভাব অনুভব করিয়া কৃতার্থ ও চরিতার্থ হইতে পারেন।

সখ্যরসে বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান্, সুবেশ ও সুখী ইত্যাদিগুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, সখ্যসেবাপরায়ণ কৃষ্ণ-সখারাই আশ্রয়ালম্বন। সখ্যরসে আশ্রয়ালম্বন চতুর্বিধ,—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখা। যাঁহারা কৃষ্ণ হইতে বয়সে বড় এবং কিঞ্চিৎ বাৎসল্যবান্, তাঁহারাই সুহৃদ্। ব্রজে সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্র প্রভৃতি সুহৃৎ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ ন্যূন ও দাস্যমিশ্রিত ভাববিশিষ্ট তাঁহারাই সখা। ব্রজে বিশাল, বৃষভ ও দেবপ্রস্থ প্রভৃতিই এই শ্রেণীর উদাহরণ। যাঁহারা বয়সে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য, তাঁহারাই প্রিয় সখা ; যেমন শ্রীদাম, সুদাম ও বসুদাম। অপিচ যাঁহারা প্রেয়সী-রহস্যের সহায়, তাঁহারা প্রিয়নর্ম্মসখা ; যেমন সুবল মধুমঙ্গল প্রভৃতি। সখ্যরসে একত্র ক্রীড়া ও এক শয্যায় শয়ন প্রভৃতি

অনুভাব, অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষ-গর্ব্বাদি সঞ্চারী ভাব এবং সাম্যদৃষ্টিহেতু নিঃসম্ভ্রমতাময় বিশ্বাসবিশেষরূপ সখ্যরতিই স্থায়ীভাব। সখ্যরতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সখ্য, প্রণয়, প্রেম, স্নেহ, এই পাঁচটী আখ্যা ধারণ করে। এই সখ্য-রসেও দাস্যরসের ন্যায় বিয়োগে তাপ, কৃশতা ও জাগরণাদি দশা ঘটিয়া থাকে।

শ্রীল রামরায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট এই সখ্যভাবকে সাধ্যতত্ত্বসার বলিয়া প্রকাশ করিলেন। প্রভু ইহা শুনিয়া বলিলেন "রামানন্দ তুমি সখ্যপ্রেমকে সাধ্য বলিয়া বলিতেছ,—ইহা অতি উত্তম কথা। কিন্তু ইহাও সাধ্যতত্ত্বের সার নহে, ইহার পরে কি তাই বল।"

বাৎসল্যভাব।

শ্রীল রামানন্দ রায় এতদুত্তরে বলিলেন, প্রভো ইহার পরে যদি বলিতে হয়, তবে বাৎসল্য প্রেমই সাধ্যসার বলিয়া আমার ধারণা। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মণ্ শ্রেয় এব মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যা স্তনং হরিঃ।

(১০।৮।৪৬)

অর্থাৎ হে ব্রহ্মণ্, নন্দগোপ কি মহাফলযুক্ত শ্রেয় তপশ্চর্য্যাই করিয়াছিলেন যে তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলেন, আর মহাভাগা শ্রীমতী যশোদার মহাভাগ্যই কত বেশী,—সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম হরি তাঁহার স্তন পান করিলেন। অপিচ—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎপ্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥

শ্রীভাগবত (১০।৯।২০)

আরও দেখুন, শ্রীমতী যশোদার ভাগ্যের সীমা নাই, ব্রহ্মা মহাদেবাদি শ্রীভগবানের যে প্রসাদ লাভে অসমর্থ, এমন কি সাক্ষাৎ পূর্ণলক্ষ্মী তাঁহার অঙ্গ-সংশ্রিতা হইয়াও যে প্রসাদ লাভ করিতে পারেন না, প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যশোদা তাদৃশ প্রসাদ লাভ করিলেন।

শ্রীভগবান্‌কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হওয়া, তাঁহাকে পুত্ররূপে লালনপালন করা নিত্যসিদ্ধগণের পক্ষেই সম্ভবনীয়। এমন মহাভাগ্য কি মানুষের হয়! তথাপি মানুষ সেই ভাব লইয়া,—ব্রজের সেই মহাবাৎসল্য-ভাব-সাগরের বিন্দুকণার আভাস লইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইলে প্রেম-সাধনার মহারাজ্যের সুগম পথ পাইতে পারেন।

বাৎসল্যপ্রেম সখ্যপ্রেম হইতেও অধিকতর আদরের। বাৎসল্য-প্রেমের যে প্রকার প্রগাঢ়তর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, আমাদের এই প্রেমাভাস-প্রকাশক সংসারেও তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীভগবানের প্রেম গাঢ়রূপে মাতৃশক্তিতে বিরাজিত। এই জগতে মাতা প্রেমের সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তি। তাঁহার স্তন্যধারা—প্রেমেরই মূর্ত্তিমান্ প্রবাহ, তাঁহার স্নেহবৎসল নয়নদৃষ্টি,—প্রেমের বাহ্য প্রকাশমাত্র, তাঁহার স্নেহমধুর মুখের বাক্য প্রেমেরই পরিস্ফুট ভাষা।

মানুষের কথা দূরে থাকুক, বনের বিহগী কত যত্নে চঞ্চুপুটে আহার আনিয়া কিরূপ ব্যস্ততা ও ব্যগ্রতাসহ শাবকের মুখবিবরে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হয়, পাঠক এস্থলে একবার সে কথা স্মরণ করুন। বিহগী কোন্ শক্তির প্রণোদনায়, কাহার প্রেরণায়, কোন্ ভাবে বিভাবিত হইয়া নিজে অভুক্ত থাকিয়াও শাবকের ক্ষুধা-নিবারণে ব্যাকুল হয়? ইহাই বাৎসল্য-প্রেম। এই মহাব্যাপ্তিময়ী বাৎসল্য-প্রীতির প্রভাব সর্ব্বত্র।

পাঠক মহাশয়, বৎসহারা ধেনুর কথা মনে করুন, সেই দিগ্বিদারী মর্ম্মস্পর্শী, প্রাণ-ব্যাকুলতাকর হাম্বারব, সেই সাক্ষাৎ ব্যাকুলতার প্রতিচ্ছবি "কি-জানি কোথা-গেলে-পাব" এমন তীব্র ভাবময় ঢল-ঢল-নয়নযুগল এক-বার মনে করিয়া দেখুন, ইতর প্রাণীতেও এই বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাব কত বলবান্। মানুষ যদি ঐ বৎসহারা ধেনুর মত শ্রীকৃষ্ণের জন্য আকুল হইয়া "কৃষ্ণ রে, বাপরে আমার" বলিয়া ডাকিতে পারেন, তবে মা যশোদার অঞ্চলের নিধি সুন্দরবালগোপাল মূর্ত্তিতে কেনই বা তিনি না দেখা দিবেন?

বাৎসল্যের অধিকার কত? প্রেমজ তাড়ন-বন্ধন ও ভৎর্সনা প্রভৃতি বাৎসল্যে যে ভাবে প্রকাশ পায়, সখ্যের সে উচ্চ অধিকার নাই। বাৎসল্যে শ্রীভগবানের প্রেমেসেবা এইরূপ বিবিধ কারণে সখ্য হইতে অধিকতর গাঢ়। তাই শ্রীল রামরায় সখ্যের পরে বাৎসল্য-প্রেমতত্ত্বের সাধ্যতা নির্দ্দেশ করেন।

বাৎসল্য রসে কোমলাঙ্গ বিনয়ী সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন ইত্যাদি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, বাৎসল্যসেবাপরায়ণ, শ্রীভগবন্নিষ্ঠ পিত্রাদি আশ্রয়ালম্বন। ব্রজে ব্রজেশ্বরী, ব্রজরাজ, রোহিণী, উপনন্দ, অন্যত্র দেবকী বসুদেব ও কুন্তী প্রভৃতি বাৎসল্যরসের আশ্রয়ালম্বন। হাস্য, মৃদুমধুর বাক্য ও বালচেষ্টাদি,—উদ্দীপন বিভাব। মস্তকাঘ্রাণ ও লালন পালনাদি,—অনুভাব। স্তম্ভ স্বেদাদি ও স্তন্যক্ষরণ—সাত্ত্বিকভাব। হর্ষ শঙ্কা প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। এই রসে বাৎসল্য রতি স্থায়ীভাব। প্রেম স্নেহ ও রাগ এই তিনটী উহার উত্তরোত্তর অবস্থাত্রয়। ইহাতেও বিয়োগে পূর্ব্বের ন্যায় দশটী দশা সংঘটিত হয়।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর,—ব্রজের এই পাঁচ ভাব। শান্তভাব ব্রজের মুনি ঋষিদের। ইহাঁদিগের হৃদয়েও কৃষ্ণনিষ্ঠ প্রেম আছে, কিন্তু তাহা আবৃত। দাস্যেই প্রেমের প্রথম বিকাশ, কিন্তু এই দাস্যে শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবই বিদ্যমান। সখ্যপ্রেমে যে এক নব ভাব প্রকটিত হয়, ইতঃপূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। বাৎসল্যের স্নেহ,—প্রেমেরই ঘনাবস্থা। তাই মহাপ্রভু বাৎসল্যকে "উত্তম" বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু রায় রায় তখনও প্রভুর সাধ্যতত্ত্বের পরম ও চরম লক্ষ্যে উপনীত হইলেন না। তাই প্রভু বলিলেন—

কান্তাভাব।

"—এহোত্তম আগে কহ আর।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রেমের ক্রমবিকাশপ্রদর্শন দ্বারা সাধ্যতত্ত্বের

পরম ও চরম লক্ষ্য জীবসমাজে প্রকটন করাই প্রভুর উদ্দেশ্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীল রাম রায় মহাশয় বাৎসল্য প্রেম পর্য্যন্ত বলিলেন, তথাপি প্রভুর জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল না। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত বেদান্তের চরম সীমা। শান্ত ভাবেই সেই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি। কিন্তু শ্রীপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার প্রারম্ভ,—দাস্যপ্রেম হইতে। শান্তে কৃষ্ণনিষ্ঠতা আছে, কিন্তু তাহাতে প্রেমের সেবা নাই। দাস্যেই প্রেমভজনের আরম্ভ। সখ্য ও বাৎসল্য ইহার ক্রমবিকাশ। বাৎসল্য-রসের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন "ইহা উত্তম। কিন্তু ইহার পরে কি?" রাম রায় বলিলেন, "তবে শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাগণের প্রেমের কথা বলিব কি? শ্রীকৃষ্ণবল্লভা ব্রজসুন্দরীগণের প্রেম অতি অদ্ভুত। শ্রীভাগবত বলেন—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যা।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্।

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ রাসোৎসবের সময়ে ব্রজসুন্দরীগণের কণ্ঠে ভুজদণ্ড অর্পণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি যেরূপ কৃপা করিয়াছিলেন, শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থল সমাশ্রিতা একান্তরতিশালিনী লক্ষ্মীর প্রতিও তাদৃশ প্রসাদ উদিত হয় নাই। সুতরাং নলিনীগন্ধশীলা স্বর্গযোষিৎ প্রভৃতি অপর রমণীগণের পক্ষে সে সৌভাগ্যলাভের আর সম্ভাবনা কি?

ব্রজসুন্দরীগণই মধুর ভজন প্রকটন করেন। মধুর চাহনি, মধুর হাসি, মধুর সম্ভাষণ, মধুর হাবভাব,—নবযৌবনের নবানুরাগের সমস্ত মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণের পদমূলে সমর্পণ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। শ্রীবৃন্দাবনের কুসুমিত কুঞ্জেকুঞ্জে ব্রজসুন্দরীগণ রসরাজের যে মধুর সেবা করেন, ত্রিভুবনে আর কোথাও তেমন সেবা-পারিপাট্যের লেশাভাস দৃষ্ট হয় না। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অনেক উপায় আছে বটে,

সাধকগণ শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন বটে, কিন্তু সকলেই একরূপ ভাবে তাঁহার তত্ত্ব-রসাস্বাদ সম্ভোগ করিতে পারেন না। ঐ শ্যামলদূর্ব্বাদলপরিশোভিত তরুণঅরুণকিরণরাগরঞ্জিত অভিনব শিশির-বিন্দু আমি দেখিতেছি, তুমি দেখিতেছ, আর প্রকৃতির প্রিয়তম ভক্ত একজন সুকবিও দেখিতেছেন। আমার তোমার চক্ষু উহাকে একটী সামান্য শিশিরবিন্দু ভাবিয়া উহার দিকে অভিনিবেশসহ আকৃষ্ট হই-তেছে না। কিন্তু বিশ্বের সৌন্দর্য্যপিপাসু কবির নয়নযুগল উহাতে অখিলরসামৃত রসরাজের সৌন্দর্য্যশিল্পের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেছে।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রভৃতি ভাবনিচয় শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে অনেক তারতম্য পরি-লক্ষিত হয়। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তারতম॥

শান্তভাবে ভজন করিলেও শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। কিন্তু দাস্যে যে ভজনরস আছে, শান্তে তাহা নাই। আবার সখ্যে যাহা আছে, দাস্যে তাহা নাই, বাৎসল্যে যাহা আছে, সখ্যে তাহা নাই, অবশেষে মাধুর্য্যে যাহা আছে বাৎসল্যে তাহা নাই। অথচ শান্তে যাহা আছে, দাস্যে তাহা ত আছেই, আরও কিছু বেশী আছে। শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও দাস্যের সেবা এই দুই দাস্যে আছে, কিন্তু দাস্যে সখ্য নাই। সখ্যে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, এবং সখ্যের আপন-আপন নিঃসঙ্কোচ ভাব আছে, অথচ বাৎসল্যের স্নেহ নাই। বাৎসল্যে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা দাস্যের সেবা, সখ্যের নিঃসঙ্কোচ এবং স্নেহের প্রবলভাব বর্ত্তমান। কিন্তু

উহাতে কান্তার মধুর সেবা অসম্ভব। মধুর ভাবে উক্ত চারিভাবই বিরাজিত। তাই শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্তদাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরেতে বৈসে॥

এই কথাটী দার্শনিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও প্রেমিক ভক্ত শ্রীল রামরায় বেদান্তদর্শনের পঞ্চীকরণ-তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :—

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥

বেদান্তসারে লিখিত আছে :—

"আকাশে শব্দোঽভিব্যজ্যতে। বায়ৌ শব্দস্পর্শৌ। অগ্নৌ শব্দস্পর্শ-রূপাণি। অপ্সু শব্দস্পর্শ রূপরসাঃ। পৃথিব্যাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাশ্চ।"

অর্থাৎ আকাশের গুণ কেবল শব্দ। বায়ুতে আকাশের গুণ শব্দ আছে, নিজের গুণ স্পর্শও আছে। অগ্নিতে শব্দ স্পর্শ ও রূপ আছে। রসে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এই চারিটী গুণ আছে। পৃথিবীতে জলের চারিটী গুণতো আছেই, ইহা ব্যতীত গন্ধ নামক স্বতন্ত্র গুণ আছে। সুতরাং পৃথিবীতে পাঁচগুণ বর্ত্তমান। এই প্রকার মধুর ভাবেও পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান থাকায় ইহার স্বাদাধিক্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অন্যান্য ভাবেও কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, সত্য। কিন্তু গুণাধিক্যেই স্বাদাধিক্য হয়, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা গুণশীল মধুরেই স্বাদাধিক্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তাই শ্রীরামরায় বলেন—

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমের বশকৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥"

কথাটা একটুকু বিশদরূপে বলা যাইতেছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায়-শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নির্গত প্রতিজ্ঞা বাক্য এই যে

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম্।

অর্থাৎ "যে আমাকে যেরূপ ভাবে ভজন করে, আমিও সেইরূপেই তাহার ভজন করিয়া থাকি।"

কিন্তু অতীব বিস্ময়ের বিষয় এই যে ব্রজগোপীদের ভজন-প্রভাবে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিশ্রুতি নিরর্থক হইয়া পড়ে। তাঁহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হইয়া যায়। অথবা ভক্ত চূড়ামণি ভীষ্মই যাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন, পরম প্রেমিক গোপীদের প্রেমভজনে তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তাই শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি আপনার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষা পিবা
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।

শ্রীভাগবতে (১০।৩২।২২)

গোপীদের ভজনের অনুরূপ ভজন করিতে না পারিয়া শ্রীভগবান গোপীপ্রেমে ঋণী হইয়া বিকাইয়া ছিলেন। সুতরাং কান্তভাবই সর্ব্বসাধ্য সার।"

প্রভু বলিলেন "সাধ্যের অবধি এই বটে। অর্থাৎ জীবের সাধনের চরমসীমা এই পর্য্যন্ত। ব্রজসুন্দরীগণের ভাব লইয়া জগতের নরনারী যদি কৃষ্ণভজনের অধিকার প্রাপ্ত হয়েন তাহা হইলেই তাঁহাদের সাধ্যের অবধি নির্ণয় হইল।"

কিন্তু তথাপি প্রভুর জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল না।

কান্তাপ্রেমে প্রেমের চরম বৃদ্ধি পায়। প্রেম এক মহাকর্ষী শক্তি।

এই শক্তির প্রভাবাধিক্যে সম্বন্ধ-নৈকট্য সংসাধিত হয়। প্রেমের আধিক্যের অনুপাতে নৈকট্যের পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। প্রেমের এই নিয়ম গণিতবিজ্ঞানসিদ্ধ। রসায়ন-বিজ্ঞানে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের প্রভাব ধরিয়া পদার্থের তিন অবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। বায়বীয় (Gaseous), তরল (Liquid), এবং (Solid)। বিপ্রকর্ষণের প্রভাবাধিক্যই বায়বীয়তার কারণ, আবার অপর পক্ষে আকর্ষণের আধিক্যনিবন্ধনই পদার্থের ঘনত্ব সাধিত হয়। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের সাম্যবস্থাতে তারল্য। প্রেমের নিয়মও কিয়ৎ পরিমাণে এইরূপ। যেখানে প্রেমের আকর্ষণ অতি প্রবল, সেখানে এক হৃদয় অপর হৃদয়ের অভিমুখে প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হয়, সেই আকর্ষণের ফলে এক হৃদয় অপর হৃদয়ে মিলিয়া মিশিয়া এক হইতে চাহে। এই হিসাবে চিন্ময় জগতে প্রেম,—আকর্ষণী শক্তি, ও মায়া,—বিক্ষেপিকা শক্তি। প্রেমের টানে জীবের ভগবৎসাম্মুখ্য ঘটে, প্রেমের টানে জীব প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়া ধাবিত হয়, আবার অপর পক্ষে মায়ার বিক্ষেপিকা শক্তির (Repulsion) প্রভাবে জীব ভগবদ্বহির্মুখ হইয়া সংসার দুঃখে নিপতিত হয়। সুতরাং প্রেমই জীবের সাধ্য। তন্মধ্যে কান্তাপ্রেম উৎকৃষ্টতর। ভজনের এমন উচ্চতর অধিকার শান্তদাস্তসখ্য বাৎসল্যের অগোচর। মধুররসে অপরাপর রসের সমাবেশ থাকায় মধুর রসই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকল্পিত হইয়াছে। ইন্দুমতী বিয়োগবিধুরা অজের মুখে কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস বলিয়াছেন :—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

অর্থাৎ গৃহিণী মন্ত্রণায় সচিবের ন্যায়, প্রমোদালাপে সখীর ন্যায় এবং ললিত কলাবিধিতে শিষ্যার ন্যায়। এ স্থলেও মধুর ভাবে যে অন্যান্য রস সমুদায়ের সমাবেশ আছে, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

আবার মহানাটককার যে স্থলে সীতা-শোক-সন্তপ্ত ভগবান্ শ্রীরাম-চন্দ্রের উক্তিতে লিখিয়াছেন :—

কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী
ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়াচ ধাত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্যা
রঙ্গে সখী লক্ষণ সা প্রিয়া মে॥

তখনও এই মধুর রসে অপরাপর রসনিবহের সমাবেশ-ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে।

পবিত্রতম প্রেমের ঘনীভূতভাব,—ভবভূতির পদ্যে ও মহানাটকে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় তেমন পদ্য অতীব বিরল। ভবভূতির—

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ॥"

পদ্যটী—দাম্পত্যপ্রেম-প্রকর্ষবর্ণনের একটী অত্যুজ্জ্বল আদর্শ।

অপি চ
"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে॥

অর্থাৎ যে প্রেম, সুখে দুঃখে কোনরূপ বিকৃত হয় না,—সকল অবস্থাতেই যে প্রেম অনুকূল,—সংসার-সুলভ শোকক্ষোভাদি-প্রপীড়িত হৃদয়ের পক্ষে যে প্রেম একমাত্র বিশ্রামস্বরূপ,—বার্দ্ধক্যেও যে প্রেমের হ্রাস বা বিনাশ হয় না,—দীর্ঘকালের সংসর্গে লজ্জাভয়াদির তিরোধানে যে প্রেম স্নেহসারে পরিণত হয়,—সজ্জনের এইরূপ অতি বিরল নিরুপাধি প্রেম প্রকৃতই অতি দুর্লভ।

প্রেমের কি-জানি-কেমন এক উদ্ভ্রান্তভাবে বিমুগ্ধ হইয়া শ্রীরাম-

চন্দ্র যখন সীতাদেবীর শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শে অব্যক্ত মহামধুর রসে নিমজ্জিত হইয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন :—

বিনিশ্চেতুং শক্যো সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবাধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তবস্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সম্মীলয়তি চ॥

অর্থাৎ হে দেবি আমি কি সুখে আছি না দুঃখে আছি ; এ কি আমার নিদ্রাবস্থা না জাগরণাবস্থা ; আমার শরীরে কি বিষ সঞ্চারিত হইতেছে, অথবা আমি সম্মোহানন্দে বিভোর হইতেছি ; আমি ত কিছু নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। তোমার স্পর্শজনিত চিত্তবিকারে আমার মনোবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। কখন একটুকু জ্ঞান হইতেছে, আবার কখন মোহপ্রাপ্ত হইতেছি।

প্রেমের একটা জগদতীত ভাব ভবভূতির এই প্রসন্নগম্ভীর পদ্যে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রেমের অন্যান্য অবস্থায় যে একটুকু দূর-দূরভাব পরিলক্ষিত হয়, এই প্রেমের গূঢ় গভীর আকর্ষণে সেই ভাব দূরীকৃত হইয়া যায়, নৈকট্য অধিকতর সম্বর্দ্ধিত হইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে "আপন আপন" অথবা "তুমি আমার, আমি তোমার" এই ভাবের প্রগাঢ়তা জন্মে। কিন্তু এইরূপ প্রেমও বহিরঙ্গ। ব্রজদেবী-নিষ্ঠ কান্তা-প্রেমই সাধ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাগণ, সাধারণী সমঞ্জসা ও সমর্থাভেদে ত্রিবিধা। ইহাঁদের সকলেরই কান্তাভাব স্থায়ী। তন্মধ্যে সাধারণীর কান্তাভাব সম্ভোগেচ্ছার নিদান ; সমঞ্জসার কান্তাভাব ক্বচিৎভেদিতসম্ভোগেচ্ছ, এবং সমর্থার কান্তাভাব স্বরূপাভিন্নসম্ভোগেচ্ছ।

কান্তাভেদ-বিনির্ণয়।

ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে :—কেবল স্বীয় সম্ভোগেচ্ছাই যে কান্তাভাবের মূল,—উহাই সম্ভোগেচ্ছানিদান কান্তাভাব ; সম্ভোগেচ্ছা যে

কান্তাভাবে কখন কখন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায় তাহারই নাম কচিদ্ভেদিত সম্ভোগেচ্ছ কান্তাভাব ; আর যে কান্তভাবে সম্ভোগেচ্ছা নিত্যই স্বরূপের সহিত অভেদভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাই স্বরূপাভিন্ন সম্ভোগেচ্ছ কান্তা-ভাব। সাধারণীর উদাহরণ—কুব্‌জা ; সমঞ্জসার উদাহরণ—মহিষীবর্গ ; আর সমর্থার উদাহরণ—ব্রজদেবীগণ।

সাধারণী কান্তাদিগের বলবতী সম্ভোগেচ্ছা, সকল সময়েই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময় প্রেম হইতে ভিন্নাকারে প্রকাশ পায়। উহাঁদের সম্ভোগেচ্ছা,—কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গজনিত স্বসুখ-বাসনারূপা। সমঞ্জসা কান্তাগণের সম্ভোগেচ্ছা, কখনও বা সাধারণীদের ন্যায়, কখনও বা সমর্থা কান্তাদের ন্যায় প্রকাশিত হয়। সমর্থা ব্রজদেবীগণের সম্ভোগেচ্ছা সততই কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী। কৃষ্ণসুখ ভিন্ন ইঁহাদের আত্মসুখানুসন্ধানের লেশাভাসও নাই। যদি বল সমর্থা-ব্রজদেবীগণের আত্মসুখে বাসনা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎ-কারে তাঁহাদের আত্মসুখানুভূতি অপরিহার্য্য ; কিন্তু যেখানে সুখের অনুসন্ধান বা বাসনা নাই, তৎস্থলে অনুভব হওয়া না হওয়া উভয়ই সমান।

ব্রজদেবীগণ নিরন্তর তুরীয় অবস্থায় অবস্থিতা। তাঁহাদের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের অনুভব না থাকায় তাঁহারা স্থূল সূক্ষ্মাদির কোনও সংবাদ রাখেন না। আনন্দ-চিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা ব্রজদেবীগণের আনন্দচিন্ময়রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গজনিত যে আনন্দানুভব হয়, তাহা স্থূলজগতের স্পর্শাদি-জনিত সুখ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উহা ব্রহ্মানন্দজনিত সুখ হইতেও কোটিগুণে অধিক,—তাহার সহিত ইহার তুলনাই হইতে পারে না।

বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীতে ব্রজদেবী-নিষ্ঠ কান্তাপ্রেমের যে সকল উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সংস্কৃত ভাষাতেও সেইরূপ কবিতা অতি দুর্লভ। এ স্থলে শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া অতি সংক্ষেপে কান্তাপ্রেমের কথার উপসংহার করা যাইতেছে।

সে পদটী এই :—

বঁধু হে! নয়নে লুকায়ে থোব।

প্রেম-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া

হৃদয়ে তুলিয়া লব॥

শিশুকাল হৈতে, আন নাহি চিতে

ও পদ করেছি সার।

ধন জন মন জীবন যৌবন

তুমি সে গলার হার॥

শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে

কভু না পাসরি তোমা।

অবলার ক্রুটী হয় শত কোটী

সকলি করিবে ক্ষমা॥

না ঠেলিও বলে অবলা অখলে

যে হয় উচিত তোর।

ভাবিয়া দেখিনু তোমা বঁধু বিনে

আর কেহ নাহি মোর॥

তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি

আড়াল হইলে মরি।

চণ্ডীদাস ভণে অনুগত জনে

দয়া না ছাড়িহ তুমি॥

এখানে দার্শনিক তত্ত্বের সূক্ষ্ম কথা নাই, চিন্তা করিয়া বুঝিবার কিছু নাই। আছে কেবল—সরল প্রাণের সরল প্রেমের সরল কথা। শ্রীরাধার প্রেমই জীবের সাধ্যতত্ত্বের অবধি। শ্রীমতীর প্রেম,—প্রেম-তত্ত্বের উচ্চতম-আদর্শ। প্রভু স্বয়ং সেই প্রেমের স্বাদ আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহা জগতে প্রকটন করিয়াছেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব বলেন :—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্তজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজু মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

শ্রীভাগবতে (১০।৪৭।৬১)

অর্থাৎ অহো আমি যেন ব্রজসুন্দরীদিগের পাদরেণুসেবী বৃন্দাবনের গুল্মলতা বা ওষধির মধ্যে কোন কিছু হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি। যেহেতু এই ব্রজসুন্দরীগণ দুস্তজ স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি-গণের অন্বেষণীয় মুকুন্দপদটী ভজনা করিয়াছেন।

"কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনই সাধ্যতত্ত্বের অবধি", রায় শ্রীল রামা-নন্দের মুখে এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তা বটে, সাধ্যের সীমা এই পর্য্যন্তই বটে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, ইহা আমারও স্বীকার্য্য। যদি ইহার পরে আরও কিছু বলিবার থাকে দয়া করিয়া বল।"

রায় মহাশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি সাধ্যসাধনতত্ত্বের চরমসীমা বলিয়া, মহাপ্রভুর তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিলেন না। তিনি কোথা হইতে আরম্ভ করিয়া কোথা আসিয়াছেন! ইহার পরে ভজনের আদর্শ আর কি হইতে পারে? মানুষ, সাধনের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভান্তর চিত্ত ভগবদুন্মুখ হইলে উহারই প্রথম বিকাশ,—শান্তভক্তি। ক্রমে যতই নৈকট্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ভাবে চিত্তবৃত্তি পরিপুষ্ট হইয়া তদ্ভাবে সাধক শ্রীভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। উচ্চতম সাধনায় ভজনের এই উচ্চ-তম ভাবগুলি ক্রমে বিকশিত হয়। এক এক শ্রেণীর ভক্ত এক এক প্রকার ভাব লইয়া ভজন করিয়া থাকেন। ইহার সকল ভাবই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়। কিন্তু অনন্তকোটী জন্মের ভজন-ফলে এবং কৃপা-

ময় শ্রীভগবানের দয়ায়,—যে ভক্তের হৃদয়ে কান্তাভাবের উদ্রেক হয়, তাঁহারই ভজন-পদ্ধতি চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন, সাধ্যের অবধি এই-ই বটে। কিন্তু ইহার পরে যদি আরও কিছু থাকে, দয়া করিয়া তাহাও বল।

রায় মহাশয় ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীরাধিকার প্রেমের কথা উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, শ্রীরাধার প্রেমই সাধ্য-শিরোমণি। এই বলিয়া পদ্মপুরাণের এক শ্লোক পাঠ করিলেন, তদ্‌যথা :—

রাধাপ্রেমে অন্তাপেক্ষ।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা॥

শ্রীমতী যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, তাঁহার কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সকল গোপীর মধ্যে শ্রীমতী রাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। শ্রীভাগবতে শ্রীরাধার নাম স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকিলেও একটী শ্লোকে তাহা স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তদ্‌যথা :—

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩০।২৮।

অর্থাৎ "ভগবান ঈশ্বর হরি এই গোপীর সমীপে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত। যেহেতু গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অতীব প্রফুল্লচিত্তে ইহাকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া বিহার করিতেছেন।"

মহাপ্রভু এই কথায় পরম আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "তোমার মুখে রসের কথা শুনিয়া আমার বোধ হইতেছে যেন অমৃতের নদী প্রবাহিত হইয়া ছুটিয়াছে। আমার কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না। কিন্তু এখানে একটা কথা জিজ্ঞাস্য। তুমি বলিতেছ শ্রীরাধাই সকল গোপী অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণবল্লভা। কিন্তু তাহার পরিচয় কি? শারদ-রাস-সময়ে

শঠশিরোমণি অন্যান্য গোপীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমতীকে ইঙ্গিতে নির্জ্জনে লইয়া গেলেন। সে ত চোরের কাজ। নিজের ধন নিজে ভোগ করিবেন, তা চুরি করা কেন? তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে গোপীদের অগোচরে নয়নভঙ্গীতে শ্রীমতীকে সঙ্কেত জানাইয়া তাঁহাকে গুপ্তস্থানে লইয়াছিলেন। তাহা হইলেই "অন্যাপেক্ষার" কথা উঠিতেছে। কিন্তু অন্যাপেক্ষায় প্রেমের গাঢ়তার স্ফূর্ত্তি হয় না।

চুরি করি রাধা নিল গোপীগণ ডরে।
অন্যাপেক্ষা হইলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধা লাগি গোপী যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥

যে প্রেম সর্ব্বত্র প্রধাবিত, তাহা তরল। গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণ ভয় করিলেন কেন? কেননা,—রাধার প্রতি অধিকতর প্রেম দেখাইলে তাঁহারা মান করিবেন। তাহা হইলে এ প্রেম গাঢ় হইল না। যেহেতু, ইহাতে অন্যাপেক্ষা বিদ্যমান। নিরপেক্ষ না হইলে, লোকাপেক্ষা ত্যাগ না করিলে, অনুরাগ গাঢ় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। যদি গোপীদের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর প্রতি অধিকতর প্রেমবশ্যতা দেখাইতে পারিতেন, তবে বুঝা যাইত যে শ্রীমতীতে তাঁহার অনুরাগ দৃঢ়। কিন্তু তাঁহার লোকাপেক্ষা রহিয়াছে। গোপীদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার প্রতি অধিকতর প্রীতি প্রদর্শন করা হয় নাই। সুতরাং শ্রীমতীর প্রতি যে তাঁহার গাঢ় অনুরাগ, তাহার পরিচয় কি?"

রামরায় বলিলেন, "প্রভো, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে এ অধম সম্পূর্ণই অযোগ্য। তবে আপনি কৃপা করিয়া যাহা বলাইতেছেন তাহাই বলিতেছি,—ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের উপমা নাই। শ্রীরাধার প্রেমমাধুরী বৈকুণ্ঠের অনুপম অমৃত।"

এই বলিয়া রামরায় যেন কি বলিবেন বলিয়া বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার মুখে কোন কথাই ব্যক্ত হইল না।

শ্রীরাধাপ্রেম।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ়ানুরাগ সম্বন্ধীয় তত্ত্বসমূহ বিশদ করার জন্য যে বিতর্ক উপস্থিত করেন, তদুত্তরে শ্রীল রামরায় বলেন "প্রভো, ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের উপমা নাই। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীজয়দেব বলেন :—

১। কংসারিরপি সংসারবাসনাবন্ধশৃঙ্খলাং
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ।

২। ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটান্ত-কুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥"

এই দুইটী শ্লোক বলিয়া শ্রীরামানন্দ রায় বলিলেন "প্রভো, এই শ্লোকের অর্থ বিচার করিলেই শ্রীরাধার প্রেমমহিমা জানা যাইতে পারে। এই দুই শ্লোকের বিচারে প্রকৃতই অমৃতের খনি লাভ করা যায়।"

রসরাজের সহিত রসিক ভক্তের সম্মিলন! সেই নির্জ্জন মিলনে প্রেমতত্ত্বের আলাপ! মহাপ্রভু শ্রোতা—রায় মহাশয় বক্তা। বিষয়াসক্ত ভগবদ্বিমুখ জনগণের পক্ষে সেই তত্ত্বকথার নাম করাও অনধিকার চর্চ্চা। কিন্তু অবিবেকী ব্যক্তির আর লজ্জা কোথায়? ভক্ত পাঠক, ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা করিবেন, আমরা এই শ্লোকদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ করিতে প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটী কথা বলা আবশ্যক।

বৈষ্ণব পাঠকমাত্রেরই জানা আছে, শরৎকালে ও বসন্তকালে রাসোৎসব হইয়া থাকে। শারদীয় রাসের পরেই প্রবাস-যাত্রা। শ্রীকৃষ্ণ, প্রবাসে গমন করিয়া নানাস্থানে নানাপ্রকার লীলাবিলাস করিলেন। কিন্তু শ্রীমতীর ন্যায় প্রেমবতী আর কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবনস্থ।) আবার রাসবিলাসে ইচ্ছা হইল। বসন্ত রাস আরম্ভ হইল।

শতকোটী গোপী রাসমণ্ডলে দেখা দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সকলের সহিতেই এক দেহে সমভাবে রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি সকলের সহিত সমভাবে রাসবিলাস করিতেছেন দেখিয়া প্রগাঢ় প্রেমময়ী শ্রীমতীর মান উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন, প্রত্যেক গোপীর স্কন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ বাহু অর্পণ করিয়া রাসরসে প্রমত্ত হইয়াছেন। যত গোপী, তত কৃষ্ণ। সর্ব্বত্রই সমান ভাব, সকলের প্রতিই সমান আদর। উঁহাদের মধ্যে তিনিও একজন। সুতরাং তাঁহার নিকটেও এক কৃষ্ণ রহিয়াছেন। প্রেমের সর্ব্বত্র সমতা দেখিয়া প্রগাঢ় প্রেমময়ী মানিনীর দুর্জ্জয় মান উপস্থিত হইল। তিনি রাস ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। রাসেশ্বরী রাসমণ্ডলীর বাহির হওয়া মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিরহে আকুল হইলেন। রাসভঙ্গ হইল। কংসারি শ্রীকৃষ্ণ পরমাশ্রয়া শ্রীমতীর মধুর রূপ হৃদয়ে ধারণ করিয়া অন্যান্য গোপী-গণকে ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন।

এখানে একটা কথা এই যে, এই মাধুর্য্য-লীলায় "কংসারি" শব্দের ব্যবহার করা হইল কেন? অপিচ "কংসারিরপি" বলিতে যে "অপি" শব্দ আছে তাহারই বা কি প্রয়োজন? রোগ, শোক, দুঃখ ও ভবভয়,— কং শব্দের এই কয়েকটী প্রতিশব্দ দৃষ্ট হয়। যিনি রোগ শোক দুঃখ ও ভবভয়ের অরি, তিনিই কংসারি। শ্রীকৃষ্ণের নামেই রোগ শোক দুঃখ ও ভবভয়াদি দূরীকৃত হয়। এহেন শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমতীর বিরহ-শোকে আকুল হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন রাধিকার ইষ্ট, শ্রীরাধাও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের ইষ্টা। ইষ্ট বস্তুতে অনুরাগ স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সহিত রাসরসে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু যেই তাঁহার রাস-বিলাস-বাসনার শৃঙ্খল-স্বরূপিণী শ্রীমতী মানের প্রভাবে রাসমণ্ডলী হইতে বাহির হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণ-মাত্রও শ্রীমতীর বিরহ সহিতে না পারিয়া তাঁহার রূপরাশি সম্যকরূপে হৃদয়ে ধরিয়া রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া শ্রীমতীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে পাইলেন

না, অনঙ্গবাণে তাঁহার মন খিন্ন হইয়া পড়িল, অবশেষে শ্যামসুন্দর শ্রীযমুনার শ্যামল দূর্ব্বাদলপরিশোভিত তটপ্রান্তে বসিয়া, বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যাঁহাকে ব্যতীত শতকোটী গোপীও শ্রীকৃষ্ণের মনোরথ পরিপূরণে সমর্থ নহেন, তিনি শতকোটী গোপী পরিত্যাগ করিয়া যে শ্রীমতীর জন্য অধীর হয়েন, রাসের রসাস্বাদ ত্যাগ করিয়া অনঙ্গবাণে পরিখিন্ন হয়েন, সেই প্রেমময়ী শ্রীমতীই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু।" এই কথা বলিয়া শ্রীরাম রায় বলিলেন "প্রভো, এই জন্যই বলিয়াছি ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের উপমা নাই।"

প্রভু পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন "এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব কথা শ্রবণ করার জন্যই তোমার নিকট আসিয়াছি। সাধ্য-সাধনতত্ত্ব এখন বেশ বুঝিতে পাইলাম। কিন্তু এখনও আমার অনেক জানিবার আছে।

শ্রীল রাম রায় পূর্ব্বে দেখাইলেন কান্তাভাবে কৃষ্ণভজন প্রেমভজনের উচ্চতম সোপান। মহাপ্রভু তাহা মানিয়া লইলেন। তার পরে রাম রায় বলিলেন "গোপীপ্রেম অত্যদ্ভুত। শ্রীকৃষ্ণ গোপীপ্রেমের ধার শোধিতে না পারিয়া তাঁহাদের নিকট ঋণী হইলেন। ফলতঃ উদ্ধব নারদাদি একান্ত ভক্তগণও গোপীপ্রেমের অনুসারী। গোপী-প্রেম প্রেমভজনের অবধি; কেন না, ইহারা আর্য্যপথ ও স্বজনাদি পরিত্যাগ করিয়া পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে পরকীয়াভাবে ভজন করিয়াছেন অথচ তাঁহাদের প্রেম কামগন্ধলেশ-বিবর্জ্জিত। সুতরাং "গোপীপ্রেম সাধ্যের সীমা।"

গোপীভাব।

রামরায়ের এই উক্তিতেও প্রভুর জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল না। তিনি সাধ্যসাধন তত্ত্ব সম্বন্ধে পুনরপি প্রশ্ন করিলেন। রামরায় তখন রাধা-প্রেমের কথা তুলিলেন। প্রভু তাহাতে বিতর্ক উঠাইয়া বলিলেন "রাস-মণ্ডলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে গোপীগণের ভয়ে ইঙ্গিত করিয়া লইয়া

গেলেন কেন? অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে এ প্রেম নিরপেক্ষ নহে, এ প্রেম অন্যাপেক্ষ। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদের মনের দিকে না চাহিয়া পারেন না। অন্যাপেক্ষ প্রেমের বা "ভাগের প্রেমের" দৃঢ়তা কোথায়?"

তদুত্তরে রামরায় বলিলেন "রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ আছে। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া আর কোন দিকে চাহিলেন না, অমনি আনন্দে বিভোর হইলেন। কিন্তু শ্রীমতী যখন দেখিলেন প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বেই এক এক কৃষ্ণ, ঠিক সেইরূপ সাধারণ ভাবে তাঁহার পার্শ্বেও এক কৃষ্ণ রহিয়াছেন। ইহাতে শ্রীমতীর মান হইল, তিনি রাস ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। মহাভাবময়ী শ্রীমতীর বিরহে তৎক্ষণাৎ রাসের চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী-বিরহে যমুনাকূলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এখন বিচার করুন। গোপী-প্রেমের ধার শ্রীকৃষ্ণ শোধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের নিকট ঋণী হইলেন, কিন্তু এক শ্রীমতী ব্যতীত শতকোটী গোপীও তাঁহার রাসবিলাসের বাসনা-নির্ব্বাপণে সমর্থ হইলেন না। প্রভো, এই জন্যই বলিয়াছি, রাধা-প্রেম জগতে প্রকৃতই অতুলনীয়।"

শ্রীরাধার প্রেমোৎকর্ষ।

প্রভুর শ্রীমুখকমল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি প্রীত হইয়া বলিলেন, "এই সকল রসতত্ত্ব জানিবার জন্যই তো তোমার নিকট আসিয়াছিলাম। এখন এ সকল কথা ভালরূপেই বুঝিতে পারিলাম। সাধ্যসাধন-নির্ণয়তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু আমার আরও জিজ্ঞাস্য আছে। কৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীরাধার স্বরূপ, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তুমি কৃপা করিয়া না বলিলে আর কোথাও এই সকল জানিবার উপায় নাই। তুমি ভিন্ন আর কেহ এই সকল তত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ নহে। দয়া করিয়া বল।"

প্রভুর শ্রীকণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই অতি মধুর, তাহাতে আবার বিনয়মাখা।

সে বিনয়মাখা মধুর কথা শুনিলেই লোক বিমুগ্ধ হইত। তাহার উপরে যখন তিনি করুণস্বরে দীনভাবে কোন কথা বলিতেন, শ্রোতৃবর্গ তাহাতে প্রকৃতই মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া পড়িতেন। শ্রীল রামরায় প্রভুর কথা শুনিয়া একবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তিনি ভূলোকে আছেন, কি দ্যুলোকে আছেন, তিনি বিদ্যানগরে আছেন, কি গোলকে আছেন, ক্ষণকাল তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে একান্ত অবশের ন্যায় রাম রায় বলিলেন "প্রভো, আমাকে এ সকল কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি মূঢ় ইহার কি জানি? এই যে এতক্ষণ তোমার নিকট কি বলিয়াছি, তাহা কি আমি বলিয়াছি? তুমি হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া যাহা বলিয়া দিতেছিলে, আমি তোমার নিকট তাহাই বলিতেছিলাম। লোকে যেমন শুক পাখীকে কৃষ্ণ-নামাবলী শিখাইয়া আবার তাহারই মুখে নাম শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হয়, তুমিও সেইরূপ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমার দ্বারা তত্ত্বকথা বলিতেছ, আবার নিজে সেই সকল কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইতেছ। তুমি যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। তোমার নাট কে বুঝিবে?

"তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণ করাও, জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি॥"

যেমন শিষ্য, তেমনই প্রভু! প্রভু বলিলেন "সে কি কথা! আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী,—ভক্তিতত্ত্বের কি জানি? মায়াবাদে আমার মন মলিন হইয়া গিয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কৃপা হইল, তিনি দয়া করিয়া তাঁহার কৃপাসঙ্গলাভে আমার অধিকার দিলেন। তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আমার চিত্ত নির্ম্মল হইয়া উঠিল। নির্ম্মল চিত্ত না হইলে তো আর শ্রীকৃষ্ণ-কথায় রুচি হয় হয় না। তাঁহার সঙ্গগুণে কৃষ্ণকথা

শুনিতে আমার বড় সাধ হইল; তাই তাঁহার নিকট কৃষ্ণ-ভক্তি-তত্ত্ব শুনিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন "এ সকল কথা আমার কিছুমাত্র জানা নাই, কেবল এক রামানন্দ রায় জানেন। কিন্তু তিনি তো এখানে নাই।"

আমি সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট তোমার মহিমা শুনিয়াই তোমার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে আসিয়াছি, আর তুমি কিনা আমাকে সন্ন্যাসী মনে করিয়া আমার স্তুতি করিতেছ! সন্ন্যাসী সর্ব্ববর্ণের গুরু। লোকে সন্ন্যাসী দেখিলে গুরু বলিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করে, তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানে। কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই প্রকৃত গুরু—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
কৃষ্ণ-রাধা-তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥"

কৃপাময় পাঠক, এরূপ সরস, সুন্দর সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত আলাপ আর কোথাও পাঠ করিয়াছেন কি? প্রভু ও ভক্তের মধ্যে তত্ত্ব কথার আলাপ হইতেছে। এই আলাপের মধ্যে তত্ত্ব-কথার সঙ্গে সঙ্গে ঐ যে বিনয়ের অলৌকিক অমৃতধারা প্রবাহিত হইতেছে, উহা মন্দাকিনীর সুশীতল পবিত্রতম ধারা হইতেও অধিকতর সুশীতল ও পবিত্রতর। রামরায় প্রভুকে "ঈশ্বর" বলিলেন। কিন্তু প্রভু ভক্তের স্তুতিবাক্য এত সহজে গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার প্রকাশ,—ক্রমবিকাশের ভাবপূর্ণ। রামরায় তাঁহাকে ঈশ্বর বলিলেও তিনি এত সত্বরে সে স্তুতিবাদ স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন "একি কথা!

"তোমার ঠাই আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥"

সংসারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুসারে বিশ্বাসীদের নিকট সন্ন্যাসী নারায়ণবৎ মান-

নীয়। কিন্তু দেখ, রামরায়, আমি তাহা ভাল বুঝি না। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। লীলাময় শ্রীভগবানের মধুর নিত্যলীলা আমি কিছুই জানি না। মায়াবাদীর মনে সে সকল তত্ত্বের স্ফূর্ত্তিও হয় না। তবে সার্ব্বভৌমের কৃপাসঙ্গে এটুকু বুঝিয়াছি যে কৃষ্ণভক্তিই জগতে সার। আমি সন্ন্যাসী, সর্ব্ববর্ণের গুরু; তাই বলিয়া তুমি আমাকে শিক্ষা দিবে না, আর আমি তোমার কৃপাশিক্ষায় বঞ্চিত হইব ইহা হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ হউন, সন্ন্যাসী হউন, অথবা শূদ্রই হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু। সুতরাং সন্ন্যাসী বলিয়া তুমি আমায় বঞ্চনা করিও না।" *

মহাপ্রভু এস্থলে অনেক প্রকার শিক্ষা প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রত্যেক বাক্যই বহু অর্থপূর্ণ। আমাদের বোধহয় তিনি এস্থলে এই কথায় অনেক তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন :—

১। সন্ন্যাসীরা জ্ঞানমার্গাবলম্বী, কিন্তু মায়াবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান হইতে যে ভগবদ্ভক্তি উচ্চতর, তিনি বিনীতভাবে সেই কথা বলিয়া দিলেন।

২। "গুরু কে" এ প্রশ্নেরও এস্থলে মীমাংসা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হউন, সন্ন্যাসী হউন, আর শূদ্রই হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু।

---

* এস্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোন কোন পুঁথিতে নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয় দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাং।
শূদ্রশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ॥
ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্র তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্নস্যাৎ শ্বপচো বৈষ্ণবো গুরুঃ॥

পদ্মপুরাণে।

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাৎ বৈষ্ণবঃ।

বিষ্ণুপুরাণে।

৩। কৃষ্ণতত্ত্বাভিজ্ঞত্ব যে কত উচ্চাধিকার, ইঁহাতে তাহাও অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রভু লোকাপেক্ষা ত্যাগ করেন নাই। তথাপি শূদ্র যদি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হয়েন, তাঁহাকেও গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে বিধি দিয়া গিয়াছেন। শূদ্র শিক্ষাগুরু হইতে পারেন, কিন্তু দীক্ষাগুরু হইতে পারেন না, এই কথা বলিয়া বর্ণাশ্রমপ্রাধান্য-পরিকীর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। কেননা প্রভু কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শূদ্রের কথাই বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, তাঁহার জন্মনিবন্ধনবর্ণাশ্রমধর্ম্ম খণ্ডিত হইয়া যায়। মহাসাগরে মিশিয়া গেলে নদীর যেমন নামরূপ থাকে না, কৃষ্ণ-প্রেমসাগরে প্রবেশ করিলে মহৎ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র বর্ণবিচার মাত্রও থাকিতে পারে না। নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে স্ত্রীপুরুষ, মহৎ ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি অনন্ত ভেদবুদ্ধি একবারেই নিরস্ত হইয়া যায়। মহাপ্রভু এস্থলে ব্রাহ্মণ বা শূদ্রের নিকট মন্ত্র লইতে বলেন নাই, "কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তাকেই" গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাদৃশ নিরুপাধি প্রেমসাগরে যদি কেহ মজ্জিত হইয়া থাকেন, নিরুপাধি কৃষ্ণ-প্রেমে ডুবিয়া যদি কেহ সাংসারিক সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন, তবে তাদৃশ তথাগতকে উপাধিযুক্ত করিয়া অভিহিত করাও অপরাধজনক। এখানে প্রভু কৃষ্ণতত্ত্বাভিজ্ঞতারই উৎকর্ষ কীর্ত্তন করিয়া মায়াবাদময় সন্ন্যাসধর্ম্মের খর্ব্বতা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীচরিতামৃতে অপর স্থলেও লিখিত আছে—

মায়াবাদীর সন্ন্যাসীদের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারায় কৈল ধর্ম্মের প্রকাশ॥

৪। ইহাও হইতে পারে যে প্রভুর সহিত রামরায়ের যখন এই সকল আলাপারম্ভ হয়, তখন রামরায় প্রভুকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রেমতত্ত্বের নিগূঢ় কথা সহসা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে সঙ্কোচিত হইতেছিলেন। তাই প্রভু তাঁহার মনের ভাব

বুঝিয়াই বলিলেন "আমাকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী মনে করিয়া কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব শিক্ষায় বঞ্চিত করিও না। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী হইলেও সার্ব্বভৌমের সঙ্গপ্রাপ্তিতে আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে।" ফলতঃ প্রথমতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে রাম রায়ের মনে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। উপসংহারে তিনি নিজেও এই কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে—

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপাকরি কহে মোর তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসিস্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ॥ ইত্যাদি।

ফলতঃ অতি সত্বরেই রামরায়ের এই সংশয় তিরোহিত হইয়াছিল।

যাহা হউক প্রভু রামরায়ের বিনয়ে বাধা দিয়া বলিলেন "আমাকে কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রভৃতি দয়া করিয়া বলিতে হইবে। রামরায় আবার বিবশভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল রামরায়ের নিকট সাধ্যতত্ত্ব-নির্ণয় শ্রবণ করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরাধাতত্ত্বাদি প্রকাশ করার জন্য প্রশ্ন করায় শ্রীল রাম রায় অতীব বিনয় ও ভক্তি সহকারে বলিলেন—

"———আমি নট, তুমি সূত্রধার।
যেমতে নাচাহ, তৈছে চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চরি॥"

অধুনা মেজমারিজমের বা মোহিনীবিদ্যার আলোচনা হইতেছে, কিন্তু শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় সাক্ষাৎ প্রভু ভক্তগণকে লইয়া যে মহামেজমারিজমের প্রভাব প্রদর্শিত করিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে সেরূপ ব্যাপার আর দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তি। পরম ভক্তগণ জানিয়া শুনিয়াও অনেক সময়ে এই কৃষ্ণমায়ায় বিহ্বল হইতেন। প্রভু বলিলেন—

"সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না-কর বঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥"

শ্রীল রামরায় বুঝিতে পারিতেছেন যে, যিনি তাঁহার নিকট শিক্ষার্থি-ভাবে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের মহাশিক্ষক,—মহাগুরু—সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্; কিন্তু তথাপি শ্রীকৃষ্ণ-মায়ার এমনই প্রভাব, যে রামরায় অগত্যা ব্রহ্মাকে যেন বেদ বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীল রায় মহাশয় বলিতে লাগিলেন—

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব-কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহ সভার আধার॥
সচ্চিদানন্দদেহ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বমাধুর্য্যপূর্ণ॥"

এই সংক্ষিপ্ত উক্তিতে লঘু ভাগবতামৃতের ও ষট্‌সন্দর্ভের সমগ্র তত্ত্বের সার নিহিত রহিয়াছে। ক্রমশঃ এই সকল তত্ত্ব বিবৃত করা যাইতেছে।

কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। বেদান্তিগণের ব্রহ্ম, যোগিগণের পরমাত্মা ও ভক্তগণের ভগবান্ একই বস্তু। বেদান্তশাস্ত্রে যিনি পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত, তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই অব্যক্তগুণাবস্থ।

কৃষ্ণ শব্দের নিরুক্তি।

কৃষ্ণ শব্দের বিবিধ ব্যুৎপত্তি দৃষ্ট হয়ঃ—

(১) কর্ষতি সর্ব্বান্ স্বকুক্ষৌ প্রলয়কালে যঃ সঃ কৃষ্ণঃ।

(২) কর্ষতি আত্মসাৎ করোতি আনন্দত্বেন পরিণময়তীতি মনো ভক্তানামিতি যাবৎ যঃ সঃ কৃষ্ণঃ।

"কর্ষণাৎ কৃষ্ণঃ। যিনি আকর্ষণ করিতেছেন তিনি কৃষ্ণ। ইনি ভক্তগণের চিত্ত আনন্দত্ব দ্বারা পরিণমিত করিয়া আত্মসাৎ করেন।

মহাভারতে যানসন্ধিপর্ব্বেও কৃষ্ণ শব্দের একটি নিরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্‌যথা ঃ—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
কৃষ্ণস্তদ্ভাবযোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি সাত্বতঃ॥

সূক্ষ্মদর্শী ঋষিকল্প শ্রীধরস্বামী এতদবলম্বনে লিখিয়াছেন ঃ—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যাৎ পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"গূঢ়ং পরং ব্রহ্মমনুষ্যলিঙ্গম্।"

শ্রীভাগবতে (৭।১০।৪৮)

কোটি কোটি ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ সংসারত্যাগী যোগী ও ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে পর-ব্রহ্ম জানিয়া ইহাঁর উপাসনা করিয়া নিবৃ'তি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ,—সর্ব্বাবতারের বীজ যথা :—

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্

যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্ নরাদয়ঃ।

শ্রীভাগবতে (১।৩।৫)

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন 'নিধান শব্দের ভাবার্থ এই যে সূর্য্য যেমন তাঁহার নিজ রশ্মিসমূহের আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণও সততই তাঁহার অসঙ্খ্য অবতারের আশ্রয়-স্বরূপ। অসঙ্খ্য অবতার তাঁহা হইতে প্রসূত হইলেও তিনি অব্যয় অর্থাৎ ব্যয় রহিত—সুতরাং নিত্য পূর্ণতম। শ্লোকোক্ত "বীজ" অর্থ "উদ্গম স্থান"। অসঙ্খ্য অবতার এই শ্রীকৃষ্ণ হইতেই উদ্গত হয়েন। ইনি যে কেবল অবতার সমূহেরই বীজ তাহা নহে, এই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডও ইহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ।

ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মং স্বং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা॥

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ধৃত শ্রীভাগবত বচন (১০।৮৫।৩১)।

অর্থাৎ হে আদ্য, তোমার অংশ—পুরুষ, পুরুষের অংশ মায়া, মায়ার অংশ গুণসমূহ, উহাদের অংশভাব পরমাণুলেশে বিশ্বোৎপত্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে। এমন যে তুমি আজ সেই তুমিই আমার গতি।

কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।

কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম।

জড়জগতের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে এই বস্তুর ধারণা অসম্ভব। ব্রহ্মসংহিতা বলেন :—

যস্য প্রভা প্রভাবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মসংহিতা (৫।৪০)।

মায়াবাদের ব্রহ্ম যত বড় তত্ত্বই হউন, কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের অঙ্গ-কান্তি মাত্র, ইহাই ব্রহ্মসংহিতার সিদ্ধান্ত।

শ্রীগোবিন্দ অনাদি ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। ব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে :—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।১)।

শ্রীসনাতন শিক্ষাতেও এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করার পূর্ব্বে শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন :—

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
সর্ব্বাদি সর্ব্বাংশী কিশোর-শেখর।
চিদানন্দদেহ, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥

এখানে যেমন শ্রীল রামানন্দ রায়ের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রভু তাঁহার মুখে তত্ত্ব কথা শুনিতেছেন, সেইরূপ শ্রীল সনাতনের হৃদয়ে প্রশ্ন করার শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহার নিকটেও ঐ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

পূর্ব্বে যৈছে রায় পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল।
তার শক্ত্যে রামানন্দ তাঁরে উত্তর দিল॥

ইহ প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করেন তত্ত্ব-নিরূপণ॥

লীলারহস্যের মর্ম্মপরিগ্রহ করা জীববুদ্ধির অতীত। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বনিরূপণে ব্রহ্মসংহিতার এই শ্লোক প্রকৃতই এক প্রধানতম সূত্র।

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাবতারে বীজ, এইজন্যই তিনি অবতারী। যথা—

অবতারাবলীবীজমবতারী নিগদ্যতে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে।

শ্রীভাগবত বলেন—

এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে অবতার-নিরূপণ প্রসঙ্গে উক্ত শ্লোকপাদ লিখিত আছে। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে ইতঃপূর্ব্বে যে সকল অবতারের বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই সকল অবতারের মধ্যে কেহ বা আদ্যপুরুষের অংশ, কেহ বা তাঁহার কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি অবতারই পুরুষের অংশাবতার। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে এই সকল অবতার, লীলাবতারের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। কুমার নারদাদি কলা বা অংশাবতার।

শ্রীভাগবতামৃত বলেন—

জ্ঞানশক্ত্যাদি কলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥

পদ্মপুরাণে যথা—

আবিষ্টোঽভূৎ কুমারেষু নারদেচ হরির্বিভুঃ।

অল্পশক্তি ও মহাশক্তিভেদে আবেশ দ্বিবিধ। মহাশক্ত্যাবেশ "অবতার" এবং অল্পশক্ত্যাবেশ "বিভূতি" নামে কথিত হয়। কোন অবতার আদ্য-

ভগবত্ত। পুরুষের অংশ, কোন অবতার বা তাঁহার কলা।
অবতারীর সম্বন্ধে এইরূপ বহুল বিচার লঘুভাগবতামৃতে

দেখিতে পাওয়া যায়*, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্ কাহাকে বলে, শাস্ত্রে তাহার বিচার আছে। শ্রীভাগবতেরসিদ্ধান্ত এই যে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে।

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা যে অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন সেই তত্ত্বকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ বা ভগবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অর্থাৎ উপনিষদ্‌বেত্তাদের মতে এই তত্ত্ব ব্রহ্ম, হৈরণ্যগর্ভদের মতে পরমাত্মা এবং সাত্বতদের (ভক্ত) মতে ইনি ভগবান্ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ, তিন বিধেয় চিহ্ন॥
অনুবাদ কহি পাছে বিধেয়-স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
কৃষ্ণ পূর্ণানন্দ, কৃষ্ণ পরমমহত্ত্ব॥

* * * *

প্রকাশ বিশেষে তিঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর পূর্ণ ভগবান্॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদাহরণ সহ ইহার অতি বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অন্যত্রও লিখিত হইয়াছে—

---

* লঘুভাগবতামৃতে (১) স্বয়ং রূপ, (২) তদেকাত্মরূপ (বিলাস, ও স্বাংশ) (৩) আবেশ, (৪) প্রকাশ, (৫) পুরুষাবতার, (৬) গুণাবতার, (৭) লীলাবতার, (৮) মন্বন্তরাবতার, (৯) যুগাবতার, (১০) আবেশাবতার, (১১) প্রাভব, (১২) বৈভব, (১৩) পরাবস্থ প্রভৃতি বিষয়ের বিচার দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধেও প্রচুর বিচার এই গ্রন্থে এবং ষট্‌সন্দর্ভে আলোচিত হইয়াছে।

জ্ঞান যোগ ভক্তি এই তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥

ভক্তির সাধনাতেই ভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। এখন ভগবৎ শব্দের অর্থ, নিরূপণ করা যাইতেছে—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক
মনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্মসত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং
যদ্ বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥
শ্রীভাগবতে (৫।১২।১১।)

ভগবৎ শব্দার্থ সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন—

যত্তদব্যক্ত মজরমচিন্ত্য মজমক্ষয়ম্।
অনির্দ্দেশ্য মরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্॥
বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্।
ব্যাপ্যাব্যাপ্যং যতঃ সর্ব্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥
তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
তদেতদ্ ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ॥

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামি মহোদয় ভগবৎ সন্দর্ভে ইহার যে টীকা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"এই বচন প্রমাণ সমূহের বিশেষ্য-বিশেষণবিশিষ্টতা সম্বন্ধ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। "অরূপম্" "পাণিপাদাদ্যসংযুতম্" এই দুইটী পদ ব্রহ্মাখ্যকেবলবিশেষ্যাবির্ভাবনিষ্ঠ, "অরূপং" প্রাকৃতরূপনিষেধ-সূচক ইত্যাদি।"

অপিচ :—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দ বাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥

এই দুই শ্লোকের প্রথম শ্লোকে "ভগ" শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে। ভগ-শব্দের উত্তর নিত্যযোগে মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া ভগবৎ শব্দ সাধিত হয়। ইহাতে পূর্ণাবির্ভাব ধ্বনিত হইয়াছে। শ্রীভগবৎসন্দর্ভে এতৎসম্বন্ধে যে সুবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে, বিশেষ জ্ঞানলাভার্থীদের পক্ষে তাহার সম্যাবগতি প্রয়োজনীয়।

ভগবৎ শব্দের নিরুক্তি।

"শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্" বৈষ্ণব সাহিত্যপাঠীদিগের পক্ষে এ কথা অতি পুরাতন। কিন্তু কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সংস্থাপিত, সন্দর্ভের সে বিচার অতি সূক্ষ্ম। পূজ্যপাদ সন্দর্ভকার ইহার যে নিরুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই:—

সংভর্ত্তেতি তথাভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগইতীঙ্গনা॥
বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
সচ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থ স্ততোঽব্যয়ঃ॥

অর্থাৎ ভগবান্ পদের ভ্রগ অংশের বিচার করা যাইতেছে। "ভ" অক্ষরের দুই অর্থ—সংভর্ত্তা ও ভর্ত্তা। সংভর্ত্তা শব্দের অর্থ স্বভক্তগণের পোষক। ভর্ত্তা শব্দের অর্থ ধারক ও স্থাপক। "গ" কারের অর্থ তিনটী —নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। নেতা অর্থ, যিনি স্বভক্তি ফলস্বরূপ প্রেমের প্রাপক, তিনিই নেতা। গময়িতা অর্থ স্বলোকপ্রাপক। আর স্রষ্টা অর্থ—স্বভক্তগণের তত্তৎগুণগণের উদ্গমিতা। ইহার অপর অর্থ এই যে সমগ্র ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশ শ্রী জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয় গুণের সমষ্টিই ভগ শব্দ বাচ্য। ঐশ্বর্য্য অর্থে বশীকারিত্ব, বীর্য্য মণিমন্ত্রাদির ন্যায় প্রভাব,

যশ বাক্যমন শরীরের সদ্‌গুণ খ্যাতি। শ্রী অর্থে সর্ব্বপ্রকার সম্পৎ। জ্ঞান—সর্ব্বজ্ঞত্ব, বৈরাগ্য—প্রপঞ্চবস্তুতে অনাসক্তি।

কিন্তু ভগবৎ সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় যে লক্ষণ করিয়াছেন তাহা এই :—

"অথ তদেকং তত্ত্বং স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা কমপি বিশেষং ধর্ত্তু, পরাসামপি শক্তীনাং মূলাশ্রয়রূপং তদনুভবানন্দসন্দোহান্তর্ভাবিততাদৃশব্রহ্মানন্দানাং ভাগবতপরমহংসানাং তথানুভবৈকসাধকতম তদীয়স্বরূপানন্দশক্তিবিশেষাত্মকভক্তিভাবিতেষন্তর্বহিরপীন্দ্রিয়েষু পরিস্ফুরদ্‌বা তদ্‌বদেব বিবিক্ততাদৃশশক্তিশক্তিমত্তাভেদেন প্রতিপাদ্যমানং বা ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

ইহার ভাবার্থ এই যে সেই এক তত্ত্বই বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়া থাকেন। তিনি তাঁহার স্বরূপভূতপরাশক্তিসমূহের অবিবিক্তভাবে জ্ঞানীদের নিকট ব্রহ্মভাবে প্রকাশিত হয়েন। তাঁহারা তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। কিন্তু তিনিই পরাশক্তিসমূহের মূলাশ্রয়। ব্রহ্মানন্দবিশিষ্ট মুনিগণ তাঁহার অনুভাবানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ইহা অমূর্ত্তানন্দ। কিন্তু তাঁহার স্বরূপানন্দশক্তিবিশেষত্মকভক্তিই সাধকতম। এই ভক্তিভাবিত ভাগবত পরমহংসগণের হৃদয়ে পরমতত্ত্বের যে প্রকার স্ফুর্ত্তি হয়েন, তাহাই "ভগবান্" শব্দ বাচ্য। শ্রীভগবানে শক্তি ও শক্তিমান্ অচিন্ত্য অব্যক্তরূপে পৃথক্‌ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। তাঁহার স্বরূপানন্দশক্তিবিশেষাত্মক ভক্তিভাবিতচিত্ত ভাগবতপরমহংসগণের অন্তরে বাহিরে ইন্দ্রিয়াদির গোচরে শক্তিশক্তিমত্তার বিচিত্র বিবিক্তভাবে যে আনন্দময় তত্ত্বের দিবানিশি স্ফুর্ত্তি হয়, তাহাই "ভগবান্" শব্দ বাচ্য। ইহাই ভগবৎ শব্দের দার্শনিক তত্ত্ব। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই মূর্ত্তানন্দ। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্,—তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রীভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত। এই সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি-

প্রণীত ভগবৎসন্দর্ভে অতীব সূক্ষ্মবিচার পরিলক্ষিত হয়। তদ্দৃষ্টে জানা যায়—

ব্যঞ্জিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে স্বয়ম্।

অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইলেই ব্রহ্মতত্ত্ব স্বয়ং প্রকটিত হইয়া পড়ে। ভগবত্তত্ত্ব যে মায়ালেশবিবর্জ্জিত ও মায়ার অস্পৃশ্য, এই সন্দর্ভে তাহার যথেষ্ট বিচার করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন :—

সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব অন্তর্য্যামী।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী॥
হিরণ্য গর্ভের আত্মা গর্ভোদক শায়ী।
ব্যষ্টিজীব অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদক শায়ী॥
ইহা সভার দর্শনাদ্যে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণেতে নাহি মায়ার সম্বন্ধ॥

ভগবৎসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে—

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুঃ॥

কিন্তু যদিও উক্ত তত্ত্বত্রয় মায়া লইয়াই প্রকটিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারাও মায়ার পার। সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে আর কথা কি?

এতদ্দ্বারা প্রদর্শিত হইল যে যোগ্যতাবৈশিষ্ট্যের ক্রমপ্রাধান্যের নিয়মানুসারে আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মতত্ত্ব ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত। জ্ঞানের সাধনে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশ হয়। ভক্তি জ্ঞানের পরাবস্থা, এই ভক্তির সাধনেই ভগবত্তত্ত্ব প্রকটিত হইয়া থাকে। এই জন্য শ্রীগীতোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি", "ভক্তিলভ্য স্বনন্যয়া।"

এই জন্যই শ্রীভাগবত বলিতেছেন—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎ সরোজে
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথোননু নাথ পুংসাম্।
যদ্ যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তৎতদ্ বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এই পদ্যের "প্রণয়সে" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "প্রকর্ষেণ নয়সি, প্রকটয়সি" অর্থাৎ "তুমি ভক্তিযোগশীল যোগীর হৃৎপদ্মে তাঁহার বিভাবনা অনুসারে প্রকটিত হও।" কিন্তু শ্রীভগবানের এই শ্রীমূর্ত্তি কি কাল্পনিক? শ্রীপাদ শ্রীজীব বলেন—

"শ্রুত্যেক্ষিতপথ" ইত্যনেন কল্পনায়া নিরস্তত্বাৎ।

অর্থাৎ "শ্রুত্যেক্ষিতপথ" এই কথা বলাতেই ব্যক্তিগত কল্পনা নিরস্ত হইয়াছে। সেই অদ্বয়তত্ত্ব জ্ঞানিব্রহ্মবাদীদিগের নিকট নিরাকার হইলেও জ্ঞানের চরমাবস্থাগামী ভজনশীল পরাভক্তির সিদ্ধগণের নিকট সর্ব্বদাই ভুবনমোহন শ্যামসুন্দররূপে প্রকাশিত। তাই ব্রহ্মসংহিতা বলেন :—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদেব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দর মচিন্ত্যগুণপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে হইলে ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে হয়। ভক্তিতত্ত্বের বিকাশেই ভগবত্তত্ত্বের স্ফুর্ত্তি হয়। ভগবত্তত্ত্বের স্ফুর্ত্তি হইলেই কৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞানের সঞ্চার হয়। কেননা সাধুরা সততই প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষু দ্বারা স্বীয় হৃদয়ে অচিন্ত্যগুণপ্রকাশশীল শ্যামসুন্দরকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তির দিব্যনেত্রই শ্যামসুন্দরের ভুবনমোহনরূপ নিরীক্ষণে সমর্থ।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির সাহায্য ভিন্ন কেহ কখনও তাঁর তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ আত্মপুরুষের আদি বীজ। শ্রীকৃষ্ণ এই

অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণসমূহের বীজকারণ, তিনি অনন্ত শক্তির আশ্রয়, তিনি ভগবান অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশ শ্রী প্রভৃতির পূর্ণ আধার। কিন্তু শ্রীল রামরায় মহাপ্রভুর নিকট যে কৃষ্ণতত্ত্বের কথা উত্থাপন করেন তাহা আরও সূক্ষ্মতম, সে তত্ত্ব আরও অধিকতর উচ্চগ্রামে অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় ষট্‌সন্দর্ভে যে প্রকার শাস্ত্রবিচার করিয়াছেন তাহার পরিস্ফুট বঙ্গানুবাদ ও বিশদ ব্যাখ্যা না করিলে এসম্বন্ধে চিত্তের তৃপ্তিসাধম হয় না। সূক্ষ্ম শাস্ত্রের আলোচনায় সাধারণ পাঠকের ক্লেশের কারণ হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু যে কৃষ্ণতত্ত্ব সচ্চিদানন্দরসময়, শাস্ত্রের উপদেশ ভিন্ন, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ভক্তিপূর্ণভজন ব্যতীত সেই তত্ত্বের পরিস্ফুরণ অসম্ভব। তাই পরম কারুণিক শাস্ত্রকারগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের বহুল আলোচনা করিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে সবিশেষ কোন কথার উল্লেখ না করিলেও ষট্‌সন্দর্ভের জয়ধ্বনি করিয়া এস্থলে কেবল এইমাত্র বলিতেছি যে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীভাগবতের একটী শ্লোকই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাপ্রকাশক মূলশ্লোকরূপে আলোচিত হইয়াছে এবং সেই শ্লোকের পরিপোষক বহুল শ্লোক ও তদ্‌ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, ভজননিষ্ঠ ভক্তপাঠকের হৃদয়ঙ্গম করার উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীপাদসন্দর্ভকার

"এতেচাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

এই শ্লোকটীকে "বচন-রাজ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-নিরূপণে এই বচনটী রাজার ন্যায়। রাজা হইলে তাঁহার সৈন্য থাকা প্রয়োজনীয়, তাই সন্দর্ভকার ইহার প্রতিপোষক অনেক বচন প্রমাণ-স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া তাহার বিচার করিয়াছেন। তিনি এ সকল করিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই, এই বচন-রাজের অনেক প্রতিনিধি বচন সংগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা শাস্ত্রীয় প্রমাণে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ হইতে তাঁহার নিজের কথারই উল্লেখ করিতেছি। তদ্‌যথা—

তস্মাৎ সাধূক্তং—এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। তদেবমস্য বচনরাজস্য সেনাসংগ্রহ নিরূপিতঃ; তথা তস্য প্রতিনিধিরূপাণি বাক্যান্তরাণি অপি দৃশ্যন্তে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই বচনরাজের যে বিচার দৃষ্ট হয়, উহা শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ হইতেই সংগৃহীত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটী স্থলের উল্লেখ করা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিত আছে :—

অনুবাদ মনুক্তৈব ন বিধেয় মুদীরয়েদিতি বচনাৎ কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্ব লক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে নতু ভগবতঃ কৃষ্ণত্ব মিত্যায়াতম্। ততশ্চ কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণধর্ম্মিত্বে সিদ্ধে মূলাবতারত্বমেব সিদ্ধতি, নতু ততঃ প্রাদুর্ভূতত্বম্।

শ্রীল কবিরাজ এই বাক্যের পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া ইহার অতি বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরমব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ নহেন—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এই সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্যই "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" বাক্যের অবতারণা। শ্রীল কবিরাজ ষট্‌সন্দর্ভের উদ্ধৃত অংশের পৌর্ব্বা-পর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা :—

অনুবাদ না কহিয়ে, না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয়॥
"বিধেয়" কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।
"অনুবাদ" কহি তারে যেই বস্তু জ্ঞাত॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত॥
বিপ্র অনুবাদ, ইহার বিধেয় পণ্ডিত॥
বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাত॥
তৈছে ইহা অবতার সব হইল জ্ঞাত।

কার অবতার ?—এই বস্তু অবিজ্ঞাত॥
"এতে" শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞানে সেই অবিজ্ঞাত॥
অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব পিছে বিধেয় সংবাদ।
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব ইহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য॥

কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ নহেন, এই সিদ্ধান্ত-সংস্থাপনের জন্য "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই বচনরাজ প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া উহার বিচার করা হইতেছে। শাস্ত্রের একটা নিয়ম এই যে অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলা অসঙ্গত। এই প্রণালী আর্য্যশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই অবলম্বিত হইয়াছে। যাহা জ্ঞাত, তাহাই অনুবাদ নামে খ্যাত। যেমন "এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।" এই স্থলে বিপ্র শব্দটা "অনুবাদ" কেননা ইহা জ্ঞাত। বিপ্র যে পণ্ডিত ইহা বিদিত ছিল না "পণ্ডিত" শব্দ বলায় বিপ্রের এই অজ্ঞাত গুণ ব্যক্ত হইল। স্বয়ং ভগবান্ পদ শ্রীকৃষ্ণের বিধেয় বিশেষণ। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাবতারের মূল, ইঁহা হইতেই সমস্ত অবতার, ইনি স্বয়ং ভগবান্। ইঁহা হইতেই অপরের ভগবত্তা। শ্রীকৃষ্ণেরই ভগবত্ত্ব, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোন ভগবানের অংশ নহেন। এই তত্ত্ব প্রকাশের জন্যই মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্"। কৃষ্ণতত্ত্ব বিচারে ষট্সন্দর্ভের বহু স্থলে এই বচনরাজের উল্লেখ এবং এতৎসম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব দর্শনের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করা এক মহান্ ব্যাপার। কিন্তু পরম কারুণিক শ্রীপাদ গোস্বামিগণ এতৎ সম্বন্ধে

সুপ্রণালীবদ্ধরূপে যেরূপ আলোচনা করিয়া সন্দর্ভ লিখিয়া রাখিয়াছেন, আমরা তাহার যৎকিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিতে পারিলেও পরমতত্ত্বের অংশকণা পরিজ্ঞানে কৃতার্থ হইতে পারি। এই বাসনায় প্রণোদিত হইয়া ইতঃপূর্ব্বে এতৎ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয় অতি গুরুতর। সুতরাং প্রথমতঃ পাঠকগণের পক্ষে এই সকল কথা নীরসবৎ বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণ যখন মূর্ত্তানন্দ, তাঁহার তত্ত্ব নীরস বা অপ্রীতিকর হইবে কেন? পড়িতে পড়িতে কিঞ্চিৎ অভ্যাস হইলে শেষে নীরসতার পরিবর্ত্তে এই সকল কথাই অতীব সরসবৎ প্রতীয়মান হয়। *

---

* (ক) মহামহোপাধ্যায় ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ নীরসতা জ্ঞানে দর্শনশাস্ত্র পাঠে উপেক্ষা করেন, ফলতঃ সরস ও নীরস কাহাকে বলে তাঁহারা তাহা জানেন না। নারিকেলের উপরিভাগ অতি কঠিন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যাঁহারা একটু শ্রম স্বীকার করেন তাঁহারা উহার স্বাদু সুপেয় সুস্নিগ্ধ উদকাদি লাভ করিয়া উহাকে নীরস না বলিয়া অতীব সরস বলিয়াই প্রকাশ করেন।"

(খ) শ্রীবৃন্দাবনের সুবিখ্যাত শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত পণ্ডিত শ্রীমন্মধুসূদন গোস্বামিমহোদয় তাঁহার নবপ্রকাশিত বৈষ্ণবমতসম্মত বেদভাষ্য গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন :—

"দার্শনিক ভাষা কোই দুসরী ভাষা নহী হৈ, কেবল উসকী প্রণালী হৈঁ। কুচ্ছদিন পড়নে হী সে যহ প্রণালী সরল হো জায়গী, ঔর ফির বড়ী প্রিয় ঔর মনোহর জান্ পড়েগী।"

ইহার ভাবার্থ এই যে দার্শনিকভাষা দোসর ভাষা নহে। কেবল উহার প্রণালী পৃথক্। কিছুদিন পাঠ করিলেই উহা সরল হইয়া যায়। এমন কি উহা তখন অপর পক্ষে বড় প্রিয় ও মনোহরবৎ প্রতিভাত হয়।

(গ) Positivist Review নামক লণ্ডনের একখানি সুপরিচালিত মাসিকপত্রের সুবিখ্যাত সম্পাদক জনহিতৈষী ফ্রেডরিক হ্যারিসন সাহেব দার্শনিক লিপিপ্রণালীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "Professors of belles-letters may find it dry" অর্থাৎ তরলসাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিকটেই দার্শনিকলিপিপ্রণালী নীরস বলিয়া অনুভূত হয়।

ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব, ও শ্রীরাধাতত্ত্ব প্রভৃতির কিঞ্চিৎ জ্ঞান না হইলে ব্রজরসের জ্ঞান লাভ অসম্ভব, স্বাদগ্রহণতো দূরের কথা। ব্রজরস বা অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম বুঝাইবার জন্যই পরম দয়াল গৌরচন্দ্র শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয় দ্বারা এই সকল তত্ত্বপ্রকটিত করেন। সুতরাং তত্ত্বালোচনা না করিয়া কেবল রসের আলোচনায় রসের বিশুদ্ধি-সংরক্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতেই সমাজে নানাপ্রকার দুষ্টমত প্রচলিত হইতে আরব্ধ হয়। ব্রজের রস বুঝিবার স্পৃহা হইলে, পরম কারুণিক শ্রীপাদ গোস্বামিপাদগণের শ্রীগ্রন্থের মর্ম্ম যৎকিঞ্চিৎ বুঝিবার প্রয়াস পাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। তবে ভজননিষ্ঠ সাধক-গণের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। ভজন-সাধনবলে তাঁহাদের হৃদয়ে যে তত্ত্বের স্ফুর্ত্তি হয়, অধীয়ানগণ কোটি কোটি জন্মেও তাহা লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু ইহাও ব্যক্তব্য যে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে লীলা ও তত্ত্ব অধ্যয়ন বা শ্রবণ করাও সাধন-বিশেষ। কেন না তাহাতেও শ্রীভগবানেই চিত্তাকৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীরামানন্দের উপদেশ আলোচনা করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বাদি সম্বন্ধে কতকগুলি শাস্ত্রীয় কথা লইয়া কেন প্রবন্ধ-বিস্তার করা যাইতেছে তৎ সম্বন্ধে প্রাগুক্ত যুক্তিই আমার একমাত্র কৈফিয়ৎ। এখন আবার প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাইতেছে।

মায়াবাদ বৌদ্ধবাদেরই ছায়া বিশেষ। বৌদ্ধ দর্শন ব্রহ্ম স্বীকার করেন না, মায়াবাদ-ব্রহ্ম স্বীকার করেন, কিন্তু সে ব্রহ্ম কেবল একটা কথার কথা মাত্র। কেননা, তাঁহার কোনও শক্তি নাই। যে সকল উপায়ে পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, মায়াবাদীদের ব্রহ্মে তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। মায়াবাদীর ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি-বিবর্জ্জিত। অথচ ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্যে মায়াবাদী বলেন, "ব্রহ্ম হইতেই এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়"। অদ্ভুত অসামঞ্জস্য!

শ্রীকৃষ্ণ-শক্তি।

যাহা হউক, বৈষ্ণব বেদান্তীরা ব্রহ্মে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

ইঁহারা বলেন ভগবত্তা ভিন্ন ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বই অসিদ্ধ। ব্রহ্ম বলিলেই "ভগবান্" বুঝিতে হইবে। অশেষকল্যাণগুণময় পুরুষই ভগবান্; ইনি অনন্তশক্তিময়। শ্রীভগবানের শক্তিসমূহ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তদ্-যথা—স্বরূপ শক্তি, তটস্থ শক্তি ও মায়াশক্তি। স্বরূপ শক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গা শক্তি, তটস্থ শক্তির অপর নাম—জীবশক্তি, মায়াশক্তির অপর নাম—বহিরঙ্গা শক্তি।

স্বরূপশক্তি আবার তিন ভাগে বিভক্ত— সন্ধিনী, সম্বিদ্ ও হ্লাদিনী। ইহাই বেদান্তের স্বীকৃত সৎ চিৎ ও আনন্দ।

এই কয়েকটী কথায় শ্রীভগবান্, শ্রীভগবানের বিভূতি, জীব ও বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রকার তত্ত্বই নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ-বচনে এই তিন শক্তির উল্লেখ আছে যথা :—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যনুসন্ততান্॥

বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৬০)

অপিচ—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥

বিষ্ণুপুরাণ (১।১২।৪৮)

শ্রীচরিতামৃতে এই তিনটী শ্লোক অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে :—

—অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে একরূপ নাহি কিছু ভেদ॥
চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য—নাহি তার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত ॥
এমত স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি।
সভার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সভার স্থিতি ॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥

শ্রীচরিতামৃতে (আদি ৩ অধ্যায়)

অপিচ—

সৎ চিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গামায়া—তিনে করে প্রেমভক্তি ॥

শ্রীচরিতামৃতে (মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

অপিচ—

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর ॥
বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তি কার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি, শক্তি কার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥

শ্রীচরিতামৃতে (মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদ)

অপিচ—

অনন্তশক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিনশক্তি প্রধান—
ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম।
ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা॥
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন॥
ক্রিয়া-শক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥
অহঙ্কারে অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥
মায়াদ্বারা সৃজে তিঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে—ব্রহ্মাণ্ড কারণ॥
জড়হৈতে সৃষ্টি নহে, ঈশ্বর-শক্তি বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে শক্তি আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহে যেন অগ্নিশক্ত্যে হয় দাহশক্তি॥

ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভগবত্তত্ত্বের ও বিশ্বতত্ত্বের (Cosmogony) দিগ্‌দর্শন মাত্র। এই সকল কথার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ঘনীভূতাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত এতৎসম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ সকল শ্লোকে মৈত্রেয় মুনি, পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽপ্যভ্যুপাগতম্ ॥

ইহার প্রত্যুত্তরে পরাশর বলিতেছেন :—

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥

শ্রীধর স্বামী ইহার যে টীকা করিয়াছেন ভগবৎসন্দর্ভে উক্ত টীকা উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার মর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীজীব এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"এই শ্লোকে ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্ব শক্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কথা এই যে ব্রহ্মকে যখন নির্গুণ বলা হইল, তখন সেই নির্গুণের আবার সৃষ্ট্যাদি করার শক্তি কোথায়। শ্রীধর স্বামীর মতে উক্ত শ্লোকের অর্থ এইরূপ :—

ব্রহ্ম নির্গুণ (সত্ত্বাদিগুণরহিত), অপ্রমেয় (দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন), শুদ্ধ (অদেহ, সহকারীশূন্য), অমলাত্মা (পুণ্যপাপ সংস্কার বিহীন, অথবা রাগদ্বেষাদিশূন্য), এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট ব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার কর্তৃত্ব থাকিতে পারে কি? যাঁহার প্রবৃত্তি আছে, কার্য্য করার সামর্থ্য আছে, এ জগতের তিনিই কর্ত্তা এবং তাঁহাদ্বারাই কার্য্য নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

আমরা ঘটাদি যে সকল সৃষ্ট পদার্থ দেখিতে পাই, তাহা দেখিয়া আমাদের ধারণা হয় যে, এই সকল সৃষ্ট পদার্থের অবশ্যই একজন কর্ত্তা আছেন। যিনি কর্ত্তা অবশ্যই তাঁহার কার্য্য করিবার বাসনা এবং তদুপযোগিনী শক্তি আছে। কিন্তু ব্রহ্ম যদি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হন, তবে তাঁহাকে কিরূপে সৃষ্টি কর্ত্তা বলা যাইতে পারে? এই আশঙ্কা স্বাভাবিক।

এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী পরিস্ফুট ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। তিনি বলেন "এই প্রশ্নের সদুত্তর এই শ্লোকেই প্রদত্ত হইয়াছে। শ্লোকে বলা হইয়াছে, ইহ জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে মণিমন্ত্রাদির শক্তিই তর্কযুক্তি দ্বারা বুঝা যাইতে পারে না। কেননা, সকল শক্তিই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর ; মণিমন্ত্রাদির শক্তি যেমন অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর ও স্বভাবসিদ্ধ, আগুণের দাহিকা শক্তি যেমন অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর ও স্বভাবসিদ্ধ, ব্রহ্মের সৃষ্টিপ্রভৃতি কার্য্যও তেমনি অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর ও স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্ম, গুণাদিহীন হইলেও ব্রহ্ম তিনি অচিন্ত্যশক্তিমান্, তখন এ অবস্থায় জগৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। শ্রুতিতেও লিখিত হইয়াছে :—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ ॥

শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদে—(৬।৮)

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥

তত্রৈব—(৪।১০)

ফলতঃ মণিমন্ত্রাদির প্রভাব যেমন স্বাভাবিক, ব্রহ্মশক্তিও সেইরূপ স্বাভাবিকী এবং উহা তর্কযুক্তির অতীত। এই সম্বন্ধেও একটী শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে যথা :—

স বা * সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিরিত্যাদি।"

বৃহদারণ্যক—(৪।৪।২২)

এই সকল শ্রুতিদ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রহ্মই এই সকলের হেতু এবং তাহা হইতেই এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস এবং শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ইহাই জীবের স্বরূপ। ব্রহ্মসূত্রের ২ অঃ ৩ পাদের ৪৩ সূত্রের ("অপি স্মর্য্যতে") শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যে স্মৃতির একটী প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তদ্‌যথা :—

জীব-তত্ত্ব।

জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্ ॥
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থোব্যয়ঃ সাক্ষী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ ॥
অদাহ্যোঽচ্ছেদ্যোঽক্লেদ্যঃ অশোষ্যোঽক্ষর এব বা।
এবমাদিগুণৈর্য়ুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ ॥
মকারেণ্যোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা।
"দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন ॥"

অতএব জীব হরির দাস, অপরের দাস কথনও নহে ইহাই সিদ্ধান্ত। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে জীবকে "তটস্থ" বলা হইয়াছে যথা :—

যৎতটস্থস্তু চিদ্রূপং স্বসম্বেদ্যাদ্‌বিনির্গতং।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ সজীব ইতি কথ্যতে ॥

অর্থাৎ চিৎ পদার্থ, স্বীয় সম্বেদ্য, মূল পরমপূর্ণ পদার্থ হইতে বিনির্গত এবং তটস্থ হইয়া থাকেন। গুণরাগ দ্বারা রঞ্জিত তটস্থ চিদ্রূপই জীব-সংজ্ঞায় অভিহিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদিবেদান্তিগণ ব্রহ্মের গুণশক্তি প্রভৃতি স্বীকার করেন না। বৈষ্ণব বেদান্তিগণ তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত শাস্ত্র-যুক্তি প্রমাণবলে খণ্ডিত করিয়াছেন। শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীজীব গোস্বামিকৃত ভগবৎসন্দর্ভ হইতে আলোচনা করা যাইতেছে :—

শক্তি-বিচার ও নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন।

তত্র বস্তু তস্য সশক্তিত্বমাহ :—

"বেদ্যং বাস্তবমত্রবস্তু ইতি।"

অস্য বিশেষণাভ্যামেব "শিবদং" "তাপত্রয়োন্মূলনমিতি"। শিবং পরমানন্দং তদ্দানঞ্চ স্বরূপশক্ত্যা। তাপত্রয়ং,—মায়া শক্তিকার্য্যম্, তদুন্মূলনঞ্চ তয়া (স্বরূপশক্ত্যা)।

অর্থাৎ সেই পরমবস্তু যে শক্তিশালী তৎসম্বন্ধে বলা যাইতেছে :— শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।২ শ্লোকে ইহার প্রমাণ আছে। এই শ্লোকের "শিবদং" এবং "তাপত্রয়োন্মূলনম্" এই দুইটী বিশেষণ পদ আছে। তাপত্রয়—মায়া শক্তির কার্য্য। স্বরূপ শক্তির প্রভাবেই ত্রিতাপের উন্মূলন হয়। মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তি পরস্পর-বিরুদ্ধ; উহাদের বৃত্তি ও আপন আপন গণ পরস্পর-বিরুদ্ধ, আরও কথা এই যে উহারা অনেক, কিন্তু তাহা হইলেও এই সকল পরস্পরবিরুদ্ধ বৃত্তি ও গণের নিদান এক। যথা :—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥

(ভাঃ ৬।৪।২৬)

অর্থাৎ যাঁহার শক্তিসমূহ বাদী ও বিবাদিগণের বাদ প্রতিবাদের স্থান-স্বরূপ, এবং যাঁহার শক্তিসমূহ এই সকল বাদিপ্রতিবাদিগণের আত্মমোহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, আমি সেই অনন্তগুণশালী ভূমা পুরুষকে প্রণাম করি। *

---

* ফলতঃ ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে জগতে বাদবিসম্বাদের অত্যন্ত আধিক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ দেখুন,—স্বজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদাসহিষ্ণু অদ্বৈতবাদী। এই অদ্বৈতবাদীদের সহিত ষোড়শ পদার্থবাদী নৈয়ায়িকদের মতভেদ-নিমিত্ত বিসম্বাদ হয়।

পূজ্যপাদ সন্দর্ভকার আরও একটী পদ্য উদ্ধৃত করিয়াছন যথা :—

যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধ শক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্‌ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে॥
(ভাঃ ৪।৯।১৬)

মীমাংসকদের সহিত বৈশেষিক মতের বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, আবার স্বভাব-বাদীদের ও সাঙ্খ্যগণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভিমত।

শ্রীভাগবতের টীকাকার শ্রীমদ্‌বীর রাঘবাচার্য্য পৃথিব্যাদিকেও ভগবৎশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"শক্তিশব্দেন পৃথিব্যাদয় উচ্যন্তে।" ইনি ইহার এই উক্তি সপ্রমাণ করার জন্য শ্রুতি স্মৃতির প্রমাণ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা :—

"যস্যাত্মা শরীরম্, যস্য পৃথিবী শরীরম্ যস্যাক্ষরং শরীরম্, যস্যাব্যক্তং শরীর মাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ তোয়েন জীবান্ বিসসর্জ্জ ভূম্যাং ন্যাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং তম আসীৎ।"

আবার অন্যত্র স্মৃতি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে যথা :—

তথাচ ভগবান্ পরাশরঃ—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃশক্তি স্তথেদমখিলং জগৎ॥
বিষ্ণুপুরাণ।

জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধেও বহু বাদবিবাদ আছে। ব্রহ্মবাদিবৈষ্ণব বেদান্তীদের মতে শ্রীভগবান্ অনন্ত শক্তিময় ও অনন্ত কল্যাণময়। ইহারা সাংখ্য বৈশেষিক প্রভৃতির সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া বলেন প্রধানাদির বিশ্বরচনার যোগ্যতা নাই, জগৎরচনা ভগবৎশক্তিরই কার্য্য, এবং ইহাতে কেবল সেই ভগবৎশক্তিরই যোগ্যতা আছে। এই বিশ্বের সৃষ্টি, নিয়মন ধারণ, রক্ষণ, পালনাদির প্রয়োজনীয় অনন্ত গুণ কেবল শ্রীভগবানেরই আছে। শাস্ত্র বলেন "তিনি অখণ্ডকল্যাণগুণাত্মক।" শ্রীমৎ শুকদেব কৃত সিদ্ধান্তপ্রদীপনাম্নী ব্যাখ্যাতেও এইরূপ অভিমত দৃষ্ট হয়। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে জ্ঞানময় সর্ব্বশক্তি পুরুষের সৃষ্ট, ইহাই শ্রীপাদ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের অভিমত।

অর্থাৎ বিত্তাদি বিবিধ আনুপূর্ব্ব্য শক্তিসমূহ পরস্পর বিরোধী হইলেও যে একমাত্র ব্রহ্ম হইতে অহর্নিশ উদ্ভূত হয়, সেই বিশ্ববীজ, আত্ম ও এক আনন্দমাত্র অবিকার ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলাম।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় সন্দর্ভে "আনুপূর্ব্ব্যা" পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :—"স্বস্ববর্গে উত্তমমধ্যমকনিষ্ঠভাবেন বিত্তমানা"। "পতন্তি" পদের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে, "প্রবর্ত্তন্তে—স্বস্ব ব্যাপারং প্রকুর্ব্বন্তি।" অর্থাৎ ইহারা আনুপৌর্ব্বিক ক্রমে বিত্তমান থাকিয়া স্বস্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই প্রমাণেও ব্রহ্মের সশক্তিত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে।

অপর প্রমাণ—

সর্গাদি যোঽস্যানুরুনদ্ধি শক্তিভি
র্দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে॥

(ভাঃ ৪।১৭।২৮)

যিনি দ্রব্য (মহাভূত সমূহ), ক্রিয়া (ইন্দ্রিয়সমূহ), কারক (দেবতা) চেতনা (বুদ্ধি), আত্মা (অহঙ্কার), এই সকল শক্তিদ্বারা এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় সাধন করেন সেই সমুন্নদ্ধ বিরুদ্ধ শক্তিশালী মহান্ পরম পুরুষকে নমস্কার করি।

এই সকল বচন দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে, যিনি পরমতত্ত্ব, তিনি শক্তি-সমূহের—বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের—সমাশ্রয়। শক্তির অনন্তত্ব পরিলক্ষিত হইলেও শক্তির আধার স্বরূপ শ্রীভগবান্ এক ও অদ্বিতীয়।

এই শক্তিসমূহ যে অচিন্ত্য, পূজ্যপাদ সন্দর্ভকার শ্রীজীব গোস্বামি মহো-দয় তাহাও সপ্রমাণ করিয়াছেন যথা :—

তাসামচিন্ত্যত্বমাহ :—"আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য সহস্র শক্তিঃ ইতি

(ভাঃ ৩।৩৩।৩)

অর্থাৎ সেই আত্মেশ্বর বহুল অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট। শ্রীপাদ শ্রীজীব লিখিয়াছেন :—বেদান্ত সূত্রেও অচিন্ত্যত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় যথা :—

১। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।

২ অঃ, ১ পাঃ, ২৭ সূত্র।

এই সূত্রটীর শাঙ্করভাষ্যে অচিন্তত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা আছে তদ্‌যথা :—

"লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধীপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্ত-বৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়োবিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে, তা অপি তাবন্নোপ-দেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে। অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎ-সহায়া, এতদ্বিষয়া, এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি ; কিমুতাহচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণো রূপং বিনা শব্দেন নিরূপ্যেত। তত্রাহুঃ পৌরাণিকাঃ—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যদ্ধি তদচিন্তস্য লক্ষণম্॥"

অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, মণি মন্ত্র ও ঔষধাদির শক্তিসমূহ দেশকাল নিমিত্ত বৈচিত্র্যবশতঃ বহুল বিরুদ্ধ কার্য্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই সকল শক্তির তত্ত্ব,—উপদেশ ব্যতীত কেবল যুক্তিতর্কের পর্য্যালোচনায় অধিগম্য হয় না। এই প্রত্যক্ষ বস্তুর এই শক্তি, এই সহায়, এই বিষয়, এই প্রয়োজন,—ইহাই যখন তর্কদ্বারা জানা যায় না, তখন শাস্ত্রৈকগম্য অচিন্ত্যপ্রভাব কিরূপে জানা যাইবে? পৌরাণিকেরা বলেন :—যে সকল বিষয় অচিন্ত্য, সেই সকল বিষয়কে তর্কারূঢ় করিবে না। যাহা প্রকৃতির পরে, তাহাই অচিন্ত্য।

দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে :—

২। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ।

ব্রহ্মসূত্রে—২।১।২৮ সূত্র।

ব্রহ্ম এক ও অসহায়। তাঁহাতে অনেকাকার সৃষ্ট হয়। অথচ তাঁহার স্বরূপ বিনষ্ট হয় না। এরূপ কি প্রকারে ঘটে, মনে স্বতঃই এই তর্ক

উঠিতে পারে। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন স্বপ্নদ্রষ্টা আত্মা এক ; স্বপ্নকালে তাহাতেও অনেকাকার সৃষ্টি হয়, অথচ আত্মার স্বরূপ অবিকল থাকে। বিচিত্র স্বাপ্নিক সৃষ্টির কথা শ্রুতিতেও পরিপঠিত হইয়াছে, তদ্ যথাঃ—

"ন তত্র রথা ন রথযোগা, ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজ্যতে।"

অর্থাৎ সেখানে (আত্মায়) রথ নাই, রথবাহী অশ্বও নাই, পথও নাই। স্বপ্নদ্রষ্টা রথ অশ্ব ও পথ সৃষ্টি করে।

অপিচ ভাষ্যকার আরও লিখিয়াছন—

"লোকেঽপি দেবাদিষু মায়াব্যাদিষু চ স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব বিচিত্রা হস্ত্যশ্বাদি সৃষ্টয়ো দৃশ্যন্তে, তথৈকস্মিন্নপি ব্রহ্মণি স্বরূপানুমর্দ্দেনৈবানেকাকারা সৃষ্টির্ভবিষ্যতীতি।"

অর্থাৎ লোকমধ্যে দেবতা ও ঐন্দ্রজালিক প্রভৃতিতে উহাদের স্বরূপানুমর্দ্দন অর্থাৎ স্বরূপের বিনাশ না হইয়াও হস্তী প্রভৃতির সৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ মায়াবীরা মায়াবলে স্বদেহকে হস্তী প্রভৃতিতে পরিণত করেন, অথচ তাঁহারা অবিকল অবস্থায় থাকেন।

এই সকল শক্তি,—অচিন্ত্য শক্তিরই প্রমাণস্বরূপ।

কিন্তু মায়াবাদীরা ব্রহ্মে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইঁহারা বলেন ব্রহ্মবস্তু,—চিদেকমাত্র ইঁহারা চিৎ-ভিন্ন অপর পদার্থ স্বীকার করেন না। এই সিদ্ধান্তখণ্ডন করার নিমিত্ত শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় ব্রহ্মে শক্তির অস্তিত্ব ও স্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধে সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি এই নিমিত্ত প্রথমতঃ শ্রীভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উহার ব্যাখ্যা দ্বারা নিম্নলিখিতরূপ বিচার করিয়াছেন,—তদ্যথা—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।

জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥

(শ্রীভাগবতে ১১।৩।৩৮)

অর্থাৎ ব্রহ্মই অনেকাত্মশক্তিশালী বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন। মূলে "ব্রহ্মৈব" পদে একটী "এব" শব্দ আছে। এই "এব" শব্দটী "নিশ্চিত" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সেই শক্তি কল্পিত নহে, উহা ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি। ব্রহ্ম সদসদাত্মক হইয়াও এই দুই বহিরঙ্গ বৈভবের অতিরিক্ত বস্তু। অর্থাৎ সৎ—স্থূলকার্য্য, যেমন পৃথিব্যাদি; অসৎ—সূক্ষ্ম কারণ, যেমন প্রকৃত্যাদি; ব্রহ্ম এই দুই বহিরঙ্গ পদার্থের অতিরিক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠ তাঁহার বৈভবস্বরূপ; এবং তটস্থ বৈভব,—শুদ্ধ জীবস্বরূপ। পৃথিব্যাদি স্থূলদৃষ্টি গ্রাহ্য পদার্থ এবং প্রকৃতি প্রভৃতি সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-চর পদার্থ এস্থলে সদসৎ নামে অভিহিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সদসদ্রূপে প্রতিভাত হয়েন, কেননা, তিনি এই দুইয়ের কারণস্বরূপ। এই সকল পদার্থ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। যেহেতু ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোনও পদার্থ মূলতঃ নাই।

তাহা হইলে শক্তিসমূহকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কল্পনা করিলে এই সকল শক্তি অসিদ্ধ হইয়া উঠে। জ্ঞান, ক্রিয়া, অর্থ ও ফল দ্বারা ব্রহ্ম-বৈভবের অস্তিত্ব উপলব্ধ হইয়া থাকে,—মহদাদি জ্ঞানশক্তিরূপ, সূত্রাদি (কার্য্যানামাধারত্বাৎ সূত্রস্থানীয় মিতি শ্রীবীররাঘবাচার্য্যঃ) ক্রিয়াশক্তিরূপ। ব্রহ্ম—কার্য্যের আধার, এইজন্য ইনি সূত্রস্থানীয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র ইন্দ্রিয়ার্থরূপ প্রকৃতি, এই প্রকৃতিতে সর্ব্বভাবের সমাবেশ সূচিত হয়। এই নিমিত্ত ব্রহ্মকে সদসৎস্বরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম ফলরূপে এই সদসতেরও পর। পুরুষাখ্য স্বরূপ, অবৈভব ভগ-বদাখ্য চিদ্বস্তু এবং তদনুগত শুদ্ধাখ্য জীববস্তু এই উভয়ই ফলস্বরূপ। এই রূপ জ্ঞানক্রিয়াদি দ্বারা ব্রহ্মের বহু শক্তিত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে কি প্রকারে বহু শক্তির প্রকাশ হইল, শ্রীজীব মহোদয় উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিতরূপে তাহা স্পষ্ট করিয়াছেন যথা :—প্রথমতঃ আদিতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ; তাঁহা হইতে সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান ; তাহা হইতে ক্রিয়া শক্তিদ্বারা কার্য্যাধারস্বরূপ সূত্র ; জ্ঞান শক্তিদ্বারা মহান্ ; এই মহৎতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ; এই অহঙ্কারই জীব বা তটস্থ শক্তি। বৈকুণ্ঠাদিবৈভব জীবেরই উপলক্ষণ। এই উক্তি সপ্রমাণ করার নিমিত্ত পূজ্যপাদ ব্যাখ্যাকার শ্রীজীব নিম্নলিখিত ছান্দোগ্য শ্রুতি লক্ষ্য করিয়াছেন তদ্‌যথা :—

"তে চ—সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদ্যাঃ।"

আমরা শ্রুতিগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(১) "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত।" ইত্যাদি

ছান্দোগ্য ৬ষ্ঠ প্রপা ২ খণ্ড।

অর্থাৎ হে সোম্য এই এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু বিদ্যমান ছিলেন। কেহ বলেন আদিতে একমাত্র অদ্বিতীয় অসৎবস্তু বিদ্যমান ছিলেন। সেই অসৎ হইতে এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ আবির্ভূত হইয়াছে।

(২) কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র মাসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। (তত্রৈব ২য়)

অর্থাৎ হে সোম্য ইহা কি প্রকার? অসৎ হইতে কি প্রকারে সৎজাত হইতে পারে? হে সৌম্য এক অদ্বিতীয় সৎ-ই অগ্রে ছিলেন।

(৩) তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত ইত্যাদি।

অর্থাৎ তিনি মনে করিলেন, আমি বহু হইব, এই মনে করিয়া তেজের সৃষ্টি করিলেন

অতঃপরের প্রপাঠকে নিম্নলিখিত শ্রুতিগুলি পরিপঠিত হইয়াছে যথা :—

(১) তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীব-জমুদ্ভিজ্জমিতি।

(২) সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্ম-নানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।

(৩) তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।

(১) এই ভূতগণ অণ্ডজ জীবজ ও উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়।

(২) তখন সেই দেবতা মনে করিলেন, আমি জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতায় প্রবেশ করিব এবং ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপে প্রকাশ পাইব।

(৩) তৎপরে দেবতা মনে করিলেন আমি এই তিনের প্রত্যেককে ত্রিবৃত করিব। তিনি জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া সেইরূপ প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন নামে ত্রিবৃত্ত করিলেন।

অতঃপরে শ্রীজীব লিখিয়াছেন :—

"আদাবেকং ততস্তদ্ তদ্রূপনিতিশক্তেঃ স্বাভাবিকত্বমায়াতম্।"

অর্থাৎ ব্রহ্ম আদিতে এক, তৎপরে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রকাশ পায়, এতদ্দ্বারা শক্তির স্বাভাবিকত্ব স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইল।

যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। অদ্বিতীয় এক হইতে বহুত্বের আবির্ভাব,—এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানসম্মত। সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সর তদীয় "ফাষ্ট প্রিন্সিপাল" নামক গ্রন্থে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে এক শক্তি হইতেই অনন্ত শক্তির উৎপত্তি। বিশ্বকারণ (একমেবাদ্বিতীয়ম্) হইতেই বহু হইয়াছেন, এ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানসম্মত। শক্তির এই স্বাভাবিকত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। কেনন্না—

"অন্যস্যাসম্ভাবেনৌপাধিকত্বাযোগাৎ।"

অর্থাৎ শ্রুতি অনুসারে এক অদ্বিতীয় সৎবস্তু ভিন্ন পূর্ব্বে যখন কিছুই ছিল না, এ অবস্থায় অন্য বস্তু না থাকায় ঔপাধিকত্বের অযোগহেতু এই শক্তি ব্রহ্মেরই স্বাভাবিকী।

এই সকল শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপবৈভবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গবৎ নিত্যসিদ্ধ হইলেও সূর্য্যের রশ্মিপরমাণুবৃন্দ যেমন সূর্য্যেরই উপাদান ও সূর্য্যমূলক ভিন্ন অপর কিছুই নহে, এই সকল শক্তিও তদ্রূপ ব্রহ্মসত্ত্বা হইতে স্বীয় স্বীয় সত্তা প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহারা ব্রহ্মসত্তামূলক এবং ব্রহ্মেরই উপাদান।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীজীব শ্রৌত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্‌যথা :—

"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

এইটি মুণ্ডক শ্রুতি, যথা :—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

মুণ্ডক ২।২।১।

অতঃপরে শক্তির স্বাভাবিকত্ব ও অচিন্ত্যত্ব সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের প্রাগুক্ত শ্লোক সমূহ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

মায়াবাদীদের মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, সুতরাং প্রমাণের অগোচর। কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ হইলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের সৃষ্ট হইতে পারে না। ব্রহ্মে অবশ্যই বিবিধ শক্তি আছে, ইহা শ্রুতিতেও জানা গিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম যে নির্ব্বিশেষ, মায়াবাদীদের এই মত গ্রাহ্য নহে। মায়াবাদীরা ব্রহ্মে শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবলতর যুক্তি শুনিয়া বলেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্ম শক্তির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু উহা "আগন্তুক"। অর্থাৎ জল যেমন স্বভাবতঃ শীতল, কিন্তু অগ্নির সন্তাপে ইহাতে উষ্ণতার আবির্ভাব হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে শক্তির আপাততঃ প্রতীয়মানতা কেবল মায়া-

রই বিলাস মাত্র। এই আপত্তি খণ্ডনের নিমিত্ত সন্দর্ভকার শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন। এইরূপ আগন্তুকত্ব ব্রহ্মে স্বীকৃত হইতে পারে না। কেননা, শ্রুতি বলেন :—

"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।"

অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। সুতরাং "ব্রহ্মে শক্তি আছে," একথা স্বীকার করিলেই বলিতে হইবে যে এই শক্তি ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি, উহা আগন্তুক নহে। ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি প্রভাব দ্বারা প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণের পরিণাম ঘটে এবং তাহার ফলেই সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার সাধিত হয়। অপরন্তু ব্রহ্ম বলিলেই বুঝিতে হইবে যে :—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"

এই পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে তৎসকলই ব্রহ্ম। সুতরাং প্রাপঞ্চিক গুণাদিও ব্রহ্মের অতিরিক্ত নহে। মায়াও ব্রহ্মেরই শক্তি, সুতরাং তাহাতে গুণের অত্যন্তাভাব নাই। তবে যে তাঁহাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে তিনি প্রাকৃত গুণাদি দ্বারা স্পৃষ্ট নহেন, অপ্রাকৃত অশেষ কল্যাণগুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান। মায়া তাঁহার শক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইলেও উহা তাঁহার বহিরঙ্গ শক্তি, কিন্তু স্বরূপ শক্তি নহেন। মায়া শ্রীভগবানের অধীন, এই নিমিত্ত তিনি মায়াধীশ তাঁহার স্বরূপ শক্তি স্বাভাবিকী এবং উহা মায়াস্পৃষ্ট নহে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও লিখিতে হইয়াছে :—

১। "জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥"

২। সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তদিত্যাদি।"

এইরূপ প্রমাণ-যুক্তির অবতারণা করিয়া শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে যে সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা এই :—

"একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ

বৈভবজীবপ্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তর্মণ্ডলস্থতেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গতরশ্মি তৎ প্রতিচ্ছবিরূপেণ।"

অর্থাৎ একই সেই পরমতত্ত্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সর্ব্বদাই স্বরূপ শক্তি, বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভব, জীব ও প্রধান এই চারিভাবে সর্ব্বদাই বিরাজমান। সূর্য্যের অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজ, মণ্ডল, মণ্ডলের বহির্গত রশ্মিমালা ও উহার প্রতিচ্ছবি উক্ত বাক্যের উদাহরণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে।

এইরূপ শক্তিবিভাগ বিষ্ণুপুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায় তদ্ যথা :—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥

শ্রুতিও বলেন :—

"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি।"

ইহাতে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। সে আপত্তি এই যে প্রত্যেক শক্তিই যদি বিশ্বব্যাপিকা ও নিত্যা হয়, তবে উহাদের একত্র সমাবেশ কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? এই অনুপপত্তি সহজেই খণ্ডিত হইতেছে :—

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভগবানের শক্তিসমূহ অচিন্ত্য, যাহা দুর্ঘটক তাহাই অচিন্ত্য। শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন :—দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্।" শক্তি সাধারণতঃ তিন প্রকার—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। স্বরূপ শক্তিও বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভব অন্তরঙ্গা শক্তির অন্তর্গত। ইঁহারা সূর্য্যান্তমণ্ডলস্থ তেজের ন্যায় বিরাজমান। তটস্থা শক্তি রশ্মি স্থানীয়। এই শক্তি চিন্ময় শুদ্ধ জীবরূপিণী। বহিরঙ্গা মায়া শক্তি প্রতিচ্ছবিগত-বর্ণশাবল্য স্থানীয়া; ইহা সেই পরমতত্ত্বের বহিরঙ্গবৈভব জড়ময় "প্রধান" শব্দবাচ্য।

ইতঃপূর্ব্বে পরম-তত্ত্বের চারি প্রকার অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে,

যথা—স্বরূপ, স্বরূপ—বৈভব, জীব ও প্রধান। বিষ্ণুপুরাণে প্রধানকে মায়াবৈভবের অন্তর্ভুক্ত করিয়া শক্তিত্রয়ের সংখ্যা করা হইয়াছে। জীব-শক্তিই তটস্থ শক্তি। বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ এই :—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥

ইতঃপূর্ব্বেও ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মায়া বহিরঙ্গা শক্তি হইলেও ইহার আবরণী শক্তিপ্রভাবে তটস্থ শক্তিময় জীবকে সহজেই অজ্ঞানতমঃপ্রভাবে সমাবৃত করিতে সমর্থ। এই মায়ার আবরণের তারতম্যানুসারে ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যশক্তি ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বদেহে ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। ফলতঃ শ্রীভগবানে এই সকল শক্তিই মিলিতভাবে অবস্থান করে। চিদচিৎ সকলপদার্থই শ্রীভগবানের শরীর। যথা শ্রীভাগবতে :—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

১১।৩৪।১

শ্রীভগবান্ যে চিদচিৎশক্তিযুক্ত, শ্রীভাগবতে তাহার প্রমাণ আরও আছে যথা :—

অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্।
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥

৭৩।৩৪

শ্রীভগবান্ চিৎ অচিৎ সর্ব্বশক্তিময়। শ্রীভাগবতেও এইরূপে ব্রহ্মশক্তি বা ভগবৎ শক্তির যথেষ্ট আলোচনা আছে। শ্রীভগবৎসন্দর্ভে অতঃপরে মায়া

শক্তির বিস্তৃত আলোচনা আছে ? পরমাত্মসন্দর্ভে তটস্থা বা জীব শক্তির ব্যাখ্যা ও বিচার করা হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও একবারে শক্তি অস্বীকার করিতে পারেন নাই, সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে অতি বিশদরূপে তাহা সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয় সর্ব্বসংবাদিনীগ্রন্থেও ভগবৎশক্তি-তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ কেবলাদ্বৈতবাদিগণের অভিমত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"অদ্বয়বাদিগণ বলেন স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদরহিত জ্ঞানই পরতত্ত্ব। শ্রীভাগবতে "বদন্তি" শ্লোকে যে "অদ্বয়" পদটী আছে সেই পদের প্রয়োগেই উপপন্ন হইতেছে যে পরম-তত্ত্ব সজাতীয়াদিভেদরহিত। সুতরাং এই তত্ত্ব অনন্ত ও সত্য। জ্ঞেয়, জ্ঞান ও তৎসাধনসমূহের প্রবিভাগে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্ট্যাদিসাধনে অদ্বয়তত্ত্ব সান্ত হইয়া পড়েন। যদি বল, অদ্বয়তত্ত্ব জগতের কর্ত্তা, তবে জ্ঞানই কর্ত্তা হইয়া উঠেন। আর যদি অদ্বয়তত্ত্ব বিক্রিয়মাণ হইয়া জগতের করণস্বরূপ হয়েন, তাহা হইলে অদ্বয়জ্ঞানকে বাষ্পাদিবৎ জড় বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। তাহা হইলে অদ্বয়জ্ঞান অসত্য হইয়া পড়েন।

ইঁহারা আরও বলেন, জ্ঞান শব্দটী,—জ্ঞপ্তি, অববোধ ও বোধপর্য্যায়-ভুক্ত। এই জ্ঞান নামক তত্ত্বটী "শক্তিমৎ" একথা বলাও অসঙ্গত। যদি বল যে "এই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব "স্বরূপভূত শক্তি", তাহাও বলিতে পার না,—স্বরূপশক্তি বস্তুটী কি ? এই শক্তি অদ্বয়জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত, কি অনতি-রিক্ত ? ইহার আদ্যেই বা স্বরূপত্ব কেন, আর অন্ত্যেই বা শক্তিত্ব কেন ? সত্য বটে, এই অদ্বয়জ্ঞানকে ভগবান্ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভগবত্ত্ব যে গুণাত্মক, যে গুণদ্বারা ইনি "ভগবান্" বলিয়া শব্দিত হইয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং একটা স্বরূপশক্তি কল্পনা করিলেও উহা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জ্ঞানবিলাসের বহুত্ব বা নানাত্বও কল্পিত হইতে পারে না। অপিচ নানাবস্তে ঈশিত্ব লক্ষণবিশিষ্ট গুণক্রিয়াদিই বা কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে ?"

"আরও কথা এই যে এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের নীলপীতাদি আকারত্ব ও পরিচ্ছন্নত্বই বা কিরূপে সম্ভাবিত হয়? অদ্বয়জ্ঞানের আবার বর্ণ কি, তাহার পরিচ্ছদই বা কি? পরিচ্ছদ হইতেছে—দ্রব্যবিশেষ, বৈকুণ্ঠ—লোকবিশেষ, সেখানে যাহারা গমন করে তাহারা জীববিশেষ,—এই সকলের অদ্বয়জ্ঞানত্ব কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের ঐ সকল অবস্থা স্বীকার করিলে সকল কথাই হস্তিস্নানের ন্যায় অকর্ম্মণ্য ও অযথা হইয়া পড়ে। অর্থাৎ হস্তীকে স্নান করাইলে সেই মুহূর্ত্তে স্বীয় স্বভাবে হস্তী আবার নিজ দেহকে ধূলি ধূসরিত করে। অদ্বয়তত্ত্বে শক্তিসংযোজনও সেই প্রকার নিরর্থক। ঐরূপ সিদ্ধান্ত কখনও স্বভাবতঃ নির্ম্মল বা দোষশূন্য হইবে না।"

"তবে বলিতে পার যে "এই জগৎ যখন কার্য্যময়। শক্তি ভিন্ন কখনও কার্য্য নিষ্পত্তি হয় না, সুতরাং শক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য। তদুত্তরে আমরা বলি এই শক্তি,—তত্ত্বও নহে, অতত্ত্বও নহে, উহা অনির্ব্বচনীয়, সুতরাং উহা মিথ্যা এবং স্বরূপভূতা নহে। ভগাদি কেবল উপলক্ষণ মাত্র। জহদজহৎলক্ষণা দ্বারা ভগবান্ শব্দটী এখানে অদ্বয়জ্ঞানের সহিত সামানাধিকরণ্যে প্রযুক্ত মাত্র। যেমন "সেই ইনিই দেবদত্ত" বলিলে "দেবদত্ত" শব্দটী উপস্থিত দৃশ্যমান ব্যক্তির পরিচায়করূপে প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ "অদ্বয়জ্ঞানই ভগবান্" এই কথা বলিলে জহদজহৎ লক্ষণা দ্বারা অদ্বয়জ্ঞানেরই মুখ্যত্ব সূচিত হইয়া থাকে।"

কেবলাদ্বৈতবাদীদের এই আপত্তি খণ্ডনের নিমিত্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীবৈষ্ণবগণ বলেন, অদ্বয়তত্ত্বটী যখন ভাবরূপতত্ত্ব সুতরাং "গলগৃহীত" ন্যায় অনুসারে ইহার স্বরূপশক্তি কেবলাদ্বৈতবাদীদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে। জগদাদিকার্য্য দর্শনে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার কে না করিবে? কেবলাদ্বৈতবাদিগণের আপত্তি দোষস্পৃষ্ট। জগৎ যখন কার্য্য, কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত শক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য। সুতরাং এই শক্তি, বস্তুর

ধর্ম্মবিশেষ, ঐ ধর্ম্ম ব্যতীত কোনও কার্য্যসিদ্ধ হয় না। ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানে ও নিমিত্তকারণে এই স্বরূপভূতা শক্তি নিত্য বিরাজমান। এই শক্তি দ্বারাই কার্য্যবিশেষের উৎপত্তি হয়। উহা ত্যাগ করিয়া অপর বস্তুবিশেষ স্বীকার অনর্থক। বিবর্ত্তবাদীদের পক্ষেও একটা অধিষ্ঠান স্বীকার্য্য। শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, এই অবস্থায় শুক্তিকেই রজতভ্রমের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শুক্তিতেই রজতের ভ্রম হয়—অঙ্গারে হয় না। ব্রহ্মেই জগতের ভ্রম হয়, অন্য কিছুতে হয় না। তাহা হইলে ব্রহ্মই জগৎ-ভ্রমের অধিষ্ঠান। যখন ব্রহ্ম অতিরিক্ত অন্য পদার্থ নাই, সুতরাং জগৎ ব্রহ্মশক্তিরই পরিচায়ক।

সর্ব্বসংবাদিনীকার মায়াবাদের বিরুদ্ধে শ্রীসম্প্রদায়ের উক্ত প্রতিবাদ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন "আরও একটা কথা এই যে ব্রহ্ম যখন জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন, তখন তিনি নিজে তৎসম্বন্ধে কিছু করেন কিনা? যদি এই বিষয়ে তাঁহার নিজের কোন কার্য্য না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে অজ্ঞান দ্বারাই বিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সুতরাং তদতিরিক্ত অজ্ঞানের অস্তিত্বই বা কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? যদি বিবর্ত্তন-ব্যাপারে ব্রহ্মের কিঞ্চিৎকরত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানাশ্রয় শুদ্ধ বস্তুর শক্তি স্বতঃই আসিয়া দাঁড়ায়। অদ্বৈতশারীরকভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য স্বয়ংই লিখিয়াছেন :—

"শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা নান্যা নাপ্যসতী বা কার্য্যং নিয়চ্ছেৎ, অসত্ত্বাবিশেষাদন্যত্বাবিশেষাচ্চ তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যমিতি।" (২।১।১৮ সূত্র ভাষ্য।)

অর্থাৎ শক্তি কারণে অবস্থান করিয়া কারণগত কার্য্যের নিয়মন করে। যাহাতে কার্য্য শক্তি থাকে না, তাহা কারণ নহে, সুতরাং কার্য্যও জন্মায় না। শক্তি কার্য্যকারণ হইতে ভিন্ন ও কার্য্যের ন্যায় অসৎ (অভাবরূপিণী)

হইলে উহা কখনও কার্য্যের নিয়ামক হইতে পারিত না। তাহা হইলে "এই বস্তুদ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইবে, ঐ বস্তুদ্বারা এ কার্য্য সাধিত হইবে না"—কার্য্য-সাধনের এইরূপ নিয়ম থাকিত না। অসত্ত্বের ও অন্তত্বের অবিশেষ প্রযুক্ত অনিয়মেই কার্য্য হইত, কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকিত না। সুতরাং শক্তি কারণেরই স্বরূপ এবং কার্য্য শক্তিরই স্বরূপ, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

সর্ব্বসংবাদিনীকার শ্রীমজ্জীব গোস্বামী বেদান্তের আলোক লইয়া শ্রীভগবৎশক্তিতত্ত্বকে অতীব পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বলেন আলোকের অনুচর অন্ধকারের ন্যায় অজ্ঞান চৈতন্যের অনুচর, অর্থাৎ যেখানে চৈতন্য সেইখানেই অজ্ঞান, ইহাই নিয়ম। এই নিয়ম দেখিয়া বুঝা যায় যে এই অজ্ঞানের সত্তাও চৈতন্য হইতেই উদ্ভূত। এই সিদ্ধান্ত হইতে আরও বুঝা যায় যে এই অজ্ঞানসত্তার স্ফুরণ-ধর্ম্ম দ্বারাই স্বরূপ শক্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে। শ্রুতি বলেন—

"অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তীতি"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এই শ্রুতি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে :

বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।

বৃহত্ত্বই তাঁহার শক্তিমত্তার প্রদর্শক। অন্যান্য পদার্থে আমরা যে শক্তির স্ফুরণ দেখিতে পাই, সেই সকল শক্তির মূল প্রস্রবণ,—চিৎশক্তির সন্নিধানত্ব; নতুবা জড়ে শক্তির ক্রিয়া অসম্ভব। অন্যান্য পদার্থে যে শক্তি দেখিতে পাই, তাহাও ভগবৎশক্তির স্ফূর্ত্তিমাত্র। ইহার প্রমাণ বেদান্ত-সূত্রভাষ্য—

প্রবৃত্তেশ্চ। ২।২।২

ইতি অত্রাদ্বৈতশারীরককৃতাপি (ব্যাখ্যাতম্) "নন্ু তব দেহাদিসংযুক্তস্যাপ্যাত্মনো বিজ্ঞানস্বরূপমাত্রাব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরনুপপন্নং প্রব-

র্ত্তকত্বমিতিচেৎ, ন অয়স্কান্তবদ্রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তিরহিতস্যাপি প্রবর্ত্তকত্বো-পপত্তেঃ।"

এইস্থলে লোকায়তিক নাস্তিকগণের মত-নিরসনার্থ তাহাদের মত উদ্ধৃত করিয়া উক্ত মতের পরিহার করা হইতেছে। নাস্তিকগণ বলেন, "তুমি কেবল বলিতেছ আত্মার প্রবৃত্তি আছে কিন্তু তুমি যে প্রবৃত্তি দেখিতেছ উহা দেহসংযুক্ত আত্মারই প্রবৃত্তি; বিজ্ঞানস্বরূপ মাত্র বস্তুর প্রবৃত্তি কোথায়? সুতরাং প্রবৃত্তিবিহীন শুদ্ধ চেতনার প্রবর্ত্তকত্ব উপপন্ন হই-তেছে না।"

লোকায়তিকগণের এই মত পরিহারার্থ শঙ্কর বলেন, "প্রবৃত্তি না থাকিলেই যে কোন বস্তু প্রবর্ত্তক হইতে পারে না একথা বলিতে পার না। অয়স্কান্তমণি এবং রূপাদির দৃষ্টান্তে প্রবৃত্তিহীনেরও প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। অয়স্কান্তমণি স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও লৌহের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। রূপাদি বিষয় সকল প্রবৃত্তিবিহীন হইয়াও চক্ষুর প্রবর্ত্তক হয়। সর্ব্ব-প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও ঈশ্বর সর্ব্বগত সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি হইয়া সকল পদার্থের প্রবর্ত্তক।"

যদি বল "অজ্ঞান হইতেই জগদ্রূপ কার্য্য হইয়া থাকে, অজ্ঞান ও মিথ্যা, জগৎরূপ কার্য্যও মিথ্যা। সুতরাং জগৎ প্রবর্ত্তকত্বাদি শক্তি ব্রহ্মের নহে, উহা অজ্ঞানের।" মায়াবাদিন্, তুমি একথাও বলিতে পার না। কেন না "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্করও এই ব্যাপারেই ব্রহ্মের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্ত্যাদি হইয়া থাকে। জগৎকার্য্যত্বে ব্রহ্মপ্রসঙ্গ স্বীকার করিলে ব্রহ্মে অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের অতিরিক্ত স্বরূপ-শক্তির স্থিতি একবারেই দুর্নিবার হইয়া উঠে। কেন না এতৎপক্ষে কোনও প্রতিবন্ধকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। সবিতৃপ্রকাশক প্রকাশ্যনাশেও নষ্ট হয় না, সবিতার ন্যায় বর্ত্তমান থাকে। সবিতা আছেন অথচ তাহার প্রকাশ নাই, ব্রহ্ম আছেন অথচ তাঁহার শক্তি নাই ইহা অর্দ্ধ কুক্কুটীবৎ উপহাস্য।

এইরূপ উক্তির পরে শ্রীপাদ গোস্বামী শ্রীমৎ শঙ্করের ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শঙ্করও ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা :—

"ঈক্ষতে র্নাশব্দম্" ১।১।১৫

এই সূত্রভাষ্যে :—"অসত্যপি কর্ম্মণি সবিতা প্রকাশত ইতি কর্তৃত্বব্যপদেশদর্শনাৎ। এবম্ সত্যপি কর্ম্মণি ব্রহ্মণ স্তদৈক্ষতেতি কর্তৃত্বব্যপদেশোপপত্তে র্ন দৃষ্টান্তবৈষম্যমিতি।"

অর্থাৎ যখন কর্ম্ম বা প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ অবিবক্ষিত থাকে তখন যেমন সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন" এইরূপ বলা হয় এবং অকর্ম্মক-কর্তৃত্বের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তদ্রূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞানকর্ম্ম (জ্ঞেয় বস্তু) না থাকিতেও "তৎ ঐক্ষত" তিনি ঈক্ষণ করিলেন তদ্রূপ অকর্ম্মক কর্তৃত্ব ব্যবহারও সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে দৃষ্টান্তের কোনও বৈষম্য নাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সহস্রনামভাষ্যেও লিখিয়াছেন :—"স্বরূপসামর্থ্যেন ন চ্যুতো ন চ্যব্যতে ন চ্যবিষ্যত ইত্যচ্যুতঃ। শাশ্বতং শিবমচ্যুতমিতি শ্রুতিঃ। সুতরাং এস্থলেও শঙ্কর ব্রহ্মের স্বরূপ-সামর্থ্য বা স্বরূপ শক্তির প্রসঙ্গ স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুর শক্তি, কার্য্যের উত্তরকালে ও পূর্ব্বকালে তৎতৎ বস্তুতে মন্ত্রশক্তির ন্যায় বিরাজমান থাকে। কার্য্যকাল প্রাপ্ত হইয়া উহা প্রকাশিত হয়, এই মাত্র বিশেষ। ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও এইকথা। শঙ্কর ভাষ্যেও এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

"বিষয়াভাবাদিয়মচেতয়মানতা ন চৈতন্যাভাবাৎ।"

অর্থাৎ যে যে স্থলে অচেতয়মানতা দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল বিষয়াভাব নিবন্ধন, কিন্তু চৈতন্যাভাব জনিত নহে।

সর্ব্বসংবাদিনীকার বলেন, যদি বল জ্ঞানের নিত্যতায় জ্ঞান-বিষয় স্বাতন্ত্র্যের ব্যপদেশ দৃষ্ট হয় না, এরূপ আপত্তিও করিতে পার না। কেননা, সূর্য্যপ্রকাশে প্রকাশ ও দহন উভয়ই উপলব্ধি হয়।

"নাভাব উপলব্ধেঃ।"

এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বিজ্ঞানবাদনিরাকরণ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় আত্মার সাক্ষিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং একই তত্ত্বেরই স্বরূপত্বও স্বীকৃত হইয়াছে। স্বরূপত্ব স্বীকৃত হইলেই শক্তিত্ব ও স্বীকার্য্য হইয়া উঠে।

শাস্ত্রে উক্ত আছে পরমেশ্বরের বিমলা চিচ্ছক্তি চৈতন্য নামে অভিহিতা। এই শক্তি সত্যা ও পরা। ভগবানের জড়া শক্তি অবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই উভয় শক্তির পরস্পর সংযোগে চিজ্জড়াত্মক জগতের উদ্ভব হয়।

সর্ব্ব-সংবাদিনীকার এইরূপ সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়া আরও প্রমাণার্থ বিষ্ণুপুরাণের "বিষ্ণুশক্তি পরাপ্রোক্তা" শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীধর স্বামিকৃত উহার টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বামী লিখিয়াছেন বিষ্ণুশক্তি শব্দের অর্থ বিষ্ণুর স্বরূপভূতা চিৎশক্তি। এই শক্তি পরব্রহ্ম পর-তত্ত্বাখ্যা। ইহা ভেদবিরহিত সত্তামাত্র নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। স্বরূপ শক্তি বলিলে কার্য্যোন্মুখত্ব দ্বারাই স্বরূপের শক্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। স্বরূপ বিশেষ্যরূপ। এই শক্তিমৎ বিশেষণরূপ কার্য্যোন্মুখত্বই শক্তি। জগৎ কার্য্যক্ষমত্বমূলক। জগৎ কার্য্যক্ষমত্বের পরিচায়ক। এই ক্ষমত্বসিদ্ধরূপা শক্তি নিত্যা। সুতরাং উহাই স্বরূপশক্তি। তথাপি ইহা বস্তু হইতে অত্যন্ত পৃথক।

আবার এই শক্তি সম্বন্ধে বস্তুর নিরূপণযোগ্যতা নাই সুতরাং পৃথকত্ব নাই। সুতরাং এই শক্তিকে শক্তিমদ্ বিশেষণরূপ কার্য্যোন্মুখত্ব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে "যদি ইহাকে তোমরা শক্তিবল, তবে সেই শক্তির নাম বস্তুই হউক না কেন? উহাতো বস্তুনিষ্ঠ ধর্ম্ম বিশেষ। শক্তি স্বীকারে কি প্রয়োজন?" ইহার উত্তরে বৈষ্ণব বেদান্তিগণ বলেন, "আমরা উহাকে বস্তু বলিতে পারি না। বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রাদি দ্বারা বস্তুশক্তিই স্তম্ভিত হয়। বস্তু আছে, কিন্তু উহার কার্য্যোন্মুখত্ব স্তম্ভিত, এমত স্থলে শক্তির পৃথকত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। নতুবা এতাদৃশ স্থলে যুক্তি-

বিরুদ্ধতা দোষ ঘটে। ইহাকে স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না, সুতরাং উহা ভিন্ন ; এবং ভিন্নভাবেও চিন্তা করা যায় না এই জন্য উহা অভিন্ন। এই নিমিত্ত শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ স্বীকৃত হইয়াছে এবং শক্তি ও শক্তিমান্ অচিন্ত্য বলিয়া ও অভিহিত হইয়াছে। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ। ব্রহ্ম-শক্তিবাদ সম্বন্ধে ইহাই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত।

কিন্তু এই শক্তিতত্ত্বের পরেও শ্রীল রামরায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের যে উচ্চতম ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন এখন তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তিনি শত শত অবতারের বীজ, তিনি অবতারী, এ সকল কথা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগীতায় তাঁহার নিজ শ্রীমুখের উক্তি এই যে :—

মাধুর্য্য।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে ॥
যদা যদাহিধর্ম্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্ত তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

অর্থাৎ "সাধুগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত, দুষ্কৃতজনগণের বিনাশার্থ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্ত, আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আত্মপ্রকাশ করি।" ইহাতে জানা যাইতেছে ভূভারহরণার্থ শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চে প্রকটিত হয়েন। এখানে একটা আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে ; সে আপত্তি এই যে কৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রেই ভূভার অপহৃত হইতে পারে, অথবা তাঁহার অংশাবতার দ্বারাই ভূভার অপহরণ সম্ভবপর হয়, এমত অবস্থায় কেবল ভূভার-হরণের নিমিত্ত তাঁহার অবতরণের কি প্রয়োজন? এই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে যে মীমাংসা লিখিত হইয়াছে তদ্‌যথা :—

"যদ্যপি নিজাংশেনৈব বা নিজেচ্ছাভাসেনৈব বা ভূভারহরণমীষৎকরং তথাপি নিজচরণারবিন্দজীবাতুবৃন্দমানন্দয়ন্নেব বা লীলাকাদম্বিনীনিজ-মাধুরীবর্ষণায় বিতরিষ্যমাণোঽবতরিষ্যতীত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ "যদিও তাঁহার নিজের অংশ দ্বারা অথবা তাঁহার নিজের ইচ্ছাভাস দ্বারা ভূভারহরণ অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে, তথাপি তাঁহার স্বয়ং অবতারের এক সবিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তাহা এই যে, তদীয় চরণার-বিন্দগতপ্রাণ ভক্তবৃন্দের আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য অথবা লীলাকাদম্বিনীরূপা নিজ মাধুরীবর্ষণের নিমিত্তই তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন।" শ্রীচরিতামৃতে, সন্দর্ভের এই বাক্যের পরিস্ফুট ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তদ্‌যথা :—

পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভাব হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলা শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে—ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার কাল।
ভারহরণ কালে তাতে হইল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান্ যেই অবতার কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু দ্বারায় কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥
আনুষঙ্গে কর্ম্ম এই,—অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূলকারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥

* * * *

রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার॥
অনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥

এই যে রসময় মূর্ত্তি সাক্ষাৎ শৃঙ্গার—ইনিই শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ। এই শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তিই শ্রীবৃন্দাবনের ভজনীয় বস্তু। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি সিদ্ধকবি শ্রীল জয়দেব এই শ্রীকৃষ্ণের যে শ্রীরূপচ্ছবি প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই প্রেমিক ভক্তের ধ্যানের মূর্ত্তি তদ্‌যথা ঃ—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণী-শ্যামল-কোমলৈ রুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥

শ্রীচরিতামৃতকার ইহার মর্ম্ম লইয়া লিখিয়াছেন ঃ—

শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক এই ঃ—

অখিল রসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধকপালিঃ।
কলিতশ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥

শ্রীভাগবতে লিখিত হইয়াছে ঃ—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥

শ্রীভাগবতে (১০।৩২।২।)

অর্থাৎ "শূরবংশাবির্ভূত ভগবান্ গোপবালাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন তাঁহার মুখখানি হাসিমাখা, প্রফুল্ল। গলায় বনফুলের মালা, একে মরকত-মণি নীল সমুজ্জল কান্তি, তাহার উপরে তড়িদ্দামের ন্যায় পীতাম্বর। সেই

পীতাম্বর আবার স্কন্ধদ্বয়ের নিম্ন হইতে সম্মুখের দিকে টানিয়া আনিয়া পুরোভাগে উভয় হস্তে ধৃত,—যেন রসিকনাগর রসবতীদের নিকট মদনমোহন বেশে অপরাধ ক্ষমাপ্রার্থনায় লজ্জিত অথচ প্রফুল্লমুখে দণ্ডায়মান! গোপীরা তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ইনি যেন জগন্মোহন কামদেবের চিত্তগত কামেরও মোহজনক। এমন সাক্ষাৎমন্মথ মন্মথরূপ দেখিয়া সকলেই অধীর হইয়া দাঁড়াইলেন।”

শ্রীশ্রীমদনমোহন রূপের বর্ণনসূচক শ্রীভাগবত বচন-প্রমাণ অসংখ্য। এস্থলে দুই একটী মাত্র অতি প্রসিদ্ধ বচনের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

১। অসমানোর্দ্ধমাধুর্য্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ।
জঙ্গমস্থাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্র নন্দনঃ॥

২। কন্দর্পকোট্যর্ব্বুদরূপশোভা
নীরাজ্যপাদাব্জনখাঞ্চলস্থ
কুত্রাপ্যদৃষ্টশ্রুতরম্যকান্তে
ধ্যানং পরং নন্দসুতস্থ বক্ষ্যে।

৩। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপম্
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।

শ্রীভাগবতে (১০।২৯।৪০)

৪। ত্রৈলোক্যলক্ষ্মৈক পদং বপুর্দধৎ

৫। তত্রাতি শুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥

শ্রীভাগবতে (১০।৩৩।৬)

৬। গোপ্য স্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপম্
লাবণ্যসার মসমোর্দ্ধমনন্য সিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভি নবং দুরাপং।
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্থ॥

শ্রীভাগবতে (১০।৪৪।১৪)

৭। যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসম্
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতাঃ নিমেশ্চ।

শ্রীভাগবতে (৯।২৪।৬৫)

৮। যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকঃ স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্যচ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্।

শ্রীভাগবতে (৩।২।১২)

এইরূপ বচন প্রমাণ প্রকৃতই অসংখ্য। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনীয় মধুররূপবর্ণনে পরিপূর্ণ। মহাজনী পদাবলীতে সিদ্ধ প্রেমিক ভক্তগণ এই রূপলাবণ্যমাধুর্য্য-বারিধির যে রসময় বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছেন, বঙ্গীয় ভক্ত পাঠকগণের কর্ণ ও হৃদয় সে সুধামাখা বর্ণনারসে পরিসিক্ত। ঋক্ পরিশিষ্টে এই রসামৃত আনন্দ মূর্ত্তির উল্লেখ আছে যথা :—

১। রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।

২। কৃষ্ণ এব পরোদেব স্তং ধ্যায়েৎ তং রসয়েৎ।

গোপালতাপনী উপনিষৎ।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রত্যেক শ্লোকই এস্থলে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিতে সাধ হয়। নিখিলসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যামৃতের আনন্দময় বর্ণনাপূর্ণ এই গ্রন্থ ভক্ত-পাঠকগণের নিত্য পাঠ্য। এখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রলাপ সময়ে তদীয় শ্রীমুখোচ্চারিত একটী পদ্য উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা :—

সাক্ষাৎমন্মথ-মন্মথ।

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু

বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন :—

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা নেত্র মনোৎসব কিবা প্রাণবল্লভ
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ॥

এই অখিলরসামৃত-আনন্দমূর্ত্তি শ্রীভগবানই শ্রীভাগবতে "সাক্ষাৎমন্মথ-মন্মথ" নামে অভিহিত হইয়াছেন।

"সাক্ষাৎমন্মথ-মন্মথঃ" এই পদের ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ তোষণীকার সনাতনগোস্বামিমহানুভব যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :— "প্রাকৃত অপ্রাকৃত ভেদে অনেক মন্মথ আছেন। তদীয় শক্ত্যংশের আবেশী প্রাকৃতমন্মথগণ অসাক্ষাৎ মন্মথ—ইহারা সাক্ষাৎ মন্মথ নহেন। বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহে যে সকল মন্মথ আছেন, তাঁহাদিগকে স্বয়ং কামদেব বা সাক্ষাৎ মন্মথ বলা যায়। কিন্তু শৃঙ্গাররসরাজময়মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ এই সাক্ষাৎ মন্মথগণেরও মন্মথস্বরূপ।

মন্মথ ও মদন প্রভৃতি নামের ব্যুৎপত্তি কালিকাপুরাণে দৃষ্ট হয় যথা :—

যস্মাৎ প্রমথসে চেত স্বং জাতোঽস্মাকং তথাবিধেঃ।
তথা মন্মথনাম্না ত্বং লোকে গেয়ো ভবিষ্যসি॥
জগৎসু কামরূপ ত্বং তৎসমো নহি বিদ্যতে।
অতস্ত্বং কামনাম্নাপি খ্যাতো ভব মনোভব॥
মাদনান্মদনাখ্যস্ত্বং শম্ভোদর্পাৎ সদর্পকঃ।
তথা কন্দর্প নাম্নাপি লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি॥

২য় অধ্যায় কালিকাপুরাণ

এই শ্লোকে মন্মথ নামের ব্যুৎপত্তি এবং ধড়্জগতে মন্মথের আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত মদনের ভেদ-বিচার সম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতনের মূল উক্তিই এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "তাসামাবীরভূচ্ছৌরিঃ" শ্রীভাগবতের এই শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন :—

"নানা বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহেষু যে সাক্ষান্মন্মথাঃ স্বয়ং কামদেবাঃ,—নতু তদীয় শক্ত্যংশাবেশিপ্রাকৃতমন্মথবদসাক্ষাদ্রূপাঃ,—তেষামপি মন্মথত্ব-প্রকাশকঃ, চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদিবৎ।"

ইহাতে জানা যাইতেছে যে প্রাকৃত মন্মথগণ তাঁহার শক্ত্যংশাবেশী। উঁহারা অসাক্ষাৎরূপ, সুতরাং সাক্ষাৎ মন্মথ নহেন। বাসুদেবাদি চতু-র্ব্যূহেই সাক্ষাৎমন্মথগণের প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ এই সাক্ষাৎ মন্মথগণেরও মন্মথ। ইনি স্ত্রী-পুরুষ স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলেরই চিত্তাকর্ষক।

শ্রীল রায় রামানন্দের বচনামৃতের পদ্যানুবাদ করিয়া শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন :—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কাম গায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবরজঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥

অপ্রাকৃত নবীন মদন।

শ্রীবৃন্দাবনের এই অপ্রাকৃত নবীন মদনটি কে, কামবীজ কামগায়ত্রীই বা কাহাকে বলে, এবং কামবীজ কামগায়ত্রী দ্বারাই বা তাহার উপাসনা হয় কেন, কি উদ্দেশ্যেই বা এইরূপ উপাসনা হইয়া থাকে, এই বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা ভজন শাস্ত্রের আলোচনা-বিশেষ। এই উদ্ধৃত সুবিখ্যাত পয়ারের প্রথম দুই পংক্তির ব্যাখ্যা অনেকেই অনেক রকম করিয়াছেন। ভক্তগণের মনে যে ব্যাখ্যার উদয় হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন কথা বলিতে যাওয়া দুঃসাহসের

কথা। আমরা ভজনসাধনবিহীন, সুতরাং "মনগড়া" কথায় সিদ্ধগ্রন্থকারের মহাসিদ্ধ পংক্তিদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়া অসৎ সিদ্ধান্তের প্রশ্রয় দেওয়া অপরাধজনক মনে করি। এ অবস্থায় শাস্ত্রের সাহায্যে বিশেষতঃ স্বয়ংসিদ্ধ গ্রন্থকারের নিজের উক্তির সাহায্যে, এই ছত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা করার যদি সুবিধা পাওয়া যায়, তবে তাহার ন্যায় সুষ্ঠু প্রামাণিক উপায় বোধ হয় আর কিছুই হইতে পারে না। এস্থলে তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের একখানি অতি সুন্দর টীকা করিয়া রাখিয়াছেন। উহাতে ভজনতত্ত্বের যথেষ্ট উপদেশ আছে শ্রীচরিতামৃতের পয়ার-বিশেষের অবিকল সংস্কৃত ব্যাখ্যা এই টীকার স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। নিরতিশয় আনন্দের বিষয় এই যে—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী-কামবীজে যাঁর উপাসন।"

শ্রীচরিতামৃতের এই অতি নিগূঢ়ার্থ পয়ারের যথাবথ ব্যাখ্যা শ্রীকর্ণামৃতের টীকাতে পরিস্ফুটরূপেই লিখিত রহিয়াছে। পরম কারুণিক জগৎপূজ্য গ্রন্থকার একস্থানে সূত্ররূপে যাহার উল্লেখ করিয়াছেন, অপরস্থানে ভাষ্যরূপে তাহারই বিবৃতি করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের তৃতীয় শ্লোকটীর ব্যাখ্যাতেই আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় পদ্যটী এই:—

চাতুর্য্যৈকনিদানসীমচপলাপাঙ্গচ্ছটামন্থরম্
লাবণ্যামৃতবীচিলোলিতদৃশাং লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতম্।
কালিন্দীপুলিনাঙ্গন-প্রণয়িনং কামাবতারাঙ্কুরম্
বালং নীলমমী বয়ং মধুরিমস্বারাজ্যমারাধ্নুমঃ॥

ইহার তৃতীয় চরণের "কামাবতারাঙ্কুরম্" এই পদের ব্যাখ্যায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় লিখিয়াছেন:—

"নারীণাং মনোহারিত্বং কামাদীনাং চতুর্ব্যূহান্তার্গত প্রদ্যুম্নাখ্যস্বস্বরূপাণাং শাখাস্থানীয়ানাং, তদংশলেশাভাসরূপাণামনন্তব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতপ্রাকৃত কামানাং পত্রস্থানীয়ানামবতারস্য প্রাকট্যস্য অঙ্কুরং প্রথমোদ্ভিন্নকোমল স্কন্ধাংশম্। প্রাকৃতাপ্রাকৃতকন্দর্পনিদানবৃন্দাবনাভিনবকন্দর্পমিত্যর্থঃ। আগমাদৌ কামগায়ত্র্যা কামবীজেন চ তস্য তদ্রূপেণোপাস্যত্বাৎ। কোটীমদনবিমোহনাশেষচিত্তাকর্ষকসহজমধুরতরলাবণ্যামৃতপারাবার্ণবেন মহানুভাবচয়োঽনুভূয়মান তত্তন্মহাভাবনিবহেন শ্রীমদনগোপালরূপেণাধুনাপি বৃন্দাবনে বিরাজমানত্বাচ্চ।"

ইহার মর্ম্ম এই যে কোটীমদনবিমোহন অশেষচিত্তাকর্ষক, সহজ মধুরতর লাবণ্যামৃতপারাবার, মহানুভাবগণের মহাভাবনিবহে অনুভূয়মান শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজমান শ্রীশ্রীমদনগোপালই কামাবতারসমূহের প্রথমোদ্ভিন্ন কোমল স্কন্ধাংশ। চতুর্ব্যূহান্তর্গত কামগণ ইহাঁর শাখাস্থানীয়। ইহারা অপ্রাকৃত। ইহার অংশলেশাভাসরূপ নিখিলব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত মন্মথগণ ইহার পত্রস্থানীয়। উঁহারা প্রাকৃত বলিয়া খ্যাত। শ্রীবৃন্দাবনের অভিনব কন্দর্প, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সমস্ত কন্দর্পের নিদান। আগমাদিতে কামগায়ত্রী কামবীজ দ্বারা তাঁহার উপাসনা হয়, সুতরাং তিনি নারীমনোহারী। তিনি অধুনাও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদনগোপালরূপে বিরাজমান এবং কোটীমদনমোহনাশেষচিত্তাকর্ষক, ইহাও নারীমনোহারিত্বের পরিচায়ক। শ্রীকৃষ্ণের যে সকল গুণ আছে তন্মধ্যে নারীমনোহারিত্বও একটী গুণ, যথা:—

শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী।

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥

বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ানীশ্বর শ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্ব্বিগাহা হরেরমী॥
জীবেম্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া কচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥
কন্দর্পকোটীলাবণ্য ইত্যাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটীব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ॥
আত্মারামাগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ॥
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ॥
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ।
লীলাপ্রেম্নাপ্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদা চতুঃষষ্টীরুদাহৃতাঃ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীকৃষ্ণের এই ৬৪ গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। সংস্কৃত অতি সরল, সুতরাং অনুবাদের সবিশেষ প্রয়োজন নাই। প্রত্যেকটী পদ উদাহরণের সহিত বিশেষরূপে বুঝা অতীব প্রয়োজনীয়, অনুসন্ধানশীল ভক্তপাঠকগণ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে অবশ্য এ সমস্ত পাঠ করিতে পারেন এবং অনেকেই ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিয়াও থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের কোটীকন্দর্পলাবণ্য ও নিত্য নূতনত্ব গুণের কথাও এই গুণ-রাশির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি বৃন্দাবনে নবীন মদন। যিনি সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইয়াও আপন মাধুর্য্যের দ্বারা অননুভূতের ন্যায় বিস্ময় জন্মাইয়া থাকেন তিনিই নিত্য নূতন।

সদানুভূয়মানোঽপি করোত্যননুভূতবৎ।
বিস্ময়ং মাধুরীভি র্যঃ স প্রোক্তো নিত্যনূতনঃ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতেও লিখিয়াছেন :—

যিনি পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
নাম ধরে মদন মোহন।

এখানেও কর্ণামৃতের টীকার সেই "অভিনব কন্দর্প" পদই পুনর্ধ্বনিত হইয়াছে। শাস্ত্রেও ইনি "মদনমোহন" "মদনগোপাল" প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। যথা পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৯ম অধ্যায়ে

বন্দে মদনগোপালং কৈশোরাকারমদ্ভুতম্।
যমাহু র্যৌবনোদ্ভিন্নে শ্রীমন্মদনমোহনম্॥

ইনি কিশোরমূর্ত্তি, চিরনূতন, চিরঅভিনব। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে লিখিত হই-য়াছে :—

প্রণয়পরিণতাভ্যাং শ্রীভরালম্বনাভ্যাম্
প্রতিপদললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যাম্।
প্রতিমুহুরধিকাভ্যাং প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাম্
প্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ॥

কৈশোরাকার অত্যদ্ভুতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত এবং নবীন মদন। এই অপ্রাকৃত নবীন মদনের অনুভব, মহানুভাবেরও অসম্ভব। মহাভাবনিবহ দ্বারাই ইহাঁর অনুভব সম্ভবপর হয়। ইনি কেবল মাদনী-শক্তিস্বরূপিণী শ্রীমতীর সম্ভোগের পাত্র। মাদন মহাভাব সম্বন্ধে উজ্জ্বল-নীলমণি বলেন :—

সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসো মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব চ সদা॥

অর্থাৎ হ্লাদিনীর সার যে প্রেম, সেই প্রেম যদি সকল প্রকার ভাবোদ্গমে উল্লাসশীল হয়, তবে তাহাকে মাদন বলা যায়। এই মাদন পরাৎপর অর্থাৎ মোহন হইতেও মাদন শ্রেষ্ঠতর। কেবল শ্রীরাধাতেই মাদন মহা-ভাব বিরাজিত হয়, অন্যত্র ইহার প্রকাশ নাই। "মদয়তি আনন্দং দদাতি ইতি মদনঃ"। শ্রীশ্রীমদনগোপাল সাক্ষাৎ মন্মথগণেরও আনন্দদায়ক এইজন্য ইনি মন্মথ-মদন। এখন মাদনী শব্দের ব্যুৎপত্তি বলা যাইতেছে। মাদন-মহাভাবের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিমহাশয় লিখিয়াছেন :—

মাদয়তি হর্ষয়তি সর্ব্বং জগদপীতি তস্য ভাবঃ মাদনঃ। অর্থাৎ সমস্ত জগতের হর্ষবর্দ্ধন করেন ইনি, এইজন্য ইহাঁর নাম মাদন।

শ্রীমদনগোপাল প্রাকৃতাপ্রকৃত কন্দর্পসমূহের নিদানস্বরূপ অভিনব কন্দর্প। শাস্ত্রকারগণ এই জন্যই কামবীজ কামগায়ত্রীর দ্বারা ইহার উপাসনার বিধান করিয়াছেন। তন্ত্রে লিখিত আছে

মন্ত্রার্ণা দেবতাঃ প্রোক্তাঃ।

অর্থাৎ দেবতাসমূহ মন্ত্রবর্ণী। এই জন্য কামবীজই শ্রীমদনগোপালের বীজমন্ত্র। এবং কামগায়ত্রীই এই অভিনব কন্দর্পের গায়ত্রী। শ্রীমদন

কামগায়ত্রী

গোপাল অপ্রাকৃত কামদেবতা তদ্ধেতু তাঁহার উপাসনা মন্ত্র কামবীজ এবং তাঁহার গায়ত্রীও কামগায়ত্রী। কামগায়ত্রী এই :-

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

কা ম দে বা য় বি দ্ম হে, পু ষ্প বা ণা য়

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৪½।

ধী ম হি, ত ন্নোঽ ন ঙ্গ প্র চো দ য়াৎ"

এই কামগায়ত্রী সার্দ্ধচতুর্বিংশতি অক্ষরাত্মক।

এই সাড়ে চব্বিশ অক্ষরযুক্ত কামগায়ত্রীমন্ত্রই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। মীমাংসা-দর্শনে লিখিত আছে ঃ—

মন্ত্রাত্মিকা দেবতা।

কামগায়ত্রীমন্ত্র শ্রীমদনগোপালস্বরূপ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ঃ—

কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ
সাড়ে চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করি উদয়
ত্রিজগৎ করিল কামময়॥
সখি হে কৃষ্ণ মুখ দ্বিজ-রাজরাজ।
কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে বসি রাজ্য শাসনে
সঙ্গে করি চন্দ্রের সমাজ॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ জিনি মণি দর্পণ
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু তাহাতে চন্দন বিন্দু
সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥
করনখ চাঁদের ঠাট বংশী উপর করে নাট
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ চন্দ্রগণ তলে করে নর্ত্তন
নূপুরের ধ্বনি যার গান॥

নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্র নীলকমল
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূধনু নাসিকা বাণ ধনুর্গুণ দুই কাণ
নারীমন লক্ষ্য বিন্ধে তায়॥

এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত।
কাহোঁ স্মিতজ্যোৎস্নামৃতে কাহাকে অধরামৃতে
সব লোক করে আপ্যায়িত॥

বিপুল আয়তারুণ মদন মনঘূর্ণন
মন্ত্রী যার এই দুই নয়ন।
লাবণ্যকেলিসদন যার নেত্র-রসায়ন
সুখময় গোবিন্দ বদন॥

যার পুণ্য পুঞ্জফলে সে সুখ-দর্শন মিলে
দুই আঁখি কি করিবে পান।
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালোভ পীতে নারে মনক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দন॥

না দিলেক লক্ষ কোটী সবে দিল আঁখি দুটী
তাহে দিল নিমেষ আচ্ছাদনে।
বিধি জড় তপোধন রসশূন্য তার মন
নাহি জানে যোগ্য সৃজনে॥

যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তারে করে দ্বিনয়ন
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে কোটী আঁখি তার করে
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার॥

কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য সিন্ধু মুখ সুমধুর ইন্দু
অতি মধুর স্মিত সুকিরণ।
এ তিন লাগিল মনে লোভ করে আস্বাদনে
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালন ॥

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥

সনাতন কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সন্নিপাতি সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু ॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর মধুর হৈতে সুমধুর
তার সেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর।
মধুর হইতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর ॥
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশ দিক্ ব্যাপে যার পুর ॥

এই মাধুর্য্যামৃতপারাবার শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই প্রেমিক ভক্তের উপাস্য দেবতা; একবার এই মাধুর্য্যানন্দের সাক্ষাৎ হইলে আত্মা চিরতরে আনন্দরসে ডুবিয়া যায়, লৌকিক ভাষায় এই শ্রীমূর্ত্তির বর্ণনা অসম্ভব হয়; ভাষা,—মাধুর্য্যের অকুল সাগরে ডুবিয়া পড়ে। তখন বোবার স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশের ন্যায় কেবল "মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্" ভিন্ন আর কিছুই ব্যক্ত করিয়া উঠা যায় না। কামগায়ত্রীদেবতাই এই মাধুর্য্যানন্দপারাবার।

মীমাংসাদর্শনের মতে মন্ত্র দেবতাস্বরূপ। তাই সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন কামগায়ত্রীই যখন ব্রজমদন-গায়ত্রী, তখন

এই কামগায়ত্রীকেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। ইহারই অক্ষরে অক্ষরে সেই পূর্ণমাধুর্য্যসৌন্দর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিভাবিত হইয়া থাকে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় এক একটী অক্ষরকে চন্দ্র বলিয়াছেন এবং শ্রীঅঙ্গের প্রতি অবয়বও চন্দ্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গায়ত্র্যাত্মক দেবতাধ্যানে প্রত্যেক অক্ষরকে চন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করাই রীতি। অপরন্তু এতদ্দ্বারা ভাবকুমুদাকুল প্রকাশিত হয় বলিয়াই ইহারা চন্দ্র নামে অভিহিত হইতে পারেন।

শ্রীশ্রীমদনগোপাল, শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তি। ইনি কোটী মদনবিমোহন, অশেষ চিত্তাকর্ষক, সহজ-মধুর-তরলতর-লাবণ্যমাধুর্য্যামৃতপারাবার এবং মাদনাদি মহাভাবনিবহের আস্বাদ্য। কামবীজ ও কামগায়ত্রী * ইহার উপাসনা মন্ত্র। এই জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

* সংস্কৃত ভাষাতে কামগায়ত্রীর একটী ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাটী প্রবোধানন্দ গোস্বামীর কৃত বলিয়া লিখিত, তদ্‌যথা,—কামেন অভিলাষেণ স্ববিষয়প্রীতিদার্ঢ্যেন দীব্যতি ক্রীড়তি। দিবু ক্রীড়ায়াম্। তস্মৈ কামদেবায় বিদ্মহে (বিদ্‌লাভে, বিদ্‌জ্ঞানে বা) ধীমহি ধ্যায়েমঃ। কামদেবায় (কথম্ভূতায়) পুষ্পবাণায় (পুষ্পং কমলং তদেব বাণং যস্য তস্মৈ) তন্নোঽনঙ্গঃ কন্দর্পঃ ন অস্মান্ প্রচোদয়াৎ—প্রকর্ষেণ প্রকৃষ্টরূপেণ উদয়াৎ উদয়ং করোতীত্যর্থঃ। চকারঃ সমুচ্চয়ে। ক্লীং পদেন মূর্ত্তিমান্ পুরুষঃ। কামপদেন গণ্ডদ্বয়ম্। দেব পদেনাত্র আস্যম্ ভাল উচ্যতে। অভিলাষেণ স্ববিষয়প্রীতিদার্ঢ্যেন চন্দ্রমণ্ডলেন দীব্যতি ক্রীড়তি। তকারেণ অর্দ্ধচন্দ্রঃ, ভালে তিলকশ্চন্দ্রঃ। সার্দ্ধচন্দ্র চতুষ্টয়ং ইতো ভিন্ন শিরোঽবধি ক্রমাৎ ক্রমরূপেণ বিংশত্যক্ষরেণ বিংশতি চন্দ্রা উচ্যন্তে। কাম গণ্ডযুগে স্নেহে বিলাসে সন্বিতৃষ্ণযোরিতি ভাস্করিঃ।

কা—ককার শ্চন্দ্রিমা চন্দ্র বিলাসানাবমানয়োঃ। ইতি কামপালঃ।
ম—মকারো মধুরে হাস্যে বিকাশেচ্ছা বিতৃষ্ণয়োঃ। ইতি খণ্ডঃ।

দে ইতি দা—দানে ঔণাদিকত্বাদেকারঃ। দা-মা-স্যা-স্রোঃ আয়ামিতি এ প্রত্যয়ঃ। দে—শ্চন্দ্রেতু বিলাসে চ গর্হণে মণ্ডলেঽপিচ ইতি দেবদোক্তিঃ। দেবশ্চন্দ্রমণ্ডলে আস্যে হরিদাসবিলাসয়ো রিতি ব্যাঘ্রভূতিঃ। ব ইতি বন্ বন্ সংভক্তৌ বণ ধাতু ঔণাদিকত্বাৎ শকন্ধ্বাত্বাৎ জাতে ড ইতি ড প্রত্যয়ঃ।

কামবীজোপাসনেন সখীত্বঞ্চ সমাশ্রয়েৎ
রতিরাগং সদা প্রাপ্য প্রেম্না জন্ম তৃতীয়কম্॥

ব্য—প্রকারো লাস্তে লাবণ্যে ইন্দ্রায়ুধে শশধরে, ইতি ভাস্বদিঃ। আকারান্ত বকারেণ অর্দ্ধচন্দ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ; লক্ষণানুরোধাৎ।

র—রং চন্দ্রার্দ্ধং বৈভবঞ্চ বিলাসো দারুণং ভয়মিতি ব্যাড়িঃ। রি শব্দাদি পঞ্চাক্ষরেণ দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমেণ পঞ্চ চন্দ্রা উচ্যন্তে—তদ্যথা বিদ্মহে পুষ্প ইত্যাদি বাণাদি পঞ্চাক্ষরেণ বামাবর্ত্তাদি ক্রমেণ পঞ্চচন্দ্রা উচ্যন্তে। তদ্যথা বাণায় ধীমহি ইত্যাদি। তত্র কৌস্তুভস্য মতে রথস্তাৎ বাম দক্ষিণ রূপেণ দশাক্ষরেণ চন্দ্রা উচ্যন্তে। তত্র দক্ষিণাদি ক্রমেণ হি শব্দাদি পঞ্চাক্ষরেণ পঞ্চচন্দ্রা উচ্যন্তে। তদ্যথাহি তন্নোঽনঙ্গঃ ইত্যাদি। প্রশব্দাদি পঞ্চাক্ষরেণ পঞ্চচন্দ্রা উচ্যন্তে। প্রচোদয়াদিত্যাদি।

বি—বিশব্দো বিবিধে প্রাক্তে অঙ্গদেচ শশধরে ইতি বিশ্বঃ। ডু ধা ঞ ধারণ পোষণয়োর্ধাতো রৌণাদিক অপ্রত্যয়াস্তা নিপাতঃ ধা ধাতোর্দাম ইতি নিপাতশ্চ ইতি।

দ্ম—মঃ মকারো বিবিধে নৃত্যে তেজোরাশৌ শশধরে ইতি ভাস্বদিঃ।

হে—হে শব্দো হেতুকে বিজ্ঞে ইন্দৌ গুণরসালশো ইতি কামতন্ত্রঃ।

পু—পুঃসাচ্ছবাসনজ্যোৎস্নানৃত্যচন্দ্রাকুশাম্বুজে ইতি দেবদ্যুতিঃ।

ষ্প—ষ্পকারো বিবিধে প্রাজ্ঞে বিধৌচ মুক্তিদামনু ইতি রত্নহাসঃ।

বা—বা শব্দো বৃদ্ধৌ প্রাজ্ঞেচ বিধোঃচন্দ্রাভিবাদয়ো ইতি গৌতমিঃ।

ণা—ণাকারো বিষমাবিষ্টে নিত্যচন্দ্র রসায়নে ইতি স্বভূতিঃ।

য়—য়কার শ্চন্দ্রবিধেচ বিশালাক্ষি রসাকরে ইতি ব্যাঘ্রভূতিঃ।

ধী—ধীশব্দো বুদ্ধৌ প্রাজ্ঞেচ বিধৌ চন্দ্রাভিধানয়োঃ ইতি গৌতমিঃ।

ম—মকারো মারুতে ব্রহ্মে প্রভাকরে নিশাকরে ইতি স্বভূতিঃ।

হি—হি শব্দোহি রসাবেশে হিঙ্গুলে চন্দ্রমণ্ডলে ইতি দেবদ্যোতিঃ।

অনঙ্গ—অনঙ্গোমদনে বিদেহনঙ্গ চন্দ্র বিভাবনে ইতি গৌতমঃ।

প্র—প্রশব্দো বিবিধে নৃত্যে প্রকৃষ্টে চন্দ্রমণ্ডলে ইতি ব্যাঘ্রভূতিঃ।

চো—চশ্চণ্ডেশে কচ্ছপেচ চন্দ্রে গৌরে তথৈবচ ইতি মেদিনী।

দ—দকারো বিবিধে নৃত্যে চন্দ্রে বিদ্যাধরেঽপিচ ইতি ভাস্বদিঃ।

যা—আসনে চ বিধায়ান্ত যাকার শ্চন্দ্র উচ্যতে ইতি চন্দ্রগৌতমিঃ।

ৎ—ত্বরত্বোত্র বিকাশেষু তকার শ্চন্দ্র উচ্যতে।

এতদ্দৃষ্টে দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেকটি অক্ষরেই "চন্দ্র আছে। এই জন্যও সম্ভবতঃ "অক্ষর চন্দ্র" বলা হইয়া থাকে।

ভজননির্ণয়গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—

ব্রজবালা কৈল যেমন সর্ব্বকর্ম্মার্পণ।
নন্দপুত্র আশ মাত্র এই মনে মর্ম্ম ॥
কামবীজ সহ মন্ত্র গায়ত্রী ভজিলে।
রাধাকৃষ্ণ লভে গিয়া শ্রীরাসমণ্ডলে ॥
কৃষ্ণের হ্লাদিনী প্রিয়া রাধা ঠাকুরাণী।
কামের কন্দর্প হৈল শ্রীকৃষ্ণ আপনি ॥
রাধাকৃষ্ণ পাইতে কামবীজ সার জান।
কামবীজ হইতে হৈল ভজন—বিধান ॥
কামের গায়ত্রী সার-কামবীজ জানি।
সর্ব্বদা জানিবে লোক গুরুমুখে শুনি ॥

কামবীজ রাধাকৃষ্ণ গায়ত্রী সে সখী।
অতএব গায়ত্রীবীজ ভজনেতে লিখি ॥
দ্বাপরে দুর্ব্বাসা বর দিল বালাগণে।
কৃষ্ণপ্রেম গায় লাগি ভাবিয়া সে মনে।
সেই দুই জপি তারা সদাই প্রবীণ।
যোড়শ বয়সী সবে বয়সে নবীন ॥

সেইরূপ কামশাস্ত্র মন্থন করিয়া।
শৃঙ্গারের সর্ব্বরস রাধাকৃষ্ণ নিয়া ॥
রাখিলেন ভক্তগণ আস্বাদ করিতে।
কামের গায়ত্রী বীজ অতএব তাতে ॥

শ্রীভজন-নির্ণয়কার বলেন, শ্রীভাগবতের বচন প্রমাণের সহিত তন্ত্রের কামগায়ত্রী-কামবীজ মিশাইয়া মাধুর্য্যরস-ভজন-প্রণালী পরিস্ফুটরূপে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীভাগবত বলেন—

পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ।

ইহাতে প্রাকৃতাপ্রাকৃতকন্দর্পসমূহের মন্মথ যে শ্রীকৃষ্ণ দ্যোতিত হইয়াছেন, তন্ত্রশাস্ত্রও তাঁহাকেই "মন্মথমন্মথ" জানিয়া কামবীজ কামগায়ত্রী দ্বারা উপাসনার বিধান করিয়াছেন। তাই শ্রীভজননির্ণয়কার বলিতেছেন:

রাধাকৃষ্ণকামবীজ গায়ত্রী সহিত।
প্রত্যক্ষ অনঙ্গ হৈয়া করিল বিদিত॥
তাঁহার আচার যত সমস্ত ভাতিল।
দেব অগোচর সুধা বাটি বাটি দিল॥
মাধুর্য্য ভাবের তত্ত্ব বিশেষ কহিল।
কামবীজ কামতন্ত্রে ভজন স্থাপিল॥
ভাগবত বাক্য দিয়া শাস্ত্রের প্রমাণ।
চৈতন্য সর্ব্বস্ব তাহে পরমার্থ জ্ঞান॥
সর্ব্বলোক অগোচর যে ছিল সংসারে।
অর্থ দীপ্তি করি কৈল সমস্ত প্রচারে॥

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে কামগায়ত্রী ও কামবীজ ব্রজের মাধুর্য্যরস-ভজনতত্ত্বের মহামন্ত্র, এবং সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ শ্রীশ্রীমদনগোপাল ব্রজমাধুর্য্য-রস-ভজনের পরম দেবতা। শ্রীল রামরায় এই মাধুর্য্যরস-দেবতার স্বরূপতত্ত্বই, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সমক্ষে নিবেদন করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনের এই শৃঙ্গাররসরাজ সাক্ষাৎমন্মথ-মন্মথরূপের এমনই চমৎকারিত্ব যে স্বয়ং লক্ষ্মীও এ মূর্ত্তির পদরেণুস্পর্শাধিকারলাভের জন্য ধৃতব্রতা হইয়া তপস্যা করেন যথা শ্রীভাগবতে:—

মাধুর্য্য-মূর্ত্তি।

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীললনা চরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

এমন কি সেই মাধুর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া তিনি নিজেই বিস্মিত হয়েন এবং তদুপভোগের জন্য শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় লুব্ধচিত্ত হয়েন যথা :—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষঃ মাধুর্য্যপূরঃ॥
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতঃ
স্বরভস মুপভোক্তুংকাময়ে রাধিকেব॥

শ্রীললিত মাধবে (৮।২৮)

অপিচ শ্রীমদ্ভাগবতে

যন্মর্ত্ত্যলীলোপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্যচ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥

শ্রীভাগবতে ৩।২।১২

এই সকল পদ্যে বর্ণিত শ্রীরূপমাধুর্য্যানন্দের পূর্ণভাবে প্রমত্ত হইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যসাগরে নিমগ্ন হইতেন এবং বাহ্য ও অর্দ্ধবাহ্য-দশায় এই মন্মথ-মন্মথ-রূপমাধুর্য্যের আস্বাদন লালসায় বিরহিণী মহামাদনী ভাবরূপা শ্রীমতীর ন্যায় প্রলাপ করিতেন। চরিতামৃতে প্রলাপ-বর্ণনে এই মদনমোহন-রূপমাধুর্য্যের অনেক পদ আছে। আমরা এস্থলে পূর্ব্বোক্ত ভাবসূচক একটী পদের উল্লেখ করিতেছি, তদ্যথা :—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নর-লীলা,
নর-বপু তাহার স্বরূপ।

গোপবেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর
নরলীলা হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যেরূপের এককণ ডুবায় সব ত্রিভুবন *
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব-পরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন ভক্তগণের গূঢ় ধন
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে ॥
রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্ব সৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্য্যাদিগুণগ্রাম
এইরূপ তার নিত্যধাম ॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ
তার উপরে ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছ নেত্রান্ত বাণ তার দৃঢ় সন্ধান
বিন্ধে রাধা গোপীগণ মন ॥
কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহার যে স্বরূপগণ
তা-সভার বলে হরে মন।
পতিব্রতা শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥
চড়ি গোপীর মনোরথে মন্মথের মনমথে
নামধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর-দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লয়ে গোপীগণ ॥

---

* এই মহামাধুর্য্য-তত্ত্ব হইতেই "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রের উৎপত্তি।

নিজ-সম সখা সঙ্গে গো-গণ-চারণ-রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যাঁর বেণুধ্বনি শুনি স্থাবরজঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥
মুক্তাহার বকপাতি ইন্দ্রধনু পিঞ্ছিততি
পীতাম্বর বিজুলি সঞ্চার।
কৃষ্ণ নবজলধর জগৎ-শস্য-উপর
বরিষয়ে লীলামৃতধার॥
মাধুর্য্য ভগবত্তাসার, ব্রজে কৈল পরচার
তাহা শুক,—ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে বর্ণিয়াছে জানাইতে
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ॥
তারুণ্যামৃত পারাবার তরঙ্গ-লাবণ্য-সার
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত নারীর মন তৃণপাত
তাহা ডুবায়, না হয় উদ্গম॥
সখিহে কোন তপ কৈল গোপীগণ।
কৃষ্ণরূপমাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন॥
যে মাধুরী ঊর্দ্ধ আন নাহি যার সমান
পরব্যোম স্বরূপের গণে।
যেহ সব অবতরী, পরব্যোম অধিকারী
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে॥
তাহে সাক্ষী সেই রমা নারায়ণের প্রিয়তমা
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।

তেই যে মাধুর্য্য লোভে, ছাড়ি সব কামভোগে
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥
সেইত মাধুর্য্য-সার অন্য সিদ্ধি নাহি তার
তেঁহ মাধুর্য্যাদি গুণ-খনি।
আর সব প্রকাশে তার দত্ত গুণ ভাসে
যাহাঁ যত প্রকাশে কার্য্য জানি ॥

শ্রীকৃষ্ণের মহামাধুর্য্য এইরূপ শত শত বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ রস-মাধুর্য্যই ভারতীয় সাহিত্য সমূহকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, শ্রীল রামরায়-মহানুভাবকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে অনুরোধ করেন। শ্রীল রামরায় এই মাধুর্য্যসার—প্রাকৃতাপ্রাকৃত অনন্তকোটি-কন্দর্পনিদান—শ্রীবৃন্দাবনের অভিনব কন্দর্পের উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-কথন পরিসমাপ্ত করেন। ফলতঃ এই শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তি,—সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। মহামাদনীশক্তির একমাত্র আস্বাদ্য শ্রীবৃন্দাবনাভিনবকন্দর্প শ্রীশ্রীমদন-গোপালই ব্রজমাধুর্য্য-ভজনরসের উপাস্য দেবতা। মহাপ্রভু শ্রীভাগবতের মাধুর্য্যসার এবং তন্ত্রমন্ত্রের মাধুর্য্যসার,—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব,—শ্রীল রামরায়ের শ্রীমুখে অতি অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব কৌশলে প্রকটিত করেন। শ্রীভাগবতের সেই সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথই তন্ত্রের কামবীজকামগায়ত্রী অধিষ্ঠিত মন্ত্রাত্মিকা অনন্তমাধুর্য্যময়ী পরম রমণীয় দেবতা। ব্রজরসের ভজনপথে অগ্রসর হইতে হইলে এই শ্রীমূর্ত্তিই একমাত্র ধ্যেয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের যত টুকু জানিবার জন্য তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, এইখানেই তাহার চরম সীমা।

অতঃপর শ্রীল রামরায় শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব প্রকটন করেন। "শ্রীস্বরূপ-দামোদর" গ্রন্থে এই সম্বন্ধে শ্রীল রামরায়-মহানুভাবের উক্তিরই আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এখানে সে সম্বন্ধে পুনরালোচনা করা হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিলাস-মহত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরাধাতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া নিখিলপরমানন্দ-চন্দ্রিকা-চন্দ্রমা, অনন্তবিলাসময়, সকলভুবন-সৌভাগ্য-সার-সর্ব্বস্ব, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিলেন "রামরায়, তোমার ঐ শ্রীমুখে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব-শ্রবণে-পরম প্রীতি লাভ করিলাম। এখন একবার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসমহত্ত্বের তত্ত্ব শ্রবণ করাইয়া আমায় পরিতৃপ্ত কর।"

শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাস-মহত্ত্ব।

রামরায় বলিলেন, "প্রভো, শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত সুতরাং নিরন্তর কাম-ক্রীড়াপরায়ণ।" ধীরললিতত্ব,—বিলাসমহত্ত্বসূচক।

(ক) ধীর ললিত।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নায়কের চারি প্রকার গুণের উল্লেখ আছে,—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত এবং ধীরোদ্ধত। এস্থলে ধীবললিতই আলোচ্য। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিত আছে—

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায় প্রেয়সীবশঃ॥

ধীরললিত নায়ক বিদগ্ধ, নবতারুণ্যসম্পন্ন (নিত্য তরুণায়মান) পরিহাস-বিশারদ, নিশ্চিন্ত এবং প্রায় প্রেয়সীবশ। এখানে "প্রায়," শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে, শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় লিখিয়াছেন :—"প্রায়ঃ" শব্দ স্তৎবশত্বস্য বহির্ব্যক্তীকরণাভাবাদিতিভাবঃ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বশত্ব কি প্রকার, তাহা বাহিরে ব্যক্ত করিয়া উঠা সম্ভব-পর নহে, এই জন্যই "প্রায়ঃ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। টীকাকার প্রেয়সী-দৃষ্টান্তরূপ শ্রীভাগবতের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,

১। ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি।

২। অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

নাগররাজ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ও ভূভারহরণে সমর্থ হইয়াও প্রেয়সীবশ। তিনি সকল প্রেয়সীর সমান বশীভূত নহেন। যাঁহারা প্রেমযুক্তা তিনি তাঁহাদেরই বশীভূত। কিন্তু প্রেমবিশেষযুক্তাগণের মধ্যেও তারতম্য আছে। সেই প্রেমের তারতম্যানুসারে তিনি বশীভূত হয়েন। প্রেমাতিশয় সম্বন্ধে শ্রীমতীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সুতরাং ধীরললিত শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে শ্রীমতীর প্রেমাধীন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারই অনুকূল। অনুকূল নায়ক সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিত আছে—

অতিরক্ততয়া নার্য্যাং ত্যক্তান্যললনাস্পৃহঃ।
সীতায়াং রামবৎ সোঽয়মনুকূলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র যেমন কেবল একমাত্র শ্রীমতী সীতাতেই অনুরক্ত ছিলেন, এইরূপ অপরা রমণীদের সমস্ত স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া যে নায়ক এক স্ত্রীতে সর্ব্বতোভাবে আসক্ত হয়েন, তিনিই অনুকূল। টীকাকার শ্রীল চক্রবর্ত্তিমহাশয় লিখিয়াছেন শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষেই ইহা সম্ভবপর। এরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্র সুদুর্ল্লভ। কিন্তু বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এইরূপ অনুকূলতা দুর্ঘট নহে। তবে একটী কথা এই যে শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ হইলেও শ্রীরাধার প্রেম পরমাদ্ভুত ও সর্ব্বাতিশয় সুতরাং তদেতর প্রেমবতীগণের প্রেমবিস্মারক; অতএব শ্রীরাধার কথা শ্রবণে স্মরণে ও মননেই তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রবলতম অনুরাগের উদ্রেক হওয়ায় তিনি অন্যান্য প্রেমবতীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধা-প্রেমসম্ভোগের জন্য লালায়িত হয়েন। তাই শ্রীল জয়দেব বলেন—

রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ।

ইহাই শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুকূলতার প্রমাণ। তাই শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণিকার লিখিয়াছেন :—

রাধায়ামেব কৃষ্ণস্য সুপ্রসিদ্ধানুকূলতা।
তদালোকে কদাপ্যস্য নান্যসঙ্গস্মৃতিং ব্রজেৎ॥

শ্রীরাধার কথা মনে হইলে শ্রীকৃষ্ণের অপরা প্রেমবতীগণের আকর্ষণ অতি তুচ্ছ হইয়া পড়ে। তিনি তাঁহাদের কথা আর মনে করেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত সুতরাং নিরন্তর কামক্রীড়া-শীল। কাম অর্থ প্রেম। প্রেমবতীগণের শিরোমণি শ্রীমতী রাধার প্রেমে তিনি সততই তাঁহার অধীন। এইজন্য তিনি নিরন্তর শ্রীরাধাপ্রেমে প্রমত্ত। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে ইহার দৃষ্টান্ত এই যে :—

গহনাদনুরাগতঃ পিতৃভ্যামপনীতব্যবহারকৃত্য ভাবঃ।
বিহরন্ সহ রাধয়া মুরারি যমুনাকুলবনান্যলঞ্চকার।

পৌর্ণমাসী বলিলেন নান্দিমুখি, শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চিন্ততা দেখ, প্রগাঢ় অনুরাগ নিমিত্ত পিতামাতা ইহাকে কোন ব্যাবহারিক কর্ম্মের ভার অর্পণ করেন না। তিনি নিরন্তরই শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যমুনাকুল-বর্ত্তি বনসমূহকে অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

"নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত।"

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, বিহারের অনবচ্ছেদত্বই প্রেয়সীবশত্বের পরিচায়ক এবং ইহাই ধীর ললিতানুকূলত্বের লক্ষণ। এই ব্যাখ্যাই শ্রীল কবিরাজের ব্যবহৃত "নিরন্তর কামক্রীড়ার" তাৎপর্য্যার্থ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রামরায়-মহানুভাবের সমক্ষে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসমহত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রায় মহাশয় এক কথায় প্রভুর এই প্রশ্নের উত্তর করিলেন—সে কথাটি এই যে "প্রভো" শ্রীকৃষ্ণ ধীর-ললিত।" রসিকভক্ত পাঠকগণের অবিদিত নহে যে বিলাসব্যাপারে ধীরললিত নায়কই প্রগাঢ় উৎকর্ষশালী,—বিলাসে ধীরললিত নায়কেরই প্রধানতর গৌরব। সুপ্রাচীন সারস্বতালঙ্কারে লিখিত আছে :—

রত্যুপচারপ্রধানো,—ধীরললিতঃ।

অর্থাৎ ধীরললিত নায়ক রত্যুপচারপ্রধান।

তাই ধীরললিত নায়ক সুরসিক, নবতরুণ, পরিহাসবিশারদ, নিশ্চিন্ত এবং প্রেয়সীবশ। নায়িকার অতীব অনুকূল ধীরললিতনায়ক সততই প্রেয়সীর নিকট নতশির, সততই প্রেয়সীর প্রেমাধীন। তাঁহার চিত্ত-ফলকে প্রণয়িনীর প্রেমপ্রতিচ্ছবি সততই উদ্ভাসিত, প্রণয়িনী সততই তাঁহার মনোবর্ত্তিনী। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী প্রীতিসন্দর্ভে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুলিখিত ধীরললিতের লক্ষণ-বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন :—

"এতেচ শ্রীমদ্‌ব্রজদেবীসহিতলীলায়াং সুষ্ঠু ব্যক্তাঃ" অর্থাৎ এই সমুদায় গুণ শ্রীমদ্‌ব্রজদেবীর সহিত লীলায় অতি সুন্দররূপেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ইহার যে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই :—

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং।
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ॥
তদ্বক্ষোরুহ-চিত্র-কেলি-মকরী-পাণ্ডিত্য-পারং গতঃ।
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যজ্ঞপত্নীসদৃশী অনুরাগবতী রমণীগণের প্রতি তৎতৎ লীলাস্বরঙ্গা দূতী বলিতেছেন, "সখীগণ, শ্রীকৃষ্ণের বিলাসচাতুরী দেখ, দিবাভাগে শ্রীমতী সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে নাগররাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সখীগণের সম্মুখেই শ্রীকৃষ্ণ রজনী-রতি-কলা-প্রগল্‌ভতার কথা বলিতে লাগিলেন। বিদগ্ধ পরিহাসবিশারদ রসরাজের কথার কৌমুদীচ্ছটায় লজ্জায় শ্রীমতীর নয়নকমল নিমীলিতপ্রায় হইল। রসবিলাসময় শ্রীকৃষ্ণ এই অবস্থাতেই শ্রীমতীকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার দেহে বিচিত্র কেলি-মকরী-তিলক-রচনায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলেন। পাণ্ডিত্য কেন বলিতেছি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি?

সখীগণের সমক্ষে রজনীরতিকলাপ্রগল্‌ভতার কথা শুনিয়া শ্রীমতী মস্তক নত করিলেন। কিন্তু রসরাজ এমনই নির্লজ্জ যে তিনি সেই সকল কথা বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ শ্রীমতীকে সম্মুখে লইয়া তাঁহার বক্ষে তিলক চিত্র করিতে বসিলেন! ইহাতে শ্রীমতীর লজ্জা বোধ হইল। তাই তিনি নিজের কোমল করে শ্রীকৃষ্ণের হাত মৃদুভাবে সরাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং লজ্জাভরে নিজেও অবনত এবং দেহ সঙ্কুচিত করিতেছিলেন। ইহাতে তিলকের রেখা যে কি প্রকার সোজা ও উপযুক্ত ভাবে অঙ্কিত হইতে পারে, তাহা, বুঝিতেই পারিতেছ। তিনি যত বার তিলক অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, ততবার শ্রীমতীর অঙ্গাদিসঞ্চালনে উহার ব্যতিক্রম হইতেছিল। সুতরাং তিলক-অঙ্কনে নাগররাজ প্রকৃতই এক অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন! (ইহা উপহাসোক্তি)। এই ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ শ্রীমতীর বক্ষঃস্পর্শ নিবন্ধন অতীব প্রেমময় বিলাসের উদ্ভব হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে কুঞ্জলীলায় প্রেমময়বিলাসে কৈশরকাল সফল করেন।" এই ব্যাপার সম্প্রয়োগাখ্য প্রেমবিলাসের পরিচায়ক।

পৌর্ণমাসী কহিলেন—

> হরিরেষনচেদবতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ।
>
> অভবিষ্যদিয়ং বৃথা সৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র॥

অর্থাৎ "হে মধুরাক্ষি, হে বৃন্দে, যদি এই মথুরামণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা অবতীর্ণ না হইতেন তাহা হইলে বিধাতার এই সৃষ্টি বৃথা হইত। বিশেষতঃ এই সৃষ্টিতে কাম ত একবারেই বৃথা হইতেন।" শেষ উক্তির তাৎপর্য্য এই যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কামকেলি মহা-মুনিবৃন্দেরও ধ্যেয়, সুতরাং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অবতরণে সৃষ্টি সফল হইল, কাম আরও সাফল্যলাভ করিলেন। ললিত-গুণ সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে আরও লিখিত আছে :—

"শৃঙ্গারপ্রচুরা চেষ্টা যত্র তং ললিতং বিদুঃ।"

অর্থাৎ যে স্থলে শৃঙ্গারবিষয়ে প্রচুর চেষ্টা প্রকাশ পায় তাহাই ললিত বলিয়া জানিবে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে লিখিত হইয়াছে :—

বিধত্তে রাধায়াঃ কুচমুকুলয়োঃ কেলিমকরীম্।
করেণাব্যগ্রাত্মা সরসভসমসব্যেন রসিকঃ॥
অরিষ্টে সাটোপং কটুরুবতি সব্যেন বিহস
ন্নুদঞ্চদ্ রোমাঞ্চং রচয়তি শ্রীকৃষ্ণঃ পরিকরন্॥

অর্থাৎ "রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণ স্থিরচিত্তে অতীব কৌতুকের সহিত দক্ষিণ হাতে শ্রীমতীর বক্ষে কেলিমকরী তিলক রচনা করিলেন, আবার অরিষ্টা-সুরের সদর্প কটূক্তি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বামহস্তে বীরের ন্যায় কটি-বন্ধন করিলেন।" এখানে বীররসের গৌরব ক্ষীণ করিয়া বিলাসময় মধুর রসের ঔজ্জ্বল্যই সূচিত হইয়াছে।

ধীরললিত নায়কের রতিকেলিবিলাসভাবই সর্ব্বপ্রধান। সুতরাং শ্রীল রামরায় একটী কথাতেই বিলাস-মহত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের এক প্রকার উত্তর করিলেন। কিন্তু উক্ত উদাহরণ-পদ্যের আরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

ধীরললিত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতীসহ বিলাসের উদাহরণ স্বরূপ যে পদ্যটী ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার আরও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা যাই-তেছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর রতিকলাপ্রগল্‌ভতার কথা সখীজনসমক্ষে প্রকাশ করিলেন। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে প্রগল্‌ভতার যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে তাহা এই :—

নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্‌ভতা।

অর্থাৎ সম্ভোগ-বিষয়ে নিঃশঙ্কত্বকেই পণ্ডিতগণ প্রগল্‌ভতা বলেন। শ্রীবিদগ্ধ-মাধব হইতে ইহারও উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা :—

প্রাতিকুল্যমিব যদ্বিবৃন্বতী
রাধিকা রদ-নখার্পণোদ্ধুরা।
কেলিকর্ম্মণি গতা প্রবীণতাং
তেন তুষ্টি মতুলাং হরি র্যযৌ ॥

অর্থাৎ বৃন্দা কহিতেছেন,"সখি শ্রীরাধা কেলিকর্ম্মে প্রবীণা। তিনি উদ্ধত স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে দশন ও নখাঘাত করিয়া দৃশ্যতঃ যে প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে পরিতুষ্টই হইয়াছিলেন।" ইহারই নাম রতিকলা-প্রগল্‌ভতা। সখীজন সমক্ষে রজনীবিলাসের এই প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পাওয়ায় শ্রীমতী লজ্জিতা হইলেন, তাঁহার লোচনযুগল লজ্জায় কুঞ্চিত হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রগল্‌ভতাই কি কম? তিনি সখীজন-সমক্ষেই শ্রীমতীর বক্ষোজে চিত্রাঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাই সম্প্রয়োগাখ্য প্রেমবিলাস। এইরূপ কুঞ্জবিলাসে হরি কৈশোর কাল সফল করিলেন। মধুর রসে কৈশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের বয়স্ সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিত আছে :—

বয়ঃ কৌমারপৌগণ্ডং কৈশোরমিতি তৎত্রিধা।
কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরম্ ॥

অর্থাৎ কৌমার পৌগণ্ড ও কৈশোর,—বয়স্ এই ত্রিবিধ। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, পাঁচ হইতে দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, দশ বৎসর হইতে ষোলর বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, তাহার পরেই যৌবন। বাৎসল্য-রসে কৌমার, সখ্যরসে পৌগণ্ড, এবং মধুর রসে কৈশোর কালই প্রশস্ত। তদ্‌যথা :—

ঔচিত্যাৎ তত্র কৌমারং বক্তব্যং বৎসলে রসে
পৌগণ্ডং প্রেয়সি তথা তত্তৎ খেলাদিযোগতঃ
শ্রৈষ্ঠ্যং মুজ্জ্বল এবাস্ত কৈশোরস্ত তথাপ্যদঃ।

আদ্য মধ্য ও শেষভেদে এই কৈশোর কাল ত্রিবিধ। আদ্য কৈশোরের লক্ষণ এই :—

বর্ণস্যোজ্জলতা কাপি নেত্রান্তে চারুণচ্ছবিঃ।
রোমাবলিপ্রকটতা কৈশোরে প্রথমে সতি॥

প্রথম কৈশোরে বর্ণের উজ্জলতা, নেত্রপ্রান্তের অরুণতা ও রোমাবলীর প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রথম কৈশোরের পরিচ্ছদ বৈজয়ন্তী, ময়ূরপুচ্ছাদি, নটবর বেশ, বংশীমাধুর্য্য ও বস্ত্রশোভা যথা :—

বৈজয়ন্তী শিখণ্ডাদিনটপ্রবরবেশতা।
বংশীমধুরিমা বস্ত্রশোভা চাত্র পরিচ্ছদঃ॥

মধ্য কৈশোরে উরুদ্বয়, ও বক্ষস্থলের শোভা এবং মূর্ত্তির মধুরিমাদি প্রকাশ পায়। তদ্‌যথা—

উরুদ্বয়স্য বাহ্বোশ্চ কাপি শ্রীরুরস স্তথা।
মূর্ত্তের্ম ধুরিমাদ্যঞ্চ কৈশোরে সতি মধ্যমে॥

মন্দহাস্যবিলাসাঢ্য মুখ, বিভ্রমোত্তরলোচন এবং ত্রিজগন্মোহন গীত ইহাই মধ্যম কৈশোরের মাধুরী। তদ্‌যথা :—

মুখং স্মিতবিলাসাঢ্যং বিভ্রমোত্তরলে দৃশৌ।
ত্রিজগন্মোহনং গীত মিত্যাদি স্বিহ মাধুরী॥

মধ্য কৈশোরের চেষ্টা,—রসিকতার সার-বিস্তার, কুঞ্জক্রীড়ামহোৎসব এবং রাসলীলাদির আরম্ভ। যথা :—

বৈদগ্ধীসারবিস্তারঃ কুঞ্জকেলি মহোৎসবঃ।
আরম্ভো রাসলীলাদেরিহ চেষ্টাদিসৌষ্ঠবম্॥

চরম কৈশোরে শ্রীঅঙ্গ সকল অধিক উৎকর্ষ ধারণ করেন এবং তাহাতে ত্রিবলীরেখা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েন, তদ্‌যথা :—

পূর্ব্বতোঽপ্যধিকোৎকর্ষং বাঢ়মঙ্গানি বিভ্রতি।
ত্রিবলি ব্যক্তিরিত্যাদ্যং কৈশোরে চরমে সতি॥

অন্ত কৈশোরের মাধুর্য্যসূচক একটী উদাহরণ-পত্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তদ্‌যথা :—

দশার্দ্ধশরমাধুরীদমন দক্ষয়াঙ্গশ্রিয়া
বিধূনিত বধূধৃতিং বরকলাবিলাসস্পদম্।
দৃগঞ্চলচমৎকৃতিক্ষপিত খঞ্জরীটদ্যুতিম্
স্ফুরত্তরুণি মোদগমং তরুণি পশ্য পীতাম্বরম্॥

অর্থাৎ তরুণি, একবার ঐ পীতাম্বরকে দর্শন কর। উঁহার অঙ্গকান্তিতে পঞ্চশর-মদনমাধুরীও পরাজিত হইতেছে। এই মদনমাধুরীদমনদক্ষঅঙ্গসৌষ্ঠবে ইনি বধূগণের ধৈর্য্যবিধূনিত করিতেছেন। ইহার শ্রীঅঙ্গ শিল্পনৈপুণ্যের ক্রীড়াস্থান, ইহার চঞ্চল নেত্রসৌন্দর্য্যে খঞ্জনের নৃত্যগর্ব্ব খর্ব্ব হইতেছে।

এই চরম কৈশোরে মধুর ভজনের দেবতা সাক্ষাৎ-মন্মথমন্মথ শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ। পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার লিখিয়াছেন :—

অত্র গোকুলদেবীনাং ভাবসর্ব্বস্বশালিতা।
অভূতপূর্ব্বকন্দর্পতন্ত্রলীলোৎসবাদয়ঃ॥

অর্থাৎ এই অন্ত্য কৈশোরে ব্রজদেবীগণের অভূতপূর্ব্বকন্দর্প তন্ত্রলীলোৎসবাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অবস্থায় মদনমোহনের মোহন মাধুরী মধুর ভজনশীলা ব্রজগোপীদের সম্ভোগ্য এবং মধুর প্রেমলীলাবিলাসের প্রশস্ততম সময়। এই কালেই মদন-মাধুরী-দর্প-দমন-দক্ষ অঙ্গসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজবধূগণের ধৈর্য্য বিধূনিত হওয়ায় তাঁহারা অভূতপূর্ব্বকন্দর্পতন্ত্রলীলা-উৎসবে প্রবৃত্ত হয়েন।

ধীরললিত নায়কের উদাহরণে রসশাস্ত্রবিদ্‌গণ অন্যান্য স্থলে প্রায়শঃই কন্দর্পকেই উদাহরণস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণেই প্রকটরূপে ধীরলালিত্য গুণ পরিলক্ষিত হয়। তাই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিত হইয়াছে :—

গোবিন্দে প্রকটং ধীরললিতত্বং প্রদৃশ্যতে।
উদাহরন্তি নাট্যজ্ঞাঃ প্রয়োঽত্র মকরধ্বজম্॥

বিলাসব্যাপারে ধীরললিত নায়কই প্রকৃত পাত্র। নাট্যকারগণ অন্যান্য পাত্রে ধীরললিতত্ব গুণের অভাব দেখিয়া কন্দর্পকেই ধীরললিত বলিয়া উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু ধীরললিতত্বগুণ শ্রীকৃষ্ণেই পূর্ণরূপে প্রকটিত। সুতরাং বিলাস-লীলার মহত্ব শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণেই একমাত্র সম্ভবপর। শ্রীল রামরায় ধীরললিত নায়ক শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগবিলাসের কথা উল্লেখ করিয়া বিলাস-মহত্বের বর্ণন করিলেন। এস্থলে আরও একটী বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজনীয়। বহিরঙ্গ জনগণের জন্য আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণের রমণ-বিলাস-ব্যাপারের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা আবশ্যক।

(খ) প্রেম-বিলাস।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাস প্রাকৃত জ্ঞানের অতীত। করুণাময় শ্রীভগবান জীবের প্রতি প্রতিনিয়তই অতীব সদয়। তাই তিনি তাঁহার আনন্দলীলা প্রপঞ্চে কিয়ৎ পরিমাণে প্রাকৃতবৎ প্রকটিত করিয়া থাকেন, যথা :—

স এষ নরলোকেঽস্মিন্নবতীর্ণঃ স্বমায়য়া।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা॥

অর্থাৎ নিজজনের প্রতি কৃপাপ্রদর্শন করিয়া শ্রীভগবান্ এই নরলোকে অব-তীর্ণ হইলেন এবং প্রাকৃতজনের ন্যায় স্ত্রীরত্নকূটস্থ হইয়া রমণ করিলেন।*

* The religious interest is held fast to the person of Krishna, as central incarnation of protecting and retributive deity as well as the embodiment of ideals and delights essentially human. Priest, teacher, marriageable man, householder and beloved companion, because he is all this, therefore has Krishna been honored. Generosity, ability, sacred wisdom, heroism, humility, splendor endurance, cheerfulness, joyousness, exist constantly on this unfailing One. It is Krishna who is the origin and end of all worlds. All this universe comes into being through Him,—the eternal Maker, transcending all beings. And He enlightens and gladdens the assembly, as a sunless place would be cheered by the sun or a windless spot by the wind. SAMUEL JOHNSON.

শ্রীপাদ সন্দর্ভকার ইহার ব্যাখ্যায় বলেন শ্রীভগবান্ নিজজনের সুখ প্রদান করিবার জন্যই অবতীর্ণ হয়েন। তিনি স্বমায়াতে রমণ করেন। মায়া অর্থ কৃপা। ভক্তসুখচিকীর্ষাময়ী এই কৃপাই তাঁহার অবতরণের এক মুখ্য হেতু। তাঁহার রমণ প্রাকৃত কামরমণ নহে—উহা তাদৃশ রমণবশকারি-প্রেমবিশেষস্বরূপ। এই প্রেমবিশেষের প্রকাশই তাঁহার রমণ। তিনি স্ত্রীরত্নকূটস্থ হইয়া রমণ করেন। যে-সে নারীর সহিত তাঁহার রমণ অসম্ভব। এই জন্যই "স্ত্রীরত্ন" বলা হইয়াছে। আনন্দচিন্ময়রসপ্রতি-ভাবিতাগণই তাঁহার রমণের উপযুক্তা। ইহারাই তাঁহার স্বরূপশক্তি। শ্রীভগবানের রমণ অপ্রাকৃত, সুতরাং এস্থলে আদৌ প্রাকৃত কামের প্রবে-শাধিকার নাই। তাদৃশী প্রেমবতীগণে প্রাকৃত কামের স্পর্শলেশও অস-ম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের রমণ,—প্রাকৃত কামপূরণ নহে। কেননা যাঁহাদের প্রোজ্জ্বল প্রেমবিলাস ও ব্রীড়াময়ী হাসি নিরীক্ষণ করিলেই মদন নিহত হইয়া পড়েন, তাদৃশী প্রমদোত্তমারাও বিবিধ কুহকপ্রয়োগ করিয়া যোগে-শ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় প্রমথিত করিতে অসমর্থ, তদ্‌যথা :—

উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাস-
ব্রীড়াবলোকনিহতো মদনোঽপি যাসাম্।
সংমুহ্য চাপমজহৎ প্রমদোত্তমাস্তাঃ
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ॥

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে কুহকপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি অসম্ভব। অকৈতব-প্রেমভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেম ঘটে না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের রমণ প্রাকৃত নহে, উহা অপ্রাকৃত। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম কাম নহে—উহা সর্ব্বপ্রকার কামলেশবিবর্জ্জিত প্রেমবিশেষ। এই তত্ত্ব না জানিয়াই অজ্ঞগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে কামের আরোপ করে। যথা :—

তময়ং মন্যতে লোকো হ্যসঙ্গমপি সঙ্গিনম্
আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানমতোঽবুধঃ।

অর্থাৎ এই সাধারণ লোক নিজের ভাবে ভাবিত হইয়াই বিষয়ে অনাসক্ত শ্রীকৃষ্ণকেও কামাদি ব্যাপারযুক্ত বলিয়া মনে করে।

এই সকল বচন প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিলাস প্রাকৃত মানববুদ্ধির অধিগম্য নহে। উহা অপ্রাকৃত প্রেমানন্দ-বিলাসবিশেষ। আমাদের বর্ত্তমান প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মাহাত্ম্যের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াও ধৃষ্টতামাত্র। কিন্তু করুণাময় শ্রীভগবান্ স্বভক্তগণের হিতের নিমিত্ত, এই আনন্দপ্রেমবিলাস-লীলাসিন্ধুর বিন্দুমাত্র আস্বাদন-রস-প্রদান করার জন্য প্রাকৃতের ন্যায় এই প্রপঞ্চে বিলাসলীলা প্রকটিত করিলেন। তাই শ্রীভাগবত বলেন—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

অর্থাৎ যদিও শ্রীভগবান্ আপ্তকাম তথাপি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্যই প্রপঞ্চে বিলাসলীলার বিস্তার করিয়াছেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বের এইরূপই স্বভাব। তাঁহার এই লীলা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিও তৎপর হয়েন। রাধারমণের অপ্রাকৃত রমণলীলা আনন্দ-ময় প্রেমবিলাসবিশেষ। ভক্তিপূর্ব্বক এই লীলা শ্রবণে মদনদর্প নির্জ্জিত হয়, বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের সঞ্চার হয়। শ্রীভগবান্ যদি দয়া করিয়া মনুষ্যা-কারে কিয়ৎ পরিমাণে প্রাকৃতের ন্যায় প্রপঞ্চে প্রকটিত না হইতেন, মানুষ কখনও প্রেমময়ের এই প্রেমবিলাসের কণালেশ আস্বাদনে গোলক মাধুর্য্যভাবের অনুভবে সমর্থ হইত না। ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বিলাসলীলা শ্রবণে কামাদিহৃদ্‌রোগ বিনষ্ট হয়, পরাভক্তির উদয় হয়, যথা শ্রীভাগবতে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিলেন এই শ্লোকে কামবিজয়রূপ রাস-ক্রীড়ার শ্রবণফল বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বিলাসলীলা প্রেমিক ভক্তের হৃৎকর্ণের নিত্যরসায়ন। তাই অন্ত্যলীলায় সর্ব্বভোগবিলাস-পরিত্যাগী আদর্শ-যতীন্দ্র-চূড়ামণি মহাপ্রভু শ্রীল রামরায় ও শ্রীপাদস্বরূপ দামোদরকে বলিতেন :—

"কর্ণ তৃষ্ণায় মরে, পড় রসায়ন, শুনি।"

অর্থাৎ হে রামরায়, হে প্রাণের স্বরূপ, আমার কর্ণ তৃষ্ণায় মরিতেছে, এক-বার শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসলীলাসুধা দানে আমাকে এই দারুণ পিপাসা হইতে বাঁচাও।" শ্রীশ্রীরাসলীলা-বিলাস-শ্রবণ প্রেমিক ভক্তের পক্ষে সঞ্জীবনী সুধা-স্বাদনবৎ বাঞ্ছনীয়।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভজনীয় বস্তু,—অপরাপর সাধকগণের অনাস্বাদ্য পরম রসতত্ত্ব। ভারতে শ্রীকৃষ্ণোপাসক অনেক আছেন, কিন্তু শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের যে অতি গুহ্যতত্ত্ব জগতে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা আর কোন সম্প্রদায়ের ভজনসাধনায় প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন নাই। ভারতের অনেক উপাসক অনেক প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তিনি কাহারও মতে যোগশ্বরেশ্বর, কাহারও মতে বিষ্ণু, কাহারও মতে নারায়ণ, কাহারও মতে রুক্মিণীকান্ত, কাহারও মতে দ্বারকানাথ, কাহারও মতে কংসারি মথুরেশ প্রভৃতি ভাবে উপাসিত হইয়া থাকেন। কিন্তু গৌড়ীয় প্রেমানন্দপূর্ণ বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে "রস-স্বরূপ" "রসিকশেখর" "রসরাজ" বলিয়া জানেন এবং সেই ভাবকেই তাঁহার ভজনের চরম ভাব বলিয়া মনে করেন।

আদান-প্রদান ভিন্ন রসের অনুভব অসম্ভব। যোগমার্গাবলম্বী, নীরব নির্জ্জনে বসিয়া স্তিমিতনয়নে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে পারেন। ব্রহ্মজ্ঞানী

সমস্ত ভেদজ্ঞানবিবর্জিত হইয়া শুদ্ধ ব্রহ্মে মনোনিবেশ করিতে পারেন, কিন্তু প্রেমের ভজনশীলগণের প্রতি অনুকম্পা করিবার জন্যই স্বয়ং রসরাজ প্রেমবিলাস-লীলা প্রকটিত করেন। আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা তাঁহার সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তি স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সহিত রসরাজের এই প্রেমলীলা-বিলাস প্রাকৃত বুদ্ধির অধিগম্য নহে,—ইহা ভক্তগণের ধ্যানগম্য, প্রেমসিদ্ধ ভজননিষ্ঠ প্রেমিকগণেরই আস্বাদ্য।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল রামরায় মহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিলাস মহত্ত্বের কথা শুনিয়া বলিলেন, "রামরায়, প্রেমবিলাস-মহত্ত্ব সম্বন্ধে এই যাহা বলিলে, তাহাতো বটেই, কিন্তু তার পর।"

রামরায় স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "প্রভো ইহার পর আর কি বলিব" এই বলিয়া রামরায় একটু নীরব হইয়া যেন কি ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু সে ভাবনা নিষ্ফল হইল। তিনি নিরাশ হইয়া বলিলেন "প্রভো, ইহার পরে যে আর কি তত্ত্ব আছে তাহা বলিতে আমি অসমর্থ। ইহার পরে আর আমার বুদ্ধির গতি নাই। আমি ভাবিয়া আর কিছুই পাইতেছি না।" রামরায় এই বলিয়া নীরব হই-লেন, নীরব ভাবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া আবার যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। দয়াময় রসরাজ ঈষৎ বঙ্কিম নয়নে রামরায়ের মুখেরদিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যেন কি এক গূঢ় গম্ভীর রসতত্ত্বের সঞ্চার করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামরায়ের শ্রীমুখমণ্ডল ধীরে ধীরে আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, যেন তিনি তাঁহার স্মৃতির মন্দিরে খুঁজিতে খুঁজিতে কোন হারান ধন প্রাপ্ত হইলেন—যেন বহুকালের সুপরিচিত তত্ত্ব-রত্ন তাঁহার নেত্রসমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাতেও প্রভুর আকা-ঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইবে কিনা, প্রভু ইহাতেই পরিতুষ্ট হইবেন কিনা, অথবা এই তত্ত্বরত্ন প্রভুর গ্রহণযোগ্য হইবে কিনা, রামরায়ের মনে এই সন্দেহের সঞ্চার হওয়ায় তাহার সদানন্দের বেগ কিয়ৎপরিমাণে মন্দতর হইল। এদিকে

শ্রীরামরায় কি বলিবেন, তাহা শুনিবার জন্য প্রভু যেন নিরতিশয় ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে শ্রীল রামরায় বলিলেন "প্রভো একটী কথা মনে পড়িতেছে, সেই কথাটী বলিলেই আমার বলার শেষ হয়, কিন্তু উহাতে আপনার চিত্তবিনোদন হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ হইতেছে।" প্রভু ব্যগ্রভাবে বলিলেন "রামরায় বল বল, তোমার মুখে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসমহত্ত্ব তত্ত্ব শুনিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।" শ্রীল রামরায় তখন তাঁহার নিজের কৃত অতি গুহ্যতত্ত্বপূর্ণ প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তসূচক একটী গান গাইতে লাগিলেন যথা :—

(গ) "পহিলহি রাগ" গান।

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেম-কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন।
দুঁহুকে মিলনে মধত পাঁচ বাণ॥
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেল দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥

এই পদটী প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের উদাহরণ। প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত কাহাকে বলে, পূর্ব্বে তাহার ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়।

প্রেম কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতকার বলেন :—

কৃষ্ণকে আহ্লাদে, তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দচিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান॥

সুতরাং জানা গেল হ্লাদিনীর সার অংশের নাম প্রেম—উহা আনন্দ-চিন্ময়রসস্বরূপ। এই প্রেমের পরম সার মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা।

এখন বিলাস কাহাকে বলে তাহাও বলা যাইতেছে যথা :—

যো বল্লভাং চানুগতো বিকারো
গত্যাসনস্থানবিলোকনেষু।
তথাস্মিতং ক্রোধচমৎকৃতী চ
বিকুননঞ্চাঙ্গগতং বিলাসঃ।

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতেও লিখিত হইয়াছে :—

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্
তাৎকালিকন্তুবৈশিষ্ট্যং বিলাসঃপ্রিয়সঙ্গজম্।

অর্থাৎ প্রিয়সঙ্গ সময়ে নায়িকার গতি, স্থান, আসনাদির ও মুখ নেত্রাদি সঞ্চালনক্রিয়ার যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তাহারই নাম বিলাস।

বিবর্ত্ত কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে একটুকু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা বলেন :—

সমবায়িকারণবিসদৃশকার্য্যোৎপত্তিঃ,—বিবর্ত্তঃ।

অর্থাৎ সমবায়িকারণের বিসদৃশ কার্য্যোৎপত্তিই বিবর্ত্ত নামে অভিহিত। এই আক্ষরিক অনুবাদ বিবর্ত্ত-তত্ত্বজ্ঞান-লাভের পক্ষে প্রচুর নহে। "সমবায়ি কারণ, বুঝিবার পূর্ব্বে সমবায় কাহাকে বলে অগ্রে তাহাই বুঝিতে হইবে।

সমবায়,—বৈশেষিকদিগের পরিগণিত সপ্ত পদার্থের এক পদার্থ। বৈশেষিক সূত্রকার কণাদ বলেন :—

ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ সঃ সমবায়ঃ।

অর্থাৎ যে সম্বন্ধ হইতে অবয়বে অবয়বীর, গুণে গুণীর, কার্য্যে কারণের, ক্রিয়ায় ক্রিয়াবানের, জাতিতে ব্যক্তির "ইহাতে ইহা" এইরূপ প্রত্যয় ঘটে, সেই সম্বন্ধের নাম সমবায় সম্বন্ধ। যেমন তন্তুতে পট, কপালে ঘট, বীরণে কট ইত্যাদি।

কণাদসূত্রের ভাষ্যকার শ্রীমৎ প্রশস্তপাদাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন :—

অযুতসিদ্ধানামাধার্য্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধঃ ইহ প্রত্যয়-হেতুঃ সঃ সমবায়ঃ।

ইহার টীকাকার শ্রীধরাচার্য্য মহাশয় ন্যায় কন্দুলীতে লিখিয়াছেন :—

যুতসিদ্ধিঃ পৃথক্‌সিদ্ধিঃ। পৃথগবস্থিতিরুভয়োরপি সম্বন্ধিনোঃ পরস্পর পরিহারেণ পৃথগাশ্রয়াশ্রয়িত্বং সমবায়ঃ যথা তন্তুপটয়োঃ।

অর্থাৎ যুতসিদ্ধি—পৃথক্ সিদ্ধি। উভয় সম্বন্ধীয় পৃথক্ অবস্থিতি না থাকিলেই তাহাকে অযুতসিদ্ধ বলে। এই অযুতসিদ্ধের সম্বন্ধই সমবায় সম্বন্ধ। যেমন তন্তুপটের সম্বন্ধ। দ্রব্যে দ্রব্যত্ব, গুণে গুণত্ব এবং কর্ম্মে কর্ম্মত্ব প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

কন্দুলীকার তাই পদ্যে লিখিয়াছেন :—

পরস্পরোপসংশ্লেষো ভিন্নানাম্ যৎকৃতো ভবেৎ।
সমবায়ঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স্বাতন্ত্র্য প্রতিরোধকঃ।

ভাষাপরিচ্ছেদকার বলেন :—

ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

সমবায় কাহাকে বলে এতদ্দ্বারা তাহা বুঝা গেল। এখন কারণ কাহাকে বলে, তাহা বলা যাইতেছে তদ্‌যথা :—

অন্যথাসিদ্ধিশূন্যত্বে সতি নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিত্বং কারণত্বম্।

অর্থাৎ যাহা ভিন্ন যাহার সিদ্ধি অসম্ভব, তন্নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্বই কারণত্ব।

এই কারণ ত্রিবিধ,—সমবায়ি কারণ, অসমবায়ি কারণ ও নিমিত্ত কারণ। সমবায় সম্বন্ধে যে তৎকার্য্যাশ্রয়, তাহাকেই সমবায়ি কারণ বলে। এই সমবায়ি কারণের যে বিসদৃশ কার্য্যোৎপত্তি, তাহারই নাম বিবর্ত্ত। যেমন নানা প্রকার বিভিন্নতা প্রতীয়মান হইলেও তন্তু ও বস্ত্র তত্ত্বতঃ একই পদার্থ। রঞ্জিত তন্তু ও তন্নির্ম্মিত বিচিত্র বস্ত্র তত্ত্বতঃ অভিন্ন। কিন্তু ঐ বিচিত্র বস্ত্র রঞ্জিত তন্তু হইতে দৃশ্যতঃ বিভিন্নাকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

বেদান্ত শাস্ত্রে যে বিবর্ত্তের লক্ষণ লিখিত আছে, তদ্‌যথা :—

অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।
স্বতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীর্য্যতে॥

অর্থাৎ তত্ত্বতঃ পৃথক্ না হইয়াও বিভিন্নরূপ যে প্রতীয়মানতা ঘটে, উহাই বিবর্ত্ত।

এখন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-বিবর্ত্তের কথা বলা যাইতেছে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ একই তত্ত্ব। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

রাধাপূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণপূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই, শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ আর গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥

শাস্ত্র বলেন "শক্তিশক্তিমতো রভেদাৎ" ফলতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণে পরমৈক্য বিদ্যমান। তত্ত্বতঃ উভয়ই এক। কিন্তু লীলারস-বিস্তারের জন্য অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যত্বে এবং বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্বে নিত্যরূপে দুই শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস তত্ত্বতঃ এক হইয়াও ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েন। এই ভিন্ন প্রতীয়মানতার কারণ অচিন্ত্য। সময়বিশেষে বিলাস-লীলার

বিভিন্নতার মধ্যেও অচিন্ত্য একত্বভাব প্রকাশিত হয়েন,—তখন ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। এ ভাব অতি চমৎকার,—ইহা নিরুপাধিক। ইহাই বিলাসবিবর্ত্তের সূক্ষ্মতত্ত্ব। শ্রীল রাম রায় মহাশয় ইহারই উদাহরণ স্বরূপ "পহিলহি" পদের অবতারণা করেন। অলঙ্কার ও রস শাস্ত্র-পারদর্শী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বর-প্রাপ্ত কবিবর কবিকর্ণপুর তদীয় শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যের ত্রয়োদশ স্বর্গে উক্ত "পহিলহি" পদাবতারণার ঠিক পূর্ব্বেই লিখিয়াছেন :—

ততঃ স গীতং সরসালিপীতং
বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরস্ত
প্রেম্নোঽতিকাষ্ঠা-প্রতিপাদনেন
দ্বয়োঃ পরৈক্যপ্রতিপাদ্যবাদীৎ॥

অর্থাৎ রায় রামানন্দ রসবতী সখীর আস্বাদিত বিদগ্ধ নাগর নাগরী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পরম প্রেমের পরকাষ্ঠা প্রতিপাদন করিয়া উভয়ের পরম একতার প্রতিপাদক একটী গান করিলেন যথা :—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ্যা ভেল ইত্যাদি।

রায় মহাশয় নিজেও এই অদ্ভুত অচিন্ত্য পরৈক্যবিলাস স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া মুর্চ্ছিত হইয়াছিলেন যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে সচেতন করিয়া বলিলেন—

মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে॥

এই-যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত বা পরৈক্যবিলাস, ইহা বিলাসের এক অচিন্ত্য উচ্চতম তত্ত্ব। রায় রামানন্দের গানটী প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেরই উদাহরণ এবং তিনিও সেই কথা বলিয়াই গানের অবতারণা করিয়াছেন।

শ্রীল রাম রায়ের রচিত "পহিলহি" গানটী প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তসূচক। শ্রীকবিকর্ণপূর ঐ গানের অবতারণাকালে শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে লিখিয়াছেন এই গানটী উভয়ের পরৈক্যপ্রতিপাদক। ইতঃপূর্ব্বে প্রেম-বিলাস বিবর্ত্তের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তদনুসারে "প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত" এবং "উভয়ের পরৈক্য" এই উভয় পদই এক ভাবের প্রতিপাদক। কিন্তু অংশে অংশে বিশ্লিষ্ট ও প্রত্যেক অংশের ভিন্ন ব্যাখ্যা করিলে সর্ব্বত্র বিবর্ত্ত পরিলক্ষিত হয় না। অপিচ এক অংশের সহিত অন্য অংশের, এক ভাবের সহিত অপর ভাবের সংযোগে গানটীতে যে একটী ভাবের সজীব মূর্ত্তি প্রকটিত করে তাহা বিলাস-বিবর্ত্ত বা পরৈক্য-দ্যোতক। হৃৎপিণ্ড হইতে যেমন রক্ত সঞ্চালিত হইয়া সমস্ত শরীরের পুষ্টিসাধন করে, এই গানটীরও সেইরূপ একটী স্থানে রসাধার নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই রসাধারই এই মহাসঙ্গীতের শক্তিকেন্দ্র। সেই কেন্দ্রস্থলেই এই গানটীর আত্মা প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমতী বলিতেছেন :—

না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুঁহুমন মনোভাব পেশল জানি॥

আমাদের মনে হয় এই দুই পংক্তিই পদটীর আত্মা। এই দুই পংক্তিই প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত-দ্যোতক। সম্ভবতঃ তজ্জন্যই কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এই দুই পদের অনুবাদ করিয়া এই গানটীর বিচার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

ন সো রমণো নাহং রমণীতি ভিদা বয়োরাস্তে।
প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥

অর্থাৎ সখি, তিনি যে রমণ আমি যে রমণী এই ভেদ-বুদ্ধি আমাদের পূর্ব্বে ছিল না, মনোভব বলপূর্ব্বক প্রেমরসে উভয়ের মন নিষ্পেষণ করিয়াছে।

এই প্রেম-নিরুপাধি। স্ত্রী-পুরুষভেদবুদ্ধিজনিত ভাববিশেষ হইতে যে প্রেম প্রকাশ পায়, এ স্থলে সে প্রেমের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। প্রেমের

এই অবস্থা অতি উচ্চতম। এই অবস্থাই প্রেমের অন্তর্মুখতা। প্রেম-বিলাস,—প্রেমের Evolution, কিন্তু প্রেমের বিলাস-বিবর্ত্ত,—প্রেমের Involution এই অবস্থায় প্রেমের বহির্বিলাস বা লীলাবিস্তারের ভাব স্বীয় আশ্রয়ে ঘনীভূত হয়। ঘনীভূত প্রেম চিত্তবৃত্তিকে বিলুপ্ত করে, সুতরাং ভেদবুদ্ধি নিরস্ত হয়। ভাবগম্ভীর মহাকবি শ্রীভবভূতি এই সুগম্ভীর ভাবের প্রতিচ্ছবি শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়ে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার সেই চিত্র পাত্রের অনুরূপ হইলেও আদর্শ হইতে পারে নাই। রাম-চরিত্রে যতটুকু সম্ভবপর, তিনি এই অন্তর্মুখ প্রেমের ঘনীভূত ভাব ততটুকুই অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বলিতেছেন :—

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষ-বিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মমহি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো।
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ।

অর্থাৎ হে দেবি! আমি কি সুখে আছি না দুঃখে আছি, একি আমার নিদ্রাবস্থা, না জাগরণ অবস্থা, আমার শরীরে কি বিষ সঞ্চারিত হইতেছে, অথবা আমি সম্মোহনান্দে বিভোর হইতেছি,—আমিত কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। তোমার স্পর্শজনিত চিত্তবিকারে আমার মনোবৃত্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কখন একটু জ্ঞান হইতেছে, কখন বা মোহপ্রাপ্ত হইতেছি।”

এই প্রেম নিরুপাধি নহে, নিরুপাধি না হইলেও ইহার প্রগাঢ়তা অত্যন্ত বেশী। যে প্রেমে চিত্তবৃত্তি-বিলুপ্তির সম্ভাবনা ঘটে, যাহাতে ভেদজ্ঞান নিরস্তপ্রায় হয়, সেই প্রেমের মাত্রা আরও কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইলেই উহা নিরুপাধি প্রেমের আশ্রয়। শ্রীরামরায় উভয়ের প্রেমবিলাস বিবর্ত্তের উদাহরণ স্বরূপ যে পদটী প্রভুকে শুনাইলেন সেই পদের ভুমিকায়

ভাবরাজ্যে আমাদের ন্যায় জড়ধীগণের একবারেই প্রবেশাধিকার নাই। যে প্রেম বাহিরে প্রকাশ না পাইয়া অন্তর্মুখ হয়, বিস্তারের পরিবর্ত্তে ঘনীভূত হয় এবং পাত্রদ্বয়ের ভেদবুদ্ধির বিলোপ সাধন করে, তাদৃশ নিরুপাধি প্রেম সোপাধি জীবের আদৌ বোধগম্য হইতে পারে না।

শ্রীল কবিকর্ণপূরও শ্রীল রামরায়ের রচিত পদের উদ্ধৃত দুই পংক্তি নিরুপাধি প্রেমদ্যোতক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এস্থলে একটুকু বিস্তৃতরূপেই তাঁহার সেই সিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

শ্রীল রামানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া বলিতেছেন, প্রভো শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত অতি অদ্ভুত। শ্রীরাধার উক্তি শুনুন :—

অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূন্
মনোবৃত্তি লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হতা।
ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি
স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরম্॥

রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় জনৈক ব্রাহ্মণের মুখে প্রভু ও রায় রামানন্দের এই আলাপ শুনিতেছিলেন। সার্ব্বভৌম তখন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তারপরে শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ দেব কি বলিলেন!" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তখন আমি যা দেখিলাম তাহা শুনুন,

ধৃতফণইব ভোগী গারুড়ীয়স্য গানং।
তদুদিতমতিরত্যা কর্ণয়ন্ সাবধানম্॥
ব্যধিকরণতয়া বানন্দবৈবশ্যতো বা।
প্রভুরথ করপদ্মেনাস্য মস্তাপ্যধত্ত॥

সাপুড়িয়ার(?) গান শুনিয়া সর্প যেমন ফণা উত্তোলন করিয়া তাহা নিবিষ্ট ভাবে শ্রবণ করে, সেইরূপ অতীব মনোযোগের সহিত রায় রায়ের

গান শ্রবণ করিতে করিতে আনন্দে বিহ্বল হইয়াই হউক অথবা অনুপযুক্ত মনে করিয়াই হউক, প্রভু নিজকরকমলে রামরায়ের মুখাচ্ছাদন করিলেন।"

শ্রীচরিতামৃতেও লিখিত আছে :—

"প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।"

প্রভু কেন রামরায়ের মুখাচ্ছাদন করিলেন, রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

ভট্টাচার্য্য, কোঽয়ং সন্দর্ভঃ ? (ভট্টাচার্য্য ইহার মর্ম্মার্থ কি ?)

প্রত্যুত্তরে সার্ব্বভৌম বলিলেন :—

মহারাজ, নিরুপাধিহি প্রেম কথঞ্চিদপ্যুপাধিং ন সহেত ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে ভগবতোঃ কৃষ্ণরাধয়োঃ রনুপাধি প্রেম শ্রুত্বা তদেব পুরুষার্থী কৃতং ভগবতা মুখপিধানঞ্চাস্ত তদ্রহস্যাপ্রকাশকম্।

কোন গ্রন্থে "নিরুপধি" ও কোন পুঁথিতে "উপাধি" এইরূপ পাঠ আছে। "নিরুপধি" অর্থ অকৈতব, চ্ছলহীন ইত্যাদি। নিরুপাধি শব্দের অর্থও তদ্রূপ। অপরন্তু ন্যায় মুক্তাবলীতে লিখিত হইয়াছে "পদার্থ-বিভাজকো-পাধিত্বম্।" অর্থাৎ উপাধিত্ব, পদার্থ ভেদকধর্ম্ম সুতরাং নিরুপাধিই প্রেমই অকৈতব প্রেম। এই প্রেমে আত্মসুখেচ্ছা বা কপটতা নাই। অকৈতব প্রেম কখনও কপটতা সহিতে পারে না। তুমি ভর্ত্তা আমি ভার্য্যা, অথবা তুমি রমণ, আমি রমণী ইত্যাকার স্ত্রীপুংভেদজ্ঞানজনিত প্রেমবিশেষের মূলে উপাধি বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং উহা সোপাধিক। "ন সো রমণ না হাম রমণী"—অথচ এই উভয়ের মধ্যে প্রেমের যে এক প্রবল অনিবার্য্য ও অপ্রীতিহার্য্য আকর্ষণ থাকে এইরূপ আকর্ষণই নিরুপাধিপ্রেমদ্যোতক। ইহাতে প্রেমিকার আত্মসুখেচ্ছা নাই সুতরাং অকৈতব। প্রভু এই তত্ত্বই সার বলিয়া বুঝিয়া লইলেন, রাধাকৃষ্ণের এই বিলাস

রহস্য প্রকাশযোগ্য নহে বলিয়া নিজ শ্রীকরে শ্রীল রামরায়ের মুখাচ্ছাদন করিলেন।

শ্রীচরিতামৃতও বলেন :—

প্রীতি-বিষয়ানন্দ তদাশ্রয়ানন্দ।
তাহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাহা তাহা এই রীতি।
প্রীতি-বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥

সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে এই পংক্তিদ্বয় নিরুপাধি বা অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম-দ্যোতক।

শ্রীল কবিকর্ণপুর শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয়ের প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত-দ্যোতক পদটীকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরৈক্যসূচক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পরৈক্য ও প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত এই দুইটী পদের অর্থ যে এক ভাবাক্রান্ত তাহা ইতঃপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পরৈক্য যে নিরুপধি বা নিরুপাধিপ্রেমদ্যোতক তৎসম্বন্ধে যথামতি আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীল রামরায় মহাশয়ের পদটীর বিশ্লেষণ করিয়া উহার ভাব বিচার ও অর্থবিনির্ণয় করা আমাদের মত ক্ষুদ্রজনের সামর্থ্যাতীত। বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রাহী পণ্ডিত ব্যক্তিরাই তাদৃশ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। অপিচ কেবল পাণ্ডিত্য দ্বারাও এই শ্রেণীর পদের অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে না। যাঁহারা ভজনানন্দের সুধাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে সমর্থ, যাহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য অপ্রাকৃত মানসনেত্রে সন্দর্শনে সমর্থ, তাঁহারা এই দুরবগাহ প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত-দ্যোতক রসসুধাময় পদরত্নের অর্থলাভে অধিকারী। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার প্রয়াস বিড়ম্বনামাত্র। তবে শব্দ যখন ভাবের দাস, তখন এই শব্দরূপ দাসের সেবা করিতে করিতে, যদি আমরা ভাব-মহারাজের কিঞ্চিৎ দর্শন লাভ করিতে পারি তজ্জন্য কিঞ্চিৎ প্রয়াস-প্রযত্ন অপ্রয়োজনীয় নহে।

আলোচ্য শব্দের প্রথম পংক্তির একটী অতি প্রয়োজনীয় শব্দ—"রাগ"। (পহিলহি রাগ ইত্যাদি) রাগ শব্দটী রসশাস্ত্রের একটী বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দ। "রজ্যতে রঞ্জ রাগে" দিবাদিকোভয়পদী ধাতু হইতেই রাগ শব্দের উৎপত্তি।

ভাব ও করণ এই উভয় বাচ্যেই ঘঞ প্রত্যয় করিয়া এই পদ সাধিত হইতে পারে (ঘঞি চ ভাবকরণয়োঃ)। যাহা দ্বারা কিছু ভাসিত বা রঞ্জিত হয়, তাহাই রাগ, এই অর্থ করণ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। সে যাহা হউক, শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে রাগের যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে তাহা এই :—

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্তাতে॥

অর্থাৎ প্রণয়ের উৎকর্ষ অনেক প্রকার আছে। তন্মধ্যে প্রণয়ের যেরূপ উৎকর্ষ হইলে চিত্তে দুঃখ ও সুখরূপে প্রতীয়মান হয়, প্রণয়ের তাদৃশ উৎকর্ষের নামই রাগ। প্রণয়োৎকর্ষের এমনই মহিমা যে দুঃখ-কারণও সুখকারণরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। দুঃখের ধর্ম্ম দুঃখত্ব। কিন্তু প্রণয়োৎকর্ষ-বিশেষের প্রভাবে এই দুঃখ-কারণও সুখকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহার প্রভাবে দুঃখও সুখরূপে প্রকাশ পায় তাহাই রাগ। বস্ত্র স্বভাবতঃ শুক্ল। কিন্তু বস্ত্র যখন মঞ্জিষ্ঠারাগে রঞ্জিত হয়, তখন শুক্লত্বের স্থানে মঞ্জিষ্ঠার লোহিত বর্ণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ সুখস্বরূপ প্রণয়ের যে উৎকর্ষবিশেষে দুঃখ-কারণও সুখকর বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহারই নাম,—রাগ।

শ্রীউজ্জ্বলে ইহার যে উদাহরণ আছে তাহা এই—

তীব্রার্কদ্যুতিদীপিতৈরসি-লতা-ধারাকরালাশ্রিভি।
মার্ত্তণ্ডোপলমণ্ডলৈঃ স্ফুটিতৈঃ পদ্রেক্তটে তন্বী।
পশ্যন্তী পশুপেন্দ্রনন্দনমসাবিন্দীবরৈরাস্তৃতে।
তম্রে ন্যস্তপদাম্বুজেব মুদিতা ন স্পন্দতে রাধিকা॥

ললিতা বলিলেন, সখীগণ, শ্রীমতীর রাগের মহিমা দেখ। জ্যৈষ্ঠনিদাঘের মধ্যাহ্নসূর্য্যসন্তপ্ত গিরিতটে দাঁড়াইয়া কেমন ব্যগ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শন করিতেছেন। গিরিতটের প্রস্তরসমূহ একে ত নতোন্নত অর্থাৎ অসম, তাহাতে উহাদের কোণগুলি অসির ন্যায় ধারাল, তাহার উপরে প্রস্তরগুলি আবার সূর্য্যকান্তশিলা; উহারা স্বভাবতঃই অধিক পরিমাণে তাপ গ্রহণ করে। ইহার উপরে আবার বৃষরাশিস্থ প্রখর সূর্য্যের মধ্যাহ্ন কিরণ; এতাদৃশ মধ্যাহ্ন সূর্য্যতাপে তপ্ত অসির ন্যায় কোণবিশিষ্ট নতোন্নত সূর্য্যকান্তশিলার উপরে দণ্ডায়মানা শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সন্দর্শন করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশানুভব হইতেছে না, পরন্তু তাঁহার বোধ হইতেছে, তিনি যেন সুকোমল ইন্দীবরে আস্তৃত শয্যায় পদন্যস্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শন করিতেছেন।

এস্থলে অত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-কঠোর-গিরিতট-স্পর্শজনিত দুঃখ তদ্বিপরীত সুখধর্ম্মাক্রান্ত শৈত্যসৌকুমার্য্যাদিবৎ অনুভূত হওয়ায় শ্রীমতীর প্রবল রাগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দনিমগ্না শ্রীমতী প্রণয়োৎকর্ষবিশেষে ভীষণ ক্লেশের কারণকেও সুখের হেতু বলিয়াই মনে করিতেছেন। বঙ্গের ভক্ত কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামি মহাশয়ের একটী গান এখানে উল্লেখযোগ্য তদ্‌যথা :—

বঁধুর সরস দরস লালসে
যাইতাম যবে নিকুঞ্জ নিবাসে,
তখন চরণে বেড়িত, বিষধর কত, হইত নূপুর জ্ঞান গো।
এখন বিনে সে ত্রিভঙ্গ-
শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ ভূষণে ভুজঙ্গ জ্ঞান গো॥

এখানেও দুঃখের কারণ যে ভুজঙ্গবেষ্টন, তাহাও সুখকর বলিয়া প্রতীত হইতেছে। সুতরাং ইহাই রাগের লক্ষণ।

রাগ কাহাকে বলে, তাঁহার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা হইল। কিন্তু

রসশাস্ত্রে রাগের প্রকার ভেদ প্রকাশিত হইয়াছে। নীলিমা ও রক্তিমা ভেদে রাগ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। রাগ অর্থ রঞ্জন,—সাদা পদার্থ রঞ্জিত হইলে তাহার ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া স্বীয় রাগের ধর্ম্মই প্রকাশ পায়। বাহ্য পদার্থের দুইটী রাগের (বর্ণ) সহিত দৃষ্টান্ত সংস্থাপন করিয়া রসশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ এই দুই প্রকার রাগের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

এক্ষণে রক্তিমা রাগের কথা বলা যাইতেছে। কুসুম্ভ পুষ্প ও মঞ্জিষ্ঠসম্ভূত রাগই রক্তিম রাগ নামে খ্যাত, তদ্‌যথা ঃ—

রাগঃ কুসুম্ভমঞ্জিষ্ঠাসম্ভবো রক্তিমা মতঃ।

কুসুম্ভ রাগের লক্ষণ এই যে এই রাগ অতি শীঘ্র চিত্তে আসক্ত হয় এবং অপর রাগের কান্তিপ্রকাশ করিয়া যথোচিত শোভা পায়। তদ্‌যথা—

কুসুম্ভরাগঃ স জ্ঞেয়ো যশ্চিত্তে সজ্জতি দ্রুতং
অন্যরাগচ্ছবিব্যঞ্জী শোভতে চ যথোচিতম্।

বর্ণ পক্ষে রাগেব প্রয়োগ স্থল—পট, প্রেমাত্মক রাগের পক্ষে প্রয়োগ-স্থল—চিত্ত। কৌসম্ভ রাগ, কুসুম ফুলের রঙ্গের ন্যায় ঝটিতি চিত্ত পটকে রঞ্জিত করিয়া তোলে। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন সিদ্ধবল্লবীদেহ প্রেমিক ভক্তগণের মনে এই রাগ অতি সত্বরে প্রবেশ করে। শ্রীল চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের ব্যাখ্যা এই যে "অল্পতর ঘৃত স্নেহ বহুতর মধুস্নেহের সম্মিলনে মধুর উষ্ণতায় অতি সত্বরে ক্লিন্ন হইয়া পড়ে, এবং উহাতে মাধুর্য্য অধিকতর পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া যায় সুতরাং ঝটিতি এই রাগের উদয় হয়।" কৌসম্ভরাগ অপর রাগচ্ছবির অভিব্যঞ্জক। শ্রীল চক্রবর্ত্তি মহাশয় টীকায় বলেন কৌসম্ভরাগ মঞ্জিষ্ঠা লাক্ষাদি রাগচ্ছবি-প্রদর্শক। শ্যামলাদি সখীগণের রাগই কৌসম্ভরাগ নামে খ্যাত। শ্যামলাদির রাগ শ্রীরাধিকা-দির রাগসাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়। ইহার উদাহরণ এইরূপে ঃ—

স্তবোব শ্রবণাবধি প্রিয়সখী যা কৃষ্ণবক্ষাস্তয়া।
যা দৃষ্টে ভুজগেহপি তাবকভুজা সাম্যাৎ প্রমোদোজ্জ্বলা॥

প্রেক্ষ্য ত্বাং পুরতোঽস্ম কামপিদশাং প্রাপ্তাস্তি সেয়ং তথা।
ন জ্ঞায়েত যথা কিমেষ বলবান্ রাগো বিরাগোঽথবা॥

অর্থাৎ শ্যামলার কোন অমিতার্থা দূতী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন "কৃষ্ণ, আমার কোন প্রিয় সখী তোমার নাম শুনা মাত্রই তোমাতে চিত্তার্পণ করিয়াছিলেন। ইনি ভুজগ দেখিয়াও তোমার ভুজ মনে করিয়া প্রমোদে উন্মত্তা হইতেন; তিনি এক্ষণে তোমাকে নয়ন-সমক্ষে অবলোকন করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা অনুভব করিয়া বুঝাও কঠিন। ইহার রাগ বলবান্, কি বিরাগ বলবান্,—কিছুই বলিতে পারিতেছি না।"

এই উদাহরণে "শ্রবণাবধি" এই পদে চিত্তমধ্যে অতি দ্রুত রাগের প্রসক্তি অনুমিত হইতেছে, "দৃষ্টে ভুজগে" এই পদ অন্য রাগের কান্তি-দ্যোতক, "কামপি দশাং" এই পদে প্রয়ণমান অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে।

সারস্বতালঙ্কারেও কুসুম্ভ রাগের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে তদ্‌যথা :—

"যদপৈতিচ শোভতেচ তৎ কুসুম্ভরাগম্।"

অর্থাৎ যাহার ব্যয় আছে, এবং যাহা শোভা পায় তাহাই কুসুম্ভরাগ। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে কুসুম্ভরাগ পাকা রং নহে। কিন্তু শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে লিখিত হইয়াছে :—

সদাধারবিশেষেষু কৌসুম্ভোঽপি স্থিরো ভবেৎ।
ইতি কৃষ্ণপ্রণয়িষু ম্লানিরস্য ন যুজ্যতে॥

অর্থাৎ কৌসুম্ভ রাগ যদিও অস্থির কিন্তু সদাধার-বিশেষে সর্ব্বদা স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত কৃষ্ণ-প্রণয়িনী-জনসকলে এই রাগের ম্লানতা হয় না। কুসুম্ভ ফুলের রং স্বভাবতঃ চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু কোন কষায় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিলে ইহা হইতে পাকা রং জন্মে। সুতরাং মঞ্জিষ্ঠারাগবতী শ্রীরাধার সঙ্গিনীগণের সঙ্গবশতঃ শ্যাম-লাদি যুথেশ্বরীতেও কৌসুম্ভ রাগ স্থায়ী বলিয়াই পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষণে মাঞ্জিষ্ঠ রাগের কথা বলা যাইতেছে। উজ্জ্বল রক্তিমরাগের

মধ্যে মাঞ্জিষ্ঠ রাগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভারতীয় রসশাস্ত্রজ্ঞগণের ধারণা। এই ধারণার বশেই তাঁহারা রত্যাত্মক রাগের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিতে যাইয়া উহার দৃষ্টান্তের নিমিত্ত মাঞ্জিষ্ঠ রাগের উল্লেখ করিয়াছেন। মাঞ্জিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যে মঞ্জিষ্ঠা নীলীরাগের ন্যায় নিত্য। কিন্তু নীলীরাগের উজ্জ্বলতা নাই, শোভা নাই, কিন্তু ইহার যেমন নিত্যতা, তেমনই প্রকাশ। কুসুম্ভ রাগ উজ্জ্বল বটে, কিন্তু অস্থির। সুতরাং নীলী ও কৌসুম্ভ অপেক্ষা মাঞ্জিষ্ঠ রাগই শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন সারস্বতালঙ্কার বলেন :—

"যন্ নাপৈতি অপিচ শোভতে তন্মাঞ্জিষ্ঠঃ রাগঃ।"

অর্থাৎ এই রাগ নিত্য ও শোভাশালী এ লক্ষণ তত পরিস্ফুট নহে।

উজ্জ্বল নীলমণির লক্ষণ আরও সুন্দর, আরও পরিস্ফুট তদ্‌যথা :—

অহার্য্যোঽনন্যসাপেক্ষো যঃ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা।
ভবেন্মাঞ্জিষ্ঠরাগোঽসৌ রাধামাধবয়ো র্যথা॥

প্রথমতঃ বর্ণ-পক্ষের অর্থ করা যাইতেছে—মাঞ্জিষ্ঠ রং জলে নষ্ট হয় না, দীর্ঘকালেও ম্লান হয় না, এই বর্ণ অনন্যসাপেক্ষ, অর্থাৎ ইহার ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনার্থ অন্য কোন বর্ণের প্রয়োজন হয় না, ইহা স্বতঃই সমুজ্জ্বল। ইহার কান্তি অনুদিনই বর্দ্ধিত হয়।

এখন প্রেম পক্ষে অর্থ বলা যাইতেছে। প্রেম-পক্ষের অর্থ এই যে সঞ্চারি ভাব দ্বারা ইহা বিচলিত হয় না, ইহা অনন্যসাপেক্ষ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। এই প্রেমোৎপত্তির জন্য কাহারও অপেক্ষা নাই, এই রাগ অনুদিনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কখনও ইহার অবধি হয় না। ইহা অপরিমিত। রাধামাধবের রাগই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার যে উদাহরণ লিখিত হইয়াছে, তাহা এই :—

ধত্তে দ্রাগনুপাধি জন্মবিধিনা কেনাপি না কম্পতে।
সূতেত্যাহিতসঙ্কটৈরপি রসং তে চেষ্টিতো বর্দ্ধনে॥

ঋদ্ধিং সঞ্চিনুতে চমৎকৃতিকরোদ্দাম প্রমোদোত্তরাং।
রাধামাধবয়ো রয়ং নিরুপমঃ প্রেমানুবন্ধোৎসবঃ ॥

অর্থাৎ রাধামাধবের এই নিরুপম প্রেমানুবন্ধোৎসব উপাধি ব্যতিরেকেও রতি দ্রুত উৎপন্ন হয়, কোন বিধি দ্বারা বিচলিত হয় না এবং গুরু জন-জনিত ভয় অথবা ক্লেশ-পরম্পরা উপস্থিত হইলে তাহা যদি বন্ধ লাভ নিমিত্ত হয় তবে তদ্দ্বারাও রসের উৎপত্তি হয় এবং অনুদিন প্রেমের বৃদ্ধি হয়।

ইহাতে দেখা যাইতেছে কৌসুম্ভ রাগের ন্যায় মাঞ্জিষ্ঠ রাগের দ্রুতসঞ্জাতত্ব গুণ আছে, তদ্ব্যতীত "ঋদ্ধিং সঞ্চিনুতে" পদ দ্বারা "অনুদিন বর্দ্ধনের" ভাবও প্রকাশ পাইল। ''অনুপাধি জন্ম" পদে অনন্যসাপেক্ষত্ব প্রকাশিত হইল। ''ধত্তে" এই ক্রিয়া পদ দ্বারা ''অহার্য্যত্ব'' সূচিত হইল। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে মাঞ্জিষ্ঠ রাগে অহার্য্যত্ব, দ্রুত সঞ্জাতত্ব, অনন্যসাপেক্ষত্ব, অনুদিনবর্দ্ধনত্ব প্রভৃতি থাকা প্রয়োজনীয়। যদি ইহাই মাঞ্জিষ্ঠ রাগের লক্ষণ হয়, তবে এস্থলে আমরা উহার আরও একটী উদাহরণের উল্লেখ করিতেছি তদ্‌যথা :—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ্যা ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহু মন মনোভব পেশল জানি ॥
এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥
না খোঁজল দূতী না খোঁজল আন।
দুহুকো মিলনে মধত পাঁচ বাণ ॥

এই পদের "রাগ" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই এতক্ষণ রাগের প্রকার ভেদ ও লক্ষণ উদাহরণ সহ বলিয়াছি। এখন দেখা যাইতেছে

যে এই রাগ মাঞ্জিষ্ঠ রাগ। মাঞ্জিষ্ঠ রাগে কুসুম্ভরাগের "দ্রুতসঞ্জাতত্ব" গুণ আছে, তাই রসজ্ঞ পদকর্ত্তা বলিতেছেন :—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ্যা ভেল।

এই "নয়নভঙ্গ্যা" পদটী রাগের দ্রুতসঞ্জাতত্বদ্যোতক। ইহার পরেই লিখিত হইয়াছে :—

অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।

"অনুদিন বাঢ়ল" এই বাক্য "কান্ত্যা বর্দ্ধতে" বা অনুদিনবর্দ্ধনত্বের" প্রকাশক, যাহার অবধি নাই তাহা অনন্ত ও অব্যয় সুতরাং আহার্য্য। ইহার পরে বলা হইয়াছে—

ন সো রমণ না হাম রমণী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই পংক্তি শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরৈক্যদ্যোতক। ইহা নিরুপাধিও বটে। নিরুপাধিত্ব যাহা, অনন্যসাপেক্ষত্বও তাহা। মাঞ্জিষ্ঠ-রাগ লক্ষণের অনন্যসাপেক্ষত্বের উদাহরণবিন্যাসনিমিত্তই উদাহরণ শ্লোকে "অনুপাধি জন্ম" পদের অবতারণা করা হইয়াছে।

না খোঁজল দূতী না খোঁজল আন।

এই পংক্তিও অনন্যসাপেক্ষত্বের পোষক। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়-মান হইতেছে যে এই পদটি শ্রীশ্রীরাধামাধবের মাঞ্জিষ্ঠ রাগোত্থ প্রেম-বিলাসের অথবা প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের অতি স্পষ্ট উদাহরণ। এই মাঞ্জিষ্ঠ রাগই শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরৈক্যদ্যোতক। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বসিদ্ধান্ত বিশিষ্ট-রূপেই দৃঢ়ীকৃত হইল।

না সো রমণ না হাম রমণী।

এই বাক্যে শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমের অনন্য সাপেক্ষকত্ব বা নিরু-পাধিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, অপরন্তু শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরৈক্যও ইহা দ্বারা স্ফুটতররূপে দ্যোতিত হইয়াছে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় শ্রীল রাম রায় মহোদয়ের এই

বাক্যের পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি হইতে মহাভাবের উদাহরণের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই :—

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাৎ।
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্॥
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে।
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃকৃতী॥

মাঞ্জিষ্ঠ রাগে মহাভাবজনিত শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-প্রতিপাদনার্থ এই উদাহরণটিও উৎকৃষ্ট। শৃঙ্গাররসরূপ কৃতীশিল্পী মনোভব দুই চিত্তকে যে প্রেম-রসে এক করিয়া পরৈক্য-প্রতিপাদন করিলেন এই পদ্যটি তাহারই প্রমাণ। প্রীতি সন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামি পাদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উহার টীকা করিয়া লিখিয়াছেন—

"তাদৃশ প্রেমাবেশো জাতঃ, যেন তৎস্বভাবনিজস্বভাবয়োরৈক্যমেব তাসু জাতমিত্যর্থঃ। যথা শ্রীমদুজ্জ্বল নীলমণৌ মহাভাবোদাহরণম্ রাধায়া-ইত্যাদি।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের এমনই পরম প্রেমজননত্বস্বভাব, যে তাঁহারা এই প্রেমমহিমায় গোপীগণের হৃদয়ে এমন অদ্ভুত প্রেমাবেশ জাত হইল যে তাঁহাদের স্বভাব ও তাঁহার নিজ স্বভাব এক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠিল। মহাভাবের এই পরৈক্য অতি স্বাভাবিক। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে মহাভাবের উদাহরণে বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন "হে গোবর্দ্ধননিকুঞ্জকুঞ্জররাজ, শৃঙ্গাররসরূপ সুপণ্ডিত শিল্পী অন্তর্বহির্দ্রাবী স্বেদাখ্য সাত্ত্বিকবৃত্তিসমূহ দ্বারা শ্রীরাধার এবং তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে দ্রবীভূত এবং অভিন্নরূপে সংযোজিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যমধ্যে চিত্র করিবার নিমিত্ত নবরাগ হিঙ্গুল দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছেন।"

এস্থলে নবরাগ হিঙ্গুলের অনুরঞ্জনের সহিত মাঞ্জিষ্ঠরাগের কথাও বিবেচ্য।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এই পদ্যের যে তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন তাহা এই :—

"অত্রপরস্পরমভিন্নচিত্তত্বাৎ তত্র অন্যস্যা অপ্রবেশাৎ স্বসংবেদ্যদশা দর্শিতা।" অর্থাৎ এস্থলে পরস্পর অভিন্নচিত্তত্বনিবন্ধন স্বসংবেদ্যদশা দর্শিত হইয়াছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ও এই পরৈক্যসিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন,—"নির্ধৃতভেদভ্রমং যথাস্যাৎ তথা যুঞ্জন্",—"শিল্পী শৃঙ্গাররসে এমন ভাবে উভয়ের চিত্ত একত্র সংযুক্ত করিয়া দিলেন যে উহাতে সমস্ত প্রকার ভেদভ্রম নির্ধূত হইল।

শ্রীল রাম রায়ের উক্তিতে লিখিত "প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত", কবিকর্ণপুরের লিখিত শ্রীরাধামাধবের "পরৈক্য",উজ্জ্বলনীলমণিকার লিখিত "নির্ধূতভেদ-ভ্রম" এবং শ্রীজীবের সিদ্ধান্তিত "পরস্পরমভিন্নচিত্তত্ব" প্রভৃতি সমস্বরে স্ত্রীপুংভেদভাব নিরস্ত করিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমবিলাসের উচ্চতম বিবর্ত্ত ব্যাখ্যা করিতেছে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী এই পদ্যের বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন "এই পদ্য দ্বারা 'যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব' উক্ত হইল।" শ্রীল শ্রীজীব ও শ্রীল চক্রবর্ত্তী উজ্জ্বলের ভাবলক্ষণ-পদের ব্যাখ্যায় এই যাবদাশ্রয়বৃত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় যে আশ্রয়-ভেদেই বৃত্তি-(ব্যাপার বা ক্রিয়া) ভেদ। যদিও অন্যান্য ব্রজসুন্দরীতে মহাভাবের আবেশ হয় বটে, কিন্তু শ্রীরাধা স্বয়ং মহাভাবস্বরূপিণী। ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বগুণে সকল গোপী অপেক্ষা গরীয়সী। শ্রীরাধিকার প্রেমবৈশিষ্ট্যবিক্রম সম্বন্ধে পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করায় মহাদেব বলিলেন, (যথা শ্রীউজ্জ্বলে—)

লোকাতীতমজাণ্ডকোটীগমপিত্রৈকালিকং যৎসুখং।
দুঃখঞ্চেতি পৃথগ্ যদি স্ফুটমুভে তে গচ্ছতঃ কূটতাং।
নৈবাভাসতুলাং শিবে তদপি তৎকূটদ্বয়ং রাধিকা-
প্রেমোদ্যৎসুখদুঃখসিন্ধুভবয়োর্বিন্দোত বিন্দোরপি।

অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগত, তথা কোটী-কোটী ব্রহ্মাণ্ডগত ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল সম্বন্ধীয় সমস্ত সুখদুঃখগুলিকে যদি পৃথক্ দুই স্থলে রাশীকৃত করা যায়, তাহা হইলেও এই উভয় স্তূপ, শ্রীরাধার সুখদুঃখসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্ব প্রভৃতি বৃত্তি * মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকাতে সবিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল গুণ অংশাংশিভাবে অন্যান্য গোপীদিগের মধ্যেও সম্ভবে, কিন্তু শ্রীমতী রাধিকাই ইহাদের পূর্ণাশ্রয়। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন :—

রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নহে,—শাস্ত্র-পরমাণ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি, কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি॥

শ্রীমতী রাধিকাই একমাত্র মাঞ্জিষ্ঠরাগবতী। মাঞ্জিষ্ঠরাগ কীদৃশ প্রেমাতিশয্যপ্রকাশক, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরাধামাধবের রাগই মাঞ্জিষ্ঠ রাগ। তদ্‌যথা—

ভবেন্মাঞ্জিষ্ঠরাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা।

---

* অত্রানুভাবা গোবিন্দে কান্তাশ্লিষ্টেঽপি মূর্চ্ছনা।
অসহ্য দুঃখস্বীকারাদপি তৎসুখকামনা॥
ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্ব তিরশ্চামপি রোদনম্।
স্বভূতৈরপি তৎসঙ্গ তৃষ্ণা মৃত্যু প্রতিশ্রবাৎ॥
দিব্যোন্মাদাদয়োঽপ্যন্তে বিদ্বদ্ভিরনুকীর্ত্তিতাঃ।
প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোদনোঽয়মুদঞ্চতি॥

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি।

মাঞ্জিষ্ঠ রাগে যে রাধামাধবের পরৈক্য প্রকাশ পায়, শ্রীল রামরায়ের এই গান তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পদামৃতসমুদ্র নামক পদসংগ্রহকর্ত্তা শ্রীরাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ও "পহিলহি" পদটীর সংস্কৃত ভাষায় এক প্রকার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। * উহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

---

* শ্রীল রাধামোহনের ব্যাখ্যা এইরূপ—আদৌ পূর্ব্বরাগো নয়নভঙ্গ্যা জাতঃ। স এব অনুদিনং বর্দ্ধিষ্ণুঃ সীমাং ন প্রাপ্তঃ। ন মে স পতি র্নাহং তৎপত্নী। তথাপি আবয়োর্মনঃ কন্দর্পেণ পিষ্টমভিন্নং কৃতমিত্যহং জানে। অতস্তৎ সর্ব্বং প্রেমকৃত্যং শ্রীকৃষ্ণায় কথয়িষ্যসীতি। "বিছুরহ জানি" বিস্মৃতাঃ মাভূঃ যত স্বং তদ্বিস্মরণশীলস্য অনুগতা দূতী। অতো বিস্মরণং সাহজিকমিতি বক্রোক্তিঃ। "মধত পাঁচবাণ"—মধ্যস্থঃ কন্দর্পঃ। "অবসোই বিরাগ" ইত্যনেন বক্রোক্তি মানশ্চ স্পষ্টঃ। অত্রাবহিত্থা কিঞ্চিন্মানবিরামাদেব বোধ্যা।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে "প্রথমতঃ নয়নভঙ্গিতে পূর্ব্বরাগ জন্মিল। সেই পূর্ব্বরাগ, অনুদিন বাড়িতে লাগিল, উহা সীমা প্রাপ্ত হইল না। তিনি আমার পতি নহেন, আমিও তাঁহার পত্নী নহি, কিন্তু তথাপি কন্দর্প আমাদের মন পেষণ করিয়া অভিন্ন করিয়াছিল। এই সকল প্রেমকৃত্য শ্রীকৃষ্ণকে তুমি বলিও, বিস্মৃতা হইও না। কেননা, তুমি সেই বিস্মরণশীল শ্রীকৃষ্ণের অনুগতা দূতী। সুতরাং বিস্মরণ তোমার পক্ষে সাহজিক" ইহা বক্রোক্তি। "অবসোই বিরাগ" এই কথায় বক্রোক্তি ও মান অতি স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে। এ স্থলে মানের কিঞ্চিৎ বিরামের পর অবহিত্থা সূচিত হইয়াছে।"

কেবল "অবহিত্থা" শব্দ ব্যতীত এই অনুবাদের প্রত্যেক কথাই পাঠকগণের নিকট সরল বলিয়া অনুমিত হইবে। অবহিত্থা শব্দটী রসশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। ইহার অর্থ "আকারগুপ্তি।" এই আকার গোপন নানা প্রকারেই হইতে পারে। কাপট্য, লজ্জা, ভয়, গৌরব ও দাক্ষিণ্য ইত্যাদি অবহিত্থা বা আকার গোপনের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকে। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর মহোদয় "পহিলহি" পদের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া "আদৌ রাগ" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "পূর্ব্বরাগ"। রাগ শব্দ প্রণয়োৎকর্ষ-বিশেষদ্যোতক। "পূর্ব্বরাগ" বিপ্রলম্ভরসের একতম। রাগে সম্ভোগ থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। বিপ্রলম্ভে আদৌ সম্ভোগ নাই সুতরাং বিপ্রলম্ভে প্রেমের বিলাস অসম্ভব। কিন্তু এই গানটী উচ্চতম প্রণয়োৎকর্ষের বিলাসবিশেষের দ্যোতক

অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগত, তথা কোটী-কোটী ব্রহ্মাণ্ডগত ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল সম্বন্ধীয় সমস্ত সুখদুঃখগুলিকে যদি পৃথক্ দুই স্থলে রাশীকৃত করা যায়, তাহা হইলেও এই উভয় স্তুপ, শ্রীরাধার সুখদুঃখসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্ব প্রভৃতি বৃত্তি * মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকাতে সবিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল গুণ অংশাংশিভাবে অন্যান্য গোপীদিগের মধ্যেও সম্ভবে, কিন্তু শ্রীমতী রাধিকাই ইহাদের পূর্ণাশ্রয়। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন :—

রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নহে,—শাস্ত্র-পরমাণ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি, কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি॥

শ্রীমতী রাধিকাই একমাত্র মাঞ্জিষ্ঠরাগবতী। মাঞ্জিষ্ঠরাগ কীদৃশ প্রেমাতিশয্যপ্রকাশক, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরাধামাধবের রাগই মাঞ্জিষ্ঠ রাগ। তদ্‌যথা—

ভবেন্মাঞ্জিষ্ঠরাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা।

---

* অত্রানুভাবা গোবিন্দে কান্তাশ্লিষ্টেঽপি মূর্চ্ছনা।
অসহ্য দুঃখস্বীকারাদপি তৎসুখকামনা॥
ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্ব তিরশ্চামপি রোদনম্।
স্বভূতৈরপি তৎসঙ্গ তৃষ্ণা মৃত্যু প্রতিশ্রবাৎ॥
দিব্যোন্মাদাদয়োঽপ্যন্যে বিদ্বদ্ভিরনুকীর্ত্তিতাঃ।
প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোদনোঽয়মুদঞ্চতি॥

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি।

মাঞ্জিষ্ঠ রাগে যে রাধামাধবের ঐক্য প্রকাশ পায়, শ্রীল রামরায়ের এই গান তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পদামৃতসমুদ্র নামক পদসংগ্রহকর্ত্তা শ্রীরাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ও "পহিলহি" পদটীর সংস্কৃত ভাষায় এক প্রকার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। * উহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

---

* শ্রীল রাধামোহনের ব্যাখ্যা এইরূপ—আদৌ পূর্ব্বরাগো নয়নভঙ্গ্যা জাতঃ। স এব অনুদিনং বর্দ্ধিষ্ণুঃ সীমাং ন প্রাপ্তঃ। ন মে স পতি র্নাহং তৎপত্নী। তথাপি আবয়োর্মনঃ কন্দর্পেণ পিষ্টমভিন্নং কৃতমিত্যহং জানে। অতস্তৎ সর্ব্বং প্রেমকৃত্যং শ্রীকৃষ্ণায় কথয়িষ্যসীতি। "বিছুরহ জানি" বিস্মৃতাঃ মাভূঃ যত ত্বং তদ্বিস্মরণশীলস্ত অনুগতা দূতী। অতো বিস্মরণং সাহজিকমিতি বক্রোক্তিঃ। "মধত পাঁচবাণ"—মধ্যস্থঃ কন্দর্পঃ। "অবসোই বিরাগ" ইত্যনেন বক্রোক্তি মানশ্চ স্পষ্টঃ। অত্রাবহিত্থা কিঞ্চিন্মানবিরামাদেব বোধ্যা।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে "প্রথমতঃ নয়নভঙ্গিতে পূর্ব্বরাগ জন্মিল। সেই পূর্ব্বরাগ, অনুদিন বাড়িতে লাগিল, উহা সীমা প্রাপ্ত হইল না। তিনি আমার পতি নহেন, আমিও তাঁহার পত্নী নহি, কিন্তু তথাপি কন্দর্প আমাদের মন পেষণ করিয়া অভিন্ন করিয়াছিল। এই সকল প্রেমকৃত্য শ্রীকৃষ্ণকে তুমি বলিও, বিস্মৃতা হইও না। কেননা, তুমি সেই বিস্মরণশীল শ্রীকৃষ্ণের অনুগতা দূতী। সুতরাং বিস্মরণ তোমার পক্ষে সাহজিক" ইহা বক্রোক্তি। "অবসোই বিরাগ" এই কথায় বক্রোক্তি ও মান অতি স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে। এ স্থলে মানের কিঞ্চিৎ বিরামের পর অবহিত্থা সূচিত হইয়াছে।"

কেবল "অবহিত্থা" শব্দ ব্যতীত এই অনুবাদের প্রত্যেক কথাই পাঠকগণের নিকট সরল বলিয়া অনুমিত হইবে। অবহিত্থা শব্দটী রসশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। ইহার অর্থ "আকারগুপ্তি।" এই আকার গোপন নানা প্রকারেই হইতে পারে। কাপট্য, লজ্জা, ভয়, গৌরব ও দাক্ষিণ্য ইত্যাদি অবহিত্থা বা আকার গোপনের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকে। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর মহোদয় "পহিলহি" পদের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া "আদৌ রাগ" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "পূর্ব্বরাগ"। রাগ শব্দ প্রণয়োৎকর্ষ-বিশেষদ্যোতক। "পূর্ব্বরাগ" বিপ্রলম্ভরসের একতম। রাগে সম্ভোগ থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। বিপ্রলম্ভে আদৌ সম্ভোগ নাই সুতরাং বিপ্রলম্ভে প্রেমের বিলাস অসম্ভব। কিন্তু এই গানটী উজ্জ্বল প্রণয়োৎকর্ষের বিলাসবিশেষের [illegible]

ইতঃপূর্ব্বেও লিখিত হইয়াছে শ্রীল রামরায় যখন এই পদটী গাইতে আরম্ভ করিলেন মহাপ্রভু তখন বংশীধ্বনিবিমুগ্ধ ফণীর ন্যায় বিস্মিতভাবে এই গানটী শ্রবণ করিতে লাগিলেন, এবং স্বীয় কর-কমলে শ্রীরাম রায়ের বদন আচ্ছাদন করিলেন। ইহাতে রাজা প্রতাপরুদ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "ভট্টাচার্য্য, প্রভু যে স্বীয় করকমলে শ্রীরাম রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন ইহার তাৎপর্য্য কি ?"

তদুত্তরে শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন :—

"মহারাজ, নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপ্যুপাধিং ন সহতে ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে ভগবতো কৃষ্ণরাধায়ো রনুপাধি প্রেম শ্রুত্বা তদেব পুরুষার্থীকৃতং ভগবতা। মুখপিধানঞ্চাস্য তদ্রহস্যত্বাপ্রকাশকম্।" অর্থাৎ মহারাজ, নিরুপাধি প্রেম কোন প্রকারেই উপাধি সহিতে পারে না। এই গানের পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীশ্রীরাধা মাধবের অনুপাধি প্রেমের কথা শুনিয়া শ্রীভগবান্ উহাই পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। শ্রীশ্রীরাধামাধবের এই অদ্ভুত বিলাস-মহত্ত্বের রহস্য প্রকাশযোগ্যনহে বলিয়াই প্রভু শ্রীহস্তে রামরায়ের মুখাচ্ছাদন করিলেন। অতঃপরে—

প্রভু কহে সাধ্য বস্তু-অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥

জীবের যাহা সাধনীয়, প্রভু এই স্থলে তাহার অবধি বিনির্ণয় করাইয়া সাধ্য

বলিয়া সঙ্গীতকর্ত্তা স্বীয় মত অভিব্যক্ত করিয়াছেন। মাঞ্জিষ্ঠরাগই প্রণয়োৎকর্ষের উচ্চ-তম অবস্থা। শ্রীরাধামাধবের প্রেমোৎকর্ষই মাঞ্জিষ্ঠরাগের উদাহরণ স্থল, সুতরাং বিপ্রলম্ভরসাত্মক পূর্ব্বরাগ শব্দটী "রাগের" প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না ইহাও বিবেচ্য। অপরন্তু রসশাস্ত্রের পরিভাষা ব্যবহারে শ্রীল রামরায়ের শিথিলতা ছিল, তাহাও আমাদের মনে হয় না। পাঠকগণ এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মর্ম্ম আমাদের আলোচিত পূর্ব্বোলিখিত ব্যাখ্যার সহিত তুলনা করিয়া পাঠ করিয়া দেখিবেন।

বস্তুর জিজ্ঞাসা শেষ করিলেন। শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমবিলাস যে এক হইয়া ভিন্নবৎ প্রতীয়মান এবং ভিন্নবৎপ্রতীয়মান হইয়াও যে এক এবং অচিন্ত্য,—এই পরৈক্যসূচক প্রেমবিলাসবিবর্ত্তরূপ মহত্বই সাধ্যবস্তুর অবধি। প্রেমের আশ্রয় ও বিষয় এই উভয় ভেদবৎ প্রতীয়মান হইলেও অভিন্ন। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব। শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের প্রেমবিলাসেও তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীল রামরায়ের গানটি উহারই উদাহরণ।

এ পর্য্যন্ত "পহলহি" পদটী যত দূর ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীরাধামাধবের প্রেমপরৈক্য সম্বন্ধেই আলোচিত হইয়াছে। কবি-কর্ণপূর বলেন—

> নাসো রমণ না হাম রমণী।
> দুঁহুমন মনোভব পেশল জানি॥

ইহা পরৈক্যপ্রতিপাদক। শ্রীচরিতামৃতও বলেন—

> রাধা আর কৃষ্ণ ঐছে একই স্বরূপ।
> লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥

এই পরৈক্যবাদ দৃঢ়ীকরণের জন্যই স্বয়ং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ইহার আর একটী উদাহরণস্বরূপ "রাধায়া শ্চিত্তবৃত্তিজতুনা" শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া-ছেন। উক্ত শ্লোকের "নির্ধূতভেদভ্রমম্" "যুঞ্জন্" এবং "শৃঙ্গার কারুঃ কৃতী" এই কয়েক পদের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই—

> নাসো রমণ না হাম রমণী।
> দুঁহুমন মনোভব পেশল জানি॥

এই পয়ারের পরৈক্যার্থ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ফলতঃ অচিন্ত্যভেদা-ভেদবাদে শ্রীরাধামাধবের প্রেমবিলাস মহত্বের ইহাই উচ্চতম তত্ত্ব। সুতরাং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস তত্ত্বতঃ এক। তত্ত্বতঃ এক হইয়াও

প্রতীয়মানতায় বিভিন্ন হইলেই তাহাকে বিবর্ত্ত বলা যায়। এই বিবর্ত্ত-প্রদর্শনের জন্যই গানের শেষে লিখিত হইয়াছে—

"অবসোই বিরাগ তুহুঁ ভেল দূতী।"

এস্থলে অভিন্নতায় ভিন্নত্ব প্রতীয়মান হইল। সুতরাং ইহা বিবর্ত্ত। প্রেমে প্রণয়ের প্রতীতি না হইয়া বিরাগের প্রতীতি হইয়াছে। কিন্তু এই বিরাগ প্রকৃত পক্ষে বিরাগ নহে, ইহা বিরাগাভাস। বামাগণের প্রণয়কোপে বা ঈর্ষাদিতেও এইরূপ বিবর্ত্ত সূচিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে বামা নায়িকাগণ নায়কদিগকে যথেষ্ট ভালবাসেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই প্রণয় কথায় কথায় মানে পরিণত হয়, কুটীলতায় পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং প্রতীয়-মানতায় প্রেমতত্ত্ব অন্যরূপে প্রকাশ পায়। এই বিবর্ত্তের ব্যাখ্যা করিতে হইলে আদৌ শ্রীরাধামাধবের প্রেমতত্ত্ব-ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থের পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে উহা শ্রীভগবানের প্রেমতত্ত্বের একখানি সূক্ষ্মতম দর্শনশাস্ত্র,—Psychology of Divine Love.

শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের প্রেমপরৈক্য বুঝিতে হয়। প্রথমতঃ বুঝিতে হয়,—রাধামাধবের প্রেম, তত্ত্বতঃ এক; দ্বিতীয়তঃ বুঝিতে হয়,—তত্ত্বতঃ এক হইয়াও প্রতীয়মানতায় বিভিন্ন। সুতরাং বিরাগাভাস-প্রদর্শনেই বিবর্ত্তের পূর্ণতা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ফলতঃ শ্রীরাধামাধবের প্রেমবিলাস,—প্রণয়োৎকর্ষের চরম সীমা। ইহা মাঞ্জিষ্ঠরাগের একমাত্র উদাহরণ স্থল। অন্যান্য গোপীগণের সময়ে সময়ে মহাভাবের আবেশ হইতে পারে, কিন্তু শ্রীরাধা সাক্ষাৎ মহাভাবস্বরূ-পিণী, শ্রীরাধা প্রেমে সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত প্রধানা, যথা শ্রীউজ্জ্বলে :—

সর্ব্বথৈব সমর্দ্ধো বা সা স্যাদাত্যন্তিকাধিকা।
সা রাধা সা তু মধ্যেব যন্নাত্যাসদৃশী ব্রজে॥

শ্রীরাধাই কৃষ্ণময়ী (দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা ইত্যাদি)। সুতরাং কেবল শ্রীরাধামাধবের প্রেমেই পরৈক্য পরিলক্ষিত হয়, অন্যান্য গোপীদের সম্বন্ধে পরৈক্য সম্ভবে না, এবং শ্রীল রামরায় কথিত উচ্চতম সাধ্যতত্ত্ব—প্রেম-বিলাসবিবর্ত্তও অন্য গোপীকায় সম্ভাবিত হইতে পারে না।

পরৈক্য ভিন্ন বিবর্ত্তজ্ঞান অসম্ভব। উত্তররামচরিতে লিখিত আছে—

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদা
দ্ভিন্নং পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্।
আবর্ত্ত বুদ্বুদতরঙ্গময়ান্ বিকারান্
অম্ভো যথা সলিলমেব তু তৎ সমগ্রম্॥

অর্থাৎ এক করুণরস নিমিত্তভেদ-নিবন্ধন (কারণ বৈচিত্র্যবশতঃ) বহু বিধ-রূপে ভাসমান হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করিয়া থাকে। জলের যেমন আবর্ত্ত, বুদ্বুদ ও তরঙ্গ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ রূপ প্রতীয়মান হইলেও উহারা বস্তুতঃ জল ছাড়া অপর পদার্থ নহে, সীতার হৃদয়ে এক করুণরসই হর্ষবিষাদাদিরূপে ভিন্ন ভিন্নভাবে ভাসমান হইয়াছিল। এইরূপ হেতু ধরিয়া শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি মহোদয় বৈষ্ণবতোষিণীর টীকায় লিখিয়াছেন—

"মমতাধিক্যেন হি গম্ভীরপ্রেমপ্রবাহাধিক্যং ভবতি। তত এব তদ্বিবর্ত্ত-রূপ বাম্যাপরকৌটিল্যাভাসো জায়তে।"

এই কৌটিল্যাভাস প্রেমেরই ভিন্ন প্রকাশ। তত্ত্বতঃ এই কৌটিল্য ও প্রেম অভিন্ন। কিন্তু এই প্রেমের গতি স্বভাবকুটিলা।

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।

এই কৌটিল্য বা বামতা একশ্রেণীর সখীতেও দৃষ্ট হয়। এমন কি ইহা সত্যভামাতেও দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাদের এই বামতা প্রেমবিলাসবিবর্ত্তরূপ সাধ্যাবধিরূপে গণ্য হইতে পারে না। কেননা প্রেম-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইহাদের পরৈক্য সম্বন্ধ নাই, তাহা কেবল শ্রীরাধারই আছে।

পরৈক্য আছে বলিয়াই এই প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত সাধ্যাবধিরূপে নির্ণীত হইয়াছে। এই পরৈক্যভাব প্রদর্শন না করা পর্য্যন্ত প্রভুর প্রশ্নের নিবৃত্তি হইয়াছিল না। নচেৎ প্রভু যখন বলিলেন রাধার প্রেম শ্রেষ্ঠ কেন, এবং তদুত্তরে রামরায় যখন বলিলেন :—

"সাধারণ প্রেমে দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেমে হইল বামতা॥
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তারে না দেখিয়া ইহা ব্যাকুল হইলা হরি॥"

তখনই তাঁহার প্রশ্ন নিবৃত্তি হইত। কেননা "বিবর্ত্তরূপ বাম্যপর কৌটিল্যাভাস" উক্ত কতিপয় ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল "বাম্যপর কৌটিল্যাভাস"ই সাধ্য বস্তুর অবধি নহে। তাহা হইলে ললিতা বিশাখা প্রভৃতির বামতাও সাধ্যাবধি বলিয়া বর্ণিত হইত। আসল কথা এই যে শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমবিলাসবিবর্ত্তই সাধ্যের অবধি, উভয়ের পরৈক্য আছে বলিয়াই "দুঁহার প্রেমবিলাসমহত্বে" "প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত" সূচিত হইয়াছে। নচেৎ বিবর্ত্ত লক্ষণ ঠিক হইত না।

অপরন্তু শ্রীল কবিকর্ণপূরের মতানুসরণ করিয়া শ্রীল রামরায়ের পদটীর ব্যাখ্যা করিলে এই পদে বামতার কথা একবারেই আসিতে পারে না। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় এই পদের সেরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া কষ্টকল্পনাপ্রসূত একটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেক হস্তলিখিত প্রাচীন শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে উক্ত গানের "কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি" এইরূপ পাঠ আছে। তাহার অর্থ এই যে "শ্রীকৃষ্ণ এখন সম্ভবতঃ এই সব প্রেম কাহিনী ভুলিয়া গিয়াছেন, দূতি, সেই সকল কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থিত করিয়া দিও।" এই দূতী শ্রীমতীরই নিসৃষ্টার্থা দূতী। ইহার লক্ষণ এই :—

বিন্যস্তকার্য্যভারা সাধ্বয়োরেকতরেণ যা।

যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে॥

অর্থাৎ নায়কনায়িকার মধ্যে একজন দ্বারা কার্য্যভারপ্রাপ্ত হইয়া যুক্তি দ্বারা তদুভয়ের মিলনকারিণীই নিসৃষ্টার্থা দূতী নামে অভিহিতা। শ্রীল রামানন্দ রায়ের গানের অর্থে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে প্রতীয়মান হয়, শ্রীকৃষ্ণের প্রবাসে শ্রীমতী বিরহব্যাকুলা হইয়াই তাঁহাকে আনিবার জন্য দূতীকে প্রেরণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলিবার জন্য দূতীকে যুক্তি বলিয়া দেন। সে যুক্তি —সেই প্রগাঢ় মাঞ্জিষ্ঠরাগের প্রেম এবং উভয়ের প্রেমের পরৈক্য ভাব।

কিন্তু শ্রীল রাধামোহন এই দূতীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত দূতী করিয়াছেন এবং শ্রীমতীর মুখে বলিতেছেন "বিছুরহু জানি" "বিস্মৃতা মাভূঃ যতস্ত্বং তদ্বিস্মরণশীলস্য অনুগতা দূতী অতো বিস্মরণং সাহজিকমিতি।" অর্থাৎ হে দূতি তুমি ভুলিও না, তুমি ভুলিলেও ভুলিতে পার, কেননা তুমি ত সেই বিস্মরণশীলের দূতী, সুতরাং বিস্মরণ তোমার পক্ষে অতি সহজ। (ইহা বক্রোক্তি)। "অবসোই বিরাগ" ইহাতেও বক্রোক্তি ও মান স্পষ্টতঃই সূচিত হইয়াছে। মানের কিঞ্চিৎ বিরামে এ স্থলে অবহিত্থা প্রকাশ পাইয়াছে।"

শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় এইরূপ কষ্টকল্পিত অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া গানটির স্বতন্ত্র অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যদি এই গানের ঐরূপ অর্থ মনে করিতেন তবে তিনি "তথাহি" বলিয়া কৌটিল্যাভাসদ্যোতক কোনও একটী বচন-প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতেন, তাহা না করিয়া "নির্ধৃতভেদভ্রমং" "যুঞ্জন্" প্রভৃতি পদপূর্ণ শ্রীমতীর মহাভাবের উদাহরণ বচনের উল্লেখ করিতেন না।

শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় পদামৃতসমুদ্রে মহাজনগণের পদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার টীকা করিয়াছেন। তাঁহার টীকায় এক পদের সহিত অপর

পদের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন্ পদ কি ভাবের, তাহাতে অনেক স্থলে তিনি সবিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই, নিজের কল্পনানুসারে সংস্কৃত ভাষায় শব্দগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য পদটী তিনি ধীরাধীরা নায়িকার মানের উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্‌যথা :—

শ্রীকৃষ্ণনিকটাদাগত্য দূতী শ্রীমতীং প্রতি "শুনহ রায়ান ঝি, লোকে না বলিবে কি," (চণ্ডীদাস) ইত্যাদিকং সোপালম্ভমাহ। তৎশ্রুত্বা রাগ-পরিণামবতী তত্র সাহজিক ধীরাধীরা শ্রীমতী "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ্যা ভেল" ইত্যাদিকমাহ। ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়মিতি অস্য বাষ্পং বিনাপি "প্রতিপাদা কামবরদা", শ্লোকোদাহরণং দৃষ্ট্বা এত-ত্তুদাহৃতম্।

এইরূপ ভূমিকা করিয়া শ্রীল রাধামোহন "পহিলহি" পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন ধীরাধীরার মানের উদাহরণ "প্রতিপাদ্যকাম বরদামিত্যাদি" যে পদ্যটী আছে, তাহা দেখিয়াই এই উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা উজ্জ্বল নীলমণি হইতে সেই উদাহরণ শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, তদযথা :—

তামেব প্রতিপাদ্য কামবরদাং সেবস্ব দেবীং সদা।
যস্যা প্রাপ্য মহাপ্রসাদমধুনা দামোদরামোদসে॥
পাদালক্তচিতং শিরস্তবমুখং তাম্বূলশেষোজ্জ্বলং।
কণ্ঠশ্চায়মুরোজ কুট্মল্ স্রঙ্নির্ম্মাল্যমাল্যাঙ্কিতঃ॥

অর্থাৎ শ্রীমতী কহিতেছেন "হে দামোদর, যাহার পাদলগ্ন লাক্ষারসচর্চ্চিত তাম্বুল ও বক্ষের প্রসাদিমালা মহাপ্রসাদরূপে পাইয়া স্বীয় মস্তক শোভিত, মুখমণ্ডল উজ্জল ও কণ্ঠ শোভিত করিয়াছ, সেই কামবরদাত্রী দেবীর শরণাপন্ন হও, তাহারই সেবা কর।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন "বাষ্পস্যাত্রাভাবঃ" অর্থাৎ এই উদাহরণে বাষ্পের অভাব। শ্রীরাধামোহন

ঠাকুরও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। যাহা হউক এই উদাহরণ অনুসারে "পহিলহি" * পদটী কোনও প্রকারে ধীরাধীরা মানময়ী নায়িকার উক্তির উদাহরণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারেনা। এই গানটী শ্রীরাধামাধবের প্রেম-পরৈক্যদ্যোতক এবং সাধ্যতত্ত্বের অবধি।

---

* এই অধ্যায়ে "পহিলহি" পদ ও উহার অংশ এবং আরও কতকগুলি সিদ্ধান্ত-বাক্য পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা পুনরুক্ত দোষ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বিষয়-বিশেষের বিশদ ব্যাখ্যা এবং সপ্রমাণতার নিমিত্ত এইরূপ পুনরুল্লেখ দোষ-জনক নহে। ন্যায়সূত্র-গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের আটান্ন সূত্রের ভাষ্যে বেদের পুনরুক্ত আশঙ্কা পরিহারার্থ বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন :—"পুনরুক্ত দোষোঽভ্যাসে নেতি প্রকৃতম্। অনর্থকোঽভ্যাসঃ পুনরুক্তঃ। অর্থবানভ্যাসোঽনুবাদঃ।" অর্থাৎ অভ্যাসে (পুনঃ পুনঃ বলায় বা লেখায়) পুনরুক্ত দোষ হয় না। অনর্থক অভ্যাসই পুনরুক্ত। অর্থবান্ অভ্যাস,—অনুবাদ। অনুবাদে পুনরুক্ত দোষ হয় না যথা—গোতমসূত্রে :—

"অনুবাদেত্বপুনরুক্তং শব্দাভ্যাসাদর্থবিশেষোপপত্তেঃ।"

গোতম সূত্র (৫।২।১৫)

ব্যাখ্যাদির জন্য পুনঃ পুনরুল্লেখকে অনুবাদ কহে (Explanatory repetition or reference to what is already mentioned.)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সাধনতত্ত্ব বা ভক্তিতত্ত্ব।

ভজনার্থী সাধুগণের সাধ্যসাধনতত্ত্বের জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। পরমদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীল রামরায়ের দ্বারা বৈষ্ণবজগতে এই তত্ত্ব প্রকটিত করেন। সাধ্যতত্ত্ব কি, তাহার অবধিই বা কি, ইতঃপূর্ব্বে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। এখন প্রভু সাধনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

> সাধ্যবস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।
> কৃপাকরি কহ রায়, পাবার উপায়॥

সাধ্যবস্তু লাভ করিতে হইলে সাধনের আবশ্যক। বিনা সাধনে সাধ্যবস্তুর লাভ হয় না। কৃপাসিদ্ধগণের ও নিত্যসিদ্ধগণের কথা স্বতন্ত্র। মায়ার বিক্ষেপিকা শক্তিতে জীব শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া পড়েন, উহারই আবরণী শক্তির ক্রিয়ায় জীবের হৃদয়ে শ্রীভগবত্তত্ত্বের স্ফুর্ত্তি হয় না। শ্রীভগবৎসান্নিধ্য এবং তাঁহার সহিত জীবের যে নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, তৎপরিজ্ঞানের জন্য মায়ার প্রতিকূল শক্তি হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তির প্রয়াসই জীবের প্রাথমিক সাধন। প্রথমতঃ সাধনবলে বিবেক-বৈরাগ্যাদির উদয় হয়, মুক্তিই এই প্রাথমিক সাধনের ফল। বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্ম ও জ্ঞানের সাধন দ্বারা এই মুক্তি লাভ হইতে পারে। কিন্তু ভক্তির সাধন ভিন্ন ভগবত্তত্ত্বের স্ফুর্ত্তি হয় না। সাধনভক্তি দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল রামরায়কে যে সাধনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহা জীবের উচ্চতম সাধন। সাধ্যের অবধিকে লাভ করিতে হইলে সাধনেরও অবধি আবশ্যক। সুতরাং সাধনার উচ্চতম রাজ্যে অধিরূঢ়

না হইলে সেই সাধ্যলাভে অধিকার জন্মে না। শ্রীল রামরায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট সাধনার যে উচ্চতম প্রক্রিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা উচ্চতম অধিকারীরই সাধন।

ভিন্ন ভিন্ন সাধকগণ ভিন্ন ভিন্ন পথে পরমতত্ত্ব লাভের জন্য সাধন করিয়া থাকেন। কেহ কর্ম্ম, কেহ যোগ, কেহ জ্ঞান ইত্যাদি নানা প্রকারের প্রক্রিয়ায় তত্ত্ববস্তু লাভের চেষ্টা করেন। বৈষ্ণবগণের সাধন—ভক্তি। বৈষ্ণবগণের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে। সকলেই ভক্তিদেবীর অনুগত। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাধনা—প্রেমভক্তির উচ্চতম সেবাবিশেষ। সেই সাধনা কি প্রকার, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল রামরায়ের মুখে তাহাই প্রকটিত করিয়াছেন।

অধিকারিভেদেই উপাস্যতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্বের ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীল রামরায়ের সাধ্যতত্ত্ব তোমার আমার সাধ্য নহেন, তাঁহার সাধনাও আমার তোমার তোমার সাধনা হইতে পারে না। আমি তুমি বৈধিভক্তির বিন্দুমাত্র লাভ করিতে পারিলেও জীবনকে কৃতার্থ মনে করিব। রাগানুগা আমাদের অভীপ্সিত হইলেও বর্ত্তমান অবস্থায় উহা দুর্লক্ষ্য ও দুর্নিরীক্ষ্য। কিন্তু শ্রীল রামানন্দের ন্যায় উচ্চতম অধিকারিগণ বৈধীভক্তির সীমায় আবদ্ধ নহেন, তাঁহারা গোপীভাবে বিভোর, গোপীভাবের সেবানুরাগে নিয়ত প্রলুব্ধ। কিন্তু একালে সেরূপ ভক্ত অত্যন্ত সুদুর্লভ। শত কোটী ভক্তের মধ্যে একটি ভক্তেরও সেরূপ অধিকার আছে কিনা সন্দেহ।

শাস্ত্রে রাগানুগা ও রাগাত্মিকা ভক্তির প্রসঙ্গ আছে এবং ব্রজরসাস্বাদনে যে ঐরূপ ভক্তিই একমাত্র সাধন, তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি অধিকারভেদেই উপাসনাভেদ। শ্রীল রামানন্দ মহাপ্রভুর নিকট সাধ্যাবধির কথা বলিয়াছেন। সেই সাধ্যাবধি লাভ করিতে হইলে "সাধনাবধি" অবলম্বনীয়। এখানে সেই সাধনাবধিরই

উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। মাধুর্য্য ভজনের লক্ষ্য—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের আস্বাদন। ইহার সাধনা,—গোপী অনুগত হইয়া দিবানিশি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস পরিচিন্তন। তদ্ভিন্ন ব্রজরস আস্বাদনের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তাই শ্রীল রামরায় বলিয়াছেন :—

নিজে প্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণসুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥
সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুমার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাব যোগ্য দেহপাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

* * * *

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রদিনে চিন্তে রাধা কৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখী ভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ॥
গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

ব্রজসুন্দরীগণ রাগময়ী; তাঁহাদের আনুগত্যে ভজনই রাগানুগা ভক্তি-মার্গের উপাসনা। এই রাগানুগা ভক্তিই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলামৃত-

স্বাদনের সাধন। সখীগণের আনুগত্যস্বীকারব্যতীতরাগানুগাভক্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই। সখীরাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভজনের আদর্শ। গোপীভাব ভিন্ন ব্রজরস-আস্বাদনের আর দ্বিতীয় পথ নাই। এ সকল বিষয় অতঃপরে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে।

বহুবিধ শাস্ত্রে বহুপ্রকার সাধনের উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদান্ত-বর্ণিত সাধন চতুষ্টয় সর্ব্বজনবিদিত। মধুরভজনশীল বৈষ্ণবগণেরও তাহা অবিদিত নহে। ভক্তির সাধন, ভক্ত বৈষ্ণবগণের সর্ব্বদা আদরণীয়। এস্থলে সর্ব্বপ্রথমে ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুই একটি কথা সংক্ষেপ আলোচনা করা যাইতেছে।

নিখিল রসামৃত মূর্ত্তি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার ও তাঁহার সঙ্গরসা-স্বাদনের একমাত্র উপায়,—ভক্তি। শ্রীভগবান বলেন :—

ভক্তির স্বরূপ।

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" "ভক্তিলভ্যস্ত্বনন্যয়া" "সর্ব্বং মদ্ভক্তি যোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা" "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" "ভক্ত্যা মামভিজানাতি।" ইত্যাদি উক্তি শ্রীভগবদ্-গীতোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। বাসুদেব উপনিষদে লিখিত আছে :—

মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্।
স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্॥

মাঠর শ্রুতি বলেন :—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তি রেবৈনং দর্শয়তি;
ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী।"

অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া গিয়া শ্রীভগবানকে দর্শন করান, শ্রীভগবান্ ভক্তির বশ, ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন।

শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় :—

"বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠন্তি।"

অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দঘন শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দৈকরসস্বরূপ ভক্তিযোগেই অবস্থিত। আনন্দময় পরমব্রহ্ম শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার ও সম্ভোগের নিমিত্ত ভক্তিই একমাত্র সাধন।

ভক্তি কাহাকে বলে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। ব্যাকরণ বলেন "ভজ্ শ্রিঙ্ সেবায়াম্।" ভজ্ ধাতু সেবা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপিচ "ভজ বিশ্রাননে; বিশ্রাননং দানম্।" দান অর্থেও ভজধাতুর প্রয়োগ আছে। প্রথমতঃ "ভজ্ সেবায়াম্" এই ধাত্বর্থ হইতেই ভক্তি শব্দের অর্থ নিষ্কর্ষ করা যাইতেছে। নারদ পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে :—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা হৃষীকেশের সেবনই ভক্তি। এই সেবন সর্ব্ব প্রকার স্বার্থাভিসন্ধানময়-উপাধিবিবর্জ্জিত এবং শ্রীভগবৎপরায়ণতায় নির্ম্মল।

ইহার আর একটী লক্ষণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে তদ্‌যথা :—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

আনুকূল্যভাবে অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং জ্ঞানকর্ম্মাদিঅনাবৃত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। এই শ্লোকের অনুশীলন শব্দটী শীল ধাতু হইতে উৎপন্ন। শীলধাতুর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুই অর্থ আছে। প্রবৃত্ত্যর্থক শীল ধাতু কায়বাক্যমানসীয় চেষ্টারূপ। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উদ্দেশ্যে নিখিল চেষ্টাই কৃষ্ণানুশীলন। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পাদসেবন-অর্চ্চন-বন্দন-দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদন প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। ধ্যানও এই অনুশীলন শব্দের বাচ্য। ধ্যান,—নিবৃত্ত্যর্থ অনুশীলন। শ্রীপাদ রামানুজ ধ্যানকে "ধ্রুবানু-

স্মৃতি” নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং ধ্রুবানুস্মৃতিকেই ভক্তি বলিয়া সংজ্ঞা দিয়াছেন।*

এই কৃষ্ণানুশীলন শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। বৈরভাবে ও স্মরণ মননাদি হইতে পারে কিন্তু তাহা অনুকূল নহে। সুতরাং তাদৃশ স্মরণ মননাদি ভক্তিপদ বাচ্য নহে। অপিচ ইহা অন্যাভিলাষবর্জ্জিত হইবে। তদ্ব্যতীত এই অনুশীলন জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত। শ্রীজীব গোস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন এই শ্লোকের জ্ঞান শব্দটী নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান বলিয়া বুঝিতে হইবে—কিন্তু ভজনীয়ত্বের অনুসন্ধানে যে জ্ঞানের আবশ্যক সে জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কর্ম্ম, অর্থ স্মৃত্যাদি উক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম। “কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্” এই পদ দ্বারা এইরূপ কর্ম্মের বাধা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ভজনীয়ের পরিচর্য্যাদি কর্ম্ম অবশ্যই প্রয়োজনীয়—কেন না সেই সকল কর্ম্ম অনুশীলন-বিশেষ। “জ্ঞান কর্ম্মাদি” পদে যে “আদি” শব্দ আছে উহাতে বৈরাগ্য-যোগ-সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। এইরূপে ভজ্ ধাতুর সেবা অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। আবার দেহ মন প্রাণ ও আত্মা

---

* ধ্যানং চ—তৈলধারাবদবচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপম্—ধ্রুবানুস্মৃতিঃ। * * সাচ স্মৃতিঃ দর্শনসমানাকারা। * উপাসনং স্যাদ্ধ্রুবানুস্মৃতির্দর্শনান্নির্ব্বচনাচ্চ। “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনু স্বাম্।* ভগবতৈবোক্তম্ :—

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

অত স্তস্মাৎ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিস্মর্য্যমাণাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থপ্রিয়া যস্য, স এব পরেণাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পর আত্মেত্যুক্তং ভবতি। এবং-রূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে। উপাসনপর্য্যায়ত্বাদ্ভক্তিশব্দস্য। অতএব শ্রুতিস্মৃতিভিরেবমভিধীয়তে—“তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি। তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি ; নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে।—শ্রীভাষ্যে।

শ্রীভগবানের শ্রীচরণারবিন্দে সমর্পণও ভক্তির কার্য্য। সুতরাং এস্থলে ভজধাতুর দান অর্থেরও সার্থকতা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

শাণ্ডিল্য বলেন—"সা পরানুরক্তি রীশ্বরে"।

ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি। ভাষ্যকার স্বপ্নেশ্বর বলেন—"ভগবন্মহিমাদি-জ্ঞানাদনুপশ্চাজ্জায়মানত্বাদ্ অনুরক্তিবিত্যুক্তম্।" অর্থাৎ অনু—পশ্চাৎ, রক্তি—আসক্তি। শ্রীভগবানের স্বরূপ ও মহিমাদি জ্ঞানের পরে তাঁহার প্রতি যে আসক্তির উদয় হয়, তাহাই ভক্তি।

পতঞ্জলি বলেন—"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা।"

এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে লিখিত আছে "প্রণিধান" অর্থ ভক্তিবিশেষ। এতদ্দ্বারা যোগীর নিকট সেই পরমপুরুষের কৃপা আবির্ভূত হয় এবং তাঁহার বাসনা-ফল লব্ধ হয়। ভোজ বলেন প্রণিধান অর্থ তদীয় ভক্তি। এতদ্দ্বারা কৃপাকাঙ্ক্ষীর ইন্দ্রিয় ভোগবাসনাদি পরিত্যক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত হয়।

নারদ বলেন—"সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা।"

অর্থাৎ শ্রীভগবানে পরমপ্রেমই ভক্তি। এই ভক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে অধিক, যথা:—

সা তু কর্ম্মজ্ঞান-যোগেভ্যোপ্যধিকতরা।

নারদসূত্র ৪র্থ অনুবাক্ ২৬ সূত্র।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় তদীয় ভক্তিরসায়ন গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্ম্মধারাবাহিকতাং গতা।
সর্ব্বেশে মনসো বৃত্তি র্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥

ভগবদ্গুণাদিতে যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছে, তাঁহার মনোবৃত্তি যখন ভগবদ্ধর্ম্মের ধারাবাহিকতা লাভ করিয়া ভগবদ্বিষয়ে একাগ্র হয়, তখন সেই মনোবৃত্তি ভক্তিনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ইনি আরও বলেন—"সাধন ভক্তিনিষ্ঠয়া নিখিলমপি প্রেমাণং ভগবত্যেব প্রতিষ্ঠাপয়তঃ সকলবিষয়বিমুখমনসো মহাভাগস্য কস্যচিদ্ ভগবদ্গুণগরিমগ্রথনরূপগ্রন্থশ্রবণজনিত দ্রুতিরূপায়াং মনোবৃত্তৌ সর্ব্বসাধনফলভূতায়াং গৃহীতভগবদাকারতায়াং বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগেন রসরূপতয়াভিব্যক্তৌ ভগবদাকারতারূপ-রত্যাখ্য স্থায়িভাবঃ পরমানন্দ সাক্ষাৎকারাত্মকঃ প্রাদুর্ভবতি স এব ভক্তিযোগঃ ইতি তং পরমং নিরতিশয়ং পুরুষার্থং বদন্তি।" অর্থাৎ যিনি সাধনভক্তিনিষ্ঠাদ্বার নিখিলপ্রেম একমাত্র শ্রীভগবানে সংস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি সকল বিষয়-ভোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ভগবদ্গুণগরিমগ্রন্থনসূত্ররূপ গ্রন্থাদিশ্রবণে এতাদৃশ মহাভাগের হৃদয়ে গৃহীত যে সর্ব্বসাধনফলস্বরূপ ভগবদাকারপ্রতিবিম্বিত বৃত্তি প্রকাশ পায়, তাহা বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচাররূপ রসভাবের সংযোগে রসরূপে অভিব্যক্ত হইলে ভগবদাকার পরমানন্দ সাক্ষাৎকারাত্মক রত্যাখ্য যে স্থায়ীভাবের উদয় হয়, উহাই ভক্তিযোগ। পণ্ডিতগণ ইহাকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া থাকেন।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর উক্ত বাক্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে "দ্রবীভাব পূর্ব্বিকাহি মনসো ভগবদাকারতা সবিকল্পবৃত্তিরূপা—ভক্তিঃ। অর্থাৎ মনের দ্রবীভাবযুক্ত সবিকল্প বৃত্তিই ভক্তি। বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মানুসন্ধানকে ভক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। ফলতঃ ইহা সাধন ভক্তি। পরাভক্তি বা সাধ্যভক্তি—ফলরূপা।

সর্ব্বভক্তিশাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা ভক্তির একটি লক্ষণ দেখিতে পাই তদ্‌যথা :—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক কর্ম্মণাং।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকীতু যা।
অনিমিত্তা ভগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥

শ্রীভাগবত (৩।২৫।৩২)

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর টীকা অনুসারে ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে বিষয়জ্ঞাপক (গুণলিঙ্গ) ইন্দ্রিয়গণের বা তদধিষ্ঠাতৃ দেবগণের (দেবানাং) সত্ত্বমূর্ত্তি হরির প্রতি যে অনিমিত্তা ও স্বাভাবিকী বৃত্তি তাহাই ভক্তি। বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারাই ইন্দ্রিয় সকলের এরূপ বৃত্তি হয়, নচেৎ হয় না। শুদ্ধ সত্ত্ব পুরুষের পক্ষে মুক্তি অপেক্ষাও এতাদৃশী ভক্তি গরীয়সী।

শ্রীজীব গোস্বামীর ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র। তিনি এই বৃত্তিকে 'জ্ঞানবিশেষ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, যথা ঃ—"একমনসঃ পুরুষস্য যা বৃত্তিস্তদানুকুল্যাত্মকো জ্ঞানবিশেষঃ।" অনিমিত্তা,—ফলাভিসন্ধিশূন্যা। স্বাভাবিকী —স্বরসত এব বিষয়সৌন্দর্য্যোদয়ত্বেনৈব জায়মানা ;—নচ বলাদাপদ্যমানা ভাগবতী ভক্তিঃ প্রীতিরিত্যর্থঃ।" শ্রীজীব এই ভক্তিকে প্রীতিসন্দর্ভেও "প্রীতি" বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন যথা ঃ—"ইয়মেব ভগবৎপ্রীতির্ভক্তি শব্দেনাপ্যুচ্যতে—পরমেশ্বরনিষ্ঠত্বাৎ।"

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে ভক্তির সাধারণতঃ ত্রিবিধ বিভাগ * দেখিতে পাওয়া যায়—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি।

(ক) ভক্তিবিভাগ।

সাধনভক্তি, বৈধী ও রাগানুগা নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত রাগাত্মিকাভক্তিরও লক্ষণ এবং উদাহরণ উক্ত গ্রন্থে আছে। রাগাত্মিকা দুই ভাগে বিভক্ত—কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা। যাহা সম্ভোগতৃষ্ণাকেও প্রেমে পরিণত করে, তাহাই কামরূপা। এজন্য গোপীরাই

---

* নারদীয় পুরাণে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক, উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে নবধা ভক্তির ৮১ প্রকার ভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়ে মানসী, বাচিকী, কায়িকী, লৌকিকী বৈদিকী ও আধ্যাত্মিকী (যোগজা ও সাংখ্যজা) এই ছয় ভাগে ভক্তির বিভাগ দৃষ্ট হয়। কর্ম্মমিশ্র, জ্ঞানমিশ্র, আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা প্রভৃতি ভেদের কথা বহুপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের মাধুর্য্য কাদম্বিনী গ্রন্থে উৎসাহময়ী, ঘূঢ়বিকল্পা, বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গরঙ্গিণী নামে ভক্তির বিভাগ লিখিত হইয়াছে।

ইহার উদাহরণ। শ্রীগোবিন্দের প্রতি পিতৃমাতৃ প্রভৃতি ভাবই সম্বন্ধরূপা ভক্তি। রাগানুগা,—কামানুগা এবং সম্বন্ধানুগা এই দুই বিভক্ত। বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির আলোচনা অতঃপরে দ্রষ্টব্য। ভাবভক্তির লক্ষণ এই—

(খ) ভাবভক্তি।

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

শুদ্ধসত্ত্বই যাহার আত্মা, প্রেমসূর্য্যকিরণ যাহাতে প্রতিফলিত, রুচিসমূহ দ্বারা যাহা চিত্তবৃত্তিকে মসৃণ করিয়া তোলে তাহাই ভাব। ভাবই ভক্তি এই অর্থে ভাব-ভক্তি। শ্রীজীব ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সম্বিদ্ বা জ্ঞানাখ্যা বৃত্তিই শুদ্ধসত্ত্ব। এই ভক্তি হ্লাদিনী ও সম্বিদের সারসমবেতরূপ। সুতরাং ইহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিস্বরূপ। ইহা প্রেমসূর্য্যের অংশুভাক্ অর্থাৎ প্রেমের প্রথম প্রতিচ্ছবি। তন্ত্র বলেন—

প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকা স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

শ্রীজীব বলেন, ইহা শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ্যা ও হ্লাদিনীর সাররূপা সুতরাং মোক্ষ-সুখেরও তিরস্কারিণী।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎপ্রণীত সিদ্ধান্তরত্নগ্রন্থে ভক্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারসংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে—ভক্তিও জ্ঞানবিশেষ। ভক্তিও জ্ঞানত্বধর্ম্মবিশিষ্ট। বিদ্যা ও বেদন ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। এই বিদ্যাকে কেহ কেহ ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিদ্যা নিমেষশূন্য দর্শনের ন্যায় ত্বম্পদার্থানুভবস্বরূপ। বেদন—অপাঙ্গ বীক্ষণ সদৃশ। ইহারই অপর নাম ভক্তি। শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর ভক্তিরসায়নে ইহার সবিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য। বেদন—অপাঙ্গ দর্শনের ন্যায় বলিয়া শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "ভক্ত্যামামভিজানাতি।" অর্থাৎ ভক্তি দ্বারাই আমাকে বিশিষ্টরূপে জানা যায়। শ্রীধরস্বামী গীতার অন্তিম শ্লোকের ব্যাখ্যায় জ্ঞানকে ভক্তির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ বলদেব ভক্তির স্বরূপ বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভক্তি যে ভগবদ্বশীকারিণী, শ্রুতি ও স্মৃতিতে তাহার প্রমাণ আছে। এখন বিচার্য্য এই যে, ভক্তির স্বরূপ কি? উহা কি প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার জ্ঞানানন্দারূপা,—অথবা শ্রীভগবানের জ্ঞানানন্দরূপা—অথবা জৈব জ্ঞানানন্দারূপা,—অথবা হ্লাদিনী সারসমবেতসম্বিৎস্বরূপা? উহা প্রাকৃত সত্ত্বময় নহে তাহা হইলে উহা দ্বারা ভগবান্ বশীভূত হইতেন না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং পূর্ণ সুতরাং মায়াবশীভূত নহেন। দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত—কেন না শ্রুতিবাক্য এই যে শ্রীভগবান্ ভক্তের ভক্তিতে আনন্দাধিক্যানুভব করেন। দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে ভক্তের ভক্তিতে পূর্ণানন্দ ভগবানের আনন্দাধিক্য অসম্ভব হইয়া পড়ে। তৃতীয় পক্ষও অস্বীকার্য্য, যেহেতু জীবের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও ক্ষুদ্র আনন্দের ধ্বংশ আছে, উহা কখনও বিপুল জ্ঞানানন্দস্বরূপ, নিত্যভক্তি নামে অভিহিত হইতে পারে না। সুতরাং চতুর্থ পক্ষই স্বীকার্য্য —অর্থাৎ ভক্তি শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তির ও সম্বিৎশক্তির সারভাগ। ভক্তিতে যখন ভগবান্ বশীভূত হয়েন তখন অবশ্যই ভক্তির উক্ত স্বরূপ স্বীকার্য্য। ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপ-বিশেষভূত হ্লাদিনী শক্তির ও সম্বিৎ-শক্তির সাররূপা। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরে সাধকবিশেষে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের উদয় হয়, উহা হইতে ভগবদ্বিষয়িণী তৃষ্ণার সঞ্চার হইতে থাকে। এই তৃষ্ণা হইতে শ্রীভগবদ্বিষয়িণী আনুকূল্যময়ী চেষ্টার অভ্যুত্থান হয়, উহা ভক্তি। এই চেষ্টা যে শক্তি হইতে প্রকাশ পায় সেই শক্তি সাধ্যাভক্তি। সাধ্যাভক্তি শ্রীভগবানের নিত্যধামে নিত্যপরিকর-নিচয়ে অবস্থান করেন এবং মন্দাকিনী প্রবাহের ন্যায় ভক্তপরম্পরায় প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। এই ভক্তিই জীবকে ভগবৎ রাজ্যে লইয়া যান এবং শ্রীভগবানের শ্রীচরণ সন্দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করেন। তাই শ্রুতি বলেন "ভক্তিরেবৈনং নয়তি ইত্যাদি।"

(গ) প্রেমভক্তি।

সম্বিৎশক্তি ও হ্লাদিনীশক্তির সারাংশরূপা রতিপ্রেমাখ্যা ভক্তি ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর সম্বন্ধ-সঙ্ঘটনে নিযুক্ত থাকিয়া উভয়কে অনুরঞ্জিত করেন। শ্রীভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে শক্তি দ্বারা জ্ঞানবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েন এবং জীবসকলকে জ্ঞানবিশিষ্ট করেন তাহারই নাম সম্বিৎশক্তি। অপরন্তু তিনি আনন্দস্বরূপ হইয়াও স্বকীয় যে শক্তি দ্বারা আনন্দবিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েন এবং মনুষ্যদিগকে স্বীয় সাম্মুখ্য প্রদান করিয়া আনন্দিত করেন তদীয় স্বরূপভূত সেই শক্তিই হ্লাদিনীশক্তি। এই উভয় শক্তির সারাংশরূপা রতিই প্রেমভক্তি।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিত আছে—

সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাব স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

অর্থাৎ যাহা দ্বারা চিত্ত সম্যক্‌রূপে মসৃণ হয়, যাহা চিত্তকে শ্রীভগবানের প্রতি অতিশয় মমত্বযুক্ত করিয়া তোলে, এতাদৃশ ঘনীভূত ভাব প্রেম বলিয়া অভিহিত হয়। এস্থলে "সান্দ্রাত্মা" পদটী প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ। সান্দ্রত্ম-ভাব অর্থে ঘনীভূত ভাব। অপর দুইটী বিশেষণ, তটস্থ লক্ষণ। নারদ পঞ্চরাত্রেও প্রেমভক্তির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

ইহাই ভক্তির সংক্ষিপ্তস্বরূপবিচার। অতঃপরে সাধনভক্তির অঙ্গীভূত বৈধীভক্তির কথা বলা যাইতেছে।

বৈধী-ভক্তি।

বৈধী ভক্তির বিমল পথ অতীব প্রসরতর। বৈধীভক্তি ভিন্ন অনর্থ নিবৃত্তি হয় না, বৈধীভক্তি ভিন্ন চিত্ত-শুদ্ধি হয় না, বৈধী ভিন্ন রাগানুগাভক্তিমার্গে প্রবেশের অধিকার জন্মে না। এইজন্ত শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন শিক্ষায় বলিয়াছেন—

এবে সাধন-ভক্তি-লক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হইতে পাই কৃষ্ণপ্রেম-মহাধন ॥

যাহা শ্রবণাদিইন্দ্রিয়প্রেরণ দ্বারা সাধ্য এবং প্রেম যাহার ফল, তাহারই নাম সাধনভক্তি। শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা বা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করায় উদয় ॥

অর্থাৎ "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি যে নবধা ভক্তির উল্লেখ আছে এই নবধা ক্রিয়া সাধনভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। অর্থাৎ এই সকল ক্রিয়া সাধনভক্তি হইতে অভিন্ন। ইহা হইতে প্রেম উপজাত হয়, এই যে প্রেমের উপজনন কার্য্য, ইহাই সাধন ভক্তির তটস্থ লক্ষণ। প্রেমের উপ-জনন-ক্রিয়া সাধন ভক্তি হইতে ভিন্ন হইয়াও সাধন ভক্তির বোধক। কেননা "তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং তটস্থ লক্ষণত্বম্" অর্থাৎ তাহা হইতে ভিন্ন হইয়াও যাহা তদ্বোধক তাহাই তটস্থ লক্ষণ।

এখানে প্রেমের উপজনন বা "সাধ্যভাব" বলাতে আর একটী দোষের আশঙ্কা হইতেছে। সে আশঙ্কা এই যে কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ, ইহা সাধ্য নহে। যাহা সাধ্য তাহা জন্য, যাহা জন্য, তাহা প্রাগভাবযুক্ত। যাহা প্রাগভাবযুক্ত তাহা নিত্যত্বের লক্ষণহীন। কেননা "ধ্বংসপ্রাগভাবরহিতত্বং নিত্যত্বম্" অর্থাৎ ধ্বংস ও পূর্ব্বভাব রহিতত্বই নিত্যত্বের লক্ষণ। যদি কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য বা উপজাত হয়েন তবে তাহা অনিত্য হইয়া পড়েন। সুতরাং ইহার অর্থ অন্যপ্রকার। তাই পূজ্যপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন,

"নিত্যসিদ্ধস্থ ভাবস্থ প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।

অর্থাৎ হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধভাবের যে প্রকাশ-প্রাপ্তি, তাহাই এস্থলে সাধ্যতা শব্দের তাৎপর্য্য। কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ, জীব হৃদয়ে নিত্যই উহার অধিষ্ঠান; কিন্তু মায়ামলিন জীব মায়ার আবরণ বশতঃ উহার অনুভবে অসমর্থ। সাধন-ভক্তির প্রভাবে মায়ার আবরণ তিরোহিত হইলেই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়া থাকে। তাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহার শিক্ষাষ্টকে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—

"চেতোদর্পণ-মার্জ্জনম্"

অর্থাৎ চিত্তরূপ দর্পণে সততই কৃষ্ণপ্রেম প্রতিফলিত, কিন্তু মায়ার মলিনতাবরণে উহা দুর্দ্দর্শ ও অননুভবনীয়। গীতাতেও তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশ এই যে—

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেনচ।

অর্থাৎ ধূমের দ্বারা যেমন বহ্নি আবৃত হয়, মল দ্বারা যেমন আদর্শের স্বচ্ছতা বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অজ্ঞান দ্বারা জীবগণ মোহিত হইয়া পড়ে। চিত্তরূপদর্পণে কৃষ্ণপ্রেম সততই প্রতিবিম্বিত, কিন্তু মলিনতা নিবন্ধন আমরা উহার অনুভব করিতে পারি না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ এই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনরূপা সাধন ভক্তির দ্বারা চিত্তের মলিনতা অপহৃত হয়, তখন পরিস্কৃত চিত্তদর্পণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম স্বতঃই প্রকটিত হইয়া থাকেন।

এই সাধনভক্তি,—বৈধীও রাগানুগাভেদে দুই প্রকার, যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে :—

বৈধীরাগানুগাচেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।

শ্রীকৃষ্ণানুরাগ অতি সুদুর্ল্লভ। সুতরাং বৈধী ভক্তির বিমল পথই প্রাথমিক সাধকগণের পক্ষে প্রসরতর। এই নিমিত্ত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ এই যে-

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥
অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক, অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

শাস্ত্র এই যে—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ সঙ্গাদ্ যথা পুংসো তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গ এবং তাহার সঙ্গিসঙ্গ এই উভয়, পুরুষের যাদৃশ মোহ এবং বন্ধনের কারণ হয়, অন্য প্রসঙ্গ হইতে সেরূপ হয় না। সুতরাং যাঁহারা কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে সমুৎসুক, এই সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে। নচেৎ ভজন-সাধনে বহুল বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, মায়ার প্রভাব শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়।

রাগানুগা ও রাগাত্মিকা ভক্তি বহুজন্মের সাধনা-লভ্য। বৈধীভক্তি কি পরিমাণে অনুশীলিত হইয়াছে, বৈধীভক্তিতে চিত্তবৃত্তি কি পরিমাণে বিশুদ্ধ হইয়াছে, সাধকের আগে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মরাজ্যে ক্রম আছে। ক্রম-লঙ্ঘনে ধর্ম্ম হয় না, অপর পক্ষে প্রত্যুত প্রত্যবায় ঘটে। যে কুঞ্জ-সেবা সখীদের অধিকার, যাহা সিদ্ধদেহের লভ্য, সেখানে প্রবেশের চেষ্টা করিতে হইলে উচ্চতম সাধকের উচ্চতম কল্পনাময় বাসনাময় সিদ্ধ দেহের বিশুদ্ধ বিকল্পন প্রয়োজনীয়। সেখানে মায়ার ক্রীড়নক ইন্দ্রিয়াসক্ত সংসারের ক্ষুদ্র জীব কি প্রকারে সহসা প্রবেশ করিতে পারিবে? তাদৃশ প্রেমলাভ করিতে হইলে সাধন ভক্তির প্রথমাঙ্গ বৈধীভক্তির অনুষ্ঠান আবশ্যক। "বৈধীভক্তি বিবিধ প্রকার। শ্রীচরিতামৃতে সনাতনের শিক্ষায়, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্বভাগের দ্বিতীয় লহরীতে এবং শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে বৈধীভক্তির উপদেশ যথেষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। বৈধীভক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিতে অসমর্থ হইলেও বৈধীভক্তিই

রাগানুগার সাধন। বৈধীভক্তির কৃপায় চিত্ত বিষয়বিমুক্ত হয়, রাগানুগা-ভক্তি ধারণের উপযুক্ত হয়। সুতরাং বৈধীই সাধন-ভক্তির প্রথম অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীল রামরায় মহাশয়ের কথিত সাধনতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি রায় মহাশয়ের ন্যায় সাধনতত্ত্বের অধিকারী জগতে অতি সুদুর্ল্লভ। বিশেষতঃ তাঁহার সাধনায় অতি অপ্রাকৃত আচরণের উল্লেখ আছে। স্বয়ং মহাপ্রভু বলিয়াছেন শ্রীল রামরায় ভিন্ন তদ্বৎ আচরণের আর দ্বিতীয় পাত্র নাই। এ সকল কথা পরে সবিস্তাররূপে বলা যাইবে। যাঁহারা ব্রজভজনের মধুর রাজ্যে প্রবেশ করিবার সাধনার পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে সর্ব্ব প্রথমে বৈধীভক্তির নিষেবণে চিত্ত-শুদ্ধির প্রয়োজন। শ্রবণাদি দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে উহা কৃষ্ণপ্রেমের উপযোগিতা লাভ করে। সুতরাং বৈধীভক্তি রাগানুগা ভক্তির সাধন। আমাদের মত নরাধমদের বৈধীভক্তিই একমাত্র আশ্রয়। অতএব উচ্চ-তম সাধনতত্ত্বের শাস্ত্রীয় ছায়াভাস প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে বৈধীভক্তির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বৈধীভক্তির যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে তাহা এই যে—

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধীভক্তি রুচ্যতে॥

শ্রীভগবানে রুচি উৎপন্ন হয় নাই অথচ শাস্ত্রশাসনভয়ে ভগবৎসেবায় যে প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহারই নাম বৈধীভক্তি। আমাদের দৃষ্টি অতি স্থূল, এই স্থূলতম প্রপঞ্চের মায়াবরণীর মধ্য দিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প স্থূল বিষয়ও আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না। সাধারণতঃ জড়ীয় বিজ্ঞান যে শক্তির সপ্রমাণ করে, তাহাও আমাদের বুদ্ধির অতীত। সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম জগতের তত্ত্বনিবহের বহু বহু অন্তরালে জড়ীয় শক্তির অতীত,—

গুণময়ী মায়ার অতীত,—গুণাতীত ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। ব্রহ্মজ্ঞানের বহুপরে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয়। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হইলে আদৌ শ্রীভগবানে রুচি হয় না।

আমি স্থূলতম জগতের মায়াবিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রতম কীট। শ্রীভগবানে অনুরাগ বা রাগানুগাভক্তি আমাতে সম্ভাবিত হইতে পারে কি? কৃপাসিদ্ধগণের কথা বলিতেছি না, জন্মজন্মার্জ্জিত সঞ্চিতসাধনায় ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর মহাত্মগণের কথাও বলিতেছি না, আমাদের স্থায় সাংসারিক লোকের কথাই বলিতেছি। শ্রীভগবানের সম্বন্ধে আমাদের এখন কোনও প্রতীতি নাই। আমরা শাস্ত্রে শ্রীভগবানের ধ্যান পাঠ করি, মাহাত্ম্য পাঠ করি, লীলা পাঠ করি, চিত্রপটে, বা দারুময়ী বা মৃন্ময়ী প্রতি-মায় তাঁহার রূপের যৎকিঞ্চিৎ ছায়ালেশাভাস প্রাপ্ত হই, কিন্তু তাহাতে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের কোনও ধারণা জন্মে না।

তিনি যে আমাদের আপনার হইতে আপনার, তিনি যে আমাদের চিরসুহৃদ্, তিনি যে প্রেমলীলার নায়ক, তিনি যে রাসবিহারী রসিক-শেখর, ইহার কিছুমাত্র প্রকৃত ধারণা আমাদের চিত্তে উদিত হয় না। সেরূপ সৌভাগ্য লাভ করা বহু সাধনা ও ভাগবতী কৃপার ফল। নিজের চিত্তের সহিত প্রতারণা করা ভাল নহে, উহারই অপর নাম ধর্ম্মধ্বজিত্ব। যাঁহাদের চিত্ত মায়ার অতীত হইয়া ভক্তিপুষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাই ব্রহ্মতত্ত্বের অতীত ভগবত্তত্ত্বের ধারণায় সমর্থ হইতে পারেন, তাঁহারা রাগানুগাসেবার অধিকারী হইতে পারেন। আমরা তাঁহাদের চরণরেণুর কণামাত্র পাইয়াও জীবন কৃতার্থ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি, কিন্তু তাদৃশ ভক্ত একান্ত সুদুর্ল্লভ।

বৈধীভক্তির অভ্যাসে ও সাধনায় চিত্তবৃত্তি ক্রমশঃ জড়ীয় ভাব ত্যাগ করে, তাদৃশী চিত্তবৃত্তির নিকট মায়ার গাঢ় আবরণের গাঢ়তা ক্রমেই ক্ষীণ-তর হইতে থাকে। অবশেষে রাগানুগা ভক্তিলাভের জন্য চিত্তভূমি প্রস্তুত হইয়া উঠে। এই সময়েই রাগানুগা ভক্তিদেবীর কৃপার উপযুক্ত

সময়। চিত্তের এরূপ অবস্থা না হইলে মিছামিছি আত্মপ্রতারণা করা সুসঙ্গত নহে, বৈধীভক্তির দ্বারা চিত্ত সংযম ও চিত্ত-শুদ্ধির চেষ্টা করাই একান্ত কর্ত্তব্য। বিধি সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ বলেন—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বেবিধিনিষেধাঃ স্যু রেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

অর্থাৎ সর্ব্বদা বিষ্ণুর স্মরণ করিবে, কখনও বিস্মৃত হইবে না। ইহাই মুখ্য বিধি-নিষেধ। শাস্ত্রীয় অন্যান্য বিধি-নিষেধ ইহারই কিঙ্কর। পঞ্চরাত্রে বৈধীভক্তির আর একটী লক্ষণের উল্লেখ আছে তদ্‌যথা :—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃপরা ভবেৎ॥

পঞ্চরাত্রে বৈধীভক্তি প্রকরণে এই বচন উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, হে দেবর্ষে, হরির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই বৈধী ভক্তি, এই ভক্তির সাধনাতেই পরাভক্তি বা প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

হিন্দুশাস্ত্রের গ্রন্থাদির পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় শাস্ত্র-কারগণ ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে কোন প্রকার উপদেশ দিবার পূর্ব্বে ইহার অধিকারিনির্ণয় সম্বন্ধেই অগ্রে উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপ অধিকারি-বিনির্ণয় না করিয়া ধর্ম্মোপদেশে যে কি কি কুফল উৎপাদিত হয়, প্রজ্ঞাবান্ আচার্য্যগণের নিকট তাহা অবিদিত নহে। আমরা বহুস্থলে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং অধিকারি-নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখানে সেই সকল কথার পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

পরম পূজ্যপাদ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামি মহোদয় তদীয় শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বৈধীভক্তির ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে উপদেশ করার পূর্ব্বে ইহার অধিকারি-নির্ণয় করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। তদ্‌যথা :—

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেনে জাতশ্রদ্ধোহস্য সেবনে।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্য্যসৌ ॥

অর্থাৎ অতি ভাগ্যবশাৎ (মহৎ সঙ্গাদিজাতসংস্কারবশাৎ) শ্রীকৃষ্ণ-সেবনে যাঁহার শ্রদ্ধা উপজাত হইয়াছে, অথচ বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে নাই এবং শ্রীকৃষ্ণেও আসক্তি জন্মে নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিই বৈধী ভক্তিতে অধিকারী। এই অধিকারী উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে তিন প্রকার। উত্তম অধিকারীর লক্ষণ এই—

শাস্ত্রে যুক্তৌচ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোহধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥

শাস্ত্র যুক্তিতে যিনি প্রবীণ, যিনি সর্ব্বপ্রকারে দৃঢ় নিশ্চয়, যিনি প্রৌঢ়শ্রদ্ধ, তিনিই উত্তম অধিকারী। যাঁহারা বৈধীভক্তিমার্গাবলম্বী, শাস্ত্র-শাসনই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সেবনে প্রবৃত্তির কারণ। শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি এই যে—

সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্রই প্রমাণ।
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান ॥

সুতরাং শাস্ত্রার্থে দৃঢ়বিশ্বাসিত্বই উত্তম অধিকারীর লক্ষণ। "সর্ব্বথাদৃঢ় নিশ্চয়" শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহাশয় বলেন তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার ও পুরুষার্থ বিচারে শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র উপাস্য, এই বিষয়ে যিনি দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছেন তিনিই উত্তম ভক্ত। এস্থলে যে যুক্তির উল্লেখ আছে উহা শাস্ত্রানুগতা যুক্তি বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কেবলা যুক্তির কোন প্রকার প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রুতি বলেন "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" অর্থাৎ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। এই তর্ক বেদবিরোধী তর্ক বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কেবলা যুক্তির প্রতিষ্ঠা নাই। কিন্তু বেদবিহিত যুক্তির প্রতিষ্ঠা আছে। মনু বলেন—

আর্ষধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্ম বেদ নেতরঃ ॥

অর্থাৎ বেদশাস্ত্রাবিরোধি তর্ক দ্বারা যে ধর্ম্ম সিদ্ধান্তিত হয় তাহাই ধর্ম্ম, তদিতর, ধর্ম্ম নহে। বৃহস্পতি বলেন—

যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।

অর্থাৎ যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়।

এইজন্যই নিখিলশাস্ত্রসারভূত শ্রীবৈষ্ণবশাস্ত্রের আচার্য্য প্রবর বলিয়াছেন :—

"শাস্ত্রে যুক্তৌচ নিপুণঃ।"

যিনি উত্তম অধিকারী, তিনি শাস্ত্রেতে ও যুক্তিতে প্রবীণ হইবেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম যে যুক্তির দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, পাঠক এই বচনেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু শাস্ত্রবাক্য—আপ্ত বাক্য—পরিত্যাগে ব্যক্তি-বিশেষের উৎপ্রেক্ষামাত্রজাত তর্কের আদৌ আদর নাই। তাই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও বেদান্ত-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"নিরাগমাঃ তর্কাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাঃ তর্কাঃ অপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি। পুরুষোৎপ্রেক্ষায়াঃ নিরঙ্কুশত্বাৎ।"

অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্রহীন পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধন তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। কেননা ব্যক্তিবিশেষের উৎপেক্ষা উৎশৃঙ্খল। পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় এই যুক্তি বা তর্কের ব্যাখ্যার্থে বৈষ্ণব তন্ত্রের একটী উত্তম প্রমাণ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্‌যথা :—

পূর্ব্বাপরানুরোধেন কোঽন্বর্থোঽর্থোভিমতোভবেৎ।
ইত্যাদ্যমূহনং তর্ক শুষ্কতর্কন্তু বর্জ্জয়েৎ॥

অর্থাৎ শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর আলোচনা দ্বারা কোন্ অর্থ অভিমত, কোন্ অর্থ অভিমত নহে এতৎ সম্বন্ধে উহকেই তর্ক বলা হয়, কিন্তু শুষ্ক তর্ক সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। গোতমও ন্যায়দর্শনে এই প্রকার লক্ষণবিশেষযুক্ত উহকেই তর্ক বলিয়াছেন যথা :—

অবিজ্ঞাত তত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিত তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ।

অর্থাৎ অবিজ্ঞাততত্ত্ববিষয়সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত কারণ-প্রদর্শন সহকারে যে জিজ্ঞাসা, তাহারই নাম তর্ক।

লোকে তর্ক বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, এ তর্ক বা যুক্তি সেরূপ নহে। ফলতঃ শাস্ত্র ও যুক্তির দৃঢ় ভিত্তিতে যে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে বিশ্বাস আদৌ বিশ্বাসই নহে। তাহা আজ আছে, হয়ত দুই দিন পরে চলিয়া যাইবে। শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাস করিতে হইবে, এবং তত্ত্ববিচার সাধনবিচার ও পুরুষার্থবিচার দ্বারা বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করিতে হইবে। যিনি এই ভাবে শাস্ত্রযুক্তি প্রভৃতির দৃঢ় ভূমিতে বিশ্বাসকে সংস্থাপিত করিয়া কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাদৃশ প্রৌঢ়শ্রদ্ধ ব্যক্তিই উত্তম অধিকারী। মধ্যমাধিকারীর লক্ষণ এই যে :—

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।

যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ অথচ শ্রদ্ধাবান্ তিনিই মধ্যমাধিকারী। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন অনিপুণ শব্দের অর্থ নিপুণসদৃশ। শাস্ত্রীয় বিচার সময়ে বলবতী বাধা উপস্থিত হইলে শাস্ত্র যুক্তিতে উহার সমর্থন করিতে অসমর্থ হইলেও যাঁহার বিশ্বাস ভূমি বিকম্পিত না হয়, তিনিই মধ্যমাধিকারী। কনিষ্ঠাধিকারীর লক্ষণ এই যে

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে

যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রসম্মত যুক্তিতে অনিপুণ, বিরুদ্ধমতবাদীরা শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা সহজেই যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন, তিনিই কোমল-শ্রদ্ধ। বৈধীভক্তির অধিকারিবিনির্ণয় সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল ইহা অপেক্ষাও অধিকতর উদার, অধিকারিত্ব-বিনির্ণায়ক বচন প্রমাণ শ্রীশ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধুকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা কারিকা :—

শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা।
সর্ব্বাধিকারিতা মাঘস্নানস্য ব্রুবতা যতঃ॥
দৃষ্টান্তিতা বশিষ্ঠেন হরিভক্তির্নৃপং প্রতি।

ফলতঃ ভক্তি সম্বন্ধে বর্ণবিশিষ্টতা কিছুই নাই। ভক্তি-বিষয়ে মানুষ মাত্রেরই অধিকার আছে। শাস্ত্রে ইহার স্পষ্ট আদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব মহারাজ দিলীপকে হরিভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছেন মাঘ-স্নানে যেমন সকল বর্ণেরই অধিকার আছে, হরিভক্তি-তেও তেমন সকল বর্ণেরই অধিকার আছে। পদ্মপুরাণ বলেন—

সর্ব্বেঽধিকারিণো হ্যত্র হরিভক্তৌ যথানৃপ।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে :—

অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রেশঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংভুবঃ॥

ময়ূরধ্বজপ্রদেশে অন্ত্যজ জাতিও বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া যাজ্ঞিকের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন। এতৎদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে মনুষ্য মাত্রই বৈধীভক্তি বিষয়ে অধিকারী।

বৈধীভক্তি অনুশীলনের জন্য শাস্ত্রকারগণ ইহার বহু অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধানতঃ ৬৪ অঙ্গই সবিশেষরূপে গণিত হইয়াছে।

বৈধী-ভক্তির ৬৪ অঙ্গ।

ভক্ত্যঙ্গযাজী বৈষ্ণবগণের বৈধীভক্তির সাধন পারিপাট্য কি মহৎ ফলপ্রদ, চিন্তাশীলপাঠকগণ ভক্তির ৬৪ অঙ্গ আলোচনা করিলে তাহার আভাস পাইতে পারিবেন। এস্থলে আমরা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে ভক্তি-অঙ্গের উল্লেখ করিতেছি। তদ্‌যথা :—

গুরুপদাশ্রয় (১) স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্। (২) বিশ্রম্ভেন গুরোঃসেবা (৩) সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্। (৪)। সদ্ধর্ম্ম পৃচ্ছা (৫) ভোগাদিত্যাগশ্চ কৃষ্ণহেতবে (৬)। নিবাসো দ্বারকাদৌচ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ (৭)॥ ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা (৮)। হরিবাসরসম্মানো (৯) ধাত্র্যশ্বথাদি গৌরবম্ (১০) এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা॥ এই দশটি দশাঙ্গ নামে খ্যাত। ক্রমনিয়মে ভক্তির সাধন প্রয়োজন।

একত্র অনেক বিষয়ের অনুশীলনে কোনটীই অনুশীলিত বা অভ্যস্ত হয় না। সুতরাং এই দশটীকেই শাস্ত্রকার প্রারম্ভরূপ অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

ইহার সর্ব্বপ্রথমেই গুরুপদাশ্রয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই দৃশ্য জগতের অতি সামান্য বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইলেই যখন গুরুপদাশ্রয় ভিন্ন তৎজ্ঞানলাভের উপায়ান্তর নাই, এই অবস্থায় অতীন্দ্রিয় অপার্থিব সচ্চিদানন্দময় তত্ত্বের সাধনভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইলে গুরুপদাশ্রয় কীদৃশ প্রয়োজন, তাহা অতি সহজেই বুঝা যাইতে পারে। যিনি রসায়ন-বিজ্ঞানে লব্ধবিদ্য, কৃতকর্ম্মা, সুতরাং সুসিদ্ধ, রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অভীপ্সিত ফললাভ করিতে হইলে তাহার প্রক্রিয়াগুলি তিনিই অপরকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, অপরে পারিবে কেন? অতএব গুরুপদাশ্রয় অতি প্রয়োজনীয়। গুরুর লক্ষণ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সদ্‌গুরুর নিকট কৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। "তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্‌" এই কথার ব্যাখ্যায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন "কৃষ্ণ দীক্ষাদীতি দীক্ষাপূর্ব্বক শিক্ষণমিতি।" কিন্তু ভক্তিসন্দর্ভে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর যথেষ্ট পার্থক্য-বিচার পরিলক্ষিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রথমেই এই দুই প্রকার গুরুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট গুরুপদা-শ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ হইলে বহু গুরুর প্রয়োজন অপ্রাসঙ্গিক হইয়া উঠে। কেননা, সদ্‌গুরুর পদাশ্রয়ই শাস্ত্রাভিমত। যিনি দীক্ষাগুরু হইবেন, তাঁহার শিক্ষা দিবার সামর্থ্য নাই এ আশঙ্কা মনে উদিত হইলে সেই গুরুর গৌরব-হানিরূপ অপরাধে লিপ্ত হইতে হয়। তবে ব্যাবহারিক জগতে শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গুরুর শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয় ইহা স্বীকার্য্য। শ্রীবিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি বেশ্যাকেও গুরু বলিয়া তাঁহার জয়জয়কার করিলেন, শ্রীপাদ সোমগিরি তদীয় দীক্ষাগুরু বলিয়া স্বীকৃত;

এতদ্ব্যতীত শিখিপিঞ্ছমৌলি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তিনি শিক্ষাগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ভক্তিসন্দর্ভে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ফলতঃ অবস্থাভেদেই এইরূপ ব্যবস্থা প্রকল্পিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সর্ব্বতোমুখী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এখানে প্রসঙ্গবিরুদ্ধ বলিয়া এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা হইল না।

তৃতীয় অঙ্গ—বিশ্বাস সহকারে গুরুসেবা। গুরুর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা অতি প্রয়োজনীয়। যিনি আমাদের অতীন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষ-গোচর সূক্ষ্মতম তত্ত্বের উপদেশ করেন, সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তাঁহার সেবা ও তাহার উপদেশ বিশ্বাস না করিলে কখনও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে না।

চতুর্থ অঙ্গ—সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন। এই পদের সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর ব্যাখ্যা এই যে "সদাচরিতশ্রুত্যাদিবিধিসেবিত্বম্" অর্থাৎ সাধুব্যক্তির আচরিত শ্রুতিস্মৃতিপ্রণোদিত বিধিসমূহের অনুশীলন ও ব্যাবহারিক ভাবে তৎসকলের অনুষ্ঠান। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই সদাচারের বহুল নিয়ম লিখিত আছে। সদচার দ্বারা জীবনের কার্য্যাবলী নিয়মিত না হইলে, হৃদয়ে ভক্তিদেবীর পদার্পণ ত দূরের কথা, তাদৃশ হৃদয়ে পবিত্রতার সঞ্চারও অসম্ভব। ব্রহ্মযামল হইতে ইহার যে প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা এই :—

শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
আত্যন্তিকী হরের্ভক্তি রুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥
ভক্তিরৈকান্তিকীবেয় মবিচারাৎ প্রতীয়তে।
বস্তুতস্তু তথানৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে॥

অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ ও পঞ্চরাত্রি প্রভৃতি শাস্ত্রে যেসকল বিধিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল বিধির অনাদরে যদি আত্যন্তিকী হরিভক্তি অনুষ্ঠিত হয় তাহা উৎপাতের কারণই হইয়া উঠে, তাহাতে আত্মার হিতসাধিত

হয় না। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী ইহার টীকায় লিখিয়াছেন উক্ত বচনে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে বৈষ্ণবাধিকারের বিধিই মানিয়া চলিতে হইবে। শাক্ত সৌর প্রভৃতির জন্য সবিশেষ নির্দ্দিষ্ট বিধি বৈষ্ণবের আচরণীয় নহে। শাস্ত্রীয় বিধির অবজ্ঞায় ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় অসম্ভব। যদিও বৌদ্ধ দত্তাত্রেয়দিগের মধ্যে এক প্রকার আত্যন্তিক ভক্তির ভাব দৃষ্ট হয়, উহা অলীক প্রতীতি মাত্র। ধর্ম্ম, শাস্ত্রবিধিপ্রভব। ন্যায় এই যে ঃ—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।" শাস্ত্রের অবজ্ঞায় ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ আদৌ অসম্ভব। যদিও শাস্ত্রে বুদ্ধাদির অবতারত্বের উল্লেখ আছে, উক্ত অবতার কেবল অসুর-বিমোহনের জন্য। এইরূপ অবতারে শুদ্ধভক্তির শিক্ষা প্রচারিত হয় নাই।

পঞ্চম অঙ্গ—সদ্ধর্ম্ম পৃচ্ছা অর্থাৎ সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা। ভজননিরত সাধু-সজ্জন কি প্রকার সাধন পথের অনুসরণ করিয়া ভজন-সাফল্য লাভ করেন, কি প্রকারে জীবের সদ্গতি হইতে পারে এই সকল তত্ত্ব জানিবার জন্য মানুষের মতি যখন আগ্রহশালিনী হয় তখন দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই তাঁহার সর্ব্বার্থ পূরণ করেন। যীশুরও এইরূপ উপদেশ আছে তদ্‌যথা—

Blessed are they who do hunger and thirst after righteousness for they shall be filled. খ্রীষ্টানেরা ধর্ম্মনীতির যে সকল সামান্য সামান্য উপদেশ সারধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বনের প্রারম্ভেই তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিকতর মূল্যবান্ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যীশুখৃষ্টের অভিপ্রায় অনুসারে যেরূপ চরিত্র লাভ করিলে মানুষের চরম পুরুষার্থ লাভ হয়, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাথমিক সাধককেই সেইরূপ চরিত্রবান্ হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিতে হয়। যীশুখৃষ্টের উপদেশ এই যে—

1 Blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven.

2 Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.

(১) অর্থাৎ দীনাত্মগণ ধন্য, যেহেতু স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই। আমেরিকা নিবাসী মিঃ ব্লেয়ার এই উপদেশের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মর্ম্মানুবাদ এই যে যাঁহারা পার্থিব বিষয় হইতে মন ও হৃদয়কে অপহৃত করিয়া ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত করেন, তাঁহারা জগতের সমাজে দীনাতিদীন হইলেও তাঁহারাই অন্তঃসুখ ও অন্তরারাম।

তাঁহারা প্রচুর ধনের অধিকারী হইলেও রাজর্ষি জনকের ন্যায় তাঁহাদের চিত্ত ধনমদে মূর্চ্ছিত হয় না তাঁহাদের ধনদ্বারা জগতের বহুল সাধুকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

(২) নিরীহ বিনয়ী মৃদু প্রকৃতির লোকেরাই ধন্য, কেননা তাঁহারাই জগতের অধিকারী হইবেন।

খৃষ্টধর্ম্মে এই সকল উপদেশ ব্যক্তিবিশেষে মূর্ত্তিমন্তাবে প্রকটিত হইয়াছে কি না, তাহা আমাদের অবিদিত। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম এতাদৃশ দীনতার অবতারগণের আবির্ভাবে এখনও সমুজ্জল। কিন্তু যাঁহারা অপরা-পর ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই আমরা এই উপদেশের ভীষণ লঙ্ঘন ব্যতীত প্রতিপালনের লেশাভাসও দেখিতে পাই না।

যাহা হউক, সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছার জন্য শ্রীপাদ সনাতন কি প্রকার ব্যাকুল ভাবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তাহার এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় তদ্‌যথা :—

তবে সনাতন প্রভুর চরণ ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লৈঞা॥
নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়ে কূপে পড়ি গোঁয়াইনু জনম॥

আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপনার কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
"কে আমি? আমারে কেন জারে তাপত্রয়।"
ইহা নাহি জানিনে কেমনে হিত হয়॥
সাধ্যসাধন তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি সারতত্ত্ব কহত আপনি॥

ইহারই নাম সৎধর্ম্মপৃচ্ছা। বাইবেলের মধ্যে ইহারই নাম Hunger and thirst after righteousness, যাঁহারা ধর্ম্মের বুভুক্ষু ও পিপাসু তাঁহাদের সেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পূর্ণ হইবে ইহাই যীশুর উপদেশ। শ্রীপাদ সনাতনের সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছার প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নারদীয় পুরাণের বাক্য উল্লেখ করিয়া বলিলেন :—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষা মভীপ্সিতঃ॥

সদ্ধর্ম্মের জ্ঞানলাভের জন্য যাঁদাদের মতি আগ্রহশালিনী হয় তাহাদিগের অভিলষিত অর্থ অচিরেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

৬ষ্ঠ উপদেশ—কৃষ্ণের নিমিত্ত ভোগাদিত্যাগ। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে :—

শ্রদ্ধাহমৃত কথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম।
পরিনিষ্ঠাচ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষঙ্গচেষ্টাচ বচসা মদ্গুণেরণম্।
মর্য্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্॥

মদর্থেঽর্থ পরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যানামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্‌।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থো বিশিষ্যতে॥

শ্রীভাগবত (১১।১৯।২০—২৪)।

এই সারগর্ভ ছত্রনিচয়ের পঞ্চম ছত্রেও আমরা শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত ভোগাদি ত্যাগের উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি। আধুনিক লোকদের নিকট এই উপদেশটী কি প্রকার প্রতীত হইবে আমরা তাহা বলিতে পারি না। হয়তো অনেকেই মনে করিবেন ধর্ম্মের সঙ্গে আবার ভোগাদি-ত্যাগের সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ বোধ হয় খুবই আছে। যদি তাহা না থাকিত, তবে সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তদিগের চিত্তবিক্ষিপ্তির কথা উল্লেখ করিতেন না যথা ঃ—

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌।
ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

বৈরাগীদের প্রতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ এই যে

বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্য সিদ্ধি নহে, কৃষ্ণে করয়ে উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, হয় আর রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাকপত্র-ফলমূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতিউতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়

শ্রীমদ্ রঘুনাথের ব্যবহারে বৈরাগ্যের পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রসঙ্গ-চ্ছলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই সকল উপদেশের অবতারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বয়ং রঘুনাথ যখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট সদ্ধর্ম্মজিজ্ঞাসার জন্য ব্যাকুল ভাবে উপস্থিত হইলেন প্রভু তাঁহাকেও তখন দৃঢ় করার জন্য এই উপদেশই প্রদান করিয়াছিলেন যথা :—

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পড়িবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

আমরা অবতারবাদী বৈষ্ণব। সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর উপদেশ শত শত বিধি অপেক্ষাও আমাদের নিকট বলবান্। কিন্তু এই সকল বিধি যে গভীর শাস্ত্রযুক্তিমূলা, তাহা সপ্রমাণ করা বড় কঠোর বিষয় নহে। সাধকগণের নিকট শাস্ত্রাজ্ঞাই বলবতী, সুতরাং এখানে এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের প্রমাণ করার জন্য যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন।

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তচিত্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানে কখনও অগ্রসর হইতে পারে না।

৭ম অঙ্গ—দ্বারকা ও গঙ্গাদি সমীপে বাস।

শাস্ত্রে লিখিত আছে "নহি বস্তুশক্তিস্তর্কমপেক্ষতে।" অর্থাৎ বস্তু শক্তি তর্ককে অপেক্ষা করে না। সুতরাং তীর্থাদিতে ও গঙ্গা সমীপে বাস করিলে যে ভজন-সাধনের আনুকূল্য হয় তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলক।

৮ম অঙ্গ—যাবদার্থানুবর্ত্তিতা। সকল প্রকার ব্যবহারেই যে সকল নিয়ম নির্ব্বিবাদে প্রতিদিন চলিতে পারে সেই প্রকার নিয়মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। নারদীয় পুরাণ বলেন :—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥

অর্থাৎ যাদৃশ নিয়ম অনুষ্ঠান করিলে স্ব স্ব ভক্তি নির্ব্বাহ হইতে পারে, অর্থজ্ঞব্যক্তি সেই পরিমাণ নিয়মই স্বীকার করিবেন, কারণ নিয়মের আধিক্য বা ন্যূনতা ঘটিলে পরমার্থভ্রষ্ট হইতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জপ পূজা প্রভৃতি সম্বন্ধে একদিন খুব বেশী ঘটা করিয়া করা হইল, পরদিন হয়ত আর সেরূপ করিতে ইচ্ছা হইল না, অথবা সাংসারিক কোন কার্য্যভারে আর সময় রহিল না সুতরাং পূর্ব্ব নিয়মের ভঙ্গ করিয়া কোন প্রকারে দায়সারা কাজের ন্যায় জপ বা পূজাদি সম্পন্ন করা হইল। এইরূপ নিয়মের ব্যভিচারে নিষ্ঠা বিনষ্ট হয়, চিত্তের দৃঢ়তা থাকে না, ভগবৎ সেবাদির প্রতি অনাদর উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে করিতে হইবে। একদিন চিত্তের আবেগে সহস্রবার জপ করিলাম, আর একদিন অষ্টোত্তর শতবার জপ করারও হয়ত সময় হইল না, এরূপ অনিয়ম অশাস্ত্রীয় ও ভজনের প্রতিকূল। যে পরিমাণ নিয়ম করিতে হইবে, প্রতিদিন একাগ্রভাবে ঠিক সেই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। ইহাতে চিত্তের একাগ্রতা ও দৃঢ়তা বর্দ্ধিত হয়, ভক্তি-অনুষ্ঠানের সম্মান সংরক্ষিত হয়। ভজনাদর্শ দাস গোস্বামী মহোদয়ের নিয়মের কথা স্মরণ করুন—

"রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।"

ব্রহ্ম হরিদাস বৃদ্ধ হইয়াও সংখ্যাজপের ন্যূনতা করেন নাই। তাদৃশ সিদ্ধ পুরুষও শাস্ত্রীয় নিয়মের বাধ্য ছিলেন। এমন কি যিনি সর্ব্ব নিয়মের নিয়ন্তা, ব্রহ্ম হরিদাসের সেই পূর্ণব্রহ্মসনাতন শ্রীগৌর ভগবান্ তাঁহাকে সংখ্যাজপ ন্যূন করিবার কৃপানুমতি করিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি নিয়মভ্রষ্ট হয়েন নাই। সুতরাং যে নিয়ম করিতে হইবে তাহা প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের বিধান। শরীরের অনুরোধে বা সংসারের অনুরোধে কিংবা সুবিধা অসুবিধার অনুরোধে ভক্তি-অঙ্গের নিয়ম ভঙ্গ করিলে দৃঢ়তা নষ্ট হয়, ভক্তির প্রতি অনাদর করা হয়, ইহাতে নিষ্ঠা বিনষ্ট হয়।

এই শ্রেণীর সুবিধাবাদীদের একুল-ওকুল দুই কূলই অধঃপতিত হইয়া থাকে।

৯ম অঙ্গ,—হরিবাসর-সম্মান। হরিবাসর শব্দের অর্থ একাদশী। একাদশীতে উপবাস করিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রীভগবানের স্মরণ ও কীর্ত্তন অতি কর্ত্তব্য। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে একাদশীতে উপবাস, নিত্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, উহার অন্যথা করিলেই প্রত্যবায় ঘটে। এখন অনেকেই উপবাস করেন, সে উপবাস "লঙ্ঘন" মাত্র। কিন্তু উপবাসের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও মর্য্যাদা অল্পই রক্ষিত হইয়া থাকে। উপবাস শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যুৎপত্তি এই যে—

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যোবাস স্তদ্‌গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো নোপবাসস্তু লঙ্ঘনম্ ॥*

---

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রি সম্পাদিত শতপথব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদের ১৭৬—৭৭ টীকায় লিখিত হইয়াছে। "ইতঃপূর্ব্বে (১।১।১।১১) বলা হইয়াছে যে, যজমান ও তাঁহার পত্নী ব্রতগ্রহণ করিয়া অগ্নির আগারে গিয়া শয়ন করিবেন,—প্রভাতে যে অগ্নির তাঁহারা যাগ করিবেন তাঁহার নিকট সংযত হইয়া নিয়মগ্রহণ করিয়া বাস (উপ+বস্) করেন বলিয়া তাহা হইতেই তাদৃশ নিয়মসূচক অবস্থিতিকেই উপবাস শব্দ বুঝাইতেছে। অনশনকে যে বুঝাইতেছে না, তাহা সর্ব্বত্রই প্রতীয়মান হয়, কেন না, সেই দিন ব্রতোপযোগী দ্রব্যের আহার করার ব্যবস্থা পাওয়া যায় (শতপথ ব্রাহ্মণ ১।১।১।৯।১০)। অথবা সে দিন তাঁহারা তাদৃশ নিয়মপূর্ব্বক অবস্থান করিতে দেবগণ তাঁহাদের নিকটে আগমন করেন (১।১।১।৭), ইহা হইতেও ঐ উপবাস হইতে পারে। এতাদৃশ স্থানে যে ইহার অর্থ অনশন নহে, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাচীন শাস্ত্রদর্শিগণ বলিয়া গিয়াছেন, যথা—"এতৎ কৃত্বোপবসতি" এই আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রের (১।১৪।১৬) ভাষ্যকার রুদ্রদত্ত বলিতেছেন—"শ্বো যাগার্থে হগ্নিসমীপে নিয়মবিশিষ্টো বাস উপবাসঃ।" "উপোষ্য পৌর্ণমাসেন হবিষা যজেত" এই শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রের (১৩।১) ভাষ্যকার বরদত্তসুত আনর্ত্তীয় বলিতেছেন—"বস্যতি পত্নীযজমানৌ ব্রতমধীয়াতামিত্যাদি;" (অন্যান্য শ্রৌতসূত্রেও ইহার বিধি আছে, বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না)। "পূর্ব্বাং

অর্থাৎ শুদ্ধ লঙ্ঘন করিয়া থাকিলেই উপবাস হয় না, সমস্ত পাপ হইতে উপাবৃত্ত থাকিয়া শ্রীভগবানের গুণ কীর্ত্তনাদি করিয়া যে কাল অতিবাহিত করা হয় তাহাই উপবাস। কেবল "লঙ্ঘন" উপবাস নহে। একদশীতে পাপরাশি অন্ন আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সুতরাং একাদশীতে লঙ্ঘন বিহিত হইয়াছে। শ্রীহরিবাসর-তিথি শ্রীগোবিন্দের স্মারণী। একাদশ্যুপবাস দিবসে উপবাস করাও ভক্তির অঙ্গ।

দশম অঙ্গ—ধাত্রী অশ্বথাদির গৌরব রক্ষণ। স্কন্দপুরাণ বলেন :—

অশ্বথ তুলসী ধাত্রী গোভূমিস্থরবৈষ্ণবাঃ।
পূজিতা প্রণতা ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘান্॥

পৌর্ণমাসীমুত্তরাং বোপবসেৎ"—এই কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের (২।১।১) ভাষ্যকার কর্ক বলিতেছেন—"—স চায়মুপবাসশব্দঃ নিয়তদ্রব্যকালপরিমাণেঽপ্যশনে উপলভ্যতে, যথা চান্দ্রায়ণমুপবসেদিতি। অতো যমনিয়মবিষয়তোপবাসশব্দস্য।" উপবসেদিত্যনেন অত্র অনশনং ন বিধীয়তে ; কুতঃ? "অপরাহ্নে ব্রতোপায়নমশ্নীত" ইত্যনেন (২।১।১০) বিরোধাৎ। কিং তর্হি? চান্দ্রায়ণমুপবসতি ইত্যাদৌ নিয়তদ্রব্যকালপরিমাণবদশন-সত্যবদন-ক্রোধলোভাদিবর্জ্জনাদি-যম-নিয়মকারিণ্যপি উপবসতীত্যস্য প্রয়োগস্য দৃষ্টত্বাৎ অত্রাপি পূর্ব্বাপরবিরোধপরিহারায় স এবার্থোঽবসীয়তে—ইতি তত্রৈব যাজ্ঞিকদেবঃ। "তদাহুর্যদ্দর্শপূর্ণমাসয়োরুপবসতি"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (৭।২।১০) এই অংশের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—"যাগরূপং ব্রতং নিশ্চিত্য গার্হপত্যাদ্যগ্নিসমীপে যো বাসঃ স উপবাসঃ। যদ্বা দেবা অস্যাপি যজ্ঞে সমীপে বসন্তীতি এতদীয়োঽনুষ্ঠানসঙ্কল্প উপবাসঃ। —অতএব শাখান্তরে শ্রূয়তে উপাস্মিঞ্ শ্বো যক্ষমাণে দেবতা বসন্তি (তৈঃ সঃ ১।৬।৭।৩ ; তুলঃ—শতঃ পঃ ১।১।১।৭) ;—যদ্বা গ্রাম্যাশনপরিত্যাগ উপবাসঃ। তৎপরিত্যজ্য আরণ্যাশনরূপং নিয়মং স্বীকুর্য্যাৎ—(দ্রঃ—তৈঃ সঃ ১।৬।৭।৩)।" অতএব ইহা দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে, উপবাস শব্দের সৃষ্টি কিরূপে কি অর্থে হইয়াছিল। ইহা হইতেই স্মৃতিশাস্ত্রের এই বচনটি হইয়াছে—"উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্ত বাসো গুণৈঃ সহ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন শরীরবিশোষণম্।" ইহা গোভিলগৃহ্যভাষ্যে (১।০।২) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার-ধৃত পাঠ ; শব্দকল্পদ্রুমে চতুর্থ চরণের পাঠ "সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ।" ইহা হইতেই ক্রমে নিরম্বু একাদশী উপবাসের সূত্রপাত হইয়াছে কি?"

অর্থাৎ অশ্বত্থ, তুলসী, আমলকী, গো ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব পূজিত প্রণত ও ধ্যাত হইলে মানুষের পাপ বিনষ্ট করেন। পদ্মপুরাণেও অশ্বত্থ, ধাত্রী ও তুলসীর যথেষ্ট মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অশ্বত্থ শ্রীভগবানের বিভূতি-স্বরূপ যথা শ্রীভগবদ্গীতায় :—

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধার্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥

তুলসী ও ধাত্রীর মাহাত্ম্য শ্রীহরিভক্তি বিলাসে প্রচুররূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। গো-মাহাত্ম্য হিন্দু শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই উক্ত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধ গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে :—

গবাং কণ্ডূয়নং কুর্য্যাদ্ গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণং।
গোষু নিত্যং প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতি॥

ভবিষ্য পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যমোক্ত শ্লোক এই যে :—

পৃষ্ঠে ব্রহ্মা গলে বিষ্ণুঃ মুখে রুদ্রঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
মধ্যে দেবগণাঃ সর্ব্বে রোমকূপে মহর্ষয়ঃ॥
নাগা পুচ্ছে খুরাগ্রেষু যে চাষ্টৌ কুলপর্ব্বতাঃ।
মূত্রে গঙ্গাদয়োঃ নদ্য র্নেত্রয়োঃ শশিভাস্করৌ॥
এতে যস্তাঃ স্তনে দেবাঃ সা ধেনুর্ব্বরদাস্তমে॥

বরাহপুরাণেও গোমাহাত্ম্য বহুল পরিমাণে উক্ত হইয়াছে।

ভূমিসুর বা ব্রাহ্মণের গৌরব রক্ষা করা ভক্তিসাধকগণের একান্ত কর্ত্তব্য। সময়ে সময়ে কোন ভেকধারী-ভক্ত গৃহীর নিকট সদ্ব্রাহ্মণের অনাদর দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বিদ্বেষ ভক্তির বিনাশক। বিশ্বপূজ্য বৈষ্ণব-শাস্ত্রের আচার্য্য শ্রীপাদ গোস্বামিগণ ব্রাহ্মণগৌরব প্রদর্শনের সহস্র সহস্র উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল উপদেশের অবহেলনে শ্রীভগবান্ অপ্রীত হয়েন, ভক্তিদেবী হৃদয় হইতে দূরে যান।

"প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥"

ইহাই যে ধর্ম্মের নিত্যবিধি, সেই ধর্ম্মযাজক বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ বা ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা একান্তই পাপ-জনক বলিয়া মনে রাখিতে হইবে। স্বয়ং শ্রীসনাতন বৈষ্ণব-স্মৃতিতে যে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, শ্রীগোপাল ভট্ট যাহার অনুমোদন করিলেন, শ্রীরূপ যে বিধি তাঁহার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পুনরুক্ত করিলেন, দাস রঘুনাথ মনঃশিক্ষায় যে বিধানের পুনরুল্লেখ করিলেন, শ্রীজীব ভক্তিরসামৃতের টীকায় যে বিধি সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে লিখিলেন :—

গোব্রাহ্মণয়োর্হিতাবতারত্বাৎ ভগবতোর্ভাগবতৈরেতাবপি পূজ্যাবিতি-ভাবঃ। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ গোব্রাহ্মণের হিতের জন্য অবতার গ্রহণ করেন সুতরাং গোব্রাহ্মণ ভাগবতগণের পূজ্য।”

এই ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনাদর অশিক্ষিত বাবাজীদের পক্ষে নিতান্তই অশুভজনক সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ যেরূপই হউন, ব্রাহ্মণ ভাগবতী তনু, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, ভক্তিসাধক সর্ব্বদাই এ কথা মনে রাখিবেন। বৈষ্ণবের সম্মানও তাদৃশ। ইহাই ভক্তি-সাধকের প্রারম্ভ-দশাঙ্গ।

৬৪ অঙ্গ ভক্তির দ্বিতীয় দশাঙ্গ এই :—

সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ (১)
শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বং (২) মহারম্ভাদ্যনুদ্যমঃ (৩)
বহুগ্রন্থ কালাভ্যাস ব্যাখ্যাবাদবিবর্জ্জনম্ (৪)
ব্যবহারেঽপ্যকার্পণ্যং (৫) শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা (৬)
অন্যদেবানবজ্ঞাচ (৭) ভূতানুদ্বেগদায়িতা (৮)
সেবানামপরাধানামুদ্ভাবাভাবকারিতা (৯)
কৃষ্ণতদ্ভক্তবিদ্বেষবিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা। (১০)
ব্যতিরেক তয়ামীষাং দশানাং স্যাদনুষ্ঠিতঃ।
অস্যাস্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেঽপ্যঙ্গবিংশতেঃ।
ত্রয়ং প্রধান মেবোক্তং গুরুপাদাশ্রয়াদিকম্॥

(১) ভগদ্বিমুখ জনের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই শাস্ত্রাদেশ অতি স্পষ্ট। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও এই কথার উল্লেখ আছে যথা :—

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্য কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে॥

অর্থাৎ কখনও অসৎদিগের সঙ্গ করিবে না। কেননা তাহাতে সর্ব্বার্থ হানি হয়, এমন কি অসৎ সঙ্গে মানুষের অধঃপাত ঘটিয়া থাকে। এই অসৎসঙ্গের কথা মনে করিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যাহাদের নৈতিক চরিত্র দুষ্ট, যাহারা লম্পট, চোর, বদমাস, মিথ্যাবাদী, প্রতারক তাদৃশ নীতিচরিত্রদুষ্ট লোকদিগের সঙ্গ ত্যাগ করাই শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায়। শাস্ত্রকারগণের মতে ইহারা ত অসৎ বটেই। ইহাদের সঙ্গ ত্যাগের কথা সম্বন্ধে আর বলিবার অপেক্ষা কি? কিন্তু উন্নত নীতিচরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিগণও যদি ভগবদ্বিমুখ হয়েন শাস্ত্রকারগণের মতে তাঁহারও অসৎ; তাঁহাদের সঙ্গও পরিহর্ত্তব্য। এই কারণে ভগদ্বিমুখ-জনের সঙ্গও অসৎসঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। শ্রীকৃষ্ণবিমুখজনের সঙ্গ ত্যাগ করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, কাত্যায়ন সংহিতায় তৎসম্বন্ধে প্রমাণ আছে যথা :—

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্ত র্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজন-সংবাসবৈশসম্॥

অর্থাৎ অগ্নির জ্বালারূপ পিঞ্জর মধ্য অবস্থিতি করাও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কৃষ্ণবিমুখ জনের সহিত সহবাস করা ভাল নয়। শাস্ত্রে এইরূপ বহুল বচন দ্বারা ভগবদ্ভক্তিবিহীন জনের সঙ্গপরিত্যাগ করার বিধি আছে। শ্রীশ্রী-হরিভক্তিবিলাসে বিস্তৃতরূপে এই সম্বন্ধে শাস্ত্র যুক্তি বিলিখিত হইয়াছে।

(২) শিষ্যাদ্যনমুবন্ধিত্বম্—বহু শিষ্য করা নিষিদ্ধ।

(৩) মহারম্ভাদিতে অনুদ্যম, অর্থাৎ মঠাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে অনুদ্যম।

(৪) বহুশাস্ত্র কলাভ্যাস, ব্যাখ্যাবৃত্তি ও বাদ বিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীভাগবত (৭।১৩) অধ্যায়ে বলেন :—

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্
ন ব্যাখ্যা মুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ কচিৎ

অর্থাৎ অনেক শিষ্য করিবে না, অনেক গ্রন্থাভ্যাস করিবে না, এবং মঠাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে উদ্যোগী হইবে না। শ্রীভাগবতের এই বচনটী সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রচারণের অন্তর্গত। তাহা হইলেও নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী ভক্তগণের এই নিষেধ প্রতিপাল্য। বহু শিষ্যের দীক্ষা দেওয়া অকর্ত্তব্য, এই কথার ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন, "এই নিষেধ অনধিকারিবহুশিষ্য-স্বীকারের দোষ-জ্ঞাপক। কিন্তু শ্রীশ্রীনারদ গোস্বামীরও বহুশিষ্য ছিলেন, পুরাণে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। অপিতু বহুশিষ্য-গ্রহণ-প্রথা বারিত হইলে সম্প্রদায়-নাশেরও অশঙ্কা আছে।" কিন্তু তাই বলিয়া সম্প্রদায়-বৃদ্ধির জন্য ভগবদ্বিমুখ অনধিকারী "বহুশিষ্য গ্রহণ" করা কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য নহে। "বহুগ্রন্থাভ্যাস" পদে ভক্তিবিরোধী গ্রন্থের বিষয়ই বুঝিতে হইবে। যে সকল শাস্ত্র ভগবদ্ভক্তির পুষ্টিকর, যে সকল শাস্ত্রীয় যুক্তি ভগবদ্ভক্তির অনুকূল ও দৃঢ়তাসম্পাদক, এই বচনাংশ তৎসকলের নিষেধমূলক নহে। শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না।

(৫) ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ অন্নবস্ত্রাদি অলব্ধ হইলে বা বিনষ্ট হইলে তজ্জন্য কোন প্রকার ব্যাকুল না হইয়া হরিভজনপরায়ণ ব্যক্তি নিরন্তর আপন মনে শ্রীভগবানের শ্রীচরণ স্মরণ করিবেন। পদ্মপুরাণ বলেন ;—

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতিভূর্ত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥

(৬) শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা—ভক্তিঅঙ্গসমূহের মধ্যে শোকাদির অবশবর্ত্তিতাও একটি। যাঁহারা ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইবেন, শোক দ্বারা

তাঁহাদের চিত্ত যেন ভারাক্রান্ত না হয় এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাবধান হইতে হইবে যথা পাদ্মে :—

শোকমর্ষাদিভি র্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ॥

অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে শোক ও ক্রোধে পরিপূর্ণ তথায় কিরূপে মুকুন্দের স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা হইতে পারে? মাধুর্য্যের আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়-সিংহাসনের সম্রাট করিতে হইলে সাধককে সর্ব্ব প্রথমে হৃদয়কে শোক ও ক্রোধাদি হইতে বিমুক্ত করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে।

(৭) অন্যদেবের প্রতি অনবজ্ঞা—জনসাধারণের বিশ্বাস, বৈষ্ণব ধর্ম্ম এক বিষ্ণু ব্যতীত অপর দেবতার প্রতি বিরোধী। এ বিশ্বাস অতি ভুল। তবে ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞাতজনক অসদাচরণের নিমিত্ত জন-সাধারণের হৃদয়ে এইরূপ কুসংস্কার জন্মিতে পারে। কিন্তু অন্য দেবের পতি অসম্মান করিতে হইবে বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে হইবে, শিব, কালী দুর্গা প্রভৃতি দেব দেবীর নিকট প্রণত হইতে হইবে না, সেই সকল শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া চলিয়া যাইতে হইবে, ইহা বৈষ্ণবের পক্ষে ধর্ম্ম তো নহেই, প্রত্যুত ঘোরতর অধর্ম্ম। বৈষ্ণব শাস্ত্রের বহুস্থলে এইরূপ অসদাচরণের বিরুদ্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবের শ্রীভগবান্ ভক্তির পুষ্টিসাধন ব্যতীত ভক্তিব হানি করার উপদেশ করেন না। বৈষ্ণবের নিত্য আরাধ্য শ্রীমদ্ভাগবতে শিবাদি দেবতার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের বিধি রহিয়াছে। শিবচতুর্দ্দশী ব্রতোপবাস বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া বৈষ্ণবের জগৎপূজ্য মহাচার্য্য শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামিমহাশয় বলিতেছেন—

হরিরেব সদারাধ্য সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্ম রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

সাত্ত্বিক পুরাণ-সমুদ্রমন্থন করিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকেই আরাধ্যতত্ত্ব বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ নিষ্ঠাসহকারে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। কিন্তু অন্য দেবতার অবজ্ঞা করা নরকজনক বলিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। সতী রমণী যেমন ভাসুর, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ও মাতা প্রভৃতির প্রতি অবজ্ঞা না করিরা প্রত্যুত তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও যত্ন প্রদর্শন করিরা থাকেন, কিন্তু পতিকেই যেমন একমাত্র প্রাণেশ্বর জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন; বৈষ্ণবগণও সেই প্রকার অন্যান্য দেবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণব্রত। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের একমাত্র আরাধ্য। এইরূপ ভাবকে কেহ কেহ উদারতার অভাব বা ধৰ্ম্মমতের সঙ্কীর্ণতা মনে করিতে পারেন। কিন্তু বলা বাহুল্য শ্রীগুরুর কৃপায় ভজনের পথে অগ্রসর হইলে তাঁহাদের এই ধারণা বিনা উপদেশেই অপনোদিত ও নিরাকৃত হইয়া যাইবে। তাঁহারা তখন বুঝিতে পারিবেন, ভজন চাহে—নিষ্ঠা। নিষ্ঠায় মনোবৃত্তি-সমূহ কেন্দ্রাভিগামী হইতে থাকে। এই অবস্থায় অনন্ত ব্যাপ্তিময় বাষ্পের ন্যায় মনোবৃত্তির তরলতা ক্রমেই ঘনীভূত হইতে আরব্ধ হয়. চিত্ত তখন চিদ্‌ঘনানন্দ আনন্দমূৰ্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে ব্যাকুল হয়,—প্রাণের প্রাণ হৃদয়বল্লভকে লাভ করিবার জন্য তখন তাদৃশ ভক্ত সকলের চরণমূলে মাথা কুটিয়া নিজের প্রাণবল্লভ-লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করেন, সকলের শুভাশীৰ্ব্বাদের জয়মাল্য শিরে লইয়া কৃষ্ণান্বেষণে ধাবিত হয়েন। ক্রমবিকশের নিয়মানুসারে চিত্তবৃত্তি যখন অধিকতর প্রবল বেগে কেন্দ্রাভিমুখী হইতে থাকে, সাধক তখন বহির্দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া ভেদজ্ঞানের অনন্ত বিভিন্নতার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বর্ষার দ্বিকূলসংপ্লা-বনী সাগরগামিনী তরঙ্গিণীর উন্মাদ-উধাও তরঙ্গের ন্যায় নাচিতে নাচিতে শ্রীকৃষ্ণসাগরে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুলিত হইয়া পড়েন, সুতরাং অপর দেবতাদের মধ্যে কে কোথায় আছেন না আছেন, তাহার অনুসন্ধান

কবার অবকাশ তাঁহার আদৌ থাকে না, থাকিতেও পারে না। নৈষ্ঠিক সাধকদিকের এই প্রেম-তরঙ্গ অনিবার্য্য। ভজন বৃত্তির এই কেন্দ্রাভিমুখিত্ব, —নিষ্ঠারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই নিষ্ঠার সময়ে অপর দেবতার প্রতি যদি কোনরূপ সম্মান-দৃষ্টির অভাব ঘটে, তাহা অবজ্ঞাজনিত নহে, স্বীয় প্রাণেশ্বরের সংলাভ-বাসনায় চিত্তের পরম ব্যাকুলতা ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠাই ইহার প্রধানতম কারণ। নচেৎ অপর দেবতার প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন নিতান্ত অপরাধজনক বলিয়াই বৈষ্ণব শাস্ত্রের আদেশ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বীয় লীলাতেও শিবাদি দেবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া জীবদিগকে দেবসম্মানের অতি স্পষ্ট শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

অষ্টম অঙ্গ—ভূতানুদ্বেগদায়িতা। ভূত,—প্রাণী।—প্রাণিমাত্রের উদ্বেগ না দেওয়ার নামই ভূতানুদ্বেগদায়িতা। যাহাতে কার্য্য দ্বারা, এমন কি বাক্যদ্বারা প্রাণিগণের কোন প্রকার উদ্বেগ না জন্মে, বৈষ্ণবের সর্ব্বতোভাবে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। পূজ্যপাদ আচার্য্যবর্য্য শ্রীরূপ গোস্বামি মহোদয় মহাভারত হইতে ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তদ্‌যথা :—

> পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্।
> বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশ স্তূর্ণ তস্য প্রসীদতি॥

অর্থাৎ পিতা যেমন পুত্রের প্রতি করুণ, সেইরূপ করুণ ভাবে যিনি প্রাণি মাত্রকেই কোন প্রকারে উদ্বিগ্ন না করেন সেই বিশুদ্ধ চিত্ত ভক্তের প্রতি হৃষীকেশ সত্বরেই সুপ্রসন্ন হন।

সাধন ভক্তির এই অঙ্গ প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সমাজের প্রতিপাল্য। মানব সমাজে যে পরিমাণে ভক্তির এই অঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে, ঠিক্ সেই পরিমাণেই সে সমাজ শান্তিময়ত্ব ও দেবত্ব লাভ করিতে পারিবে। বিনা সাধনে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। ভক্তির এই অঙ্গ একদিনে বা দুই দিনে সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। শ্রীভগবানের কৃপার প্রতি ভরসা রাখিয়া

এই অঙ্গসাধনে চিত্তনিয়োগ করিতে হয়। শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের স্বীয় শ্রীমুখের উপদেশ এই যে

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ র্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

অর্থাৎ যিনি কোন লোককে উদ্বিগ্ন করেন না, (পরম কারুণিক স্বভাববশতঃ যিনি অপরের সর্ব্বপ্রকার উদ্বেগজনক কর্ম্ম হইতে বিরত) কোনও লোক হইতে যাঁহার কোন প্রকার উদ্বেগের আশঙ্কা নাই, অপরন্তু যিনি হর্ষ অমর্ষ ভয় উদ্বেগ সমূহ হইতে বিনির্ম্মুক্ত তিনি আমার প্রিয়।" এতাদৃশ সাধুদর্শনে বনের শ্বাপদকুলেরও হিংসাবৃত্তি তিরোহিত হয়। পরমভক্ত ধ্রুব মহাশয়কে দেখিয়া বনের ব্যাঘ্রেরও চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছিল। সমাহিতযোগীদের পাদমূলে কাননের অতি ভীত পক্ষীও নির্ভয়ভাবে বিচরণ করে।

নবম অঙ্গ—সেবা ও নাম অপরাধের উদ্ভাবের অভাবকারিতা। অর্থাৎ যাহাতে সেবাপরাধ বা নামাপরাধ না জন্মিতে পারে, এমন ভাবে সেবা করা ও নাম করা। সেবাপরাধ বর্জ্জন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধি যথা বরাহ পুরাণে :—

মমার্চ্চনাপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥

আগমে যে ৩২টী সেবাপরাধ লিখিত হইয়াছে, অগ্রে তৎ সমূহের উল্লেখ করা যাইতেছে যথা :—

যানৈর্ব্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে।
দেবোৎসবাদ্যসেবাচ অপ্রণাম স্তদগ্রতঃ॥
উচ্ছিষ্টে বাপ্যশৌচে বা ভগবদ্বন্দনাদিকং।
একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণম্॥

পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যাঙ্কবন্ধনঃ।
শয়নং ভক্ষণঞ্চাপি মিথ্যাভাষণমেবচ॥
উচ্চৈর্ভাষা মিথোজল্পো রোদনানিচ বিগ্রহঃ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নৃষু চ ক্রুর ভাষণম্॥
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ।
অশ্লীল ভাষণঞ্চৈব অধোবায়ুবিমোক্ষণম্॥
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিত ভক্ষণম্।
তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্॥
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনাদিকে।
পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবাদনং॥
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা।
অপরাধা স্তথা বিষ্ণো দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

অর্থাৎ (১) যানে আরোহণ করিয়া অথবা পাদুকা পদে দিয়া ভগবদ্-গৃহে গমন। (২) দেবোৎসব না করা, (৩) তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির সমক্ষে প্রণত না হওয়া. (৪) উচ্ছিষ্টাবলিপ্ত দেহে বা অশৌচে শ্রীভগবদ্বন্দনাদি, (৫) এক হস্তে প্রণাম, (৬) তাঁহার সম্মুখে অন্যদেবতার প্রদক্ষিণ করা, (৭) তাঁহার অভিমুখে পদপ্রসারণ করা, (৮) পর্য্যাঙ্ক বন্ধন। (বাহুযুগল দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধন করিয়া উপবেশন।) (৯) তাঁহার সমক্ষে শয়ন, (১০) তৎসমক্ষে ভক্ষণ, (১১) মিথ্যা ভাষণ, (১২) উচ্চ ভাষণ, (১৩) পরস্পর কথোপকথন, (১৪) ক্রন্দন, (১৫) বিবাদ, (১৬) নিগ্রহ, (১৭) অনুগ্রহ (১৮) জনসাধারণের প্রতি ক্রূর ভাষণ, (১৯) কম্বলাবরণ, (২০) পরনিন্দা, (২১) পরস্তুতি, (২২) অশ্লীল ভাষণ, (২৩) অধোবায়ু বিমোচন, (২৪) সামর্থ্য থাকিলেও বিত্তশাঠ্য করিয়া কোন প্রকারে ভগবৎ-সেবা নির্ব্বাহ, (২) অনিবেদিত দ্রব্যাদির ভোজন বা পান, (২৬) যে কালে যে ফলাদি উৎপন্ন হয় তাহা শ্রীভগবানকে অর্পণ না করা, (২৭)

আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ব্যঞ্জনাদিতে প্রদান (২৮) শ্রীমূর্ত্তি পশ্চাৎ রাখিয়া উপবেশন করা, (২৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অপরকে প্রণাম করা, (৩০) গুরুর স্তুতি না করা, (৩১) নিজমুখে নিজের স্তুতি, (৩২) দেবতা নিন্দন।

বরাহপুরাণে আরও ৩২ সংখ্যক অপরাধের বিষয় লিখিত আছে, তদ্যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বচন—

দ্বাত্রিংশদপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥
যে বৈ ন বর্জ্জয়ন্ত্যেতান্ অপরাধান্ ময়োদিতান্।
সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টাঃ পচ্যন্তে নরকে চিরম্॥
রাজান্নভক্ষণঞ্চৈব মাপদ্যপি ভয়াবহং।
ধ্বান্তাগারে হরেঃ স্পর্শঃ পরং সুকৃতি-নাশনম্॥
তথৈব বিধিমুল্লঙ্ঘ্য সহসা স্পর্শনং হরেঃ।
দ্বারোদ্ঘাটো বিনা বাদ্যং ক্রোড়মাংসনিবেদনম্॥
পাদুকাভ্যাং তথা বিষ্ণো র্মন্দিরায়োপসর্পণম্।
কুক্কুরোচ্ছিষ্টকলনং মৌনভঙ্গোহচ্যুতার্চ্চনে॥
তথাপূজন কালেচ বিড়ুৎসর্গায় সর্পণম্।
শ্রাদ্ধাদিক মকৃত্বাচ নবান্নস্য চ ভক্ষণম্।
অদত্বা গন্ধ মাল্যাদি ধূপনং মধুঘাতিনঃ।
অকর্ম্মণ্য প্রসূনেন পূজনঞ্চ হরেস্তথা॥
অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠঞ্চ কৃত্বা নিধুবনং তথা।
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাং দীপং তথা মৃতক মেবচ॥
রক্তং নীল মধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনং পটং।
পরিধায় মৃতং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যাপানমারুতম্॥
ক্রোধং কৃত্বা শ্মশানঞ্চ গত্বা ভুক্ত্বাপ্যজীর্ণভুক্।

ভক্ষয়িত্বা ক্রোড়মাংসং পিণ্যাকং জালপাদপম্ ॥
তথা কুসুম্ভ শাকঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গং বিধায় চ।
হরেঃ স্পর্শ হরেঃ কর্ম্ম করণং পাতকাবহম্ ॥
মম শাস্ত্রং বহিষ্কৃত্য অস্মাকং য প্রপদ্যতে।
মুক্ত্বাচ মম শাস্ত্রাণি শাস্ত্রমন্তৎ প্রভাষতে ॥
মদ্যপস্তু সমাসাদ্য প্রবিশেদ্ভবনং মম।
যো মে কুস্তম্ভশাকেন প্রাপণং কুরুতে নরঃ ॥
মমদৃষ্টে হৃভিমুখং তাম্বুলং চর্ব্বয়েত্তু যঃ।
কুরুবক পলাশস্থৈঃ পুষ্পৈঃ কুর্য্যান্মমার্চ্চনম্ ॥
মমার্চ্চামাসুরে কালে যঃ করোতি বিমূঢ়ধীঃ।
পীঠাসনোপবিষ্টো যঃ পূজয়েৎ বা নিরাসনো ॥
বামাহস্তেন মাং ধৃত্বা স্নাপয়েদ্বা বিমুঢ়ধীঃ।
পূজা পর্য্যুসিতৈঃ পুষ্পৈঃ ষ্ঠীবনং গর্ব্বকল্পনং ॥
তির্য্যক্ পুণ্ড্রধরো ভূত্বাঃ যঃ করোতি মমার্চ্চনং।
অপ্রক্ষালিতপাদো যঃ প্রবিশেন্মমমন্দিরম্ ॥
অবৈষ্ণবস্ত পক্কান্নং যো মহ্যং বিনিবেদয়েৎ।
অবৈষ্ণবেষু পশ্যংস্তু মম পূজাং করোতি যঃ ॥
অপূজয়িত্বা বিঘ্নেশং সম্ভাষ্যচ কপালিনং।
নরঃ পূজান্তু যঃ কুর্য্যাৎ স্নপনঞ্চ নখাম্ভসা ॥
অমৌনী ঘর্ম্মলিপ্তাঙ্গো মম পূজাং করোতি যঃ।
জ্ঞেয়াঃ চান্তেঽপি বহবোঽপরাধা সদসংমতৈঃ ॥
আচারৈঃ শাস্ত্রবিহিতনিষিদ্ধাতিক্রমাদিভিঃ।
তত্রাপি সর্ব্বথা কৃষ্ণ-নির্ম্মাল্যন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ ॥

অপিচ নারসিংহ পুরাণেও এই বিষয়ের উপদেশ দৃষ্ট হয়। যথা—শান্তনুকে নারদ বলিতেছেন—

অতঃ পরন্তু নির্ম্মাল্যং ন লঙ্ঘয় মহীপতে।
নরসিংহস্য দেবস্য তথান্যেষাং দিবৌকসাং॥
কৃষ্ণস্য পরিতোষেপ্সু ন তচ্ছপথ মাচরেৎ।
নানাদেবস্য নির্ম্মাল্য মুপযুঞ্জীত চ ক্বচিৎ॥*

তথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে

আপদ্যপিচ কষ্টায়াং দেবেশ শপথং নরঃ।
ন করোতি হি যো ব্রহ্মন্ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥
ন ধারয়তি নির্ম্মাল্যমন্যদেবধৃতন্তু যঃ।
ভুক্তে ন চান্য নৈবেদ্যং তস্য তুষ্যতি কেশবঃ।

অর্থাৎ রাজান্নভোজন, অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ, বিনাবিধিতে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ, বাদ্য বিনা দ্বারোদ্ঘাটন, কুক্কুর দৃষ্ট ভক্ষ্য সংগ্রহ, অর্চ্চনে মৌনভঙ্গ, পূজা করিতে বসিয়া বিন্মূত্র ত্যাগের জন্য গমন, গন্ধমাল্য না দিয়া ধূপদান, শাস্ত্রনিষিদ্ধ পুষ্পে পূজা, দন্তধাবন না করিয়া, স্ত্রীসঙ্গমের পর স্নানাদি দ্বারা শুদ্ধ না হইয়া, মৃত দীপ ও রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া, রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, মলিন কিম্বা অপরের বস্ত্র পরিধান করিয়া, মৃত দেখিয়া অপান বায়ু ত্যাগ করিয়া, ক্রোধ করিয়া শ্মশান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না করিয়া, গাঁজা ও অহিফেন সেবন করিয়া এবং তৈল মর্দ্দন করিয়া হরির স্পর্শ ও হরিসেবা করিলে পাপ জন্মে।

অন্যত্র।

ভগবচ্ছাস্ত্রের অনাদর করিয়া ভগবৎপ্রতিপত্তি, অন্য শাস্ত্র প্রবর্ত্তন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে তাম্বুল চর্ব্বণ, এরণ্ড পত্রস্থ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চন, আসুর কালে পূজন, পীঠে বা ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া পূজন, শ্রীমূর্ত্তির স্নান কালে বামহস্তে

---

* বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত বরাহ পুরাণে যদিও দ্বাত্রিংশৎ অপরাধের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু সেই শ্লোকগুলি এরূপভাবে গ্রথিত নহে।

তংস্পর্শ, পর্য্যুষিত অথবা যাচিত পুষ্পে পূজা, পূজা করিতে করিতে থুথু নিক্ষেপণ, পূজা বিষয়ে গর্ব্ব করা, (অর্থাৎ "আমি যেমন ভক্তি সহকারে পূজা করি, আমি যেমন বিবিধ উপকরণে পূজা করি, এরূপ আর কে করে" এই গর্ব্ব), তির্য্যগ্‌ভাবে পুণ্ড্র (কপালে তিলক ধারণ) অপ্রক্ষালিত পদে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, অবৈষ্ণব পক্ক ভক্ষ্য নিবেদন, অবৈষ্ণবের দৃষ্টিতে পূজন, গণেশকে পূজা না করিয়া, বা কপালীকে দেখিয়া পূজা করা, নখের স্পৃষ্ট জলে শ্রীমূর্ত্তির স্নান, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে শ্রীমূর্ত্তি সেবা,— নিষিদ্ধ সাধুগণের অসম্মত আচার, শাস্ত্রবিহিত আচার অতিক্রম ও নিষিদ্ধ আচারে সেবা অপরাধজনক।

সেবাপরাধ সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয় ভক্তিসন্দর্ভে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এ স্থলে উহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম প্রকাশ করা যাইতেছে। তিনি বলেন বরাহপুরাণে লিখিত আছে ঃ—

শ্রদ্ধয়োপহৃতং শ্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি।
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥

অর্থাৎ "আমার ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যদি আমাকে জলবিন্দুও উপহার প্রদান করেন, আমি তাহাতে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হই, আর অভক্তের উপহার ভূরি পরিমাণ হইলেও তাহাতে আমার পরিতোষ জন্মে না।" এস্থলে শ্রদ্ধাভক্তি শব্দ দ্বারা আদরই বুঝাইবে। তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে অপরাধ সমস্ত অনাদরমূলক। সুতরাং অপরাধের নিদান অনাদরই পরিত্যাজ্য।

এই সকল সেবাপরাধ হইতে কি কি উপায়ে পরিত্রাণ লাভ করা যাইতে পারে শাস্ত্রে তাহার বিধান আছে। তদ্‌যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥
সহস্র নাম মাহাত্ম্যং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি।

অপরাধ-সহস্রেণ ন স লিপ্যেত কশ্চন ॥
দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণো যঃ পঠেৎ তুলসীস্তবং।
দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ।
তুলসীরোপণং কার্য্যং শ্রবণেন বিশেষতঃ।
অপরাধ সহস্রাণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ ॥
তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥

বরাহপুরাণেও সেবাপরাধ খণ্ডনের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে।

সেবাপরাধের সঙ্গে সঙ্গে মহদপরাধেরও উল্লেখ আছে যথা ভক্তি-সন্দর্ভে :—

ন ভজতি কুমণীষিনাং স ইজ্যাং।
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ ॥
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈ র্যঃ।
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥

বৈষ্ণব অপরাধ,—পতনের কারণ তদ্যথা :—

ঘ্নন্তি নিন্দন্তি বিদ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নভিনন্দতি।
ক্রধ্যতে দর্শনে হর্ষং ন যাতি পতনানি ষট্ ॥

বৈষ্ণব—অপরাধ ছয় প্রকার :—বৈষ্ণবকে প্রহার করা, নিন্দা করা, বিদ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, ক্রোধ করা এবং বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দিত না হওয়া এই ছয়টী বৈষ্ণব অপরাধ। ইহারা পতনের মূল। শ্রীচরিতামৃতও বলেন :—

যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উগাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা ॥

এই মহদপরাধ খণ্ডনের জন্য ভক্তিসন্দর্ভে যে ব্যবস্থা আছে তাহা এই :—যাঁহার নিকট অপরাধ করা হয় তাঁহার নিকট ভক্তিভরে ক্ষমা

প্রার্থনা করা, অথবা তাঁহার প্রীতির জন্য নিরন্তর দীর্ঘকাল ভগবন্নাম কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করা। যাঁহার নিকট অপরাধ করা তাঁহাকে প্রসন্ন করা ভিন্ন এই অপরাধ-বিমোচনের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তাই শ্রীজীব গোস্বামিপাদ সূত্রাকারে লিখিয়াছেন :—

তৎপ্রসাদং বিনা তদসিদ্ধেঃ।

পূজ্যপাদ সন্দর্ভকার ইহার যে উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই—

যোঽসৌ ময়া বিদিততত্ত্বদৃশা সভায়াং
ক্ষিপ্তো দুরুক্তিবিশিখৈর্বিগণয্য তন্মাম্।
অর্ব্বাক্ পতন্তমর্হত্তমনিন্দয়াপা-
দ্দৃষ্ট্যার্দ্রয়া স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেৎ॥

অর্থাৎ শিবের ক্রোধে দক্ষ প্রজাপতির মুণ্ডপাত হয় এবং তাঁহার দেহে ছাগমুণ্ড সংযোজিত হয়। দক্ষ প্রজাপতি স্বীয় অপরাধ বুঝিতে পারিয়া প্রাগুক্ত পদ্যে মহাদেবের স্তব করেন। উহার বঙ্গানুবাদ এই যে "প্রভো, আমি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়াতে যজ্ঞ-সভায় আপনার প্রতি বিবিধ দুর্ব্বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আপনি আমার নিমিত্ত তাহা বিস্মৃত হইলেন। অপিচ পূজ্যতমের নিন্দা করিয়া আমার যে অধঃপতন হইয়াছিল, তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করিলেন। পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে পারিলেই যাঁহার সন্তোষ হয়, আমি কি তাঁহার কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইব ?"

ভজনে প্রবৃত্ত বৈষ্ণবগণের প্রাগুক্ত অপরাধ বিষয়ে সাবধান হইয়া চলিতে হয়। তাঁহাদের আত্মা নানা প্রকার সুবিধানে ও শ্রীভগবানের কৃপাসুধায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ক্রমেই অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমানন্দ উপভোগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েন।

সেবাপরাধ সম্বন্ধে শ্রীপাদ গোস্বামি মহোদয়গণ যে সকল অপরাধের উল্লেখ করিয়াছেন, ভজনে প্রবৃত্ত বৈষ্ণব মাত্রেরই সেই সকল অপরাধের

প্রত্যেকটীর প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে এবং তৎসম্বন্ধে সদ্‌-গুরুর নিকট যথাশাস্ত্র উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

বৈধীভক্তির বিস্তৃত আলোচনায় কোন কোন পাঠক মনে কবিতে পারেন আমরা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণব দর্শনের মর্ম্মস্তলদর্শী, যাঁহারা বৈষ্ণব ভজন-তত্ত্বের শিক্ষাগুরু, তাঁহারা ধর্ম্মজীবনের ক্রমবিকাশের যে সকল নিয়ম ও প্রণালী কৃপা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, আমাদের ন্যায় বিষয়ী প্রথম অধিকারীর জন্য অবশ্যই সেই সকল নিয়ম অনুসরণীয়, নচেৎ হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বের স্ফুর্ত্তি-সম্ভাবনা নাই; রাগানুগা ভক্তিলাভতো দূরের কথা। ধর্ম্মধ্বজিত্ব বা আত্মপ্রতারণায় লোকের চিত্ত ভজনের অযোগ্য হইয়া পড়ে। প্রতিদিন এক একবার আত্মচিত্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা একান্ত কর্ত্তব্য যে, সেই গোলকের ধন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলের ধ্যান-ধারণায় চিত্ত সুপটু হইল কিনা, তাঁহাদের লীলা-রস-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র আস্বাদন করার জন্য হৃদয় প্রস্তুত হইল কিনা, শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণের জন্য চিত্তভূমি প্রস্তুত হইল কিনা?

ক্ষেত্রে বীজাঙ্কুরোদ্গমের জন্য যেমন যত্নের সহিত কর্ষণের আবশ্যক, তেমনি জলদমালার পললধারাও প্রয়োজনীয়। সাধকের পক্ষেও এই রীতি। সাধককে যেমন বৈধীভক্তি দ্বারা সুন্দররূপে চিত্তভূমি কর্ষণ করিতে হইবে, আবার তেমনি শ্যাম-জলদের কৃপা-পলল-বর্ষণের জন্যও প্রতীক্ষা করিতে হইবে; নচেৎ প্রেম-বীজাঙ্কুরের সম্ভাবনা অতি বিরল। বীজ বপন করিয়া দিয়াও কৃষককে অনুক্ষণ সাবধান থাকিতে হয়। ক্ষেত্রে অপর উদ্ভিদ্ প্রভাব না পায়, কীটকুলের সমাগমে অঙ্কুর বিনষ্ট না হইতে পারে এজন্য কৃষককে সর্ব্বদাই সতর্কতা গ্রহণ করিতে হয়। প্রেমলাভার্থী সাধকগণের সাধন ইহা অপেক্ষা সহজতর বলিয়া মনে করা অসঙ্গত। সহজিয়াগণ সহজে হরিভক্তি লাভ করিতে চাহেন কিন্তু শাস্ত্রকার বলেন:—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি ভুক্তি র্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন-সাহস্রৈ র্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

যজ্ঞাদি পুণ্য দ্বারা স্বর্গভোগ লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তির জনক, কিন্তু এই প্রকার সহস্র সহস্র সাধনেও হরিভক্তি সুদুর্লভা। শ্রীহরিভক্তি-লাভের সাধন স্বতন্ত্র, এবং সেই সাধন প্রণালী-বিন্যাসই বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশিষ্টতা। প্রেম প্রয়োজন। এই নিত্যসিদ্ধ প্রেম যাহাতে হৃদয়ে প্রকটিত হয় তাহার সাধন আছে। শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণ উহার একতম। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণে ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ, কম্প, পুলকাদি গদ্গদ অশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফলে পাই এত ধন॥

কিন্তু এই নাম গ্রহণেও সাধককে সমুচিত সাবধান হইতে হইবে। সেবাপরাধের ন্যায় নামাপরাধও ভক্তিলাভের গুরুতর বাধক। নামের ফল,—প্রেম-লাভ। কিন্তু নিরপরাধ হইয়া নাম গ্রহণ করিতে হইবে যথা শ্রীচরিতামৃতে ঃ—

"নিরপরাধে নাম লইলে দেন প্রেমধন।"

নচেৎ বহুবার শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করিলেও প্রেমলাভ অসম্ভব। নামের ফলে বস্তুশক্তির ন্যায় পাপাদি অবশ্যই তিরোহিত হইবে কিন্তু প্রেম লাভ হইবে না। হেলায় ও অশ্রদ্ধায় শ্রীনাম গ্রহণ করিলেও লোক পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। কিন্তু নামাপরাধ বড় গুরুতর অপরাধ। নাম অপরাধীর হৃদয়ে কৃষ্ণনাম বীজ অঙ্কুরিত হয় না। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঃ—

হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহা না হয় অঙ্কুর॥

এই নামাপরাধ দশটী যথা ঃ—

১। সাধুনিন্দা।

২। বিষ্ণু নাম হইতে শিব নামাদির পৃথক্ পবিচিন্তন।

৩। গুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা।

৪। শ্রুতি ও তদনুগত শাস্ত্র নিন্দন।

৫। হরিনাম মহিমায় অর্থবাদ মনে করা অর্থাৎ হরিনামের শাস্ত্র বর্ণিত মহাত্ম্য কেবল স্তুতিবাদ মাত্র অর্থ কল্পনা।

৬। প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা করা।

৭। নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি।

৮। ব্রত দান প্রভৃতি অন্যান্য শুভ কর্ম্মের সহিত শ্রীহরিনামের তুলনা।

৯। শ্রদ্ধাহীন জনের প্রতি নামোপদেশ।

১০। নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে অপ্রীতি।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে ইহার যে বচন-প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এই—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগরিহাং।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণো র্য ইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনং।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈ র্হি শুদ্ধিঃ॥

ধর্ম্মব্রতত্যাগ হুতাদি সর্ব্ব-
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্ধধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
শ্রুতেঽপি নাম মাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং মমাদিপরমো নাম্নি সোপ্যপরাধকৃৎ॥

এস্থলে দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনার কথা উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে "অহং মমাদি পরমঃ" বলিয়া অন্য একটী নামাপরাধের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। নাম-গ্রহণের অপেক্ষা বিষয়-ভোগের আধিক্যের অনুষ্ঠানও নামাপরাধের মধ্যে গণ্য অথবা ইহার আরও এক অর্থ হইতে পারে তদ্‌যথা :—

"আমি বহুতর নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকি, এই যে ইতস্তত নাম কীর্ত্তন হইতেছে ইহাও আমার প্রবর্ত্তিত, আমার সমান নাম কীর্ত্তন আর কে করিতে পারে, নাম তো আমার জিহ্বার অধীন" এই প্রকার গর্ব্ব এক গুরুতর নামাপরাধ। সাধকগণ সাবধান ভাবে নামাপরাধ পরিবর্জ্জন করেন। যদি প্রমাদেও সাধকের কখনও নামাপরাধ হয়, অনুতাপসহ ভক্তিভরে নামকীর্ত্তন করা ভিন্ন তাহা হইতে ত্রাণের আর দ্বিতীয় উপায় নাই; পদ্মপুরাণ বলেন :—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরি-সংশ্রয়াৎ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

অর্থাৎ মানুষ বিবিধ প্রকার অপরাধ করিয়াও শ্রীহরিচরণারবিন্দ আশ্রয় করিলে সকল অপরাধ হইতে মুক্তি পায়। হরির নিকট অপরাধী হইলে হরিনামই সে অপরাধ হইতে একমাত্র ত্রাতা। হরিনাম সকলের সুহৃদ্।

সুতরাং নামাপরাধ করিলে পাতিত্য অবশ্যম্ভাবি। নাম অপরাধ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ভক্তিভরে শ্রীহরিনাম করা যথা ঃ—

জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়েন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তাণি তান্যেবার্থকরানি চ॥

নামাপরাধ হইতে পরিত্রাণ লাভের কেবল অবিশ্রান্ত নামকীর্ত্তনই একমাত্র উপায়। পদ্মপুরাণে এ সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ আছে। ভক্তি-সন্দর্ভেও যথেষ্ট বিচার পরিদৃষ্ট হয়।

বৈধীভক্তির দ্বিতীয় দশকের শেষ উপদেশ—

কৃষ্ণতদ্ভক্তবিদ্বেষবিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অথবা তদ্ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ ও বিনিন্দাদি সূচক বাক্য বা কার্য্যাদিতে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ। তাই ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"ক্রোধ কৃষ্ণদ্বেষী জনে।" শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃন্বং স্তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥

অর্থাৎ যে ভগবানের বা তৎপরায়ণ ভক্তজনের নিন্দা শ্রবণ করিয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন না করে, সে সর্ব্বপুণ্যবিচ্যুত হইয়া অধোগামী হয়। শ্রীভাগবতের এই পদ্যটী শ্রীহরিভক্তিবিলাসে, শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এবং শ্রীভক্তিসন্দর্ভে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মনু বলেন—

গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দাবাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ॥

যেস্থানে গুরুর পরীবাদ বা নিন্দা হয়, সেখানে কর্ণরোধ করিয়া তাহা শ্রবণ না করা কর্ত্তব্য অথবা সেস্থান হইতে তৎক্ষণাৎ অন্যত্র চলিয়া যাওয়া উচিত। বিদ্যমান দোষের উল্লেখের নাম পরিবাদ বা পরীবাদ, এবং

অবিদ্যমান দোষের উল্লেখের নাম নিন্দা। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সদাচারেও ভবিষ্যপুরাণোক্ত এই মর্ম্মের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

তুষ্ণীমাসীত নিন্দায়াং ন ব্রূয়াৎ কিঞ্চিদুত্তরং।
কর্ণৌ পিধায় গন্তব্যং ন চৈনমবলোকয়েৎ ॥

কুমারসম্ভবে শ্রীউমামুখোক্তি এই—

ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।

অর্থাৎ যে মহতের নিন্দা করে, কেবল সেই যে পাপভাক্ হয় তাহা নহে, যে সে নিন্দা শ্রবণ করে তাহারও পাপ হয়। শ্রীভাগবতে লিখিত আছে সতীদেবী দক্ষযজ্ঞে পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া একেবারে অধীর হইয়া বলিলেন—

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে,
ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্য মানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতীমসতীং প্রভুশ্চেৎ
জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ।

অর্থাৎ নিরঙ্কুশ মানবকুল যে স্থানে ধর্ম্মরক্ষক স্বামীর নিন্দা করে, সেখানে যদি প্রতিক্রিয়ার সামর্থ্য না হয়, তবে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া তথা হইতে নির্গত হইয়া যাইবে; যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঐরূপ অকল্যাণ বচন প্রয়োগ করে, তাহার জিহ্বা বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া দিবে, তৎপরে আপন প্রাণও ত্যাগ করিবে।

শ্রীভাগবতের উক্ত শ্লোক ভক্তিসন্দর্ভেও ধৃত হইয়াছে। ইহা সতীর উক্তি। কিন্তু বৈষ্ণবগণের পক্ষে এ উপদেশ প্রযুজ্য নহে। কেননা বৈষ্ণবগণ কাহাকেও উদ্বিগ্ন করিবেন না; স্বয়ং আহত বা প্রহৃত হইয়াও জীবের মঙ্গল সাধন করিবেন। শ্রীহরিদাসই ইহার উদাহরণ স্থল।

গুরুনিন্দা, বৈষ্ণবনিন্দা ও কৃষ্ণনিন্দা শ্রবণে এইরূপ অসহিষ্ণুতার উপ-

দেশ কেন প্রদত্ত হইল? বৈষ্ণবধর্ম্ম নির্ম্মৎসর সাধুগণের ধর্ম্ম। অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধ রজোগুণোদ্ভব। সাত্ত্বিকধর্ম্মে এতাদৃশ রজোগুণের প্রশ্রয় দেওয়া হইল কেন? একটুকু চিন্তা করিলেই ইহার কারণ বুঝা যাইতে পারে।

ইতঃপূর্ব্বেই আমরা উপদেশ পাইয়াছি, কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীরই উদ্বেগ করা অকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বৈষ্ণবকে তৃণাদপি সুনীচ হইতে হইবে। একটী তৃণেরও একপ্রান্ত পদাহত হইলে অপর প্রান্ত উদ্ধৃত হইয়া উঠে, কিন্তু বৈষ্ণবকে তৃণাপেক্ষাও নিরভিমান হইতে হইবে, বৈষ্ণব পদদলিত হইলেও মাথা তুলিবেন না ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। কিন্তু এই উপদেশ বৈষ্ণবের নিজ সম্বন্ধে। যদি তাঁহার সমক্ষে কৃষ্ণনিন্দা বা তদ্ভক্ত নিন্দা হয় তখন এই মৃদুতাকে বজ্রতেজে পরিণত করিতে হইবে, কর্ণরুদ্ধ করিয়া, কথাগুলি নিতান্ত অশ্রাব্য মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। উপাস্যদেবের বা তৎপ্রিয়জনের নিন্দা শুনিয়া যদি অসহিষ্ণুতা না জন্মিল, তবে তাঁহার বা তদীয় জনগণের প্রতি কাহারও যে প্রীতি আছে, তাহার পরিচয় কি? তদ্ব্যতীত নিন্দকসংসর্গে শ্রীভগবন্নিন্দা শুনিতে শুনিতে ভক্তি তো দূরের কথা,—সামান্য শ্রদ্ধার পর্য্যন্ত হানি হইতে থাকে। এইরূপে সাধকের আরাধ্য বস্তু ক্রমেই তাঁহার হৃদয় হইতে সরিয়া পড়েন। সুতরাং এ সম্বন্ধে সবিশেষ সাবধানতা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই, পরমকারুণিক শাস্ত্রকারগণ এই সম্বন্ধে এইরূপ কঠোর আদেশ দিয়া সাধকগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

ব্যক্তিবিশেষের মনে এইরূপ উপদেশ "গোড়ামি" বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা নিষ্ঠাবান্, উপাস্যদেবতা বা তাঁহার আপনজনগণ যাঁহাদের অতিপ্রিয়, তাদৃশ সাধকগণের চিত্ত প্রিয়জনগণের নিন্দা শ্রবণ করিয়া অবিচলিত থাকিতে পারেন না, ইহা স্বভাবসিদ্ধ। তবে সমাধিমগ্ন আত্মেশ্বর যোগীদের কথা স্বতন্ত্র। কেননা তাঁহাদের নিকট জাগতিক সর্ব্ব প্রকার দ্বন্দ্বভাবই তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রেমসম্পত্তিই

যাঁহাদের ভজনের বল, তাঁহারা প্রিয়জনের নিন্দা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারেন না, তাঁহাদের প্রাণ হইতে প্রিয়তম শ্রীভগবানের নিন্দাবাদ শুনিলে স্বতঃই তাঁহাদের হৃদয় অধীর হইয়া উঠে। জগতে এই জন্য অনেক স্থলে অনেকবার ভীষণ রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে। এখন সেই সকল নিদারুণ ব্যাপারের প্রশ্রয় পাওয়া অসঙ্গত। এ সম্বন্ধে মনুর বিধিই এখন একমাত্র অনুসরণীয়। অর্থাৎ যেথানে গুরুজনের নিন্দা বা পরীবাদ হয়, কর্ণরুদ্ধ করিয়া সেস্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। এই বিধিই হিংসা-বিহীন শান্ত বৈষ্ণবগণের পক্ষে পালনীয়। নচেৎ দম্ভ, ক্রোধ, অপরের উদ্বেগ বা দৈহিক দণ্ড বিধান করা বৈষ্ণবের পক্ষে নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

এই পর্য্যন্ত ৬৪ অঙ্গের দ্বিতীয় দশাঙ্কের উল্লেখ করা হইল। শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুকার এই স্থলে বলিয়াছেন—

ব্যতিরেকেতয়ামীষাং দশানাং স্যাদনুষ্ঠিতঃ
অস্যাস্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেহপ্যঙ্গ বিংশতেঃ।
ত্রয়প্রধানমেবোক্তং গুরুপাদাশ্রয়াদিকং॥

অর্থাৎ সাধনভক্তিতে প্রবেশের পক্ষে এই বিংশতি অঙ্গ দ্বারস্বরূপ। এত মধ্যে গুরুপাদাশ্রয়াদি তিনটী প্রধান। এই তিন বিষয়ের বচন প্রমাণ গুরু-গীতায়, শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এবং ভক্তিসন্দর্ভের বৈধীভক্তি প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

এই বিংশতি অঙ্গের পরে চতুঃষষ্ঠী অঙ্গভক্তির যে সকল অঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই ক্রিয়া-প্রধান, তদ্‌যথা—

ধৃতি বৈষ্ণবচিহ্নানাং হরের্নামাক্ষরস্য চ।
নির্ম্মাল্যাদেশ্চ তস্যাগ্রে তাণ্ডবং দণ্ডবন্নতিঃ।
অভ্যুত্থান মনুব্রজ্যা গতিঃ স্থানপরিক্রমা।
অর্চ্চনং পরিচর্য্যাচ গীতং সঙ্কীর্ত্তনং জপঃ॥
বিজ্ঞপ্তিস্তব পাঠশ্চ স্বাদোনৈবেদ্য পাদ্যয়োঃ।
ধূপমাল্যাদিসৌরভ্যং শ্রীমূর্ত্তেঃ স্পৃষ্টিরীক্ষণম্॥

আরাত্রিকোৎসবাদেশ্চ শ্রবণং তৎ কৃপেক্ষণং।
স্মৃতির্ধ্যানং তথাদাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
নিজপ্রিয়োপহরণং তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্।
সর্ব্বথা শরণাপত্তি স্তদীয়ানাঞ্চ সেবনম্॥
তদীয়া স্তুলসী শাস্ত্রমথুরাবৈষ্ণবাদয়ঃ।
যথা বৈভবসামগ্রী সংগোষ্ঠিভি র্মহোৎসবঃ॥
উর্জ্জাদরোবিশেষেণ যাত্রাজন্মদিনাদিষু।
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতি শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি সেবনে॥
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানা মাস্বাদো রসিকৈ সহঃ
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥

ক্রমশঃ এই অবশিষ্ট অঙ্গগুলির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

২১। বৈষ্ণব চিহ্নসমূহের ধারণ—মালাতিলকধারণ বৈষ্ণবচিহ্ন বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ ভক্তির অঙ্গস্বরূপ।

পদ্মপুরাণ বলেন—

যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা
যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ।
যে বা ললাট ফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রা
স্তে বৈষ্ণবা ভুবন মাশু পবিত্রয়ন্তি।

অর্থাৎ যাঁহাদের কণ্ঠদেশ তুলসী পদ্মবীজ বা রুদ্রাক্ষমালা দ্বারা শোভিত, যাঁহাদের বাহুমূল শঙ্খ চক্র চিহ্নে পরিচিহ্নিত, যাঁহাদের ললাট-দেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেদীপ্যমান, তাদৃশ বৈষ্ণবগণ ভুবনকে পবিত্র করেন। এই বচন দ্বারা মালাতিলকের মাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়াছে। শাস্ত্রলাঞ্ছিক চক্রধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে আর কিছুমাত্রও বিমত হইতে পারে

না। কেহ কেহ বলিতে পারেন কেবলমাত্র চিহ্নই বৈষ্ণবের পরিচায়ক নহে। মনু (৬।৬৬।৬৭) বলেন—

দূষিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্রতত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্ ॥
ফলং কতক বৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকম্।
ন নাম গ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি ॥

মেধাতিথি ও কল্লুকভট্টের ব্যাখ্যা অনুসারে ইহার অর্থ এই যে আশ্রমলিঙ্গরহিত হইলেও ব্রহ্মবুদ্ধিতে সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কেবল দণ্ডাদি লিঙ্গ ধারণই ধর্ম্মকারণ নহে, বিহিত অনুষ্ঠানই ধর্ম্মকারণ। রাগদ্বেষলোভ প্রভৃতি যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিতে হইবে। এই শ্লোকটী ধর্ম্মপ্রাধান্যবোধের নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু চিহ্ন-ত্যাগের উদ্দেশ্যে এই বচন ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহার উদাহরণ এই যে কতক বৃক্ষের ফল কলুষজলের স্বচ্ছতাজনক বটে, কিন্তু কেবল সেই ফলের নাম গ্রহণ করিলে জল নির্ম্মল হয় না, জল নির্ম্মলীকরণের জন্য কতকফলনিক্ষেপরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। চিহ্নধারণ কেবল ফলের নাম করা সদৃশ। সুতরাং কেবল চিহ্নধারণ করিলেই অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয় না, বিহিত অনুষ্ঠানও প্রয়োজনীয়। কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ চিহ্নধারণকেও ভক্তির অঙ্গমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে মালাধারণ ও তিলকসেবা অবশ্য কর্ত্তব্য। নচেৎ আশ্রমাচারের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়, এবং তাহাতে ভক্তিদেবী অপ্রসন্না হয়েন। তিলকসেবা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশ শ্রীচৈতন্যভাগবতে অতি সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে, তদ্যথা—

প্রভু বলে কেন তাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেন কি যুক্তি ইহার ॥

তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান সদৃশ বেদে বলে॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করাই কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে। তদ্যথা—পদ্মপুরাণে নারদ বলেন—

যজ্ঞোদানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বং মূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনাকৃতম্॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু সন্ধ্যা কর্ম্মাদিকং চরেৎ।
তৎসর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকঞ্চাধি গচ্ছতি॥
যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনাকৃতং।
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ॥
যস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে ন নরস্য হি।
তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ॥

শাস্ত্রে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণের যথেষ্ট মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—

অশুচির্ব্বাপ্যনাচারো মনসা পাপ মাচরন্।
শুচিরেব ভবেন্নিত্য মূর্দ্ধপুণ্ড্রাঙ্কিতো নরঃ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীভগবানের উক্তিতে লিখিত আছে—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো ম্রিয়তে যত্রকুত্রচিৎ।
শ্বপাকোপি বিমানস্থো মমলোকং মহীয়তে॥

বৈষ্ণবভূষণ দ্বাদশ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের প্রণালী এই—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণ মথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌচ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরেতু বামনং বামপার্শ্বকে॥
শ্রীধরং বাম বাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।

পৃষ্ঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥
তৎপ্রক্ষালন-তোয়ন্তু বাসুদেবাদি মূর্দ্ধনি।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটেতু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতং।
ললাটাদি ক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে ॥

অর্থাৎ ললাটে কেশবায় নমঃ, উদরে শ্রীনারায়ণায় নমঃ, বক্ষঃস্থলে শ্রীমাধবায় নমঃ, কণ্ঠে শ্রীগোবিন্দায় নমঃ দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, দক্ষিণ বাহুতে শ্রীমধুসূদনায় নমঃ, দক্ষিণ কন্ধরে শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ, বামপার্শ্বে শ্রীবামনায় নমঃ, বামবাহুতে শ্রীধরায় নমঃ, বাম কন্ধরে হৃষিকেশায় নমঃ, পৃষ্ঠে শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ, কটিতে শ্রীদামোদরায় নমঃ। এইরূপে তিলক সেবা করিয়া বামহস্তপ্রক্ষালিত জল শ্রীবাসুদেবায় নমঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মস্তকে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। তিলক প্রক্ষালন জল বাসুদেবায় নমঃ এই মন্ত্রে অকারাদি দ্বাদশ স্বরবর্ণসহ নিজ মস্তকে ন্যাস করিবে। কেহ কেহ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারাও ন্যাস করেন। প্রথমতঃ ললাটে তিলক ধারণ করিতে হইবে, তৎপরে যথাক্রমে অন্যান্য স্থানে তিলক করিতে হইবে।

প্রাগুক্ত বচনে "কন্ধর" পাঠ অনেক গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু অভিধানে কন্ধর অর্থ মেঘ,—কং জলং ধরয়তীতি কন্ধরঃ। গ্রীবা অর্থেও কন্ধর কন্ধরা উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গ্রীবাতে তিলক দেওয়ার ব্যবস্থা কুত্রাপি দেখা যায় না। বৈষ্ণবগণ বাহুমূলে তিলক করেন, বাহুমূলে তিলক করার ব্যবস্থাও আছে। উল্লিখিত বচনে বাহুমূল শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ বাহুমূলস্থলই কন্ধর শব্দের লাক্ষণিক অর্থ হইতে পারে। কেহ কেহ কন্ধর অর্থ স্কন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা কল্পনা মাত্র। অমরকোষ এবং উহার টীকাসমূহে কন্ধর অর্থ স্কন্ধ বলিয়া লিখিত হয় নাই। মেদিনী, হেমচন্দ্র, ত্রিকাণ্ডশেষ প্রভৃতি আভিধানিকেরাও কন্ধর অর্থ স্কন্ধ বলিয়া অভিহিত করেন নাই। আধুনিক কোষকারগণের মধ্যে

শব্দকল্পদ্রুম বা বাচস্পত্যাভিধানেও কন্ধর শব্দের স্কন্ধ অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে শব্দটী যদি কন্ধর না হইয়া "কন্দর" হয় তবে স্কন্ধ-কন্দর অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, আর বাহুমূল হইতে উর্দ্ধ ত্রিপুণ্ড্র পরিমিতরূপে সরলভাবে অঙ্কিত করিলে উহা স্কন্ধ-কন্দরের উপর দিয়া গ্রীবামূল পর্য্যন্ত পৌছে। উর্দ্ধত্রিপুণ্ড্রের পরিমাণ বচন যথা—

দশাঙ্গুলপ্রমাণস্তু উত্তমোত্তম মুচ্যতে।
নবাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাৎ অষ্টাঙ্গুল মতঃপরম্॥

অর্থাৎ দশাঙ্গুল পরিমিত উর্দ্ধপুণ্ড্র উত্তম হইতে উত্তম, নয় অঙ্গুল পরিমাণ মধ্যম, অষ্টমাঙ্গুল পরিমাণ কনিষ্ঠ। সুতরাং বাহুমূল হইতে আরম্ভ করিয়া স্কন্ধ-কন্দর দিয়া গ্রীবামূল পর্য্যন্ত উর্দ্ধপুণ্ড্র হওয়াই প্রশস্ত।

মালা ধারণের সম্বন্ধে অক্ষমালাও বিহিত হইয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণবের পক্ষে তুলসীমালাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ততম এবং উহাই বৈষ্ণবাচারসম্মত।

অতঃপর অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নাম লিখন (২২), নির্ম্মাল্য ধারণ (২৩), শ্রীভগবানের মূর্ত্তির অগ্রে নর্ত্তন (২৪), দণ্ডবৎ নমস্কার (২৫), শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান (২৬), অনুব্রজ্যা (২৭), অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন, (২৮) এবং শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান স্থানে গমন ও ভক্তির অঙ্গ। তাঁহার অধিষ্ঠান দ্বিবিধ—এক তীর্থাদি, অপর—শ্রীভগবন্মন্দির (২৯), অর্চ্চন (৩০)। পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার অর্চ্চনের যে লক্ষণ করিয়াছেন তাহা এই—

শুদ্ধিন্যাসাদি পূর্ব্বাঙ্গ কর্ম্মনির্ব্বাহ পূর্ব্বকম্।
অর্চ্চনন্তু্যপচারাণাং স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনম্॥

অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাসাদি পূর্ব্বাঙ্গনির্ব্বাহপূর্ব্বক মন্ত্র দ্বারা উপচার-সমর্পণকেই অর্চ্চনা বলা হয়।

পরিচর্য্যা (৩১)—পরিচর্য্যা দুই প্রকার—উপকরণাদি পরিষ্কার, এবং চামরাদি দ্বারা উপাসনা। যথা—

পরিচর্য্যাতু সেবোপকরণাদি পরিক্রিয়া।
তথা প্রকীর্ণচ্ছত্রাদিবাদিত্রাদ্যৈরুপাসনা॥

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী বলেন রাজার ন্যায় সেবাই এস্থলে পরিচর্য্যা শব্দের বাচ্য।

গীত (৩২), সংকীর্ত্তন (৩৩),—এই সংকীর্ত্তন ত্রিবিধ যথা—

নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্ত্তনম্।

অর্থাৎ নাম লীলা ও গুণাদির উচ্চ উচ্চারণ করাকেই কীর্ত্তন বলা যায়।

জপ (৩৪)—মন্ত্রের অত্যন্ত লঘু উচ্চারণই জপ। বিজ্ঞপ্তি (৩৫)—বিজ্ঞপ্তি অর্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিশেষরূপে নিবেদন। বিজ্ঞপ্তি বহু প্রকার। তন্মধ্যে সংপ্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তি উদাহরণ সহ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত হইয়াছে।

সংপ্রার্থনাত্মিকা বিজ্ঞপ্তির উদাহরণ যথা—

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোভিরমতে তদ্বৎ মনোভিরমতাং ত্বয়ি॥

অর্থাৎ হে ভগবন্, যুবতীগণের মন যেমন যুব পুরুষে এবং যুবগণের মন যেমন যুবতীগণে আসক্ত হয় আমার মন তোমাতে যেন সেইরূপ আসক্ত হয়।

দৈন্যবোধিকার উদাহরণ—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধীচ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥

অর্থাৎ হে পুরুষোত্তম, আমার ন্যায় পাপাত্মা ও অপরাধী জগতে আর কে আছে? এমন কি পাপপরিহারের নিমিত্ত তোমার নিকট দৈন্য জানাইতেও লজ্জা বোধ হইতেছে।

লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তির উদাহরণ—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবান্।

"হে নলিন-নয়ন, কবে আমার এমন দিন হইবে যে যমুনা-তীরে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সজল নয়নে তাণ্ডব নৃত্য করিতে আরম্ভ কবিব।" ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা এই ত্রিবিধ বিজ্ঞপ্তিতে পরিপূর্ণ।

স্তব পাঠ (৩৬), নৈবেদ্য স্বাদ গ্রহণ (৩৭), পাদ্যোদকের স্বাদ গ্রহণ (৩৮), ধূপমাল্যাদির ঘ্রাণ গ্রহণ (৩৯), শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন (৪০), শ্রীমূর্ত্তি দর্শন (৪১), আরত্রিক ও উৎসবাদি দর্শন (৪২), আদি শব্দে এখানে পূজা দর্শন ও বুঝিতে হইবে। শ্রবণ (৪৩), এই শ্রবণ তিন প্রকার—নাম শ্রবণ, চরিত্র শ্রবণ, ও গুণ শ্রবণ। তৎকৃপেক্ষণ (৪৪) অর্থাৎ কবে শ্রীকৃষ্ণের দয়া হইবে এই আশানুবন্ধে কালাতিবাহিত করা। স্মৃতি (৪৫), ধ্যান (৪৬) এই ধ্যান চারিপ্রকার—রূপধ্যান, গুণধ্যান, ক্রীড়াধ্যান এবং সেবাদির ধ্যান। রূপ-গুণাদির সুষ্ঠু চিন্তনই ধ্যানশব্দ বাচ্য।

সেবাধ্যান বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে একটী অদ্ভুত গল্প আছে। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় ঐ গল্পটীর সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা উহার একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়াদিতেছি। তদ্‌যথা :—প্রতিষ্ঠানপুরে কোন এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, কিন্তু তিনি দরিদ্র হইয়াও আপনাকে কর্ম্মাধীন মানিয়া শান্তচিত্তে কালযাপন করিতেন, ব্রাহ্মণ অতি সরলচিত্ত, কোন সময়ে বিজ্ঞতম বিপ্রদিগের সভায় বৈষ্ণবধর্ম্ম সকল শ্রবণ করিতে করিতে তিনি "ঐ ধর্ম্মসকল মনের দ্বারাও সিদ্ধ হয়", এই কথা স্মরণ করিয়া স্বীয় দরিদ্রতানিবন্ধন স্বয়ং মনে মনে ঐ মানসিক ধর্ম্মের আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন এক দিবস গোদাবরী নদীতে স্নান পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিলেন, পরে নিশ্চল বুদ্ধিতে নির্জ্জন প্রদেশে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণায়ামাদি দ্বারা মনকে স্থির করিয়া তন্মধ্যে শ্রীভগবান্ হরির মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পরিচর্য্যা সন্নিধান করিলেন, পরে স্নানীয়

পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে কটি বন্ধন করিয়া শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ মূর্ত্তিকে প্রণিপাত পুরঃসর স্বর্ণরৌপ্য নির্ম্মিত কলস দ্বারা গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ সকল হইতে জল আনয়ন করিলেন, তদনন্তর বিবিধ দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক মহারাজোপচারে তাঁহার স্নানাদি আরত্রিক পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া দিন দিন অতিশয় সুখানুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইলে কোন এক দিবস মনে মনে পরমান্ন পাক করিয়া স্বর্ণপাত্রে সংস্থাপন কবিয়া ভগবানের ভোজনের জন্য দণ্ডায়-মান হইলেন। পরমান্নের উত্তপ্ততা গিয়াছে কিনা তাহাই দেখিবার জন্য মনে মনেই উহাতে নিজের অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন, অঙ্গুলিতে অত্যন্ত তাপ লাগিল। তাহাব মনে হইল যে অঙ্গুলী দগ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণের কষ্ট বোধ হইল না। তাঁহাব মনে হইল "হায় এ কি করিলাম, অঙ্গুলী স্পর্শে পরমান্ন যে কলুষিত হইল।" দুঃখিত চিত্তে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল এবং অনুতাপ করিতে করিতে দৈবাৎ অঙ্গুলীর প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে দেখিলেন সত্যই অঙ্গুলী দগ্ধ হইয়াছে, ব্রাহ্মণের এই ব্যবহার জ্ঞাত হইয়া বৈকুণ্ঠাধিপতি বৈকুণ্ঠ-নাথ ঈষৎ হাস্য কবিলেন। লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তিগণ সমীপবর্ত্তিনী থাকিয়া হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা কবিলেন, প্রভো! আপনি হাস্য করিলেন কেন? ভগবান্ কোন উত্তব না কবিয়া আপনার বিমান প্রেরণ পূর্ব্বক ঐ ব্রাহ্মণকে স্বীয় নিকটে আনয়ন করিলেন এবং প্রেয়সীগণকে দেখাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর ভগবান ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বৈকুণ্ঠে স্থান দান পূর্ব্বক বাসের অধিকার প্রদান করিলেন।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে :—

"ধ্যানং-রূপগুণক্রীড়াসেবাদেঃ সুষ্ঠুচিন্তনম্।"

অর্থাৎ রূপগুণক্রীড়া ও সেবাদির সুষ্ঠু চিন্তনই ধ্যান। এই ধ্যান অষ্টাঙ্গ যোগের এক অঙ্গ। এক অঙ্গ হইলেও আসন প্রাণায়ামাদির ন্যায় বহিরঙ্গ

নহে। ধ্যান,—যোগের অন্তরঙ্গ অঙ্গ। ধ্যানের কথা বলিতে হইলে অগ্রে ধারণার কথা বলিতে হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত নিগ্রহ করিতে হয়। চিত্ত নিগৃহীত না হইলে বিষয় হইতে চিত্ত বিনিবৃত্ত হইয়া ধ্যেয় পদার্থের আভিমুখ্য লাভ করিতে পারে না। এইরূপ আভিমুখ্যব্যাপারে প্রত্যাহারই প্রধান সাধন। প্রত্যাহার অভ্যস্ত হইলে ধারণা সহজেই সাধিত হয়। যোগাচার্য্য পতঞ্জলি বলেন :—

দেশবন্ধচিত্তস্য ধারণা। ৩।১

অর্থাৎ চিত্তকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা। শ্রীভগবদ্‌গীতাতে এই ধারণা ধৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে যথা :—

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ধৃতি তিন প্রকার। ধৃতির এই প্রকার ভেদ গীতার ১৮শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। চিত্তকে কোন স্থানে বিধৃত করিয়া রাখার অভ্যাসই ধারণা নামে অভিহিত। এই নিমিত্ত যোগীদের জন্য শ্রীভগবানের উপদেশ এই যে :—

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরং।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥

অর্থাৎ শরীর মস্তক গ্রীবা অবক্র ও নিশ্চলরূপে ধারণ এবং দৃষ্টিকে অন্যান্য দিক হইতে আকৃষ্ট করিয়া স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। ধারণা সম্বন্ধীয় পাতঞ্জলসূত্রের ব্যাসভাষ্যে লিখিত আছে "নাভিচক্রে হৃদয়পুণ্ডরীকে, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে ইত্যাদি দেশেষু বাহ্যে বা বিষয়ে চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রবন্ধ ইতি ধারণা।" অর্থাৎ নাভিচক্রে হৃৎপদ্মে ইত্যাদি স্থানে চিত্ত স্থির রাখার নাম ধারণা। ধারণায় চিত্ত একনিষ্ঠ হয়, এক চিন্তায় আবদ্ধ থাকে, এক বিষয় চিত্তবৃত্তি-সমক্ষে উপস্থিত থাকে। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে ধারণা

Concentration of attention নামে অভিহিত হইতে পারে। স্থান-বিশেষে বা বিষয়বিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখা সহজ নহে। অনেকেরই ধারণার অভাব। যাঁহারা ধারণানিপুণ, সংসারেরও অনেক কার্য্যে তাঁহারা সাফল্য লাভে সমর্থ। এই ধারণা অভ্যস্ত হইলেই চিত্ত ধ্যানের উপযুক্ততা লাভ করে। ধ্যানসম্বন্ধে যোগ সূত্র এই :—

তত্র প্রত্যৈকতানতা ধ্যানম্।

অর্থাৎ ধারণাক্ষেত্রে যখন একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ের একতান প্রবাহ ভিন্ন আর অপর প্রত্যয় উদিত না হয়, চিত্তে অবচ্ছিন্নভাবে কেবল একমাত্র ধ্যেয় প্রবাহ বহমান হয়, তাদৃশ অবস্থার নাম ধ্যান। বেদান্তসার বলেন :—

"ধ্যানম্—অদ্বিতীয় বস্তুনি বিচ্ছিদ্যবিচ্ছিদ্যান্তরেন্দ্রিয়বৃত্তিপ্রবাহঃ।"

অপর কেহ কেহ বলেন :—

বিজাতীয়প্রত্যয়ান্তরিতসজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহো—ধ্যানম্।

গরুড়পুরাণ বলেন :—

ধ্যেয়ে সক্তং মনো যস্য ধ্যেয়মেবানুপশ্যতি।
নান্যং পদার্থং জানাতি ধ্যানমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥

ফলতঃ ধ্যানে ধারণার পদার্থ নিরন্তর স্ফূর্ত্ত থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বিষয় আদৌ চিত্তে স্থান পায় না। চিত্ত তখন সম্পূর্ণরূপে ধ্যেয় পদার্থ ভিন্ন অপর পদার্থের জ্ঞানবর্জ্জিত হয়। ধারণা ও ধ্যানে পার্থক্য এই যে ধারণার কালে মনকে "বহু বস্তুর চিন্তন হইতে এক চিন্তায় আনিয়া স্থির করিতে হয়, কিন্তু চিত্ত তখন একবারে বিজাতীয় চিন্তা-প্রবাহ হইতে বিমুক্ত হয় না। ইহার এক গ্রাম উপরে উঠিয়া চিত্ত যখন বিজাতীয় প্রত্যয়বিবর্জ্জিত হয় এবং নিরন্তর একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ের চিন্তা-প্রবাহে পরিপূর্ণ হইয়া সেই বিষয়ের পরিচিন্তনে পূর্ণমাত্রায় আসক্ত হয়, তখন উহা ধ্যান নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য ধ্রুবানুস্মৃতিকেই ধ্যান বলেন। শ্রীনিম্বার্ক

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতীব আদৃত "পরপক্ষগিরিবজ্র" নামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে :—

ধ্যানঞ্চ,—বিজাতীয়প্রত্যয়শূন্যত্বে সতি ধ্যেয়াকারৈকস্মৃতিরূপং—তদেব পরিপাকাপন্নং ধ্রুবাস্মৃতি-পরাভক্তিশব্দাভিধেয়ম্ "সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ" "মদ্ভক্তিং লভতে পরা"মিতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং—তথাচ স্থিতৌ গমনেচ বিক্ষেপাৎ শয়নে লয়াচ্চ দুঃসাধ্যমিতি ভাবঃ। ধ্যানাচ্চেতি সূত্রাৎ তদ্ধ্যানং নৈশ্চল্যসাপেক্ষম্,—তদভাবেতদসিদ্ধেঃ। "ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌঃ ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতা ইত্যত্রাচলত্বমপেক্ষ ধ্যায়ন্তি প্রয়োগঃ। অচলত্বং চাপেক্ষেতি সূত্রাৎ।

শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতি নীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃকৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥

ইহার মর্ম্ম এই যে বিজাতীয় প্রত্যয় পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইলে ধ্যেয়াকার স্মৃতির প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে। উহার পরিপাক দশায় ধ্রুবাস্মৃতির উদয় হয়। এই ধ্রুবাস্মৃতি পরাভক্তি শব্দ অভিধেয়। সত্ত্বশুদ্ধিতে ধ্রুবাস্মৃতি প্রকাশ পায়। ইহাই শ্রীভগবদ্গীতোক্ত পরাভক্তি। এই ধ্রুবানুস্মৃতিই ধ্যান। ধ্যান নিশ্চলতাসাপেক্ষ। নিশ্চলতা ভিন্ন ধ্যান সিদ্ধ হয় না। যাহাতে কোন প্রকারে চিত্তক্ষোভ বা নিশ্চলতার অভাব না ঘটে, এরূপ স্থান আসন ও প্রক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধ্যানের জন্য উপবেশন করিতে হইবে। শুদ্ধ স্থানে স্থির আসনে উপবেশন করিতে হইবে, প্রথমে কুশাসন, উহার পরে অজিনাসন এবং তাহার উপরে পট্টবস্ত্রের আবরণ দিয়া আসন করিতে হইবে। আসনে উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া সংযত করিয়া মন একাগ্র করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধির নিয়োগে ধ্যানস্থ হইতে হইবে।

শ্রীহরিভক্তি :বিলাসে ও শ্রীপাদ শ্রীজীবের ভক্তিসন্দর্ভেও ধ্যান সম্বন্ধে আলোচনা দৃষ্ট হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যদিও এতৎসম্বন্ধে কোন বিচার দৃষ্ট হয় না, কেবল ধ্যানমাহাত্ম্যই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, :কিন্তু উহার টীকায় দার্শনিকভাবে স্মৃতি ও ধ্যানের ভেদাভেদ সম্বন্ধে সূত্রের ন্যায় সংক্ষিপ্তভাবে দুই একটী কথা বলা হইয়াছে, ভক্তিসন্দর্ভে স্মৃতি ও ধ্যানের সম্বন্ধে বিশদ দার্শনিক আলোচনা পরিলক্ষিত হয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রথমতঃ স্মৃতির কথা উল্লেখ করিয়া তৎপরে ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। স্মৃতির সংজ্ঞা এই যে :—

"যথাকথঞ্চিন্মনসা সম্বন্ধঃ স্মৃতিরুচ্যতে।"

অর্থাৎ যে কোন প্রকারে মনের সহিত শ্রীভগবানের একটুকু সম্বন্ধ হইলেই উহা স্মৃতিনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৩য় বিলাসে পদ্মপুরাণের বৈশাখ-মাহাত্ম্যের অন্তর্গত যমব্রাহ্মণসংবাদ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্যথা—

ধ্যায়ন্তি পুরুষং দিব্যমচ্যুতঞ্চ স্মরন্তি যে।
লভন্তে তেঽচ্যুতস্থানং শ্রুতিরেষা পুরাতনী ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিব্যপুরুষ অচ্যুতের ধ্যান ও স্মরণ করেন, তিনি অচ্যুতের স্থান প্রাপ্ত হন, ইহা প্রাচীন শ্রুতি।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—

"ধ্যায়ন্তি শ্রীপাদাব্জতলমারভ্য শ্রীকেশাগ্রপর্য্যন্তং সৌন্দর্য্যাদিসহিতং চিন্তয়ন্তি। অপ্যর্থে চকারঃ। ধ্যায়ন্তীত্যেদস্তু যে স্মরন্ত্যপি যথা কথঞ্চিৎ ভগবতি মনঃ সংযোজয়ন্তি তেঽপি। এবং ধ্যান স্মরণয়ো রভেদঃ কল্পনীয়ঃ, ধ্যায়ন্তীতি স্মরন্তীতি পৃথক্ প্রয়োগাৎ। অতএবাগ্রে লেখ্যং। ভেদঃ কল্পেত সামান্য বিশেষাত্মা তয়োরিতি, কেচিচ্চ কল্পয়ন্তি লঘু লঘূচ্চারণং স্মরণং কীর্ত্তনমুচ্চৈরিতি কুত্রচিন্নামকীর্ত্তনপ্রসঙ্গেঽস্মরণোক্তেঃ। তচ্চাসঙ্গতমিব। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃস্মরণমিত্যাদৌ বাস্তপাসনারূপাৎ

কীর্ত্তনাখ্যানসোপাসনারূপস্য স্মরণস্য পৃথগুক্তেঃ। এবঞ্চ নামকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে স্মরণং নাম্ন এব মনসি চিন্তনমিতি জ্ঞেয় মিতিদিক্।"

অর্থাৎ শ্রীপাদপদ্মতল হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকেশাগ্র পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্যাদিসহ চিন্তনই ধ্যান। উদ্ধৃত শ্লোকে "অচ্যুতঞ্চ শব্দে যে চকার আছে, ঐ চকার "অপি" অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ স্মরণ করিলেও—শ্রীভগবানে যথাকথঞ্চিৎ মনঃসংযোগ করিলেও,—অচ্যুত স্থান লাভ করা যায়। ফলতঃ ধ্যান ও স্মরণের অর্থগত বেশী বিভিন্নতা নাই। ধ্যান ও স্মরণ—সামান্য বিশেষজ্ঞা মাত্র। একটু পরেই মূলগ্রন্থে এই পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্‌যথা—

স্মরণে যত্তু মাহাত্ম্যং তদ্ধ্যানেঽপ্যখিলং বিদুঃ।
ভেদঃ কল্পেত সামান্যবিশেষাভ্যাং তয়োঃ কিয়ান্॥

টীকা অনুসারে ইহার ভাবার্থ এই যে স্মরণে ও ধ্যানে অল্পমাত্র ভেদ কল্পিত হইয়াছে। শ্রীভগবানে মনঃসংযোগ হইলেই উহা স্মরণ নামে অভিহিত হয়। শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গলাবণ্যাদি ভাবনাই ধ্যান,—বিশেষভাবে স্মরণই ধ্যান।

কেহ কেহ মনে করেন, লঘু লঘু উচ্চারণই স্মরণ; আর উচ্চভাবে স্মরণ করাই কীর্ত্তন। নামকীর্ত্তন প্রসঙ্গে কোন স্থানে অস্মরণ শব্দ দেখিয়াই তাঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ইহা অসঙ্গত। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃস্মরণং ইত্যাদি প্রমাণবচনে স্মরণ ও কীর্ত্তনের পৃথক্ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বাক্য দ্বারা উপাসনাই কীর্ত্তন, এবং মনদ্বারা উপাসনা স্মরণ। সুতরাং স্মরণ ও কীর্ত্তন এক নহে। নামকীর্ত্তন প্রসঙ্গে যে স্মরণ শব্দের উল্লেখ আছে, উহার অর্থ "শ্রীভগবানে মনঃসংযোগ" বুঝিতে হইবে।

শ্রীপাদ সনাতনের সিদ্ধান্তে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে স্মরণ ও ধ্যান এক জাতীয়। তবে যে উভয়ে অল্প একটু পার্থক্য আছে, উহা সামান্য-

বিশেষের পার্থক্য মাত্র। ভক্তি-সন্দর্ভে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভজনের উচ্চমন্দিরে আরোহণ করিতে হইলে সাধনার সোপান-অবলম্বন প্রয়োজনীয়। শ্রীজীব ক্রম-সোপানরীতির সমর্থক। তিনি বলেন ভগবৎ স্মরণ পাঁচ প্রকার—মনদ্বারা শ্রীভগবানের যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম, সামান্য স্মরণ। সকল বিষয় ও সকল চিন্তা হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া সামান্যাকারে ধ্যেয় পদার্থে মনোধারণাই ধারণা নামে অভিহিত। বিশেষরূপে রূপাদি চিন্তনের নাম ধ্যান। এই ধ্যান অমৃতধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন হইলেই উহা ধ্রুবানুস্মৃতি। কেবল ধ্যেয়মাত্র স্ফুরণের নাম সমাধি। এস্থলে ধ্যান ও ধ্রুবানুস্মৃতিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইল,—সে পার্থক্য তাত্ত্বিক পার্থক্য নহে,—এই পার্থক্য কেবল চিত্তসংযোগের পরিমাণের তারতম্যজনিত। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য ধ্রুবানুস্মৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ সন্দর্ভকার প্রত্যেক শ্রেণীর স্মরণের উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন।

ফলতঃ বিশেষাকারে প্রগাঢ় মনঃসংযোগই ধ্যানের প্রধান সাধন। এই তীব্র মনঃসংযোগের ফল অতি বিস্ময়জনক। বিষয়-বিশেষে অনবচ্ছিন্ন তীব্র মনঃসংযোগে জীবের দৈহিক আকারেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যথা শ্রীভাগবতে—১১ স্কন্ধ ৯ অধ্যায়; ২৩ শ্লোকে :—

যত্রযত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎ স্বরূপতাম্॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাংতেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্॥

অর্থাৎ দেহী স্নেহে হউক, দ্বেষে হউক বা ভয়েই হউক, অনবচ্ছিন্ন তীব্র মনঃসংযোগ করিলে তৎসরূপতা প্রাপ্ত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে কোন কীট যখন পেশস্কৃত (কুমুরে পোকা) দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহার

আবাসে প্রবেশিত হয়, সে তখন পূর্ব্বরূপ ত্যাগ করিয়া উহার রূপ ধারণ করে। এতদ্দ্বারা আমরা একদিকে যেমন একটী বৈজ্ঞানিক সত্যের মূল-সূত্র প্রাপ্ত হইলাম, অপরদিকে তেমনি একটী উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্বও আমাদের মানসনেত্রের সমক্ষে সমুপস্থিত হইল।

অপরন্তু আধুনিক একশ্রেণীর বিজ্ঞানবিৎ দার্শনিক পণ্ডিত মনঃসংযোগ ব্যাপারের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিত টমাস রিবট (Thomas Ribot) একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন,—উহার নাম Psychology of Attention। ইনি বলেন সুখ-দুঃখাদির অনুভূতিই (Emotional states) মনঃসংযোগের প্রসূতি, যাহার নিকট যাহা প্রয়োজনীয়, সে তাহার প্রতি মনঃসংযোগ করে। শিশু ক্ষুধায় আকুল, মাতৃস্তনই উহার অনুসন্ধের। ভীতিজনক পদার্থও এইরূপে মনকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। ইষ্টপ্রাপ্তি ও দ্বিষ্ট-পরিহার-বাসনা হইতে মনঃ-সংযোগ ব্যাপারের উৎপত্তি হয়।*

গোপীগণ স্নেহপরবশে, কংশভয়ে, শিশুপাল দন্তবক্রাদি বিদ্বেষে,—শ্রীকৃষ্ণে নিরন্তর মঃনসংযোগ করিয়াছিলেন, সেই মনঃসংযোগ ধ্যানে,—এমন কি সময়ে,—সমাধিতে পরিণত হয়। উহার ফল। তৎসাক্ষাৎকার জন্য মোক্ষ। কিন্তু মোক্ষের তারতম্য আছে; গোপীদের মোক্ষ আনন্দ-ময়ের আনন্দলীলাসম্ভোগ। এই সম্ভোগ, ভীত বা বিদ্বেষীর ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু ধ্যানের ফল যে শ্রীকৃষ্ণ-লাভ, তাহা প্রগাঢ় ধ্যানাবলম্বি-মাত্রের পক্ষেই সম্ভবপর।

---

* (1) It is caused by emotional states. This rule is absolute without exception. Man like animals lends his attention spontaneously only to what concerns him and interests him; to what produces in him an agreeable, disagreeable, or mixed states.

বহির্জ্জগৎ হইতে অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করিতে হইলে তীব্র স্মৃতিই তাহার প্রথম ও প্রধান সাধন। কৃষ্ণময় জগতে প্রবেশ করিতে হইলে তাঁহার সপরিকর রূপানুধ্যান ও লীলানুধ্যান প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই ধ্যান জীবের সাধন মাত্র। সাধনার ফল অবশ্যই ফলিবে, একথা বলা যাইতে পারে না,—উহা ভাগবতী কৃপা-সাপেক্ষ। ন্যায় সূত্রকার মহর্ষি গোতম বলেন—

"ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ।"

৪র্থ অধ্যায়ে, ২য় আহ্নিকে ১৯শ সূত্র।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে ইহাঁর অর্থ এই যে পুরুষ যত্নবান্ হইলেও যে অবশ্যই তিনি ফললাভ করিবেন এমন বলা যায় না। তাহাতেই অনুমান হয় পুরুষের কর্ম্মফল-আরাধন পরাধীন। এই কর্ম্মফলারাধন যাঁহার অধীন তিনিই ঈশ্বর। সুতরাং সেই ঈশ্বরই কারণ। এই কথায় এমন মনে করা যাইতে পারে, ফলনিষ্পত্তি বা ফলপ্রাপ্তি যখন ঈশ্বরাধীন,—এই অবস্থায় পুরুষের প্রযত্নের আর প্রয়োজন কি? এইরূপ নিশ্চেষ্টতা-নিবারণের নিমিত্ত পরমকারুণিক সূত্রকারের উপদেশ এই যে:—

"ন পুরুষ-কর্ম্মাভাবে ফলনিষ্পত্তেঃ।"

তত্রৈব (৪।২।১৯)

অর্থাৎ পুরুষের কর্ম্মাভাবে ফলনিষ্পত্তি হয় না। সুতরাং আবার আপত্তি হইতে পারে, যদি কর্ম্মাভাবে ফলাভাব হয় অর্থাৎ কর্ম্ম না করিলে ফলনিষ্পত্তির সম্ভাবনা না থাকে, তবে কর্ম্মকে অহেতু বল কেন? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

"তৎকারিতত্বাদহেতুঃ।"

তত্রৈব (৪।২।২২)

বাৎস্যায়ন ভাষ্যানুসারে ইহার অর্থ এই যে প্রযত্নবান্ পুরুষের ফল-প্রাপ্তি নিমিত্ত পুরুষকার ঈশ্বর দ্বারা অনুগৃহীত হইলে উহা ফলপ্রদ হয়—

নচেৎ হয় না। যদিও কর্ম্মফল ঈশ্বরাধীন, তথাপি ফলনিষ্পত্তির নিমিত্ত কর্ম্মই প্রধানতম সাধন। এই বিচার দ্বারা জানা যাইতেছে যদিও ভগবৎ সাক্ষাৎকার শ্রীভগবানের কৃপাসাপেক্ষ, তথাপি তজ্জন্য আমাদের সাধন-ভক্তির প্রয়োজন। সাধনভক্তির মধ্যে ভগবৎ স্মৃতি ও ভগবদ্ধ্যানের যথেষ্ট ফলশ্রুতি শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এস্থলে শ্রীহরিভক্তিবিলাস হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইতেছে—

উৎপাতকেষু সর্ব্বেষু পাতকেষু মহৎস্বচ।
প্রবিশ্য রজনীপাদং বিষ্ণুধ্যানং সমাচরেৎ॥

ধ্যানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। তদ্‌যথা :—

১। পাপপ্রণাশিনী শক্তি :—(শাতাতপ স্মৃতি ও বিষ্ণুপুরাণে।)

ক পক্ষোপবাসাৎ যৎ পাপং পুরুষস্য প্রণশ্যতি।
প্রাণায়ামশতেনৈব যৎপাপং নশ্যতে নৃণাং
ক্ষণমাত্রেণ তৎপাপং হরের্ধ্যানাৎ প্রণশ্যতি॥

খ ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং স্নানাদিষুচ কর্ম্মসু।
প্রায়শ্চিত্তং হি সর্ব্বস্য দুষ্কৃতস্যেতি নিশ্চয়ম্॥

২। কলিদোষহরত্ব—(বৃহন্নারদীয় পুরাণে।)

সমস্তজগদাধারং পরমার্থস্বরূপিণং।
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নসীদতি॥

৩। সর্ব্বকর্ম্মাধিকারিত্ব—(স্কন্দপুরাণে।)

কিন্তস্য বহুভিস্তীর্থৈঃ কিন্তস্য বহুভির্ব্রতৈঃ।
যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং নারায়ণমনন্যধীঃ॥

৪। মোক্ষপ্রদানত্ব :—(বৃহন্নারদীয় পুরাণে)

যে মানবা বিগতরাগপরা পরজ্ঞা,
নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি॥

ধ্যানেন তেন হতকিল্বিষবেদনা স্তে
মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি ॥

৫। শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপকত্ব :—(স্কন্দ ও পদ্মপুরাণে)

ক মুহূর্ত্তমপি যো ধ্যায়েন্নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।
সোঽপি সদগতিমাপ্নোতি কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ ॥

খ ধ্যায়ন্তি পুরুষং দিব্যং মচ্যুতঞ্চ স্মরন্তি যে।
লভন্তে তেঽচ্যুত স্থানং শ্রুতিরেষা পুরাতনী ॥

৬। সারূপ্যপ্রাপণ :—(শ্রীভাগবতে।)

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালশাল্ব-
পৌণ্ড্রাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্য মাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥

৭। স্বতঃপরম ফলত্ব :—(শ্রীভাগবতে ও স্কন্দপুরাণে)

ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো
ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ম্।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং
নিমিত্ত মন্যদ্ ভগবন্নবিদ্মহে।—৪।২০।২৯

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ।
ইদমেব সুনিস্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥

শাস্ত্রে ধ্যানের এইরূপ বহুল মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। রূপলীলাদির সুষ্ঠু চিন্তন সাধকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ধ্যানাভ্যাস ভিন্ন চিত্তের স্থিরতা জন্মে না। ধ্যানভ্যাসে নামজপেরও যথেষ্ট সুবিধা হইয়া থাকে। ভজনশীল মাত্রেরই চিত্তের স্থৈর্য্য প্রয়োজনীয়। সুতরাং অষ্টাঙ্গ যোগ বৈষ্ণবগণের পক্ষে হেয় বা পরিত্যাজ্য নহে। তবে পরমাত্মবাদী যোগি-গণ শ্রীমূর্ত্তি-ধ্যানপরায়ণ নহেন বলিয়াই তাদৃশ যোগ ও যোগীদের নিন্দা-

যায় বৈষ্ণবশাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। অপরন্তু পরমাত্মার সমাধিলাভই যেমন এক শ্রেণীর যোগীদের একমাত্র লক্ষ্য, বৈষ্ণবদের লক্ষ্য তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থানে অবস্থিত। চিত্তের স্থিরতা সাধন করার জন্যই বৈষ্ণবগণের নিমিত্ত অষ্টাঙ্গ যোগের বিধান ব্যবস্থিত হইয়াছে। যোগদ্বারা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হয়। শ্রীভগবানের রূপলীলাদি পরিচিন্তনের পক্ষে যোগের নিয়মাবলী নিতান্তই অনুকূল। এমন কি যে শ্রীনাম-জপ বৈষ্ণবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, তজ্জন্য একাগ্রতা বা একতানতা সাধনের নিমিত্ত যোগই পরম উপায়। এই জন্যই শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সম্প্রদায়ানুসারে ন্যাস-প্রাণায়ামাদির ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত নারদীয় পঞ্চরাত্রে :—

নির্গত্যাচম্যবিধিবৎ প্রবিশ্য চ পুনঃ সুধীঃ।
আসনে প্রাঙ্মুখো ভূত্বা বিহিতে চোপবিশ্য বৈ॥
সম্প্রদায়ানুসারেণ ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ।
প্রাণায়ামাংশ্চ বিধিবৎ কৃষ্ণং ধ্যায়েদ্ যথোদিতম্॥

সুতরাং আসন-প্রাণায়ামাদি বৈষ্ণবের জন্যও ব্যবস্থিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ বা শ্রীগৌরাঙ্গরূপই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধ্যানের বিষয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের তৃতীয় বিলাসের ধ্যানমাহাত্ম্যের টীকায় শ্রীমন্মদনগোপালের মন্ত্রসম্মত সুদীর্ঘ রূপধ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত রূপ নিবিষ্টভাবে চিন্তন করিলে প্রকৃতই প্রেমানন্দের সঞ্চার হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের রূপলীলা প্রভৃতির চিন্তন, কলির জীবের পক্ষে প্রেমানন্দলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। যে ছয় গোস্বামী দ্বারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিমল ধর্ম্মমত জগতে প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গরূপ-চরিত্রাদি চিন্তনে বিভোর হইতেন।

ধ্যানদ্বারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। সেই সাক্ষাৎকারের পরে মন স্বতঃই তাঁহার শ্রীচরণযুগলে অবনত হইয়া পড়ে। সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার

কিঙ্কর হইবার জন্য মন প্রধাবিত হয়। যাহাতে মনের ঐরূপ স্বাভাবিক গতি জন্মে, তাহার অনুশীলন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

দাস্য (৪৭)। চতুঃষষ্ঠী অঙ্গ বৈধীভক্তির মধ্যে দাস্য একটী অঙ্গ। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার বলেন :—

"দাস্যং কর্ম্মার্পণং তস্য কৈঙ্কর্য্যমপি সর্ব্বথা।"

কেহ কেহ বলেন শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণই দাস্য, কিন্তু স্বসম্প্রদায়ের অভিপ্রায় এই যে সর্ব্বপ্রকারে ভগবৎকিঙ্করতা স্বীকারই দাস্য, ইহাই শ্রীজীবগোস্বামিপাদের অভিমত। টীকায় তিনি ইতিহাস-সমুচ্চয় হইতে যে প্রমাণ বচন উদ্ধৃত করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

জন্মান্তর-সহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ ॥

অর্থাৎ "আমি সহস্র সহস্র জন্মে বাসুদেবের দাস" যাঁহার এইরূপ মতি জন্মে, তিনি সকল লোক উদ্ধার করেন। এই স্থলে দাস অর্থে সেবক। এইরূপ ব্যাখ্যা শ্রীধরস্বামিসম্মত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮১।৩৬) শ্রীদাম বিপ্র বলিয়াছেন :—

তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী।
দাস্যং পুনর্জ্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ ॥

এস্থলে স্বামিপাদ "দাস্যং" শব্দে "সেবকত্ব" ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দাস্যের কার্য্য—পরিচর্য্যা। শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণ করাকেও যে দাস্য বলা হয়, শাস্ত্রে তাহারও প্রমাণ আছে, যথা স্কন্দপুরাণে :—

তস্মিন্ সমর্পিতং কর্ম্ম স্বাভাবিক মপীশ্বরে।
ভবেদ্ভাগবতো ধর্ম্ম স্তৎকর্ম্ম কিমুতার্পিতম্ ॥
কর্ম্ম স্বাভাবিকং ভদ্রং জপধ্যানার্চ্চনাদি চ।
ইতীদং দ্বিবিধং কৃষ্ণে বৈষ্ণবৈ র্দ্বিসমর্পিতম্ ॥

মৃদুশ্রদ্ধস্য কথিতা স্বল্পা কর্ম্মাধিকারিতা।
তদর্পিতং হরৌ দাস্যমিতি কৈশ্চিদুদীর্য্যতে॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানে বর্ণাশ্রমাদি স্বাভাবিক কর্ম্মসকলও সমর্পিত হইলে, ঐ সকল কর্ম্ম ভাগবত ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। তাঁহার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম সকল তাঁহার প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত ও তাঁহাতে অর্পিত হইলে সেই সকল কর্ম্ম যে ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কর্ম্ম দুই প্রকার—স্বাভাবিক অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদি কর্ম্ম এবং তপধ্যানাদি। এই উভয় প্রকার কর্ম্মই মঙ্গলজনক। এই দুই প্রকার কর্ম্মই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়। মৃদুশ্রদ্ধ ব্যক্তির কর্ম্মাধিকারিতা স্বল্প। এই কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে কেহ কেহ উহাকে দাস্য বলেন। স্বমতসম্মত দাস্যের প্রমাণবচন নারদ-পুরাণে লিখিত হইয়াছে যথা :—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

কি সুখে কি দুঃখে সকল অবস্থাতেই কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির পরিচর্য্যায় যাঁহার চেষ্টা বিদ্যমান, তিনিই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ।

অতঃপরে সখ্যের (৪৮) কথা উক্ত হইয়াছে। সখ্য দুই প্রকার,—বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি। তদ্‌যথা:—

"বিশ্বাসো মিত্রবৃত্তিশ্চ সখ্যং দ্বিবিধমীরিতম্।"

টীকাকার বলেন এস্থলেও পূর্ব্ববৎ অপর মত ও স্বীয় সম্প্রদায়ের অভিমতের কথা বলা হইয়াছে। বিশ্বাস অন্যের মত। মিত্রবৃত্তিই স্বীয় মত। বিশ্বাসের উদাহরণ এই যে :—

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্॥

এই শ্লোকটি দ্রৌপদীর উক্ত। টীকাকার বলেন এই বাক্যটি প্রেম-

বিশেষের দ্যোতক, কিন্তু সাধন নহে। পরমপ্রেমাতিশয়াদেরও সাধন আছে, এইজন্য এই পদ্যটী এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিশ্বাসের আর একটী উদাহরণ :—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎ পদারবিন্দা
ল্লবনিমিষার্দ্ধ মপি স বৈষ্ণবাগ্রঃ॥

অর্থাৎ যিনি ত্রৈলোক্যরাজ্য উপস্থিত হইলেও ইন্দ্রাদিদেবগণের অন্বেষণীয় ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে লবনিমেষার্দ্ধ কালের নিমিত্ত বিচলিত হয়েন না, শ্রীভগবানের পাদপদ্মকেই সার বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া স্থির থাকেন, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। ইহার পরেই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মহোদয় এক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন তাহা এই যে :—

শ্রদ্ধামাত্রস্যতদ্ভক্তাবধিকারিত্বহেতুতা।
অঙ্গত্বমস্য বিশ্বাস-বিশেষস্য তু কেশবে॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি-বিষয়ে শ্রদ্ধাশীলমাত্রেরই অধিকারিতার হেতুতা আছে। সুতরাং এই শ্রদ্ধাকে শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয় বিশ্বাস-বিশেষের অঙ্গত্ব বলা যায়। টীকাকারের অভিপ্রায় এই যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এক পর্য্যায়বাচক। কিন্তু পূর্ব্বাবস্থা ও উত্তরাবস্থা প্রকাশের নিমিত্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এই দুই পৃথক্ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

মিত্রবৃত্তির উদাহরণ অগস্ত্যসংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহা এই যে :—

পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদেষু চ শেরতে।
মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বন্ধুবৎ॥

অর্থাৎ ভগবানকে মনুষ্যের ন্যায় দর্শন করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহার

সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করার জন্য কোন কোন মহাত্মা তাঁহার মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন।

ইহা হইতে শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামী এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে :—

বাগানুগাঙ্গতাস্য স্যাদ্বিধিমার্গানপেক্ষণাৎ।
মার্গদ্বয়েন চৈতেন সাধ্যা সখ্যরতি র্মতা॥

অর্থাৎ এই সখ্যসাধনে যখন বিধির অপেক্ষা না থাকে, তখন উহা রাগানুগা ভক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠে। সুতরাং বন্ধুভাবের রতি,—বিধি ভক্তি ও রাগানুগাভক্তি,—এই দুই প্রকারেই সাধিত হইয়া থাকে।

দাস্য ও সখ্যের পরে আত্মনিবেদনের (৪৯) কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ বলেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণা॥

শ্রীপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার বৈধীভক্তির অঙ্গসমূহের মধ্যে এই নবধা ভক্তির সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে আত্মনিবেদনেরও যথেষ্ট আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। তদীয় গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ের ৩২শ পদ্যটী উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্‌যথা—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "নশ্বর দেহ বিশিষ্ট মানুষ আত্মপোষণ ও আত্মীয় পোষণরূপ ঐহিক এবং পারত্রিক সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যখন আমার কৃপালাভের অধিকারী হয়, তখন সে অমরত্ব লাভ করিয়া সাষ্টিলক্ষণা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত—"সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্

পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।” এই আজ্ঞাও আত্মনিবেদনের উদাহরণস্বরূপ।

আত্মা শব্দের অর্থ কি, তাহা না বুঝিলে আত্মনিবেদনের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। এই কারণে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী লিখিয়াছেন—

অর্থো দ্বিধাত্মশব্দস্য পণ্ডিতৈরুপপাদ্যতে।
দেহ্যহন্তাস্পদং কৈশ্চিদ্দেহঃ কৈশ্চিন্মমত্বভাক্॥

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ স্থলে আত্মন্ শব্দের দুই প্রকার অর্থ করেন। এক প্রকার অর্থ—অহংত্বের আস্পদীভূত দেহীই আত্মা। অর্থাৎ যে পদার্থের ‘আমি’ “আমার” ইত্যাকার জ্ঞান হয়, তিনিই আত্মা। আবার কেহ কেহ মমত্বভাক্ দেহকেই আত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। যেমন শ্রুতিতে আছে “আত্মানং সততং গোপায়িত” এ স্থলে শরীরকেই আত্মা বলা হইয়াছে।

এই স্থানে এই দুই অর্থই সুসঙ্গত বলিয়া শ্রীল গোস্বামিপাদ এই দুই অর্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকাশে আত্মন্ শব্দের সাতটী অর্থের উল্লেখ আছে, তদ্‌যথা :—দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি ও প্রযত্ন। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এস্থলে দেহী ও দেহ—আত্মশব্দের এই দুই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাতেই উহার অন্যান্য অর্থও অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেহিসমর্পণের উদাহরণ, যথা যামুনাচার্য্য-স্তোত্রে—

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা
গুণতোঽসানি যথাতথাতথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়ো
রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ॥

হে ভগবন্, আমি যখন যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে প্রকার দেহ-ধারণ করি না কেন, এবং গুণনিবন্ধন আমি যাহাই হই না কেন, সেই আমি আজ তোমার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া দিলাম।

দেহনিবেদনের উদাহরণ যথা ভক্তিবিবেকে :—

চিন্তাং কুর্য্যান্নরক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্যরক্ষণাৎ॥

অর্থাৎ পশু বিক্রীত হইলে উহার রক্ষার নিমিত্ত যেমন তৎপ্রতি-পালকের আর কোনও চিন্তা থাকে না, সেই প্রকার শ্রীহরিকে দেহ নিবেদন করিয়া ইহার রক্ষণের জন্য প্রযত্ন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের নবধাভক্তিসূচক শ্লোকের আত্মনিবেদন শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামি মহোদয়ও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন, তদ্‌যথা—

"যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদে র্ভরণং পালনাদি চিন্তা ন ক্রিয়তে, তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তাবর্জ্জনমিত্যর্থঃ।"

পূজ্যপাদ ক্রমসন্দর্ভকার লিখিয়াছেন—আত্মনিবেদনের কার্য্য আত্মার্থ-চেষ্টাশূন্যত্ব। অর্থাৎ নিজের দেহগেহাদি সংরক্ষণের সমস্ত চিন্তা পরিবর্জ্জন করিয়া শ্রীভগবানের নিমিত্ত অখিল চেষ্টাময়ত্বই আত্মনিবেদনের কার্য্য। এই আত্মার্পণ,—গো-বিক্রয়সদৃশ। গো-স্বামী যতদিন নিজকে গোর অধি-কারী বলিয়া মনে করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে উহার ভরণ পোষণ ও রক্ষণাদির জন্য চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু যখন সে উহাকে অন্যের নিকট বিক্রয় করে, তখন আর উহার নিমিত্ত গো-বিক্রেতার কোনও চিন্তা থাকে না।

এইরূপ যতদিন মানুষ দেহকে "আমার" বলিয়া মনে করেন, ততদিন এই আমিত্বাভিমানের ফলে তাঁহাকে দেহের ভরণপোষণের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। কিন্তু মানুষ যদি কোটী জন্মের সৌভাগ্যের ফলে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তখন তাঁহার চিত্ত নিখিল-আত্মচিন্তা-বিবর্জ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে আসক্ত হইয়া পড়ে।

প্রাচীন একটী পদ্যে বলিরাজকে আত্মনিবেদনের উদাহরণরূপে অভিহিত করা হইয়াছে, তদ্‌যথা :—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে॥
অক্রূরঃ স্তুতিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তি যেষাং পরম্॥

দান সময়ে বলিরাজ যেরূপ দান করিয়াছিলেন, তাহা আত্মদানতুল্য। কিন্তু ভাবমিশ্র দাস্যযুক্ত আত্মনিবেদনের উদাহরণার্থ শ্রীঅম্বুরিষ মহারাজের নামই কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রেয়সীভাবের আত্মদান রুক্মিণীতে পরিদৃষ্ট হয়। আমরা এ স্থলে রসিকরাজ শ্রীল চণ্ডীদাস ঠাকুরের কৃত শ্রীবৃন্দাবন-রসমাধুরীময় পদ্য হইতে শ্রীমতী বৃন্দাবনেশ্বরীর একটী আত্মনিবেদনের পদ্য উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্‌যথা—

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগল প্রেমের ফাঁসি।
জাতিকুলশীল সকল তেজিয়া
ওপদে হইনু দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে?
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটী কমল পায়॥

না ঠেলহে ছলে অবলা অখলে
ক্রটীর নাহিক ওর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
গলায় বসন করি নিবেদন
শুনহে রসিক রায়।
চণ্ডীদাস কহে অনুগত জনে
ছাড়া না উচিত ভায়॥

আত্মনিবেদনের এই মধুর ভাব জগতের অন্য কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে নাই, অন্য কোনও কাব্যে নাই। রামপ্রসাদ বলিতেন "চিনি হওয়ার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল"। যাঁহারা সোঽহং ভাবের সাধন করেন, আমরা তাঁহাদের সাধনার চরমফলের পক্ষপাতী নহি। যদিও গাঢ়প্রেমের চরম আবেশে কখন কখন তন্ময়ত্ব ভাবের উদয় হয় বটে, কিন্তু ঐরূপ ভাবসাধকের হৃদয়ে প্রথম হইতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করা জীবের পক্ষে অপরাধজনক বলিয়াই বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায়। পাপবিদ্ধ ক্ষুদ্রতম জীব নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রকাশ করিলে সেই উক্তি ভক্তজনের পক্ষে প্রকৃতই হৃদয়বিদারিকা। বৈষ্ণবের আত্মনিবেদনে আত্মবিসর্জ্জন আছে, কিন্তু আত্মবিস্মরণ নাই। আত্মনিবেদনে আমিত্বের পূর্ণ তিরোধান না হইলেও সেই আমিত্বের স্বীয় অভিমানের আভাসলেশও থাকে না। "আমি" থাকে বটে, কিন্তু সে "আমির" অভিমান থাকে না। যদি তাঁহার কোনও অভিমানের উদয় হয়, সে অভিমান এই যে "আমিই তোমার।" বৈষ্ণব দার্শনিক এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন "তৎ (তস্য) ত্বং অসি" অর্থাৎ তুমি তাঁহার। ষট্‌পদীতে শ্রীমৎ শঙ্করও বলিয়াছেন :—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীস্ত্বম্।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

অর্থাৎ হে নাথ, জীব ব্রহ্মে ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হইলেও সত্য সত্যই প্রভো "আমিই তোমার" এ কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তুমি আমার, এ কথা বলা যাইতে পারে না। লোকে বলে, সমুদ্রেরই তরঙ্গ; তরঙ্গের সমুদ্র একথা কেহ বলে না।

সখ্য ও আত্মনিবেদন এই দুই প্রকারের সাধনভক্তি অতীব দুষ্কর, সুতরাং সাধকগণের মধ্যে এই দুই প্রকার সাধন অতীব বিরল। ধীর ভক্তগণের মধ্যেও অতি অল্প ব্যক্তিই এই দুই সাধনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। ভাবশূন্য কেবল আত্মনিবেদন দুষ্করত্ব নিবন্ধন বিরল। মহিমাধিক্য উহাতে নাই। কেননা উহাতে ভাবের অভাব। সখ্য কিন্তু উভয় প্রকারেই বিরল। কেননা, বিনাভাবে কখনও সখ্য হয় না। সুতরাং দুষ্করত্ব নিবন্ধন ও ভাবপ্রাচুর্য্যজনিত মহিমানিবন্ধন সখ্য অতি বিরল। আবার আত্মনিবেদন যখন ভাবমিশ্র হইয়া উঠে, তখন উহাও স্বীয় মহিমায় নিরতিশয় বিরল হইয়া থাকে। আমরা শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর যে আত্মনিবেদনের পদ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সহিত বৈধীভক্তির অন্তর্গত আত্মনিবেদনের সম্বন্ধ নাই বলিলেও হয়। শ্রীমতীর আত্মনিবেদন ভাবমহিমায় অদ্বিতীয়, সুতরাং অপরের পক্ষে ঐভাব একবারেই অলভ্য। আমাদের পক্ষে ভক্তিবিবেকের পদ্যে যে গো-বিক্রয়ের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই প্রযোজ্য। সাধনভক্তের ঐরূপ আত্মনিবেদন-ফল-লাভ হইলেই অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম-লাভের পথ ক্রমশঃ প্রসরতর হইয়া উঠে।

অতঃপরে "নিজপ্রিয়োপহরণে"র (৫০) কথা বলা যাইতেছে। নিজের প্রিয় দ্রব্যাদি শ্রীভগবানকে অর্পণ করা বৈধীভক্তির অঙ্গ। শাস্ত্র এই যে

যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদনন্ত্যায় কল্পতে॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান বলিতেছেন, "যে সকল দ্রব্য জনসমাজে অতি উৎকৃষ্ট

এবং যে সকল দ্রব্য নিজের অতি প্রিয়তম, তাহা আমাকে নিবেদন করিয়া দিলে উহা অনন্ত ফলপ্রদ হয়।"

এই স্থলে ইষ্টতম দ্রব্য এবং আত্মপ্রিয় দ্রব্য অর্থ—শাস্ত্রবিধিসম্মত নিবেদ্য দ্রব্যই বুঝিতে হইবে। অনিবেদনযোগ্য পদার্থের নিবেদন "নিজ প্রিয়োপহরণ" বিধির তাৎপর্য্য নহে। অথবা বৈষ্ণবের "নিজপ্রিয়োপহরণ" কখনও অনিবেদনযোগ্য হইতে পারে না। কেননা, বৈষ্ণবের কখনও অবৈষ্ণবোচিত দ্রব্যে স্পৃহা জন্মিতে পারে না। টীকাকার মহোদয় বলেন, "যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ" পদে যে চকার আছে উহার অর্থ শ্রীভগবানেরও যাহা প্রিয়" এই অর্থ বুঝিতে হইবে। অতঃপরে "তদর্থেহখিলচেষ্টিতম্" (৫১) অর্থাৎ বৈষ্ণবের সমস্ত কার্য্যই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে—

লৌকিকী বৈদেকীবাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

অর্থাৎ হে মুনে, যাঁহারা ভক্তিলাভের ইচ্ছুক, তাঁহারা লৌকিক ও বৈদিক যে সকল কার্য্য করিবেন, তাহাদিগকে তৎসকল কার্য্যই হরিসেবার অনুকূলে করিতে হইবে।

শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে অখিল কার্য্য করা, কার্য্যফল তাহাতেই সমর্পণ করা এবং তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম-লাভের প্রধান উপায়। এই ভাবই অকৈতবত্বের সাধন। আত্মপ্রীতির জন্য যাহা কিছু করা যায় তাহাই কাম। আর নিজের প্রীতি-সাধনের কোনও অভিপ্রায় না রাখিয়া কেবল শ্রীভগবানের প্রীতির জন্যই যখন জীবের অখিল চেষ্টার উত্তম জন্মে, তখন উহা যে অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম লাভের সোপান স্বরূপ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? দাস্য, সখ্য আত্মনিবেদন, তদর্থে অখিল চেষ্টা এই সকল সাধনা দ্বারা শ্রীভগবানের

চরণে জীবের সম্বন্ধ ক্রমশঃই দৃঢ়তর হইয়া উঠে। এই ভক্তি হইতেই প্রেমের উদয় হয়।

অতঃপরে শরণাপত্তির (৫২) কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শরণাপত্তি সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে কেবল নামোল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যথেষ্ট আলোচনা পবিদৃষ্ট হয়। শরণাপত্তি কাহাকে বলে, প্রথমতঃ তাহার অর্থ করা প্রয়োজনীয়। শরণ শব্দের কয়েকটী অর্থ অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। অমরের মতে শরণ শব্দের অর্থ গৃহ এবং রক্ষাকর্ত্তা। মেদিনী অভিধানে লিখিত আছে "শরণং, গৃহরক্ষিত্রোর্বধরক্ষণয়োরপি।" অর্থাৎ শবণ শব্দ গৃহ, রক্ষিতা, বধ ও রক্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঘাতক অর্থেও শবণ শব্দেব ব্যবহার দেখা যায়। শৃ ধাতুর অর্থ হিংসা করা। কিন্তু শরণ অর্থ রক্ষণ আশ্রয় বা আশ্রয় দাতৃ-রূপে ব্যবহৃত হইলে "শৃণাতি দুঃখমনেনেতি করণে ল্যুট" অর্থাৎ ইহা দ্বারা দুঃখ বিনষ্ট হয় এই অর্থে করণে ল্যুট প্রত্যয় দ্বারা শরণ শব্দ সাধিত হয়। আশ্রয় ও রক্ষাকর্ত্তা অর্থেই এই শব্দের অধিকতর ব্যবহার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীও টীকায় শরণ শব্দের এই দুই অর্থই করিয়াছেন, তদ্‌যথা :—

"শরণং প্রপন্নোঽস্মি রক্ষিতৃত্বেন বৃতবানস্মি. শরণং তদাশ্রয়ং প্রাপ্তঃ ;
শরণ শব্দেন তদ্দ্বয়মপি (আশ্রয়-রক্ষিত্রোঃ) উচ্যতে।"

শরণ ও [illegible] এই দুই শব্দের সন্ধিতে শরণাপত্তি শব্দ সাধিত হয়। আপত্তি শব্দের অর্থ এখানে প্রাপণ। শরণাপত্তি পদের অর্থ—শরণ-প্রাপণ। শ্রীকৃষ্ণের পদাশ্রয়ণই শরণাপত্তির তাৎপর্য্য।

ইহাতে এখন মনে হইতে পারে যে শরণাপত্তি,—দাস্য সখ্য ও আত্মনিবেদনেরই অন্তর্গত। ফলতঃ শরণাপত্তিতেও ঐ প্রকার মনোবৃত্তির প্রয়োজন। তাহা হইলেও দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন হইতে শরণাপত্তির পার্থক্য আছে। "আমি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণই আমার

একমাত্র রক্ষিতা” এই বলিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ করাই আত্ম-নিবেদনেব তাৎপর্য্য। ইহার উদাহরণার্থ শ্রীভাগবত হইতে একটী প্রমাণ উদ্ধৃত কবা যাইতেছে। উদ্ধব শ্রীভগবানকে বলিতেছেন :—

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছবণং ত্বদঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ॥

হে ঈশ। আমি এই ঘোব সংসাবে ত্রিতাপে সন্তপ্ত হইয়া অমৃতবর্ষী তোমাব চবণকমল আতপত্র ভিন্ন আব কোন আশ্রয় দেখিতে পাই না।

শবণাপত্তির ইহা একটী শ্রেষ্ঠলক্ষণ। তাই শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসকার বলেন :—

ইত্থঞ্চ বোধ্যং বিদ্বদ্ভিঃ শরণাপত্তিলক্ষণং।
বাচা হৃদাচ তন্বাপি কৃষ্ণৈকাশ্রয়ণং হি যৎ॥

অর্থাৎ বাক্য দ্বাবা, হৃদয়ের দ্বাবা ও কায় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আশ্রয় গ্রহণকে পণ্ডিতেবা শরণাপত্তির লক্ষণ বলিয়া জানেন। হবিভক্তি-বিলাসকার ইহার উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া আরও লিখিয়াছেন :—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথেব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিত স্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

অর্থাৎ “শরণাগতজন বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলেন, হে ভগবন্ “আমি তোমার,” মনের দ্বারাও সেইরূপ চিন্তা করেন এবং দেহ দ্বাবা তদীয় লীলাস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আনন্দানুভব করেন।” এই প্রকার শরণাগতিদৃঢ়তম, তদেকনিষ্ঠতার ফল। ইহার উদাহরণ স্কন্দপুবাণ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তদযথা :—

গোবিন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং মধুসূদনং।
ত্যক্ত্বান্যং বৈ ন জানামি ন ভজামি স্মরামি ন॥
ন নমামি নচ স্তৌমি ন পশ্যামি চ চক্ষুষা।
ন স্পৃশামি ন গায়ামি নবা যামি হরিং বিনা॥

অর্থাৎ "পরমানন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ মধুসূদনকে ছাড়া আমি অন্য কিছু জানি না, অন্য কাহারও ভজন বা স্মরণ করি না, অন্য কাহাকেও নমস্কার করি না, অন্য কাহার স্তব করি না, অন্য কাহাকেও স্পর্শ করি না, অন্য কাহারও গুণকীর্ত্তন করি না, অন্য কাহারও নিকটে যাই না, অথবা চক্ষে অন্য কাহাকেও দেখিতে পাই না।" এই "অন্য" শব্দের অর্থ দেবতান্তরই বুঝিতে হইবে।

ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে অন্য দেবতার অবজ্ঞা সেবাপরাধের মধ্যে গণ্য। এখন স্কন্দপুরাণের এই বচনে জানা যাইতেছে যে অন্য দেবতার ভজনাদি নিষিদ্ধ। ইহাতে বিরোধাপত্তির কথা উঠিতে পারে কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহাতে আদৌ কোন বিরোধ নাই। তদেকনিষ্ঠ শরণাগত ভক্ত প্রত্যেক দেবতাতেই স্বীয় ইষ্ট শ্রীভগবানের পূর্ণ প্রকাশ অনুভব করেন। তিনি যখন ষষ্ঠী দেবীকে দেখিতে পান, তাঁহার নিকটেও তখন তাঁহার মস্তক নুয়াইয়া পড়ে, বস্তুতঃ তিনি তখন ষষ্ঠী দেবী মনে করিয়া সেখানে প্রণাম করেন না। তাঁহার ধ্যাননিমজ্জিত চিত্ত সর্ব্বত্রই তদীয় ইষ্টদেবের শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ দেখিতে পান। তিনি সর্ব্বদেবেই সর্ব্বদেবদেব শ্রীভগবানকে দেখিয়া তাঁহারই বন্দনা করেন। তাঁহার ধ্যানাবস্থিত চিত্তের নিকট ব্রহ্মশিবাদিও শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। প্রত্যেক দেবতাতেই সর্ব্বদেবদেব শ্রীভগবান্ প্রকটিত হওয়ায় কার্য্যতঃ তিনি কাহারও অবজ্ঞা করেন না, অথচ তাঁহার তদেকনিষ্ঠার ফলে এক কৃষ্ণ ভিন্ন দেবতান্তর তাঁহার প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না।

এখানে তিনপ্রকার শরণাপত্তির কথা উল্লিখিত হইল। কাহারও কাহারও মতে শরণাপত্তি ছয় প্রকার।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ষড়-বর্গাদি-অধিকৃত * সংসার ভয়ে বাধ্য হইয়া মানুষ পরিত্রাণের উপায় না

(১) ষড়্‌বর্গ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরকে ষড়্‌বর্গ বলা যায়।

দেখিয়া শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করে। ইহাও এক প্রকার শরণাপত্তি। আবার ভগবদ্বৈমুখ্যজনক অশেষ প্রকার ভক্তিবাধা মোচনের জন্য ভক্তিকাম ব্যক্তি শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করেন। এই উভয় প্রকার শরণগ্রহণেই অনন্যগতিত্ব নিত্য বর্ত্তমান। অনন্যগতিত্বের অর্থ অপর গতির অভাব। অনন্যগতিত্ব ভিন্ন শরণাপত্তি অসম্ভব। "হে ভগবন্, তুমি ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় গতি নাই" এই কথা হৃদয়ে ঠিক রাখিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করাই শরণাপত্তি।

এই অনন্য গতি দুই প্রকার—অন্য কোন আশ্রয় না থাকায়, শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা। ইহা কেবল ভয়বশতঃ। এই এক প্রকার অনন্যগতি। অপর প্রকারের অনন্যগতি অন্য প্রকারের আশ্রিতের কোনরূপ পরিবর্জ্জন।

সংসার এই ষড়্‌বর্গ দ্বারা অধিকৃত। দুষ্ট রাজার অধিকৃত দেশ যেমন সর্ব্বদাই ভয়জনক, কামক্রোধাদির অধিকৃত, সংসারও সেই প্রকার সর্ব্বপ্রকার ভয়ের প্রসূতি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে জন্ম, মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ ও দোষকে ষড়্‌বর্গ বলা যাইতে পারে। শ্রীভগবানের উপদেশ এই যে—"জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্।"

ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গৌতম বলেন :—

"দুঃখজন্ম-প্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ইহার যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে প্রবৃত্তিই কুৎসিত বা অভিপূজিত জন্মের কারণ। শরীর ইন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতির নিকায় বিশিষ্ট প্রাদুর্ভাবই জন্ম। জন্ম হইলেই দুঃখ অনিবার্য্য। প্রতিকূলবেদনাই দুঃখের লক্ষণ। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হয়, দোষের তিরোধানে প্রবৃত্তির উচ্ছেদ হয়, মিথ্যাজ্ঞানের তিরোধানে দোষসমূহ তিরোহিত হয়। প্রবৃত্তির তিরোধানে জন্মের কারণ বিনষ্ট হয়, জন্ম না হইলে দুঃখের উদয় হয় না, দুঃখের তিরোধানে অপবর্গ লাভ হয়। বাৎস্যায়ন আরও বলেন "ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ো দুঃখান্তা ধর্ম্মাঃ অবিচ্ছেদেনৈব প্রবর্ত্তমানাঃ সংসার ইতি" সুতরাং সংসার যে ষড়্‌বর্গের শাসিত দুঃখাবর্ত্তময় [illegible], [illegible] দার্শনিকগণের [illegible] অভিপ্রায়।

প্রথম প্রকারের অনন্যগতিত্বের উদাহরণ এই যে—

মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছন্।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥

অর্থাৎ মরণ ধর্ম্মশীল মানুষ মৃত্যুরূপ সর্পের ভয়ে কুত্রাপি নির্ভয় হইতে না পারিয়া অবশেষে আজ তোমার পাদাব্জ লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম সুখ লাভ করিতেছেন। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই মৃত্যুভয় বিরাজমান। কেবল তোমার শ্রীচরণের সমীপেই উহার গমনাধিকার নাই।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ শ্রীভাগবতের উদ্ধবগীতা ও মহাভারতের শ্রীভগবদ্গীতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন— উদ্ধব, তুমি শ্রুতি, স্মৃতি, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শ্রোতব্য ও শ্রুত এই সকল পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর, যথা—শ্রীভাগবতে ও ধিকার শ্রীভগবদ্গীতায়।

১। মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়াস্যাহ্যকুতোভয়ঃ॥
২। সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ নিজের দুইটী অতি প্রিয় ভক্তকে সম্বোধন করিয়া লোকশিক্ষার নিমিত্ত এই অতি গুহ্যতম উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শরণাগতিতে পরমবিশ্বাসাত্মক ভক্তিবিশেষ অন্তর্নিহিত থাকে। সেই পরম বিশ্বাসময়ী ভক্তিবলে জীবের পক্ষে পরম মঙ্গল সাধিত হয়। বিশেষতঃ এই উপদেশ সাক্ষাৎ ভাগবতী আজ্ঞা। শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।১৮) লিখিত আছে—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা-
আভীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যেচ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

অর্থাৎ যাঁহার আশ্রিতজনের শ্রীচরণাশ্রিত হইলে কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, কঙ্ক যবন ও খসাদি পাপজাতিসমূহও শুদ্ধ হইয়া যায়, সেই প্রভবনশালী বিষ্ণুকে নমস্কার। তিনি প্রভবনশালী সুতরাং আর আশঙ্কা কি?

পদ্মপুরাণ হইতে আরও একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা—

সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকাঃ।
দম্ভাহঙ্কৃতিপানপৈশুনপরাঃ পাপান্ত্যজা নিষ্ঠুরাঃ।
যে চান্যে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সর্ব্বাধমা স্তেপি হি।
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণং মুক্তা ভবন্তি দ্বিজ।

অর্থাৎ যাহারা সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিত, শঠধী, ব্রাত্য, জগদ্বঞ্চক, দাম্ভিক, অহঙ্কারী, পানাসক্ত, পৈশুনপরায়ণ, ধনদারাপুত্রনিরত, অন্ত্যজ ও নিষ্ঠুর, তাহারাও শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণাপন্ন হইলে অনায়াসেই মুক্তিলাভ করে।

শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত হইয়াছে :—

"সর্ব্বথা শরণাপত্তি স্তদীয়ানাঞ্চ সেবনম্।"

শরণাপত্তিতে যে প্রকার ভেদ আছে, এই কথা দ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি কায়তঃ, বাক্যতঃ ও মননতঃ, শরণাপত্তি এই তিন প্রকার। অতঃপর হরিভক্তিবিলাসে শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্র হইতে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে শরণাপত্তি ছয় প্রকার, তদ্‌যথা—

আনকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥
শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্র।*

অর্থাৎ ভগবদ্ভজনের অনুকূল বিষয়ে সংকল্প, উহার প্রতিকূল বিষয়ের বর্জ্জন, "শ্রীভগবান্ আমায় সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ আপদ ও ভক্তি কণ্টক হইতে রক্ষা করিবেন" এই বিশ্বাস, তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করা, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা, এবং "হে দয়াময় শ্রীভগবন্, আমাকে রক্ষা কর, তুমি ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই" ইত্যাদি আর্ত্তি,—শরণাপত্তি এই ছয় প্রকার। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় ইহার ব্যাখ্যায় ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—অঙ্গাঙ্গিভেদে শরণাপত্তি ছয় প্রকার। গোপ্তৃত্বে বরণই অঙ্গী, আর অপর পাঁচটী অঙ্গস্বরূপ। অর্থাৎ ঐটিই প্রধান, আর পাঁচটী উহার পরিকর।

শরণাপত্তি অহঙ্কার নিবৃত্তির প্রধান সাধন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বলেন :—

অহঙ্কার নিবৃত্তানাং কেশবো নহি দূরগঃ।
অহঙ্কারযুতানাং হি মধ্যে পর্ব্বতরাশয়ঃ॥

সতত নমস্কার-বুদ্ধিই অহঙ্কার-ছেদনের উপায়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে অষ্টাক্ষর মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা আছে, সেই ব্যাখ্যানের প্রথমে লিখিত হইয়াছে :—

---

(২) শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার "সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকটির টীকায় শরণাগতির কথা উল্লেখ করিয়া উল্লিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ঐ শ্লোকটী বায়ুপুরাণের বলিয়া লিখিয়াছেন। ভক্তিসন্দর্ভেও এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু সেখানেও "বৈষ্ণবতন্ত্র" বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে।

অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ।
তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রিস্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতি॥

"নমস্ শব্দের মকারের অর্থ অহঙ্কার, আর নকার তাহার নিষেধক। নমস্কার অহঙ্কার খণ্ডনের সদুপায়।" সর্ব্বদা দীনাতিদীন ভাবে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলে তিনি কখনও শরণাগত জনকে পরিত্যাগ করেন না।

মনুষ্যসমাজে যাঁহারা সদ্‌বুদ্ধি ও সাধু, তাঁহারাও শরণাগতের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করেন। শাস্ত্রের বিধিও এইরূপ, যথা পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে :—

শরণাগত রক্ষাং য প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কুরুতে মানবো জ্ঞানী তস্য পুণ্যং নিশাময়॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মহত্যাদিকৈরপি।
আয়ুষোঽন্তে ব্রজেন্ মোক্ষং যোগিনামপি দুর্ল্লভম্॥

আবার অপর পক্ষে শরণাগতকে রক্ষা না করিলে যে ভয়ঙ্কর অধর্ম্ম হয়, তাহার কথাও শুনুন, (ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ও বহ্নিপুরাণে) :—

১। শস্ত্রহীনঞ্চ ভীতঞ্চ দীনঞ্চ শরণাগতম্।
যো ন রক্ষত্যধর্ম্মিষ্ঠঃ কুম্ভীপাকে বসেদ্‌যুগম্॥
লোভাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যস্ত্যজেৎ শরণাগতম্।
ব্রহ্মহত্যা সমং তস্য পাপমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥

যিনি সর্ব্বধর্ম্মের গোপ্তা, এবং সর্ব্বধর্ম্মের একমাত্র প্রবর্ত্তক, তিনি যে তাঁহার শরণাগত ভক্তকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তই শরণাগতি-সাধকগণের নয়ন সমক্ষে ধ্রুব তারার ন্যায় বিরাজমান। যিনি প্রহ্লাদের রক্ষক, যিনি দ্রৌপদীর লজ্জানিবারক, যিনি অনন্ত শরণাগতের প্রত্যক্ষ পরিত্রাতা, তাঁহার ভক্তগণের শ্রীচরণশরণ ভিন্ন এই আচারবিবর্জ্জিত শঠবুদ্ধি বিশ্-

বঞ্চক মহাপাপী নরাধম লেখকের আর গতি কি? ভক্তের চরণরেণুই সর্ব্বপ্রথমে এই অধম লেখকের প্রধানতম শরণ।

বৈধীভক্তির অবশিষ্ট অঙ্গ কয়েকটীর কথা এস্থলে উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে।

তদীয়ানাঞ্চ সেবনম্ (৫৩)—অর্থাৎ শ্রীভগবান সম্বন্ধীয় বস্তু ও ব্যক্তিদের সেবা। তদীয়গণ কি কি, মূলগ্রন্থেই তাহার উল্লেখ আছে, তদ্‌যথা—

তদীয়াঃ—তুলসীশাস্ত্রমথুরাবৈষ্ণবাদয়ঃ।

অর্থাৎ তুলসী, শাস্ত্র, মথুরা ও বৈষ্ণবাদির সেবন। তুলসী সেবার বহুল মহিমা শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এস্থলে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত স্কন্দপুরাণের একটি পদ্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসংঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী।
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তাহন্তকত্রাসিনী ॥
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা।
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা, তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥

অর্থাৎ "যাঁহাকে দর্শন করিলে নিখিল পাপ প্রণষ্ট হয়, যাঁহার স্পর্শনে দেহ পবিত্র হয়, যাঁহার অভিবন্দনা করিলে সকল রোগের নিরসন হয়, যাঁহাকে জলসিক্তা করিলে যমের ভয় দূরে যায়, যাঁহাকে রোপণ করিলে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আসক্তি হয়, শ্রীভগবানের চরণে ন্যস্ত হইলে যিনি বিমুক্তি ফল প্রদান করেন, সেই তুলসীদেবীর চরণে নমস্কার।" টীকাকার শ্রীপাদ শ্রীজীব বলেন বিমুক্তি অর্থে বিশিষ্টা মুক্তি অর্থাৎ সপ্রেম ভক্তি।

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা ॥
নবধা তুলসীং দেবীং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটি সহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে ॥

শ্রীমতী তুলসীদেবীর সেবা নয় প্রকার—দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, তাঁহার মহিম-কীর্ত্তন, প্রণমন, তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ, রোপণ, সেবন ও পূজন—যিনি প্রতিদিন তুলসীর এইরূপ সেবা করেন, তিনি কোটি সহস্র যুগ শ্রীহরি ভবনে বাস করেন।

হিন্দু, আপনি শাক সবজীর উদ্যান করিতে ভাল বাসেন, তাহা করুন, ফলপ্রদ বৃক্ষের বাগান করা প্রয়োজনীয় তাহাও আপনি করুন, দর্শন-শোভার জন্যই হউক, অথবা শ্রীশ্রীভগবানের সেবনের জন্যই হউক, আপনি বাড়ীতে কুসুম কানন করুন; কিন্তু আমাদের সর্ব্বোপরি নিবেদন এই যে বাড়ীর কোন পবিত্র সুন্দর স্থানে আপনি অবশ্য অবশ্যই তুলসীর উদ্যান করিবেন, স্নানান্তে তুলসী দেবীকে জলসিক্তা করিবেন, আর ভক্তিভরে প্রণাম করিবেন, সন্ধ্যা-সমাগমে তুলসীতলায় তৈলের একটি প্রদীপ দিবেন এবং তখনও একবার দেবীর নিকটে প্রণত হইবেন, যদি সময় ও সুবিধা হয় তবে একবার তুলসীদেবীর পবিত্রমনোহরা, প্রীতিমধুরা ভক্তিপ্রেমভরা স্নিগ্ধপ্রসন্ন শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিবেন এবং ভক্তিভরে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ নাম উচ্চারণ করিবেন; দেখিবেন হৃদয়ে পবিত্রতার সঞ্চার হইয়াছে, প্রেমভক্তির উদয় হইয়াছে, পার্থিব কলুষচিন্তা হইতে চিত্ত শান্তি ও প্রসন্নতা লাভ করিবার পথ পাইয়াছে।

অতঃপর শাস্ত্র-সেবনের কথা (৫৪)। শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রই এখানে শাস্ত্রশব্দের প্রতিপাদ্য—শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রই এই শাস্ত্র শব্দের বাচ্য। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পূজ্য। প্রমাণ বচন এই যে—

বৈষ্ণবাণি তু শাস্ত্রাণি যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা ভবন্তি সুরবন্দিতাঃ।

মথুরা স্মরণ, মথুরা দর্শন, মথুরা ভূমি স্পর্শন, মথুরা বাস প্রভৃতি সম্বন্ধে শাস্ত্রে যথেষ্ট মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। মথুরা মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থখানিও

বৈষ্ণবের অবশ্য পাঠ্য। পুণ্যধাম মথুরার স্মরণ শ্রবণেও জীবের হৃদয় পবিত্র হয়।

বৈষ্ণবাদির সেবাসম্বন্ধে (৫৫) শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে অনেক মাহাত্ম্য বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে এখানে তৎসম্বন্ধে কোন বচন প্রমাণের উল্লেখ করা হইল না।

অপর কয়েকটী ভক্ত্যঙ্গ এই—

যথাবৈভবসামগ্রী-সদ্গোষ্ঠীভির্মহোৎসবঃ। (৫৬)
উর্জ্জাদরো বিশেষণ (৫৭) যাত্রাজন্মাদিনাদিষু॥ (৫৮)
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে। (৫৯)
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥ (৬০)
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে। (৬২)
নাম-সঙ্কীর্ত্তনম্ (৬৩) শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥ (৬৪)

অর্থাৎ নিজের বৈভব অনুসারে গোষ্ঠীর সহিত শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে মহোৎসব, কার্ত্তিক মাসে নিয়ম সেবা এবং জন্মাদিতে যাত্রা মহোৎসব, শ্রীমূর্ত্তি সেবায় শ্রদ্ধা ও বিশেষতঃ প্রীতি, ভক্তিরসরসিক ভক্তগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ সমূহের রসাস্বাদ, সাধুসঙ্গ নামসঙ্কীর্ত্তন ও মথুরাবাস এই পাঁচটী অঙ্গ দ্বিরুক্ত হইয়াছে। কেন দ্বিরুক্ত হইল, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মহোদয় তাহার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন।

"নিখিল শ্রৈষ্ঠ্যবোধায় পুনরপ্যত্র কীর্ত্তনম্।"

অর্থাৎ নিখিল শ্রেষ্ঠতাবোধের নিমিত্তই পুনর্ব্বার ইহাদের নাম করা হইল। শ্রীচরিতামৃত বলেন :—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস; শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

যে প্রকার সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে মূলগ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষণের উল্লেখ আছে, তদ্‌যথাঃ—স্বজাতীয়াশয়—অর্থাৎ সমান-বাসনাবিশিষ্ট, স্নেহযুক্ত এবং নিজ হইতে সর্ব্বোতোভাবে উৎকৃষ্ট সাধুর সঙ্গ করিবে। গ্রন্থকার এই পঞ্চাঙ্গ বৈধীভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

দুরূহাদ্ভুত বীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনঃ॥

অর্থাৎ এই পঞ্চসাধন অতি দুরূহ ও অদ্ভুত প্রভাবশীল। এই সাধন পঞ্চকে শ্রদ্ধা তো দূরের কথা, ইহাদের সহিত অল্পমাত্র সম্বন্ধ সঞ্জাত হইলেও চিত্তে ভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে।

শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ, ভাগবত-পাঠ, নাম সঙ্কীর্ত্তন ও মথুরা-মণ্ডলে স্থিতি এই পঞ্চাঙ্গের অত্যন্ত প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি মহোদয় লিখিয়াছেন—

অলৌকিক পদার্থানামচিন্ত্যা শক্তিরীদৃশী।
ভবেৎ তদ্বিষয়শ্চাপি যা সহৈব প্রকাশয়েৎ॥

অর্থাৎ অলৌকিক পদার্থ সমূহের এমনই অচিন্ত্য শক্তি যে, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ হওয়া মাত্রই শ্যামসুন্দরবিষয়ক ভাব এবং সেই ভাবের বিষয়কে যুগপৎ চিত্তে স্ফুরিত করিয়া দেয়। শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি অলৌকিক, ভক্তসঙ্গ অলৌকিক, শ্রীভাগবতগ্রন্থ অলৌকিক, নাম-সঙ্কীর্ত্তন অলৌকিক, মথুরামণ্ডলও অলৌকিক। ভক্তিভরে শ্রীমূর্ত্তি-সন্দর্শন করিলে মনোময়ী ভাগবতী গতিলাভ হয়, ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গেও অধম জীব উত্তম গতিলাভের পথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের আর কথা কি! শ্রীভাগবত-শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ শ্রীভগবদ্ভাব হৃদয়ে অব-রুদ্ধ হয়, মথুরামণ্ডলের অলৌকিক অচিন্ত্যশক্তির কথা আর কি বলিব,

মথুরা-স্পর্শমাত্রই পরানন্দসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রের অনু-শাসন। বস্তুশক্তির গুণ তর্ককে অপেক্ষা করে না।

এই ৬৪ অঙ্গ ভক্তির মধ্যে কোন কোন অঙ্গের যে অল্প ফলের কথা শুনা যায় তাহা বহির্ম্মুখদের প্রবৃত্তি উদ্রেকের জন্য। কিন্তু শ্রীভগবানে রতি উৎপাদনই উহাদের মুখ্য ফল। বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মগুলি ভক্তির সাধক হইতে পারে, কিন্তু উহারা ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে পরিগণিত নহে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালনে বিষ্ণুর পরিতোষ জন্মে, তাহা হইতে ভক্তি-অঙ্গের উদয় হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ এই যে,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

অর্থাৎ "যে পর্য্যন্ত বিষয়বৈরাগ্য অথবা আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা উপজাত না হয় তাবৎ কর্ম্মকাণ্ড বিহিত কার্য্য করা কর্ত্তব্য।"

ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের নিমিত্ত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিঞ্চিৎ প্রাথমিক প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু ইহারা ভক্তির অঙ্গ নহে। এখানে জ্ঞান শব্দের অর্থ—ত্বংপদার্থবিষয়ক, তৎপদার্থ বিষয়ক এবং ইহাদের ঐক্য বিষয়ক—ইহাই ত্রিভূমিক ব্রহ্মজ্ঞান। এই ঐক্যবিষয়ক জ্ঞান ত্যাগ করিয়া তৎপদার্থ ও ত্বম্ পদার্থের যে জ্ঞান হয়, তাহা ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের কিঞ্চিৎ সহায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগি বৈরাগ্যই এখানে বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই বৈরাগ্যের ভক্তিবিরোধী ভাব ত্যাগ করিয়া লইলে ইহাও ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের ঈষৎ সহায় হইতে পারে। ইহাদের উপযোগিতা এই যে ইহারা প্রথমতঃ অন্যাবেশ দূরী-করণের পক্ষে উপাদেয়। অন্যাবেশ দূরীকৃত হইলেই ইহারা ভক্তিসাধনের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। তখন ইহাদের বিষয় ভাবিতে গেলে ভক্তিসাধনে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়।

অপিতু ব্রহ্মজ্ঞান এবং তৎসাধনের উপযোগী বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তভূমি

কঠোর হইয়া পড়িলে উহাতে আর ভক্তিলভ্য বীজ অঙ্কুরিত হয় না। সুতরাং ভক্তিই ভক্তিসাধনের উপায়। জ্ঞান দ্বারা নানাবাদনিরসনপূর্ব্বক তত্ত্ববিচার এবং বিবিধ দুঃখ সহনশীলতার অভ্যাস প্রভৃতি ব্রহ্মসাধনস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যদি ঈদৃশ জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের সাধন না হয়, তবে উহার সাধন কি? তদুত্তরে বলা হইয়াছে :—

"ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা।"

অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তির হেতু। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তিই উত্তরোত্তর ভক্তি-রাজ্যে প্রবেশের সাধন। প্রশ্ন হইতে পারে,—ভক্তিসাধনে কি আয়াস নাই, তাহাতে কি ক্লেশ-স্বীকার নাই? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ক্লেশ স্বীকার আছে বটে, কিন্তু ভক্তির প্রকৃতি স্বভাবতই কুসুমকোমলা, উহাতে কোন প্রকারেই চিত্তে কঠোরতা আসিতে পারে না। ভক্তি শ্রীভগবানের মধুররূপগুণাদিভাবনাময়ী। উহা কঠোরতা ও কোমলতার খনিস্বরূপ। শ্রীভাগবতে ৭।৯।৪৯-৫০ প্রহ্লাদ বলিতেছেন :—

নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে
সর্ব্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্ত্যাঃ।
আদ্যন্তবন্ত উরগায় বিদন্তি হি ত্বা
মৈবং বিবিচ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ॥
তত্তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্ম্মপূজাঃ
কর্ম্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিম্
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥

অর্থাৎ "গুণাধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ, গুণিগণ, মহদাদি, মনঃ প্রভৃতি ও দেব মনুষ্যগণ সকলেই জড়োপাধি এবং আদি ও অন্তবিশিষ্ট। হে উরগায়। এই জন্য সুধীগণ বিচারপূর্ব্বক অধ্যয়নাদি হইতে বিরত হইয়া সমাধিযোগে

আপনার উপাসনা করেন। অতএব হে পূজনীয়তম, আপনি পরমহংস-গণের প্রাপ্য। নমস্কার, স্তব, কর্ম্মার্পণ, পূজন, চরণস্মরণ ও কথাশ্রবণ এই ষড়ঙ্গ সেবাব্যতীত লোকে আপনাতে কি প্রকারে ভক্তি করিবে।”

সুতরাং যাহা জ্ঞানবৈরাগ্যাদির সাধ্য, তাহা ভক্তি দ্বারা সহজেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এখানে দুই একটির উল্লেখ করা যাইতেছে :—শ্রীভাগবত ১১ স্কন্ধ ৩১।৩২।৩৩ শ্লোক।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥
যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥

ভক্তির উপযোগিতার জন্য ভক্ত শ্রীভগবানের নিকট যাহা কিছু বাঞ্ছা করেন, বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান তাঁহার সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। চিত্র-কেতু আকাশে বিচরণের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শ্রীভগবান তাঁহার সে বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন, প্রহ্লাদের শ্রীভগবৎপার্শ্বে গমনের বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল, শ্রীশুকদেব মায়া-অপসরণের নিমিত্ত শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই প্রার্থনা পরিপূরিত হইয়াছিল। অর্থাৎ শুকদেব দীর্ঘকাল মাতৃগর্ভে ধ্যানমজ্জিতচিত্তে অবস্থান করিয়া-ছিলেন। সেই ধ্যানের প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিক্ষুব্ধ হইতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহার সকাশে প্রকটিত হইয়া তাঁহাকে যোগাসন ত্যাগ করিয়া বহির্নিসৃত হইতে বলেন। এতদুত্তরে শুকদেব নিম্নলিখিত পদ্যে তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন :—

ত্বং ব্রূহি, মাধব জগন্নিগড়োপমেয়ং
মায়াখিলস্য ন বিলঙ্ঘ্যতমা ত্বদীয়া।

বধ্নাতি মাং ন যদি গর্ভমিমং বিহায়
তদ্‌যামি সংপ্রতি মুহুঃ প্রতিভূস্ত্বমত্র ॥

অর্থাৎ "হে মাধব, তোমার জগন্মায়া অখিল জগতের শৃঙ্খলস্বরূপ। এই শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হওয়া জগতের লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি গর্ভ হইতে অবতরণ করিলে তোমার মায়ায় আমাকে বাঁধিয়া ফেলিবে। তুমি যদি বল যে তোমার মায়া আমাকে বাঁধিবে না এবং তুমি যদি এ বিষয়ে প্রতিভূ (জামীন) হও, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তে গর্ভ ত্যাগ করিয়া তোমার আদেশে বাহির হইতে পারি।"

শ্রীভগবান্ তাঁহার একান্ত ভক্তের এই প্রার্থনায় মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিশ্ব-মায়াকে বিসারিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, যে ভক্তিতে স্বয়ং ভগবান্ বশীভূত হয়েন, সেই ভক্তির অসাধ্য কি?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বৈরাগ্যকে সাধন অঙ্গ বলা যায়। অপর পক্ষে বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত কঠিন হয়, এইরূপ সাধন হেয় বলিয়াই অনাদৃত। কিন্তু ইহাতে যেন কেহ এমন না মনে করেন যে বৈষ্ণবের জন্য বিষয়ভোগই বিহিত হইয়াছে। বৈষ্ণবের পক্ষে বিষয়-ভোগে রত থাকা একান্ত বিরুদ্ধ। যাঁহার চিত্ত বিষয়াসক্ত, তিনি ভগবদ্বিমুখ।

বিষয়াবিষ্টচিত্তস্য কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজেন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ॥

অর্থাৎ বিষয়াবিষ্ট চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ অসম্ভব। যে বস্তু পশ্চিম দিকে আছে পূর্ব্বদিকে খুঁজিলে তাহা পাওয়া যায় কি? ধ্যান ভিন্ন আবেশ হয় না, বিষয়ের ধ্যানে বিষয়ের আবেশ হয়, কৃষ্ণাবেশ হয় না। কিন্তু যাঁহারা বিষয়-সম্ভোগের মধ্যে বাস করিয়াও উহাতে নির্লিপ্ত, যাঁহাদের চিত্ত ভগবচ্চিন্তা নিরত, তাঁহাদের পক্ষে বিষয়ও অবিষয়। কেননা, তাঁহারা বিষয়ে থাকিয়াও বিষয়ের ধ্যান করেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে যাঁহাদের

একবার রুচি জন্মিয়াছে, তাঁহাদের কি আর বিষয়ে রুচি থাকিতে পারে? পূজ্যপাদ শ্রীরূপ লিখিয়াছেন :—

রুচিমুদ্বহতস্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ।
বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে যাঁহার রুচি জন্মিয়াছে, বিষয়ে তাঁহার গরিষ্ঠ রাগ থাকিলেও ভজন-প্রভাবে উহা তিরোহিত হইয়া যায়। সুতরাং স্বভাবতই বৈরাগ্যের উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামি মহোদয়কে লক্ষ্য করিয়া এ বিষয়ে প্রথম যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সে উপদেশ এই যে—

না কর মর্কট বৈরাগ্য লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তরেতে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকাচার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবেন উদ্ধার॥

এই উপদেশের সার গ্রহণ করিয়াই যেন শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি-মহোদয় লিখিয়াছেন :—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।

অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া যাঁহারা বিহিত বিষয়ভোগ করেন, তাদৃশ ব্যক্তিদের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় আগ্রহই যুক্তবৈরাগ্য নামে অভিহিত।

আর এক প্রকার বৈরাগ্য আছে, তাহা ফল্গু বৈরাগ্য নামে অভিহিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ, প্রসাদী মালা, চরণামৃত প্রভৃতিও কোন কোন মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রাকৃত পদার্থ মনে করিয়া পরিত্যাগ করেন; ইহাই ফল্গু

বৈরাগ্য। এই ফল্গু বৈরাগ্য দ্বিবিধ :—এক প্রকার বৈরাগ্য, ভগবৎ প্রসাদাদির প্রার্থনা না করা। আর এক প্রকার,—প্রাপ্ত প্রসাদাদির উপেক্ষা করা। ইহা সেবাপরাধের মধ্যে গণ্য।

শ্রীভগবানের সেবায় যাঁহাদের চিত্ত উন্মুখ হয়, তাঁহাদের হৃদয়ে যম নিয়ম প্রভৃতি স্বতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্রীপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-কার লিখিয়াছেন :—

কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমঃ শৌচাদয়স্তথা।
ইত্যেষাঞ্চ ন যুক্তা স্যাদ্ ভক্ত্যাঙ্গান্তরপাতিতা॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভজনাধীন ব্যক্তিগণের যম নিয়মাদি স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র সাধনা করিতে হয় না। এই নিমিত্ত এই সকল ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত নহে। যাঁহারা হরিসেবাভিকামী, অন্তঃশুদ্ধি, বহিঃশুদ্ধি, তপস্যাশক্তি প্রভৃতি তাঁহাদের অনিমন্ত্রিত সহচর।

ভক্তির কোন এক মুখ্যাঙ্গই অনুষ্ঠিত হউক, অথবা অনেক অঙ্গই অনুষ্ঠিত হউক, নিষ্ঠাপূর্ব্বক আচরিত হইলেই উহা সিদ্ধি প্রদান করে, যথা :—

সা ভক্তিরেকমুখ্যাঙ্গাশ্রিতানেকাঙ্গিকাথবা।
স্ববাসনানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকৃদ্ভবেৎ॥

অর্থাৎ— এক অঙ্গ সাধে কিম্বা সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে বহে সদা প্রেমের তরঙ্গ॥

মুখ্য এক এক সাধকগণের উদাহরণ যথা :—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি-ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষা পরা॥

নবধা ভক্তির মধ্যে পরীক্ষিৎ শ্রীভাগবতকথা শ্রবণে, শুকদেব তৎকথা-

কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ শ্রীভগবানের স্মরণে, লক্ষ্মী পাদসেবনে, পৃথুরাজ পূজনে, অক্রূর অভিবন্দনে, হনুমান দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে, বলি আত্মনিবেদনে সিদ্ধিলাভ করেন।

মহারাজ অম্বরীষ অনেক অঙ্গ সাধন করেন, শ্রীভাগবতে লিখিত আছে ঃ—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃ শ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

অর্থাৎ মহারাজ অম্বরীষ, শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে মন, তাঁহার গুণবর্ণনে বাক্য, হরিমন্দির মার্জ্জনে করদ্বয়, হরিকথা শ্রবণে কর্ণ, শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীমন্দির দর্শনে নয়ন, ভক্তজনের গাত্র সংস্পর্শনের নিমিত্ত দেহ, শ্রীচরণের তুলসীর আঘ্রাণের নিমিত্ত নাসিকা এবং ভগবৎপ্রসাদাস্বাদনের নিমিত্ত রসনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার চরণ ভগবৎক্ষেত্র গমনে এবং মস্তক কৃষ্ণপদাভিবন্দনে নিযুক্ত হইয়াছিল। তিনি বিষয়ভোগবাসনাকে ভগবদ্দাস্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপারে তাঁহার ভগবৎসেবা ব্যতীত আর কোন কামনা ছিল না। যাহাতে শ্রীভগবানের নিষ্কাম রতির উদ্রেক হয়, তজ্জন্যই তিনি এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া-

ছিলেন। ইহাই ভগবৎসেবা, ইহাই ভক্তি। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে।

ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী॥

অর্থ ভজধাতু সেবা অর্থে ব্যবহৃত। বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ সেবাকে ভক্তি বলেন। সাধনসমূহের মধ্যে ভক্তি-সাধনই শ্রেষ্ঠ। এই সেবা কায়িক বাচিক ও মানসিক অনুগতি-বিশেষ।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামি মহোদয় বহু সারগর্ভ কথার অবতারণা করিয়া বৈধী ভক্তির প্রকরণ উপসংহার করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন, এই বৈধী ভক্তি শাস্ত্রোক্তির উপরে সংস্থাপিত এবং প্রবল মর্য্যাদাযুক্ত। কেহ কেহ ইহাকে মর্য্যাদামার্গ বলিয়াও অভিহিত করেন। এই মর্য্যাদামার্গই রাগানুগ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের প্রসরতম পথ। তন্নিমিত্ত এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইল।

শ্রীগোপাল তাপনীশ্রুতিতে লিখিত আছে :—

"ভক্তিরস্য ভজনং। তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনাস্মিন্
মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি।"

অর্থাৎ "শ্রীভগবানের ভজনই ভক্তি। ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থকলাভিসন্ধান নিরাস করিয়া শ্রীভগবানে মনোনিবেশ করাই ভজন।" এইরূপ মনোনিবেশের মূলে শ্রীভগবানের প্রতি জীবের এক স্বাভাবিক আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। সেই আকর্ষণে কেবল শ্রীভগবান্‌ই চিত্ত-বৃত্তিসমূহের একমাত্র প্রিয়তম বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। এইরূপ ভক্তি রাগানুগার পূর্ব্বাবস্থা।

রাগানুগা ভক্তি বৈষ্ণব-সাধন-শাস্ত্রের এক প্রধান বিশিষ্টতা। রাগানুগাভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রথমতঃ রাগাত্মিকাভক্তির কথা বলিতে হয়। কেননা যে ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির অনুসরণ করে, তাহাই রাগানুগা। যথা :—

রাগাত্মিক ও রাগানুগা

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥

অর্থাৎ ব্রজবাসিজনসমূহে পরিস্ফুটরূপে যে ভক্তি বিরাজমানা, তাহাই রাগাত্মিকা ভক্তি। এই রাগাত্মিকাভক্তির অনুগামিনী ভক্তিই রাগানুগা-নামে অভিহিত। ইহার লক্ষণ যথা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে :—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

অর্থাৎ অভিলষিত বিষয়ের সংসর্গলাভের নিমিত্ত যে স্বাভাবিক সাতিশয় ইচ্ছাময় প্রেম,—তাহারই নাম রাগ। পূজ্যপাদ সন্দর্ভকার শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় লিখিয়াছেন :—

বিষয়িণঃ স্বাভাবিকবিষয়সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ। যথা চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্য্যাদৌ। তাদৃশ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবত্যপি রাগ ইত্যুচ্যতে। স চ রাগঃ বিশেষণ-ভেদেন বহুধা দৃশ্যতে। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টমিত্যাদৌ। তত্র প্রিয়ো যথা তদীয়প্রেয়সীনাম্। আত্মা পরব্রহ্মরূপঃ শ্রীসনকাদীনাম্। সুতঃ শ্রীব্রজেশ্বরাদীনাম্। সখা শ্রীশ্রীদামাদীনাম্। গুরুঃ শ্রীপ্রদ্যুম্নাদীনাম্। কস্যাপি ভ্রাতা, কস্যাপি মাতুলেয়ঃ, কস্যাপি বৈবাহিক ইত্যাদিরূপঃ স এক এব তেষু বহু প্রকারত্বেন সুহৃদঃ সম্বন্ধিনাম্। দৈবমিষ্টং তদীয়সেবকানাং শ্রীদারুকপ্রভৃতীনামিতি প্রসিদ্ধম্ অত্র শ্রীমত্যাং মোহিন্যাং যঃ খলু রুদ্রস্য ভাবো জাতঃ স তু নাঙ্গীকৃতঃ। অনুকৃতত্ববৎ তস্য মায়ামোহিতত্বৈব তাদৃশ ভাবাভ্যুপগমাচ্চ।

অর্থাৎ বিষয়ীর বিষয়সংসর্গলাভ বাসনার নিমিত্ত স্বাভাবিক ইচ্ছাতিশয় যে প্রেম, তাহাই রাগ নামে অভিহিত। যেমন সৌন্দর্য্যসন্দর্শনের নিমিত্ত চক্ষুর স্বাভাবিক ইচ্ছাতিশয়ময়ী প্রীতি। চক্ষু সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য স্বভাবতই রাগাবিষ্টতাময়। কাননে গোলাপ ফুলটি ফুটিয়া রহিয়াছে,

তাহা দেখিবার জন্য দর্শকের চক্ষুকে কেহ আমন্ত্রণ বা অনুরোধ করিতেছে না, অথচ চক্ষু স্বভাবতঃই উহা দেখিবার জন্য উহার অভিমুখে আকৃষ্ট হয়। এইরূপে ভক্তের চিত্তও শ্রীভগবানের অভিমুখে স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এতাদৃশ স্বাভাবিক সংসর্গ-ইচ্ছাতিশয়যুক্ত প্রেমের নামই রাগ। বিশেষণ-ভেদে এই রাগ বহু প্রকার। প্রিয়ভাবে, আত্মভাবে, সুতভাবে, সখারভাবে, গুরুরভাবে, সুহৃদের ভাবে, দেবভাবে ও ইষ্টভাবে ইত্যাদি বিবিধ ভাবে এই রাগ প্রকটিত হইয়া থাকে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ প্রিয়ভাবে, শ্রীসনকাদি শান্তরসের ভক্তগণ আত্মা বা পরব্রহ্ম-রূপে শ্রীব্রজেশ্বরাদি পুত্রভাবে, শ্রীশ্রীদামাদি সখ্যভাবে, শ্রীপ্রদ্যুম্নাদি গুরু-ভাবে শ্রীভগবানের সহিত প্রেমসম্বন্ধে সম্বন্ধ। তিনি কাহারও ভ্রাতা, কাহারও মাতুল, কাহারও বৈবাহিক এইরূপ তিনি একাই ব্রজবাসিজনের বহু সম্পর্কে সম্বদ্ধ। তাঁহার সেবকগণ তাঁহাকে ইষ্টদেব মনে করিয়া তাঁহার সহিত প্রেমবিশেষে আবদ্ধ। ব্রজবাসীদের শ্রীভগবানের সংসর্গলাভ ইচ্ছা-তিশয়জনিত যে এইরূপ পরম প্রেম তাহাই রাগ। সংসর্গলাভের অতিশয়-ইচ্ছামাত্রকেই রাগ বলা যাইতে পারে না। শ্রীভগবান্ যখন রুদ্রদেবের ছলনার নিমিত্ত মোহিনীবেশ ধারণ করিলেন, সেই রূপ দেখিয়া রুদ্রের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। মোহিনীর সংসর্গলাভের জন্য রুদ্র ব্যাকুল হইলেন। মোহিনীর নিমিত্ত রুদ্রের এই যে ব্যাকুলতাময় আকর্ষণ—এই আকর্ষণ রাগ নামে অভিহিত হইতে পারে না। এই ভাবকে রূপজ মোহ বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়াই রুদ্রের ঐরূপ ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। উহা শ্রীভগবন্মায়ারই ছলনা মাত্র।

ফলতঃ অভিলষিত বিষয়ে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাই রাগ। এই রাগময়ী ভক্তির নামই রাগাত্মিকাভক্তি। ব্রজবাসিজনসমূহের নিজ নিজ অভিমান অনুসারে কেহ তাঁহাকে সখা, কেহ তাঁহাকে কান্ত, কেহ তাঁহাকে প্রভু ইত্যাদি ভাবিয়া বিবিধ সম্পর্কসূত্রে ভগবানে আবদ্ধ।

এই রাগপ্রযুক্ত শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চ্চন বন্দন সখ্য দাস্য আত্মনিবেদন প্রভৃতি ভক্তি ব্রজবাসিজনে পরিস্ফুটরূপে বিরাজমান হইয়া থাকে। এই ভক্তিকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। কিন্তু এই যে ভক্তির কথা বলা হইতেছে, ইহা রাগলক্ষণা ভক্তি,—গঙ্গা-তরঙ্গের ন্যায় প্রকাশশীলা। ইহা সাধ্যভক্তি,—সাধন ভক্তি নহে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, রাগাত্মিকাভক্তি সাধ্যভক্তি—উহা সাধন ভক্তির প্রকরণভুক্ত নহে। এই সাধ্যভক্তির অনুগামিনী উচ্চতরা ভক্তিবিশেষের নামই রাগানুগাভক্তি। এই ভক্তি ব্রজবাসিজনের ভক্তির অনুকরণ মাত্র।

ব্রজবাসিজন যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্পর্কবিশেষে আবদ্ধ এবং স্বাভাবিক ভাবে তাহাতে যেরূপ পরম আবিষ্ট, সেই ভাববিশেষে যখন কোন সাধকের অকৃত্রিম রুচি হয়, এবং সেই ভাবে যখন তাঁহার যে ভক্তিবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হয়, উহাকেই রাগানুগাভক্তি বলে। ব্রজবাসিজনের চিত্ত রাগময়। কিন্তু সাধক ভক্তগণের সে সৌভাগ্য কোথায়? ব্রজবাসিজনগণের রাগে যদি কোন সাধকের অকৃত্রিম রুচি উপজাত হয়, তাহাতেই তাঁহার পরম সৌভাগ্যের কারণ হইয়া উঠে। ব্রজবাসিজনের রাগে যাঁহার রুচি উপজাত হয়, তাঁহাদের তাদৃশ রাগাত্মিকা ভক্তির পরিপাটীসমূহে তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি তখন শাস্ত্রের বিধিনিষেধের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বভাবতঃই নিজের রুচির প্রবর্ত্তনায় তাদৃশী রাগাত্মিকাভক্তির অনুসরণ করেন। যে ভক্তির রাগই আত্মা, তাহা রাগাত্মিকা। আর সেই রাগে রুচিদ্বারা যে ভক্তির প্রবৃত্তি হয়, তাহাই রাগানুগা। অর্থাৎ রাগাত্মিকা ভক্তির প্রতি প্রগাঢ় রুচিবশতঃ যে ভক্তি উহার অনুগমন করে, তাহাই রাগানুগা ভক্তি।

রাগানুগাভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগামিনী, এই জন্যই সাধনব্যাপারে রাগানুগার প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা সম্বন্ধরূপা ও কামরূপা ভেদে দ্বিবিধা। সম্বন্ধরূপা ভক্তির লক্ষণ এই :—

সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাস্থভিমানতা।
অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীনাং বল্লভা মতা॥

অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দে পিতৃত্বাস্থভিমানত্বই সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি। ইহার নির্গলিত অর্থ এই যে "আমি শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা" "আমি শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু" ইত্যাদিরূপ মননই সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি। বৃষ্ণিবংশীয়গণ এইরূপ সম্বন্ধমাত্র দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন।এখানে "বৃষ্ণি" শব্দ উপলক্ষণত্ব মাত্র। গোপগণও শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন না, তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহাদের প্রিয়তম আত্মীয় বলিয়াই মনে করেন। তাহাতে কার্য্যতঃ শ্রীকৃষ্ণে রাগাত্মিকা ভক্তিরই পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভ-ব্রজসুন্দরীগণের কামই রাগাত্মিকা ভক্তি বা প্রেম। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয় বলেন :—স্বীয় ইষ্ট বিষয়ে রাগাত্মক প্রেমবিশেষত্বই এস্থলে কাম শব্দের বাচ্য। অর্থাৎ আপনার অভীষ্ট বিষয়ক রাগাত্মক প্রেমই কাম নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রীপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার লিখিয়াছেন :—

সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাং।
যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ॥
ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।
আসাং প্রেমবিশেষোঽয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীং॥
তত্তৎক্রীড়ানিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

অর্থাৎ যে ভক্তি সম্ভোগতৃষ্ণাকে প্রেমরূপে পরিণত করে, তাহাকে কামরূপাভক্তি বলা যায়। কেননা ইহাতে যে কোন উদ্যম পরিলক্ষিত হয়, তাহা কেবল কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত। উহাতে আত্মসুখের কোন বাসনা থাকে না। এই সুবিখ্যাত কামরূপাভক্তি কেবল ব্রজসুন্দরীগণেই বিরাজ-মানা। ইহাদিগের এই প্রেমবিশেষ কোন এক অনির্ব্বচনীয় মাধুরী প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎক্রীড়ার নিদান হয়। তন্নিমিত্ত পণ্ডিতেরা এই প্রেমকে কাম আখ্যা প্রদান করেন। যথা গৌতমীয় তন্ত্রে :—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।

উদ্ধবাদি ভক্তসত্তমগণ গোপীদিগের এই প্রেমবিশেষের প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী টীকাতে লিখিয়াছেন রাগাত্মিকা শব্দের ন্যায় কামাত্মিকা শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না, এই জন্য কামরূপা বলা হইয়াছে। কামাত্মিকা ক্রিয়ামাত্র। উহা ভাব নহে। কামাত্মিকা সম্ভোগ-তৃষ্ণাকে প্রেমরূপে পরিণত করিতে পারে না। আমা হইতে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হউক, কামাত্মিকতা এই ভাবের সৃষ্টি করিতে পারে না। কামাত্মিকা আত্মসুখের অভিলাষিণী। আমি কৃষ্ণ হইতে সুখলাভ করিব, ইহাই কামাত্মিকার বাসনা। কিন্তু কামরূপা কৃষ্ণকে সুখ দিতে তৎপরা, তাহাতে নিজের সহস্র কষ্ট, সহস্র ক্ষতি হয় হউক, ইহাই কামরূপার সঙ্কল্প। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

সহজে গোপীর প্রেম,—নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তারে কহি কাম নাম॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ-হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণসুখ দিতে করে সঙ্গমবিহার॥

মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ॥

কামপ্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম॥
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম ত প্রবল॥

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্মকর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥
আত্ম সুখ দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥
তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহ প্রীত।
সেহো তো কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে, কৃষ্ণ সম্ভাষণ।
এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥
কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥

আদিলীলা, চতুর্থ অধ্যায়।

কুব্জার রতি নিজের সুখের হেতুমূলক। এই নিমিত্ত উহা "কাম-প্রায়া" রতি নামে অভিহিত হইয়াছে। গোপীগণ এই কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানকে লাভ করেন। যথা :—

কামাদ্ গোপ্যো ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যুয়ংভক্ত্যা বয়ং বিভো॥

কিন্তু এই কৃষ্ণ-প্রাপ্তিরও তারতম্য আছে। কামরূপা ভক্তি দ্বারা পরমতত্ত্বের যেরূপ লাভ হয়, দ্বেষ ভয়াদি দ্বারা কখনও সেরূপ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুকারের সিদ্ধান্ত এই যে—

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকবিদোদিতং।
তদ্‌ব্রহ্ম কৃষ্ণয়োরৈক্যং কিরণার্কোপমাজুষোঃ॥
ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যান্তি প্রায়েণ রিপবো হরেঃ।
কেচিৎ প্রাপ্যাপি সারূপ্যাভাসং মজ্জন্তি তৎসুখে॥

দ্বেষী এবং প্রিয়গণ একই পদার্থকেই লাভ করেন, কিন্তু সেই পরম-তত্ত্বের প্রকাশভেদে এই উভয়ের শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সূর্য্য ও কিরণ এই দুই বস্তু বস্তুতঃ এক পদার্থ হইলেও যেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা আছে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্ম মূলতঃ একতত্ত্ব হইলেও প্রকাশভেদে বিভিন্নতা আছে। দ্বেষীরা কিরণস্থানীয় ব্রহ্মগতি লাভ করেন, আর প্রিয়ব্যক্তিগণ প্রেমানন্দঘন সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণযুগলে নীত হইয়া থাকেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনই পরমপুরুষার্থ। সুতরাং রাগাত্মিকার অনুগামিনী রাগানুগা ভক্তিই জীবের মুখ্যতম সাধন। রাগাত্মিকাভক্তির কামাত্মিকাস্বপ্রকারে কেবল শ্রীকৃষ্ণবল্লভা ব্রজসুন্দরী-গণেরই অধিকার। তন্ত্রশাস্ত্রে কামস্থ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজনের যে প্রক্রিয়া লিখিত আছে, উহা বিশুদ্ধ চিদানন্দময় প্রেমের ক্রীড়া। ইতঃপূর্ব্বে কামগায়ত্রীকামবীজের ভজন সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে উহার আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে আর তৎসম্বন্ধে পুনরুল্লেখ করা হইল না।

সম্বন্ধরূপা ও কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি সাধনভক্তির অন্তর্গত নহে। ইহাদের অনুগামিনী কামানুগা ও সম্বন্ধানুগাই সাধন-ভক্তির অন্তর্ভুক্ত।

সম্বন্ধানুগাভক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ বক্তব্য আছে। শ্রীপাদ ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুকার লিখিয়াছেন :—

সা সম্বন্ধানুগাভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি।
যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধমননারোপণাত্মিকা॥
লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তিঃ কার্য্যাত্রসাধকৈঃ।
ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া।

অর্থাৎ পিতৃত্বাদিসম্বন্ধের মননরোপণাত্মিকা ভক্তিই সম্বন্ধানুগা রাগানুগা ভক্তি নামে অভিহিত। সাধকগণ নন্দযশোমতী প্রভৃতির বাৎসল্য সেবায় এবং সুবলাদির সখ্যসেবায় লুব্ধ হইয়া তদ্রূপ ভাব-চেষ্টা-মুদ্রা প্রভৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় প্রবৃত্ত হয়েন। ইহাই সম্বন্ধানুগা ভক্তি। কিন্তু এ স্থলে সাধকগণের পক্ষে সাবধানতার নিমিত্ত উপদেশ এই যে তাঁহারা যেন নিজকে ব্রজজনের সহিত অভিন্ন মনে না করেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকরগণের কোন শ্রীমূর্ত্তির সহিত নিজের অভেদ-কল্পনা অপরাধ-জনক। ইহাকে অহংগ্রহোপাসনা বলে। সাধক,—রাগানুগা ভক্তিময়, ব্রজবাসীজনের ভাবলুব্ধ হইয়া সেই ভাবপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহাদের অনুগতি স্বীকার করিবেন। ব্রজজনের ভাবমাধুর্য্য-শ্রবণে তত্তৎভাব লাভের জন্য যে লোভ উপস্থিত হয়, সেই লোভই রাগানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তক। যে পর্য্যন্ত এই ভাবের আবির্ভাব না হয়, তাবৎকাল সাধককে বৈধীভক্তির অনুশীলন করিতে হয়। বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্র অনুকূল তর্কের অপেক্ষা আছে যথা :—

বৈধভক্ত্যধিকারীতু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ।
অত্র শাস্ত্রং তথা তর্ক মনুকূল মপেক্ষতে॥

সম্বন্ধানুগা রাগানুগা ভক্তিতে ব্রজরসের আবির্ভাব হয়। কিন্তু সম্বন্ধানুগাও আইকৃত্তু [illegible] প্রেম-প্রাপ্তির সাক্ষাৎ সাধন নহে। শ্রীল রামরায় বলেন :—

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখীবিনা এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখীবিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে তারে যেই করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

সুতরাং কামানুগা ভক্তিই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলায় প্রবেশের প্রধানতম সাধন। সখীরাই এই সাধনার গুরু। কামরূপা সখীগণের অনুগতিময়ী ভক্তির নাম কামানুগা ভক্তি। কামানুগাভক্তির লক্ষণ এই যে:—

কামানুগা ভবেৎতৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা

অর্থাৎ কামরূপা সখীগণের প্রেম ভক্তির অনুগামিনী তৃষ্ণাই কামানুগা ভক্তি। কামানুগা ভক্তি দুই প্রকার—সম্ভোগেচ্ছাময়ী এবং তত্তদ্ভাবেচ্ছা-ময়ী। কেলিতৎপরতাভক্তি, সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভক্তি নামে অভিহিত। স্ব স্ব অভীষ্ট সখীদিগের ভাববিশেষের প্রাপ্তির নিমিত্ত নিরন্তর ইচ্ছাময়ী যে ভক্তি, তাহাই তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা-কেই মুখ্যকামানুগা বলা হয়।

ব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণপ্রেম কৈতবগন্ধবিবর্জ্জিত ও বিশুদ্ধ। অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম লাভের একমাত্র সাধন—রাগানুগাভক্তি। শ্রীরামরায় বলেন:—

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়॥

রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥

এই পয়ারচতুষ্টয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর নিম্নলিখিত পদ্যগুলিরই প্রতিধ্বনি যথা :—

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্॥
তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যশ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণম্॥

সুতরাং রাগানুগাভক্তি,—ব্রজজনের সেবামাধুর্য্যের প্রবলতর লোভে প্রলুব্ধ হইয়া বর্ষার উন্মাদিনী দ্বিকুলপ্লাবিনী পদ্মার খরপ্রবাহের ন্যায় দুকুল ভাসাইয়া শ্রীকৃষ্ণসাগরে আত্মসমর্পণের নিমিত্ত উধাও ভাবে প্রবাহিত হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য শাস্ত্র কি উপদেশ দিতেছেন, যুক্তিই বা কি বলিতেছে তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার আর অবকাশ বা প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু ইহাতে এরূপ মনে করিতে হইবে না যে শাস্ত্রযুক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া রাগানুগা ভক্তিমার্গে চলিতে হইবে। রাগানুগা ভক্তি-পথের পথিকগণের স্বকর্ম্মকত্ব থাকে না, তাঁহারা স্বীয়বুদ্ধিতে স্বাধীন বা উচ্ছৃঙ্খল ভাবে চলেন না, পরন্তু তাঁহারা এক প্রবলতর শক্তির অনিবার্য্য প্রেরণায় সবেগে পরিচালিত হয়েন। ব্রজবাসিজনের শ্রীকৃষ্ণসেবার মাধুর্য্য ও পারিপাটা-স্মরণে তাঁহাদের চিত্ত তদ্রূপ সেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল ও বিচলিত হইয়া উঠে। সেই লোভ তাঁহাদের চিত্তে উত্তরোত্তর প্রবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগকে রাগানুগা ভক্তিপথে পরিচালিত করে। সুতরাং তখন তাঁহাদের আর শাস্ত্রযুক্তির প্রতি লক্ষ্য করার অব-সর থাকে না। এইরূপ লোভোৎপত্তি হইলে বিষয়ব্যাপারে স্বতঃই তাঁহাদের সংস্রব শিথিল হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের সেবামাধুর্য্যে তাঁহারা তখন একবারেই বিভোর হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় প্রাথমিক সাধক-

গণের নিমিত্ত যে সকল বিধিব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, রাগানুগা ভজননিষ্ঠের মধ্যে সেই সকল বিধি পালনের দৃঢ়তা আর পরিলক্ষিত হয় না, হইবার কথাও নহে। বৈধীভক্তির অনুষ্ঠানের যে উদ্দেশ্য, তাহাদের সেই উদ্দেশ্য এই অবস্থায় সফলীকৃত হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বৈধীভক্তি রাগানুগা ভক্তি লাভের সাধন। বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠানে যখন উহার ফলস্বরূপ রাগানুগা ভক্তি উপজাত হয়, তখন বৈধীভক্তির অনুষ্ঠানে শিথিলতা পরিলক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু রাগানুগার সঞ্চার না হওয়া পর্য্যন্ত বৈধীভক্তি পরিত্যাগ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তদ্‌যথা :—

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে

বৈধীভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ।
অত্র শাস্ত্রং তথাতর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥

অর্থাৎ ভাবের আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত বৈধীভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। এই অবস্থায় শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা স্বীকার্য্য।

বৈধীভক্তির নিষেবণে রাগানুগা ভক্তির উদয় হয়। এই রাগানুগা ভক্তির কামানুগা অঙ্গই অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির সাধন।

যে প্রকারে রাগানুগার সাধন করিতে হয়, তাহার প্রণালী সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামি মহোদয়ের উপদেশ এই যে :—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

রাগানুগা ভক্তিপথের পথিকের পক্ষে স্মরণই প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ এবং স্বীয় অভীপ্সিত তাঁহার প্রিয়জনকে সর্ব্বদা স্মৃতিপথে বিরাজমান রাখিতে হইবে। তাঁহাদের লীলাচরিত্রাদি স্মরণে মননে ও শ্রবণে সতত নিরত থাকিয়া ব্রজভূমে বাস করিতে হইবে। ব্রজবাস সম্বন্ধে টীকাকার

পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামিমহোদয়ের ব্যবস্থা এই যে সমর্থ হইলে শ্রীবৃন্দাবনাদিতে বাস করিতে হইবে, নচেৎ মনদ্বারা ব্রজবাস পবিচিন্তন করিতে হইবে। সাধকরূপ দেহদ্বারা ও সিদ্ধরূপ দেহদ্বারা রাগানুগা ভক্তি-সাধক অভীষ্ট ব্রজবাসিজনেব সেবানুসরণ করিয়া ভগবৎসেবা করেন।

আমাদের এই বর্ত্তমান যথাবস্থিত দেহই সাধক দেহ, আব "অন্তশ্চি-ন্তিতঅভীষ্টতৎসেবোপযোগি" দেহই সিদ্ধদেহ। ইহাই শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয়েব অভিপ্রেত। সিদ্ধদেহেব ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট কবা যাইতেছে। রসময় রসিকশেখবেব সাক্ষাৎসেবা এই গুণময় জড়ীয় দেহ দ্বাবা হয় না। ব্রজবসেব রসময় দেহ ভিন্ন ব্রজনাথেব সমীপ-বর্ত্তী হওয়া যায় না। সাধকদেহও গুণময়। অভীষ্ট সখীব অনুগা মূর্ত্তি ধ্যানগম্যা। ধ্যানদ্বাবা নিজকে তদ্রূপ ভাবিয়া অভীষ্ট সখীর অনুগা হইয়া কুঞ্জসেবাব অধিকাব লাভ করিতে হয়। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ইহার যে প্রণালী লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন তাহা এই :—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞাসেবাপবাং তত্তৎরূপালঙ্কাবভূষিতাম্॥

নিজকে শ্রীললিতা ও শ্রীরূপমঞ্জবী প্রভৃতি কোন সখীব সঙ্গিনীর ন্যায় ধ্যান করিতে হইবে। সেই অভীষ্ট সখীব আজ্ঞাপরা হইতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞা অনুসাবে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা করিতে হইবে। সখীর অনুগা এই বাসনাময়ী মূর্ত্তিকে শ্রীকৃষ্ণের মনোহবরূপে তত্তৎরূপ অলঙ্কাব দ্বাবা বিভূষিত কবিতে হইবে। সনৎকুমার তন্ত্রও বলেন :—

আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥

এস্থলে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে আচার্য্যগণ এবং মহাজনগণও ধ্যানমূর্ত্তির কথাই উপদেশ করিয়াছেন। আমাদের এই যথাবস্থিতদেহকে সখীর অনুগা ভাবে সাজাইতে হইবে, ইহা কেন কেহ মনে না করেন। এই গুণময়

জড়ীয়দেহ রসরাজের সেবাকুঞ্জে প্রবেশলাভ করিতে অসমর্থ। আমার এই রক্তমাংসের দেহ দেখিলে রক্তমাংসের কথাই মনে পড়িবে। এত নিয়ে থাকিয়া কুঞ্জসেবার অধিকার লাভ ঘটে না। আনন্দচিন্ময়রসভাবিতা সখীগণের সহচরী হইতে হইলে সাধকগণকেও তদনুরূপ ধ্যানমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইবে। আমাদের এই সাধকদেহের কথা ভুলিতে হইবে এই বাহ্যজগৎ, এই বাহ্যদেহ প্রভৃতির সহিত সর্ব্বসংস্রব নিবাকৃত করিয়া সাধককে আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা শ্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করার জন্য সাধনা করিতে হইবে। যে স্থানে যাইতে হইবে, নিজে সে স্থানের অনুরূপ না হইলে সে স্থলে প্রবেশাধিকার পাওয়া অসম্ভব। এই নিমিত্ত শ্রীল রামরায়ের উপদেশ এই যে :—

ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহার সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী অনুমতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেও নাঁহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥

ঠাকুর নরোত্তম প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইয়াছেন, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহোদয় রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা প্রভৃতিতে এই তত্ত্ব বিশদরূপে প্রকটিত করিয়াছেন। ব্রজরসের মধুর সাধনাই অকে-

স্তব কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির একমাত্র সাধন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবসমাজে এই মধুর ভজন প্রকটিত করেন। শ্রীপাদ রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব দর্শনের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাদের নিকট ঋণী। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের অকৈতব প্রেমতত্ত্ব পরম দয়াল শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দ্বারাই প্রচারিত হয়। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের ভজননিষ্ঠা অতি সুন্দর। তাঁহাদের ভক্তিনিষ্ঠাও যথেষ্ট। কিন্তু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় ভজন,—ব্রজের নিগূঢ় রস তাঁহাদের সাধনার অবিদিত। তাঁহারা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক। এই উপাসনা ঐশ্বর্য্যময়ী। ঐশ্বর্য্যময়ী সেবাই শ্রীসম্প্রদায়ের ভজনাদর্শ। কিন্তু এই ভজনা ভজনের চরমাদর্শ নহে। কেননা এই ঐশ্বর্য্য-ভজনায় ব্রজের মধুর রস অধিগম্য হয় না। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের মধুময় রসরাজ্যে প্রবেশ ভিন্ন সাধকের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় না। এই নিমিত্ত স্বয়ং লক্ষ্মীও ব্রজরস-লাভের জন্য ব্যাকুলা।

শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য্য সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বেঙ্কট ভট্টের সহিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এ সম্বন্ধে যে অতি সুন্দর বাক্যালাপ হইয়াছিল, এস্থলে শ্রীচরিতামৃত হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—

প্রভু কহে "ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ, গোপ,—গোচারণ।
সাধ্বী হঞা কেন চাহে তাহার সঙ্গম॥
এই লাগি সুখ ভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত নিয়ম করি তপ করিলা অপার॥

শ্রীভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে যথা :—

কস্যানুভাবস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো

বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥

ইহার উত্তরে বেঙ্কট ভট্ট বলেন, "প্রভো, ইহাতে লক্ষ্মীর দোষ হইতে পারে না, কেননা কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই স্বরূপ। কৃষ্ণে লীলা ও বৈদগ্ধ্যাদিগুণ অধিকমাত্রায় প্রকটিত। শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ রাসেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণের কৌতুক ও রাসবিলাস লাভ করিতে ইচ্ছা না হয় কাহার? সুতরাং লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পাইতে অভিলাষ করেন। ইহাতে আমার লক্ষ্মীর সতীত্ব ধর্ম্মের কি হানি হইতে পারে? তাঁহার দোষই বা কি?"

প্রত্যুত্তরে প্রভু বলিলেন, "দোষ কিছুই নাই, তাহা ঠিক। কিন্তু লক্ষ্মী এত তপস্যা করিয়াও রাসবিলাসের সৌভাগ্য-লাভে বঞ্চিত হইলেন কেন? এই শুন, শ্রীভাগবত কি বলিতেছেন:—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ

স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-

লব্ধাশিষং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্।

রাসোৎসবে শ্রীভগবানের দ্বারা গৃহীতকণ্ঠা ব্রজসুন্দরীদের প্রতি যে প্রকার শ্রীভগবৎপ্রসাদ পরিলক্ষিত হয়, শ্রীনারায়ণের বক্ষস্থিত নিতান্ত রতিশীলা লক্ষ্মীর প্রতি কখনও তাদৃশ প্রসাদের উদয় হয় নাই। উপেন্দ্রাদি অবতারের পত্নীগণের কথা তো দূরের কথা।

কিন্তু শ্রুতিগণ তপস্যা করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভট্ট বলিতে পার কি, শ্রুতিগণ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে লাভ করিলেন, আর নারায়ণের বক্ষস্থিতা হইয়াও লক্ষ্মী এই মাধুর্য্য-আস্বাদনে অসমর্থ হইলেন কেন?"

ভট্ট বলিলেন, "প্রভো, লীলারসময় শ্রীভগবানের লীলা কোটীসমুদ্র গম্ভীর! আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, আমার বুদ্ধি উহাতে প্রবেশ-লাভে

অসমর্থ। তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্, দয়া করিয়া যাঁহাকে জানাও তিনিই জানিতে পারেন, নচেৎ অপরে জানিতে পারে না, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ইহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দাও!

প্রভু বলিলেন, “ভট্ট, শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব এই যে তিনি স্বীয় মাধুর্য্যে সকলকে আকর্ষণ করেন। ব্রজলোকের ভাব তাঁহারই মাধুরীময়। তাঁহাদের ভাবের অনুসরণ না করিলে সেই প্রেমময়ের মধুর ভাব অধিগম্য হয় না। ব্রজবাসীরা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন না। তাঁহারা মনে করেন কৃষ্ণ তাঁহাদের নিজজন, যথা ;—

কেহ তাঁরে পুত্র জ্ঞানে উদুখলে বান্ধে।
কেহ সখা জ্ঞান করি চড়ে তাঁর কান্ধে॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন তারে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান নাহি, নিজ সম্বন্ধ-মনন।
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

শ্রুতিগণ এই ব্রজগোপীগণের অনুগত হইয়া গোপীভাব সহকারে যশোদা-নন্দনের ভজন করেন। ভজন-ফলে গোপীদেহ লাভ করিয়া ইহারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাসক্রীড়া করেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপজাতি, গোপীগণ তাঁহার প্রেয়সী। শ্রীকৃষ্ণ অন্য স্ত্রীকে অঙ্গীকার করেন না। এমন কি দেবীরাও তাঁহার প্রসাদ-লাভে সমর্থ হয়েন না। লক্ষ্মী স্বীয় দেহে রাস-বিলাস পাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা সফল হইবে কেন? গোপীদেহ ভিন্ন অন্য দেহে রাসবিলাসে অধিকার জন্মে না। গোপীর অনুগতি সহকারে গোপীভাবে সাধনার ফলে গোপীদেহ-লাভ হয়। গোপীর ভজনই যে ভজনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, কামানুগা ভক্তিই যে অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমলাভের একমাত্র উপায়, ভজন শাস্ত্রের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত।

সুতরাং নিখিলরসমাধুর্য্যকাদম্বর রসরাজ রসিকশেখরকে লাভ করিতে

হইলে সখীর অনুগা হইয়া কামানুগাভাবে তাঁহার সেবাই একমাত্র সাধন। সখীর অনুগতিই ব্রজরসলাভের একমাত্র উপায় এবং অকৈতব শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-প্রাপ্তির একমাত্র সহায়।

কামরূপা সখীদের ভজনই ভজনের আদর্শ। মানবহৃদয়ের পুরুষোচিত প্রবৃত্তির বিদ্যমানতায় মধুর রসের ভজন অসম্ভব। মধুর রসের ভজন সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইলে কামানুগা ভক্তিরসই উহার একমাত্র সাধন। এই ভজনের মধুরতায় প্রলুব্ধ হইয়া কঠোর তপশ্চর্য্যাপরায়ণ ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সাধকগণও সখীদেহ লাভের নিমিত্ত তপস্যা করিতেন। শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামিমহোদয় লিখিয়াছেন :—

নারী হৃদয় ও মধুর ভজন।

পুরাণে শ্রূয়তে পাদ্মে পুংসামপি ভবেদিয়ম্।

অর্থাৎ পদ্মপুরাণে লিখিত আছে প্রেয়সীগণের ন্যায় সেবা করার নিমিত্ত পুরুষগণেরও আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তদ্‌যথা :—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুং ঐচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥

অর্থাৎ পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ শ্রীরামচন্দ্রের দুর্ব্বাদলশ্যামল মনোহরমূর্ত্তি দেখিয়া বিহ্বল হয়েন। ভাবী অবতার সৌন্দর্য্যসারবিগ্রহ শ্রীশ্রীমদনমোহনরূপ তখন তাঁহাদের মানসনেত্র-সমক্ষে বিরাজমান হয়েন। সেই কোটিমদনমোহনাশেষ-চিত্তাকর্ষক-সহজমধুর-তরললাবণ্যামৃত-পারাবার শ্রীমন্মদনগোপালের রূপমাধুরী-সন্দর্শনে সেই রূপমাধুর্য্য আস্বাদন করার নিমিত্ত তাঁহাদের চিত্ত ধ্যানমজ্জিত হয়। প্রগাঢ় সমাধির ফলে তাঁহারা প্রাকৃত দেহ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবার উপযোগি ব্রজবধূদেহ প্রাপ্ত হয়েন। ধ্যানফলে দেহান্তর প্রাপ্তি,—স্থূলবিজ্ঞানের সুবিদিত না

হইলেও সূক্ষ্মবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তিত সত্য। শাস্ত্রকারগণ এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট কীটবিশেষের দেহান্তর-প্রাপ্তির দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাবনানুরূপ দেহপ্রাপ্তি,—দর্শন-বিজ্ঞানসম্মত।

শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়েও লিখিত হইয়াছে :—

অন্তর্গৃহগতাঃকাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মিলিতলোচনাঃ॥
দুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপাধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনিবৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥

প্রগাঢ় ধ্যানফলে এক শ্রেণীর গোপী গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া আনন্দময় দেহ লাভ করিলেন এবং তদ্দেহে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন, এই বচনগুলি তাহারই প্রমাণ। মহাকূর্ম্মপুরাণেও লিখিত আছে :—

অগ্নিপুত্রা মহাত্মান স্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে।
ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্‌যোনিং বাসুদেবমজং বিভুম্॥

অর্থাৎ মহানুভাব অগ্নিপুত্রগণ তপস্যাপ্রভাবে স্ত্রীত্বলাভ করিয়া অজ, বিভু এবং জগৎযোনি বাসুদেবকে ভর্ত্তৃভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ সিদ্ধদেহপ্রাপ্তি ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের মধুরসেবায় অধিকার জন্মে না। কৃষ্ণ-সেবার অধিকার লাভ করিতে হইলে কামানুগা ভক্তিই উহার একমাত্র সাধন। সাধকদেহ বা যথাবস্থিত দেহের বিদ্যমানতাতেও বাসনাময় সিদ্ধ দেহ দ্বারা শ্রীভগবানের মধুর লীলা-ক্ষেত্রে প্রবেশপথ পাওয়া যাইতে পারে। আবার দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিদের ন্যায় সাধকদেহ একবারে পরিত্যাগ করিয়া নিত্যসিদ্ধ দেহও লাভ করা যাইতে পারে। যাঁহার যেরূপ সাধনের বল, তিনি সেইরূপ ফললাভ করেন।

সাধকদেহবিশিষ্ট ভক্তগণ ধ্যান-বল-লব্ধ বাসনাময়ী মূর্ত্তিতে শ্রীভগবানের

সেবাকুঞ্জের প্রবেশপথ লাভ করেন। এই সাধনার পরিপাকে গুণময় দেহ গুণময় জগতে পড়িয়া থাকে। সিদ্ধ ভক্ত তাঁহার নিত্যসিদ্ধ সেবোপযোগি দেহ লইয়া চিরদিনের তরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাকুঞ্জে প্রবেশ করেন। তথা হইতে আর তাঁহার পুনরাগমন হয় না। এই দেহ সেবোপযোগি নারীদেহ। তাঁহাকে কান্তভাবে লাভ করাই মধুর ভাবের সাধকগণের কামনা, সুতরাং নারীদেহ লাভ ভিন্ন সে কামনার পূরণ হয় না।

সেই রসিকশেখর রসরাজ আনন্দরসবিগ্রহকে কান্তভাবে ভজনা করিলে যে সুখোদয় হয়, তাহা তোমার আমার বুদ্ধির গোচর হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরকে লইয়া ব্রজগোপীরা যে রসসাগরে নিমজ্জিত হয়েন, তাঁহার ধারণাও মর্ত্ত্যবাসী লোকের পক্ষে অসম্ভব ; আর কেনই যে তিনি নারীরূপিণী আনন্দমূর্ত্তিগণের সহিত প্রেমরসে নিমজ্জিত রহেন, পরম যোগিগণের পরমার্থ বুদ্ধিও সে রহস্য-ভেদ করিতে অসমর্থ। কিন্তু এ কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, রমণীহৃদয়ই প্রেমের প্রকৃত আধার, রমণী-হৃদয়ই প্রেমরসের সুনির্ম্মল একনিষ্ঠ অক্ষয় উৎস। অবিকৃত রমণীহৃদয় ও প্রেম,—তত্ত্বতঃ বুঝি আধার আধেয় ভাবে সম্বদ্ধ। প্রেম দিয়া ভগবানের ভজন,—শ্রেষ্ঠতম ভজন। অবিকৃত রমণী হৃদয় সেই প্রেমের আধার। নিউম্যান প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত এই যে মানবের আত্মা যে পরিমাণে রমণী-হৃদয়ের প্রেমরস লইয়া কান্তভাবে শ্রীভগবানের উপাসনার জন্য উপস্থিত হয়েন, ভজন-রহস্য ততই তাঁহার পক্ষে সুবিদিত হইয়া উঠে।

আনন্দময় সূক্ষ্মতম ধামের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাবলেশাভাস এই স্থূলতম জগতেও প্রকটিত হইয়া থাকে। এই জগৎ সেই নিত্যধামের ছায়াভাস। এ জগতেও অবিকৃত রমণীহৃদয়ে নিষ্কাম ভাব ও অকৈতব প্রেমের ছায়াভাস যেরূপ পরিলক্ষিত হয়, পুরুষ-হৃদয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য দার্শনিকপ্রবর জনষ্টুয়ার্ট মিল তদীয় Subjection of Women

নামক গ্রন্থে নারী-হৃদয়ের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, সে সমুদায় আর্য্যশাস্ত্রেরই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। নারী প্রকৃতই শক্তিস্বরূপিণী। নারীর প্রেমে স্বয়ং ভগবান্‌ও বশীভূত। বৈষ্ণবগণের নিকট নারী-হৃদয়ের শক্তি-প্রভাবের কথা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবদিগের কামানুগা ভক্তির অতি বিদ্বেষী। তাঁহাদের আপত্তি এই যে :—

(১) শ্রীভগবান্ অপক্ষপাতী। যিনি নরনারী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি নারীর প্রতি কৃপা করিবেন, নরের প্রতি তেমন কৃপা করিবেন না ইহা যুক্তিযুক্ত নয়।

ইঁহাদের আপত্তি-খণ্ডনার্থ বলা যাইতে পারে যে তাঁহার কৃপায় কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, কিন্তু পাত্রবিশেষেই ফলের তারতম্য প্রতিভাত হয়। যেমন সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্রই পতিত হয়, কিন্তু স্ফটিকপাত্রে উহার যেরূপ নয়নানন্দপ্রদ বর্ণবৈচিত্র্য-লীলা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে, মৃৎপাত্রে কখনও সেরূপ হয় না।

(২) আবার যাঁহারা ভারত-উদ্ধারের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের অত্যন্ত আপত্তি এই যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই শিক্ষায় দেশকে নিস্তেজ ও রমণীজনসুলভ কোমল করিয়া তুলিয়াছে। ইঁহাদের আপত্তি স্থূলজ্ঞানজাত। বলাবাহুল্য ইঁহারা ব্যাবহারিক জগতের প্রতিপত্তি ও পারমার্থিক জগতের সাধনাকে এক আসনে স্থান প্রদান করেন। ইহজগতে তুমি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ব্যাকুল হইবে, তাহাতে তোমার তেমন নিন্দা নাই, তুমি নরহত্যা করিয়া দিগ্বিজয়ী নামের গৌরবলাভ করিতেছ, সংসারে তাহাতে তোমার জয়ঢক্কা অনবরত নিনাদিত হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্মজগতে প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠার ন্যায় ঘৃণনীয়, নরহত্যা মহাপাপ। তোমরা এই ধূলিবালি পূর্ণ অসার জগতের ক্ষণবিধ্বংসী বৃথা গৌরবের দীনভিখারী, কিন্তু বৈষ্ণব নিত্যধামের নিত্যানন্দময়ী রাসলীলা আস্বাদনের নিষ্ঠাবান্ মহাসাধক।

বৈকুণ্ঠে ও নরকে যত প্রভেদ, তোমার উদ্দেশ্যেও বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে তত প্রভেদ। আসল কথা এই যে যাহারা নারীহৃদয়ের মাহাত্ম্য ও প্রভাব জানে না, তাহারাই নারীহৃদয়ের দুর্ব্বলতা উল্লেখ করিয়া তাহার নিন্দাবাদ করিতে পারে। কিন্তু শাস্ত্র-যুক্তিনিপুণ ও নারীচরিত্র-পাঠে অভিজ্ঞ লোকেরা জানেন, নারীত্ব প্রাপ্ত হওয়াই মানবের শ্রেষ্ঠতম পরিণতি। শ্রীভগবান্ স্বীয় শক্তিস্বরূপিণীগণের সহিত লীলাবিলাস প্রপঞ্চে প্রকটিত না করিলে জগতে মধুর ভজন চিরদিন অবিদিত থাকিত। ইহা অপেক্ষা জগতের পারমার্থিক ক্ষতি আর কি হইতে পারে? ইহা কেবল বৈষ্ণবের কথা নহে, ইয়োরোপ ও আমেরিকায় অধুনা এই উক্তি চিন্তাশীল লেখক ও লেখিকাগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের জনৈক সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। *

---

* Man, being thus the product of starvation, is temporary and will pass. The process of evolution will gradually evolve him into a woman. As man approaches the industrial age, of which the highly evolved instincts of the bee and the ant are the precursors, we cannot but recognise that the characteristics of humanity are becoming the same in the men and women of the higher civilisation. Height, bearing, vigour of muscle, equality of brain-power, decrease of hairiness, assimilate the boy and the girl.

The male begins to develop certain rudimentary organs hitherto entirely feminine, thus proving the oneness of the constructive creative elements in the male and female organisms, and the ultimate goal intended by natural evolution. In extreme cases in the lower species, the male develops in a certain period, generally of two or three years, entirely into the female; such is the case among those curious animals, the Ostracida and Cirripeda, There is no known case where the female, through atrophy of her distinctive organs, degenerates into a male.

In some species so great and fundamental is the change

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউতে শ্রীমতী সুইনী একটি দার্শনিক প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন :—

The ultimate destny of men is to become a woman.

অর্থাৎ ক্রমবিকাশের নিয়মে নারীরূপ লাভই মানুষের চরম পরিণতি। তিনি আরও বলেন, "মনুষ্য অবিকশিত নারী ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

যীশুর উক্তি এই যে :—

When that which is perfect is come, then that which is imperfect shall be done away and the two shall be one—the male as the female.

অর্থাৎ পূর্ণতার আবির্ভাবে মনুষ্য নারীরূপে প্রকটিত হইবে। ইহার নির্গলিতার্থ এই যে কামাস্পৃহাভাবে শ্রীভগবদুপাসনার নিমিত্ত আত্মা যখন প্রস্তুত হয়েন, তখন তাঁহার নারীদেহ পরিগ্রহই স্বাভাবিক এবংসিদ্ধের রাজ্যে উহাই পূর্ণতার লক্ষণ। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদেহ-প্রাপ্তিই বৈষ্ণবসাধকের ভজন-দেহের শেষ-পরিণতি।

---

wrought, that actually the male becomes more feminised than the female, develops stronger maternal traits and constructive habits.

See, for instance, the case of many of the fish tribe, where the smaller male after fertilisation, takes sole charge of the ova. Among the sticklebacks the male forms the nest, keeps jealous guard over the eggs therein deposited, and protects the young when hatched while the female lives the life of a free-lance.

Among birds, the lower bird devotes weeks of loving labour in preparing a fit habitation for his prospective mate, and when she is safely ensconced therein, assiduosly replenishes and variegates the aesthetic adornments of the nuptial chamber and its approaches.

The male ostrich broods over the the eggs with a greater devotion than his inconsequent partner. And thus characteristics normally functional in the femine organism have been transmitted to the male in so great a degree as to overcome his normal katablis. tendency.

১৯০৫ সালের মে মাসের রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

মানব আত্মার প্রধানতম লক্ষ্য—শ্রীকৃষ্ণভজন। শ্রীকৃষ্ণভজনের প্রধানতম সাধন,—রাগানুগা ভক্তিতে সখীর অনুগা হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা। তাহা হইলেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে মানব আত্মার পূর্ণ পরিণতি, নারী-ভাব—সখীভাব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বারাও এই সত্য দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। বৈষ্ণবসিদ্ধ পুরুষগণ এই মহাসত্যই জগতে প্রকটন করিয়াছেন।

কোথায় অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, আর কোথায় এই নীচ নীচাচার হীন-মতি ক্ষীণশক্তি, ক্ষুদ্রাধম লেখক। আমি মায়ার ক্রীতদাস। আমার সমস্ত জ্ঞান (consciousness) বিষয়ে অভিভূত, —ইদম্ বৃত্তির পূর্ণতম লীলাস্থলী। দিবানিশি জাগতিক পদার্থ-জ্ঞানের তরঙ্গাভিঘাতে আমার মস্তিষ্ক বিভোর ও প্রমত্ত। এই প্রাকৃত রাজ্যের অন্ধকারময় কারাগৃহে আমার মন দিবানিশি অবরুদ্ধ। আমি পূর্ণরূপে মায়াবদ্ধ। আমার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রাপঞ্চিক ও মায়াহত। কিন্তু "যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার," শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ আমার ধারণার অতীত, আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা সখীগণের প্রেম প্রোজ্জ্বলমূর্ত্তি এবং আনন্দচিন্ময়রস মাদৃশ মহাপাপীর পক্ষে একবারেই অনধিগম্য, সুতরাং কুঞ্জ-সেবার সাধন বুঝিবার অধিকার আমার নাই। এই অবস্থায় সিদ্ধগণের সেব্য বিষয়ে কোন কথা বলিতে প্রবৃত্ত হওয়া প্রকৃতই অতিবড় ধৃষ্টতার কার্য্য। যাহা নিজে বুঝিতে পারি না, তাহা অপরকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইব, কৃপাময় পাঠকগণ যেন এ অধম লেখককে এরূপ দুঃসাহসী বলিয়া মনে না করেন। সপার্ষদ শ্রীগৌরচরণ-চিন্তা করিয়া শ্রীল রামরায়ের কৃপা-উপদেশের আমি যেরূপ অর্থ করিতে প্রয়াস পাইতেছি এখানে কেবল তাহাই প্রকাশ করা যাইতেছে। সুবিজ্ঞ ভজন-নিষ্ঠ পূজ্যপাদ ভক্তগণ এ বিষয়ে এ কৃপার্হ ব্যক্তির কথাগুলি সংশোধন করিয়া দিলে চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব। শ্রীল রায় মহাশয় বলিতেছেন—

সখী ও ভজন-শিক্ষা।

রাধাকৃষ্ণ লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্য ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখী ভাবে যেই তারে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

সখী ও লীলাবিলাস।

রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস মহত্ত্ব সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যে আলোচনা করা হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে এই লীলা অতি গূঢ়তর। এমন কি ভাববিশেষের প্রবল আতিশয্যে যখন উভয়ের ভেদভাব তিরোহিতবৎ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই অবস্থায় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা এমনই রহস্যপূর্ণ যে তাহা কাহারও জ্ঞানগম্য হয় না। না জানিলেও জ্ঞেয় হইতেই যেমন অজ্ঞেয়ের ধারণা হয়, দ্বৈত হইতেই যেমন অদ্বৈত তত্ত্বের ভাবোদয় হয়, ইদম্বৃত্তি হইতেই যেমন অহম্বৃত্তির অনুভূতি হয়, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এই গূঢ়তম লীলারহস্য অপরের উপলব্ধির বিষয় না হইলেও এই উচ্চতম সাধন-তত্ত্বের উপলব্ধি কেবল সখীগণেরই গ্রাহ্য। সখীগণ কুঞ্জসেবার সহায়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবায় কেবল সখীগণেরই একমাত্র প্রবেশাধিকার রহিয়াছে। এই লীলায় দাস্যবাৎসল্যাদির প্রবেশাধিকার নাই।

সখীরাই সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরূপিণী, আনন্দলীলাময়ী শ্রীমূর্ত্তি। সখীরাই লীলার সহায়, সখীরাই পুষ্টিকারিণী, তাঁহারাই আস্বাদিকা। শ্রীউজ্জ্বল বলেন—

প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যক্ বিস্তারিকা সখী।
বিশ্রম্ভরত্নপেটী চ ততঃ সুষ্ঠু বিবিচ্যতে॥

যাঁহারা প্রেমলীলা-বিহারের সম্যক্ বিস্তার করেন তাঁহারাই সখী। কেবল দৌত্যই সখীগণের কার্য্য নহে। সখীগণ রসলীলার পুষ্টিকারিণী। ইঁহারা উভয়ের প্রেমলীলা-বিস্তারের সহায়।

আমাদের এই প্রাপঞ্চিক রক্তমাংসের বিকারশীল দেহের ন্যায় শ্রীভগবদ্ধামের দেহাদি বিকারাধীন নহেন। শ্রীভগবদ্দেহ বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তিগণের দেহ রক্তমাংসের নহে,—তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দ-ময়ী। এই ইন্দ্রিয়পরায়ণতাময় কামাচারেব মধ্যে বাস করিয়া, এই প্রাকৃত দেহের ধর্ম্মে অভিভূত থাকিয়া, প্রাকৃতভাবে আত্মাকে নিমজ্জিত রাখিয়া অপ্রাকৃত অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেমের সন্ধান করা একবারেই অসম্ভব। আমরা জগতের অতি স্থূলতম কয়েকটী গুণের সংবাদ রাখি। আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান অতি স্থূল, মনের ধারণাও অতি স্থূল। আমরা নিম্নশ্রেণীর জীবের প্রকৃতি লইয়া আহার নিদ্রা মৈথুনাদিতে নিরত হইয়া থাকি। উচ্চতম জগতের উচ্চতম তত্বে কঠোর সাধনা বিনা আমাদের প্রবেশাধিকার জন্মে না, কদাচার কামাচার বা স্বার্থ ভিন্ন কি প্রকারে যে প্রেম থাকিতে পারে, তাহা আমাদের ধারণায় আইসে না। গোপীগণের প্রেম অতি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ। প্রেমই তাঁহাদের কাম। সে জগতের সহিত এ জগতের পার্থক্য অনন্ত। এই জগৎ মায়ার প্রহেলিকা। মায়ার কোটী দোষে আমরা কলুষিত ও কুসংস্কারগ্রস্ত। আমরা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির জন্য সর্ব্বদা উন্মত্ত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-উৎপাদনের জন্য গোপিকাকুল আকুল ও উন্মাদিনী। শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য বিশুদ্ধ প্রেমময়। গোপীগণ তাঁহারই আহ্লাদিনী শক্তির শ্রীমূর্ত্তি। সুতরাং কৃষ্ণসুখই গোপী-প্রেমের তাৎপর্য্য। সিদ্ধ ভক্তগণের আত্মা ধ্যানযোগে অনন্ত জগৎ পার হইয়া শ্রীধামের নির্ম্মল প্রেমমাধুরী অনুভব করেন, শ্রীগোপীগণের আনন্দলীলা ও আনন্দ-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেন। তদ্‌যথা—

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎ শ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥

অর্থাৎ গোপীগণ আমার রাসক্রীড়ায় সহায়, প্রেম শিক্ষায় গুরু, হিতোপদেশপ্রদান ও শাসনাদিতে শিষ্যা, রসনির্য্যাস-আস্বাদনে ভুজিষ্যা, (ভোগ্যাস্ত্রী,) উপকৃত্যাদিতে বান্ধব, পত্যেকনিষ্ঠাদিতে শক্তিমত্তাবে আমার ধর্ম্মপত্নী তুল্যা। গোপীরা যে আমার কি নহেন তাহা বলিতে পারি না। ইহারা আমার সেবা শ্রদ্ধা এবং আমার মনোগত ভাব ও তত্ত্বতঃ যেরূপ জানেন আর কেহ সেরূপ জানে না।

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

বিভুরতি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ।
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ॥
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ।
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥

চিদ্বিভূতিসমূহ ব্যতীত যেমন ঈশ্বরের পুষ্টি হয় না, সেইরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব ব্যাপক, অতি মহান্, অতি সুখস্বরূপ ও স্বয়ং প্রকাশমান হইলেও সখীদের সাহায্য বিনা নানারসের সম্পুষ্টি হয় না। অতএব ইঁহাদের পদ কোন রসজ্ঞ ভক্ত আশ্রয় না করেন্?

শ্রীল উদ্ধব মহাশয় বলেন :—

আসামহোচরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

সুতরাং গোপীগণের চরণরেণুলাভ ভিন্ন অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেমরাজ্যে

প্রবেশাধিকার অসম্ভব। গোপীগণই অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির একমাত্র সহায়।

ভক্তপাঠক, শ্রীচরিতামৃতের আদিলীলায় চতুর্থ অধ্যায়ে গোপীভাবের দার্শনিক তত্ত্ব পাঠ করিয়াছেন। গোপীগণ বিশুদ্ধ প্রেমবতী। তাঁহাদের চিত্তে কামগন্ধলেশবিবর্জ্জিত, যথা :—

আত্মসুখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

এইরূপ প্রণয়োৎকর্ষ আর কোথাও সম্ভবনীয় নহে। শ্রীচরিতামৃতাকর আরও বলেন—

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি; সুখ হয় কোটী গুণ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটী গুণ গোপী আস্বাদয়॥

* * * *

গোপীপ্রেম করে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি॥
প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়নন্দ।
তাহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাহা তাহা এই রীতি।
প্রীতি-বিষয়-সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥

শ্রীল রামরায় মহাশয়ের উপদেশামৃতে এই সকল সূক্ষ্মতত্ত্বের পুনরুল্লেখ করা

হইয়াছে। শ্রীল রায় মহাশয় বলিতেছেন "প্রভো! সখীদের প্রেমের মহিমা শুনুন, স্বীয় সুখ কাহাকে বলে সখীরা তাহা জানেন না," শ্রীরাধা-মাধবের লীলাবিহারের রসপুষ্টি করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের সুখ। শ্রীমতী মানিনী হইলেন, সখীরা মান-প্রশমনের উপায় করিতে লাগিলেন, পদপতিত নাগররাজের পক্ষাশ্রয় করিয়া শ্রীমতীকে কত ভৎ সনা করিতে লাগিলেন। আবার শ্যামবিরহে রাই পাগলিনী প্রায় হইলেন, এমন কি তাঁহার অন্তিম-দশা উপস্থিত হইল, সখীরা তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণনাম জপ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধার চেতনা হইল, তিনি পাগলিনীর মত ইতিউতি চাহিতে লাগি-লেন। সখীরা তাঁহাকে সাজাইতে বসিলেন, কিন্তু শ্যামের অভিসারে শ্যামোন্মাদিনী শ্রীমতী উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া চলিলেন, সখীরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িলেন, শ্রীমতী তখন জ্ঞানহারা। পাছে ব্রজের পথে কাঁটায় কাঁকরে শ্রীমতীর কুসুমকোমল চরণ দুখানি ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, সখীরা সেই ভয়ে অস্থির। কুঞ্জবনে রাধাশ্যামের মিলন হইল, সখীদের আর আনন্দের সীমা নাই, তাঁহারা নানাপ্রকারে কুঞ্জ-সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন, নানাপ্রকারে রসবতী রসরাজের রসসেবাসুখে নিমগ্ন হইলেন। এই সেবাতেই তাঁহাদের পরম সুখ ও চরমা তৃপ্তি। তাঁহারা আর কিছু চাহেন না। তাঁহারা কেবল চাহেন—"আমরা যেন এই যুগলরূপ জীবন ভরে হেরি।" এমন নিষ্কাম নিঃস্বার্থ মধুর সেবা কে কবে করিয়াছে?

সখীর স্বভাব সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃত বলেন—

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় সখীর নাহি মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হতে তাতে কোটী সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ,—কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্পপাতা॥

কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটী সুখ হয়॥

এস্থলে শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে তদ্‌যথা—

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনী নামশক্তেঃ
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যা মমুষ্যাং
জতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্॥

অর্থাৎ সখীগণ ব্রজকুমুদবিধু শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সার প্রেম-রূপিণী শ্রীরাধালতিকার কিশলয়পত্র এবং পুষ্পাদি সদৃশ। তাঁহারাও তৎতুল্যা। কৃষ্ণলীলামৃতরস দ্বারা স্বয়ং লতা পরিসিক্ত ও উল্লাসযুক্ত হইলে পত্রপুষ্পাদিতুল্য সখীগণের যে স্বীয় সেক অপেক্ষা শতগুণে অধিক উল্লাস উপজাত হয়, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তাই শ্রীচরিতামৃত বলেন :—

নিজ প্রেম সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥

মানুষের জ্ঞান আছে, সে জ্ঞান অনিত্য, সীমাবদ্ধ ও বিষয়দুষ্ট। ভগবানের জ্ঞান অসীম, অনন্ত, অপাপবিদ্ধ, বিশুদ্ধ ও শাশ্বত। মানুষের এক প্রকার প্রেম আছে, তাহা প্রকৃত প্রেম নহে, এমন কি বিশুদ্ধ প্রকৃত প্রেমের আভাসও নহে, উহা কামেরই নামান্তর। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে উহা কাম ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু যিনি অনন্ত জগতের অধীশ্বর যিনি সর্ব্বকারণের কারণ, যিনি সকল জ্ঞানের জ্ঞান, যিনি নিখিল প্রেমের প্রেম, তাঁহার প্রেমলীলা যে কি চমৎকার ব্যাপার, তাঁহার প্রেমলীলার সহায়স্বরূপিণী তাঁহার স্বীয় স্বরূপশক্তি-রূপিণী প্রেমময়ীদের প্রেমসেবা-পারিপাট্য কেমন অদ্ভুত ও নিষ্কাম, তাহা ব্রজসাধনায় সিদ্ধগণেরই অনুভবনীয়। কেননা এই সখীরাই তাঁহাদের প্রেমসেবার শিক্ষাগুরু।

ভুবনপাবন গৌড়ীয় গোস্বামিগণের ভজন-প্রক্রিয়ার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইলেই এই ভজনের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত সহজে হৃদয়ঙ্গম হইয়া উঠে। শ্রীপাদ সনাতন, রূপ, রঘুনাথদ্বয়, গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব গোস্বামিপাদ মহোদয়গণের মধুরভজন,—ভজনের সমুজ্জ্বল আদর্শ। বৈধী ভক্তিতেই তাঁহাদের সাধনার আরম্ভ এবং কামানুগা ভক্তিতে সেই সাধনার সিদ্ধি।

পাহাড়ের পদপ্রান্তস্থ ক্ষুদ্র ঝরণা শিলাপূর্ণ প্রদেশের কঠোর ভূমির মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া কুলু-কুলু-কলকলনাদে কোথাও ধীর, কোথাও তীব্র গতিতে প্রবাহিত হয়। এইরূপে কঠোর পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সুদূরে নয়নসুলভ শস্যপূর্ণ শ্যামল কোমল ভূমির বক্ষে পতিত হইয়া, —বর্দ্ধিতবেগে স্বীয় প্রসার বিস্তার করিয়া, উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া,—ভীম-ভৈরব গর্জ্জনে অসীম অনন্ত জলধির অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে উহার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

সাধনারূপিণী অতি ক্ষুদ্র ঝরণার ক্ষীণপ্রবাহ এইরূপে বৈধীভক্তির কঠোর ভূমির উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে রাগানুগার শ্যামল কোমল ভূমি প্রাপ্ত হয়। রাগানুগার প্রেমের প্রবাহ বর্দ্ধিত হয়, সাধনা-তটিনী তখন দুকুল ভাঙ্গিয়া আপনার প্রভাব-প্রভুত্ব-প্রসার বিস্তৃত করিয়া লয়। এইরূপে সাধনার স্রোত যতই অগ্রসর হইতে থাকে, কামানুগার সুকোমলতম প্রদেশ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হয়, অবশেষে শতমুখী গাঙ্গপ্রবাহের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-জলধিতে সম্মিলিত হইয়া জীবের সাধনা কৃতার্থ হইয়া থাকে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

বিবিধ-কথা।

শ্রীল রামরায় দ্বারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এইরূপ অকৈতব-কৃষ্ণপ্রেম ও উহার সাধন প্রণালী জগতে প্রকটিত করিলেন। আপনি শ্রোতা হইয়া ব্রহ্মার দুর্লভ সাধনতত্ব সাধকবিশেষের হিতার্থে এই প্রপঞ্চে উপদেশ করিলেন। ইহা অপেক্ষা পরম দয়ার পরিচয় আর কি হইতে পারে? শ্রীল রামরায়ের মুখে সাধ্যসাধন-তত্ব শ্রবণ করিয়া রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বর্দ্ধিত প্রেমবেগে গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় উভয়ের প্রেমাশ্রু বক্ষ বহিয়া চলিল। সারারাত্রি উভয়ে কৃষ্ণকথায় মজিয়া রহিলেন। সুখময় সুমধুর কৃষ্ণকথায় সুদীর্ঘ যামিনী কি প্রকারে অতিবাহিত হইল, প্রভু ও রামরায় তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। *

রামরায় বুঝিতে পারিলেন প্রভু এখন চলিয়া যাইবেন। ভগবদ্‌বিরহের ন্যায় দুঃসহ যাতনা আর কি আছে? রায় মহাশয় বলিলেন, প্রভো এ অধমের প্রতি অশেষ কৃপা প্রকাশের জন্যই যখন এ দীনের কুটিরে আপনার শুভ পদার্পণ হইয়াছে, তখন দিন দশ দয়া করিয়া এখানে

---

* অমর কবি ভবভূতির উত্তরচরিতে শ্রীরামচন্দ্র আলেখ্য দেখাইতে দেখাইতে, সীতাদেবীকে বলিতেছেন :—

কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা-
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো-
রবিদিত গতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ। (প্রথম অঙ্কে।)

থাকিতে হইবে, এখানে থাকিয়া আমার দুষ্ট চিত্তের শোধন করিতে হইবে; যথা চৈতন্যচরিতামৃতে :—

মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইহ আগমন।
দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন॥
তোমাবিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমাবিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে॥

প্রভু বিনয়ের খনি—ভক্তমহিমপ্রকাশে পরম সুচতুর। তাঁহার বাক্য স্বভাবতঃই মধুময়। রামরায়ের দৈন্য উক্তি শুনিয়া প্রভু তাঁহার বিনয়-বাক্যের উপরে মধুর বিনয়নম্র বচনের মাত্রা চড়াইয়া বলিলেন, "রামরায়, লোক মুখে তোমার গুণের কথা শুনিয়া আমি আপন চিত্ত শোধন করার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি। যেমন শুনিতে পাইয়াছিলাম, ঠিক সেই প্রকারই তোমার মহিমা দেখিতে পাইলাম। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেম-রসজ্ঞান জীবজগতে তোমাতেই সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তোমার এখানে আমাকে দশদিন অবস্থান করার কথা বলিতেছ। আমি বলি, দশদিন কেন, যত কাল বাঁচিয়া রহিব, ততদিন তোমার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না।" যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

প্রভু কহে—আইলাম শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন॥
যৈছে শুনিল, তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-জ্ঞানের তুমি সীমা॥
দশদিনের কা কথা, যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব॥

প্রিয় পাঠক, অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে আপনি অনেক কথা জানেন, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় অনেক উপদেশও আপনার স্মৃতিমন্দিরে পুঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু আমার প্রেমময় মহাপ্রভুর এক একটী বাক্য প্রেমিক

ভক্তের হৃদয়ে অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের মহাভাব যে প্রকারে জাগাইয়া তোলেন, তাহার রসাস্বাদ করিলে লক্ষ শাস্ত্র-পাঠের ফল সহজে অধিগত হইয়া থাকে। প্রভু তাঁহার প্রেমিক ভক্তকে বলিতেছেন :—

দশদিনের কা কথা, যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব॥

সন্ন্যাসীরা সঙ্গত্যাগ করেন। লোকসঙ্গ হইতে দূরে বাস করেন ইহাই তাঁহাদের রীতি। কিন্তু এই প্রেমিক সন্ন্যাসিশিরোমণির সঙ্গস্পৃহা কত বলবতী, উপরোক্ত পয়ারের অর্থগাম্ভীর্য্যের বিষয় ভাবিয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। ইহা প্রেমেরই মহা অভিব্যক্তি, এই আকর্ষণ প্রেমেরই বিশাল ব্যাপার। ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের এমনই টান যে তিনি চিরদিন ভক্তসঙ্গে একত্র অবস্থান করিতে ইচ্ছুক।

রামরায় বলিলেন, "প্রভো দশদিন এখানে থাকুন।" প্রভু বলিলেন, "দশদিন কেন, যতদিন বাঁচিয়া রহিব ততদিন তোমার সঙ্গে থাকিব।" এই বলিয়া পরম দয়াল এখানে তাঁহার একটী মনের কথা জানাইলেন, তিনি বলিলেন :—

নীলাচলে তুমি আমি রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥

আপাতদৃষ্টে রামরায় বিষয়ী, প্রভু সন্ন্যাসী। কিন্তু রামরায় যদি প্রাকৃত বিষয়ে বিষয়ী হইতেন, তবে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাকে কখনও এরূপ কথা বলিতেন না। রামরায়ের বিবিধ বৈভব, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, বিলাসের সহস্র উপাদান। প্রভু তাঁহাকে বলিতেছেন, "নীলাচলে তুমি আমি একসঙ্গে থাকিব, এবং কৃষ্ণকথারঙ্গে সুখে কাল যাপন করিব।" প্রভু সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জানেন রামরায় বিষয়ী হইয়াও বিষয়াসক্তির লেশাভাস-বিবর্জ্জিত, পরম বৈরাগ্যপূর্ণ ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরসসাগরে নিত্য-নিমজ্জিত; বৃন্দাবন-রসমাধুর্য্যই তাঁহার সুখের একমাত্র বস্তু। তাই প্রভু

তাঁহার প্রিয়তম ভক্তকে জানাইলেন, উভয়ে নীলাচলে একত্র থাকিবেন, এবং কৃষ্ণকথারস-রঙ্গে কাল অতিবাহিত করিবেন।

কি প্রকার কৃষ্ণকথারঙ্গে উভয়ে নীলাচলে সুখে কাল কাটাইতেন, শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় তাহার কিছু কিছু আভাস জানিতে পারা যায়। মধুময়ী কৃষ্ণকথায় যে কি সুখ আছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না—সে সুখ আমাদের জ্ঞানের অতীত। মহাপ্রভু বিদ্যানগরে আসিয়া কৃষ্ণকথার সাথী পাইলেন, শেষ লীলায় যে সুখে যে ভাবে দিনযামিনী বিভোর থাকিবেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এই প্রিয়তম সাথীকে জানাইলেন, এবং স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন "নীলাচলে আমরা একত্র থাকিব, আর কৃষ্ণকথারঙ্গে সুখে কাল কাটাইব।"

বৈষ্ণবের ভজন চিররসময়। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি রসিকশেখর শ্রীভগবান্ বৈষ্ণবের উপাস্য। তাঁহার লীলাকথা চির মধুর ও অনন্ত রসরঙ্গময়ী। রসের ভজন একাকী হয় না—সাথী চাই, সাথী ভিন্ন রসের পুষ্টি হয় না। ইষ্টগোষ্ঠি ভিন্ন কৃষ্ণকথারঙ্গের আস্বাদ উথলিয়া উঠে না। প্রিয়তম পাঠক, নীলাচলে কৃষ্ণ কথারসরঙ্গে যে অকৈতব প্রেমের উৎস উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার স্মরণ, মনন ও ধ্যান করাই জীবের অতি শ্রেষ্ঠ সাধন। বিরহব্যাকুল মহাপ্রভুর রাধাভাব,—কৃষ্ণপ্রেম-উন্মাদিনী শ্রীমতীর ন্যায় প্রেমবিহ্বলতা,—বাহ্যজ্ঞানের পূর্ণ বিলোপ,—সতত শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি, প্রাণবল্লভ শ্যামসুন্দরের বিরহে হাহুতাশ,—স্বরূপের সুললিত লীলারসময়ী গীতির আশ্বাস, আর শ্রীল রামরায়ের কৃষ্ণকথায় সান্ত্বনা প্রভৃতিতে নীলাচলে ব্রজরস উথলিয়া উঠিয়াছিল, সেই রসসুধা-মহাসাগরের বিন্দুমাত্র হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলেও কৃষ্ণকথারসরঙ্গতরঙ্গের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। রসিক ভক্তের নিভৃত নিত্যসঙ্গ ভিন্ন কৃষ্ণকথার মাধুর্য্য-সুধাস্বাদ-লাভ করা যায় না। এখানে কৃপাময় পাঠকগণ প্রত্যহ নিয়মের কৃষ্ণকথা শ্রবণে আমাদের বিষয় একবার মনে করুন।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র একদিবস কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণান্তিকে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করেন :—

কৃষ্ণকথা শুনিবার মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয়॥

ইহার উত্তরে মহাপ্রভু যাহা বলেন তাহা এই—

প্রভু কহে কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে তার মুখে শুনি॥
ভাগ্য তোমার—কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ পাশে যাই করহ শ্রবণ॥

প্রভু বলিতেছেন, ঠাকুর, তুমি আমার নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে আসিয়াছ, আমি সন্ন্যাসী, কৃষ্ণকথার কি জানি? কৃষ্ণকথা শুনিতে সাধ হইলে শ্রীল রামরায়ের মুখে আমি কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া থাকি। তোমার যে কৃষ্ণকথা শুনিতে সাধ হইয়াছে, ইহা তোমার পরম ভাগ্য। তুমি রামরায়ের নিকট যাও, তিনি তোমাকে কৃষ্ণকথা শুনাইবেন।" এ সকল কথা অতঃপরে বিস্তৃতরূপে অলোচনা করা যাইবে।

শ্রীল রামরায় ভজনতত্ত্ব ও কৃষ্ণকথাতত্ত্ব সম্বন্ধে কীদৃশ অধিকারী ছিলেন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই উক্তিও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা পাঠে জানা যায় শ্রীল রামরায় সুমধুর কৃষ্ণকথা বলিয়া মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহ-ব্যথা প্রশমিত করিতেন।

শ্রীল রামরায়ের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আরও কয়েক দিবস তাঁহার ভবনে থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীল রামরায় ও মহাপ্রভু আবার ইষ্টগোষ্ঠী কথা আরম্ভ করিলেন। প্রভু রামরায়কে পরমার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, আর রায় মহাশয় উহার যথাযথ উত্তর দান করিলেন। এখানে কতিপয় প্রশ্নোত্তরের উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা :—

ভগবান্। বিদ্যার মধ্যে কোন্ বিদ্যা সার?

রামরায়। একমাত্র কৃষ্ণ-ভক্তিই বিদ্যা, তদ্ভিন্ন আর বিদ্যা নাই॥ *

(*) "বিদ্যতে তত্ত্বং অনয়া ইতি বিদ্যা।" অর্থাৎ যদ্দ্বারা তত্ত্ব জানা যায়, তাহাই বিদ্যা। নাগোজী ভট্ট বলেন "পরমোত্তমপুরুষার্থসাধনভূতা বিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞানরূপা।" অর্থাৎ পরম উত্তম পুরুষার্থসাধনস্বরূপিণী বিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞানরূপিণী।

বিষ্ণুপুরাণে বিদ্যাশব্দের যে অর্থ করা হইয়াছে তাহা এই :—

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতা শ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যাহ্যষ্টা দশৈবতাঃ॥

অর্থাৎ অঙ্গসমূহ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দঃ) চারি বেদ (ঋক্, সাম যজু, অথর্ব্ব) মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব ও অর্থ-শাস্ত্র এই অষ্টাদশ বিদ্যা। কিন্তু এই সকল শাস্ত্র বিদ্যা হইয়াও প্রকৃতপক্ষে পরা বিদ্যা নয়, কেননা এতদ্দ্বারা পরম তত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীভগবত্তত্ত্ব জানা যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদি পাঠ করিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আধুনিক কোন সংস্করণের টীকায় লিখিত হইয়াছে—"এখানে কৃষ্ণভক্তিবিদ্যা বলিতে কৃষ্ণভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্র। শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত যথাযথ ভক্তিস্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, এই নিমিত্ত কৃষ্ণভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসই যথার্থ বিদ্যা।"

এই ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। কৃষ্ণভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্র অভ্যাস করিলেই পরাবিদ্যা লাভ হইল এ কথা বলা অসঙ্গত। কেননা, "ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণম্" প্রভৃতি বাক্য সত্যের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে লিখিত হইয়াছে :—

'কিম্ বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈঃ কিমুতীর্থনিষেবণৈঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥

গরুড়পুরাণে—অন্যং যজ্ঞোহপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্ত স্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥

সুতরাং ভক্তিশাস্ত্রের অভ্যাস করিলে ভক্তিলাভ হয় না। শাস্ত্রাভ্যাস বিদ্যা নহে, ভক্তিই বিদ্যা। "আত্মসূক্ত" এইরূপ বক্তৃপ্রয়োগানুসারে "হরিভক্তিরেব বিদ্যা"

ভগবান্। কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।

রামরায়। কৃষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥

"ভগবদ্‌ভক্ত" এই খ্যাতি অপেক্ষা আর কোনও খ্যাতি মহতী বলিয়া গণ্য নহে। দানাদি দ্বারা লোক কীর্ত্তি অর্জ্জন করে, কিন্তু "ভগবদ্‌ভক্ত" এই খ্যাতির নিকট কোন খ্যাতিই আদরণীয় নহে।

ভগবান্। সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?

রামরায়। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই মহাধনী॥

ফলতঃ ধনজন গ্রামাদি সম্পদ্ অতি নশ্বর, এবং এই সকল সম্পদ্ অনেক সময়েই বিপদের কারণ হইয়া থাকে। অপিতু এই সকল সম্পদ দ্বারা লোক প্রকৃতপক্ষে শ্রীযুক্ত হইতে পারে না। অভাব মোচন করিয়া সুখ-শান্তি-প্রদানই সম্পদের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু বাসনার ক্ষয় না হইলে অভাব মোচন হয় না। বিশাল তৃষ্ণার অনল অহরহ হৃদয়ে জ্বলিলে ইন্দ্রের বৈভবেও লোকের অভাব মোচন করিতে পারে না। কিন্তু

এই অর্থ বুঝিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটককারও তাহাই বলিয়াছেন। তদ্‌যথা :—

"হরিভক্তিরেব, ন পুনঃ বেদাদিনিষ্ণাততা।"

টীকাতে লিখিত হইয়াছে "হরিভক্তিরেব বিদ্যা" অর্থাৎ হরিভক্তিই প্রকৃত বিদ্যা বেদাদি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের নাম বিদ্যা নহে।

ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই যে ভক্তি জন্মে, আর তাহা না করিলেই যে ভক্তি জন্মে না ইহার কোন প্রমাণ নাই।' পঞ্চমবর্ষীয় বালক প্রহ্লাদ ভক্তাবতার ; তিনি কোন্ ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই ? আসল কথা এই যে ভক্তি দ্বারাই তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে জানা যায়, এই জন্য ভক্তিই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উক্তি এই যে:—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।"

শ্রীধর স্বামী গীতার টীকায় বলিয়াছেন, ভক্তি দ্বারাই পরম তত্ত্বকে উত্তমরূপে জানা যায় বলিয়া ভক্তি জ্ঞানেরই পরাকাষ্ঠাবিশেষ। সুতরাং ভক্তিই প্রকৃত পরা বিদ্যা।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রীতি হৃদয়ে উদিত হইলে জীবের সকল প্রকার বাসনা বিনষ্ট হয়, বিষয়-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়, জীব তখন নিজকে পরিতৃপ্ত বলিয়া মনে করে। ভগবৎপ্রেমধনের ন্যায় সম্পদ্ জগতে আর কি আছে? এই ধন লাভের জন্য ইন্দ্র চন্দ্র কুবের এমন কি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ব্যাকুল। পার্থিব সর্ব্বপ্রকার সম্পৎ ত্যাগী স্বয়ং ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি এই ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত মহাযোগে নিমগ্ন। সুতরাং ভগবৎ প্রেমই সর্ব্বসম্পদের সার সম্পদ।

ভগবান্। দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর।

রামরায়। কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর॥*

ফলতঃ ভগবদ্ ভক্তের ন্যায় প্রিয়তম জন জগতে আর নাই। ইহাদের দ্বারা জীবের যে উপকার হয়, পিতামাতা পুত্র কলত্র কাহার দ্বারাও তাহা হইতে পারে না। ইহাদের দর্শনে প্রাণ পুলকিত হয়, সঙ্গলাভে হৃদয় প্রেমপরিপ্লুত হয়, অদর্শনে প্রিয়ভক্ত-হৃদয় শোকে অধীর হইয়া পড়ে।

ভগবান্। ভাল, মুক্ত কাহারা?

রামরায়। প্রত্যাসক্তি র্হরিচরণয়োঃ সানুরাগে ন রাগে।
প্রীতিঃ প্রেমাতিশায়িনি হরের্ভক্তি যোগে ন যোগে॥
আস্থা তস্য প্রণয়রভসস্যোপদেহে ন দেহে।
যেষাং তে হি প্রকৃতিসরসা হন্ত মুক্তা ন মুক্তাঃ॥

অর্থাৎ যাঁহাদের হরিচরণানুরক্ত জনে আসক্ত ও বিষয়ীতে অনাসক্ত, প্রেমাতিশয়বিশিষ্ট হরিভক্তি যোগে প্রীতি, অপর যোগে অপ্রীতি, শ্রীকৃষ্ণের

---

* এই কয়েকটী প্রশ্নোত্তর শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়ে পদ্যে এইরূপ প্রথিত হইয়াছে, তদ্যথা—
কা বিদ্যা? হরিভক্তিরেব ন পুন র্বেদাদিনিষ্ণাততা।
কা কীর্ত্তিঃ? ভগবৎপরোহয়মিতি যা খ্যাতি র্ন দানাদিজা।
কা শ্রীঃ? তৎপ্রিয়তা ন বৈ ধনজনগ্রামাদি ভূয়িষ্ঠতা।
কিং দুঃখং? ভগবৎপ্রিয়স্য বিরহো নো হৃদ্ব্রণাদি ব্যথা।

প্রণয়যোগ্য সিদ্ধ দেহের প্রতি আস্থা, এবং এ দেহে অনাস্থা, সেই প্রকৃতিসরস জনগণই মুক্ত। ফলিতার্থ এই যে কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক জনগণই মুক্ত।

ভগবান্। গানের মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম ?

রামরায়। যে গীতের মর্ম্ম রাধাকৃষ্ণ প্রেমকেলি, সেই গীতই জীবের নিজ ধর্ম্ম। কেননা, ভগবৎপ্রেমই জীবের স্বরূপ। জার্ম্মেণ দার্শনিক ফিক্‌টেও বলেন, প্রেম হইতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবের উৎপত্তি।* এই প্রেমগীতিকাই জীবের নিজধর্ম্ম। এ তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম।

ভগবান্। জীবের শ্রেয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি ?

রামরায়। কৃষ্ণভক্ত সঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ।

ভগবান্। স্মর্ত্তব্য কি ?

রামরায়। শ্রীভগবানের নাম গুণ লীলাদি।

ভগবান্। ধ্যেয় কি ?

রামরায়। শ্রীকৃষ্ণ-পদাম্বুজ।

ভগবান্। শ্রাব্য কি ?

রামরায়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা।

ভগবান্। উপাস্য কে ?

রামরায়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল।†

---

* Life is Love and whole form the power of Life consist in Love and spring from Love.—Lect. I. The Doctrine of Religion.

† এই প্রশ্নোত্তরগুলি চন্দ্রোদয়ে নিম্নলিখিত পদ্যে গ্রথিত হইয়াছে যথা—

কিং গেয়ম্ ? ব্রজকেলিকর্ম্ম, কি মিহ শ্রেয়ঃ ? সতাং সঙ্গতিঃ।
কিং স্মর্ত্তব্য মঘারি নাম ; কি মনুধ্যেয়ং ? মুরারেঃ পদম্।
ক স্থেয়ম্। ব্রজ এব। কিং শ্রবণয়োরানন্দি বৃন্দাবন-
ক্রীড়ৈকাদিযুগাভজন মহলী শ্রীকৃষ্ণ-রাধাভিধে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে অতঃপরে আর কোন প্রশ্নের বিষয় লিখিত হয় নাই। মহাপ্রভু রামরায়ের মুখে উপাস্য তত্ত্বের কথা শুনিয়া বলিলেন "রামরায়, ভাল, বল বল?" ইহা শুনিয়া রামরায় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "ইহার পরে আর কি বলিব? ইনি যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার ত উত্তর দিয়াছি। এখন যাহা বলিব তাহাতে ইঁহার মনস্তুষ্টি হইবে কিনা জানি না।" এই বলিয়া একটি শ্লোক পাঠ করিলেন। কিন্তু শ্রীচরিতামৃতে আরও দুইটী প্রশ্ন আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে :—

যাঁহারা মুক্তি বাঞ্ছা করেন তাঁহাদের গতি কোথায়? আর যাঁহারা ভক্তি বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদেরই বা গতি কোথায়?

ইহার উত্তরে রামরায় বলেন, মুক্তিবাঞ্ছাকারীর গতি স্থাবরদেহাবস্থিতির ন্যায়, এবং ভক্তিবাঞ্ছাকারীর গতি দেবদেহাবস্থিতির ন্যায়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন মতে যে মুক্তাত্মার লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, সেই মুক্তি সর্ব্বপ্রকার সুখ-দুঃখের অনুভূতির বিলোপসাধন মাত্র। উহা স্থাবরবৎ অনুভূতিবিবর্জ্জিত। কিন্তু দেব-দেহাবস্থিত আত্মা যেমন পূর্ণানন্দ ভোগ করেন ভক্তের গতি তদ্রূপ। ভক্ত সর্ব্বদা পূর্ণানন্দে বিভোর থাকেন। মুক্তি জ্ঞানের ফল। উহা রসিক বৈষ্ণব ভক্তগণের ধিক্কৃত ও ত্যাজ্য। ইহার পরেই জ্ঞান ও ভক্তির তারতম্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্যথা :—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে ইহার মূল শ্লোক এই :—

নির্ব্বাণ-নিম্বফলমেব রসানভিজ্ঞা
শ্চুষন্তু নাম রসতত্ত্ববিদো বয়ন্তু।

শ্যামামৃতং মদনমন্থরগোপরামা-

নেত্রাঞ্চলচুলকিতাবসিতং পিবামঃ ॥

অর্থাৎ "যাঁহারা রসের সন্ধান জানে না, সেই রসানভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই নির্ব্বাণমুক্তিরূপ নিম্বফল চুষুক, আমরা সুরসিক হইয়া নির্ব্বাণ-নিম্বফল চুষিতে যাইব কেন? মদনমন্থরা গোপরামাগণের নেত্রাঞ্চলপীতাবশিষ্ট শ্যামামৃতই আমাদের একমাত্র পেয়।"

অতঃপরে মধুময়ী কৃষ্ণকথার তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, তারপরে ব্রজ-লীলার করুণ গীতিকায় মহাপ্রভু প্রেমরসে বিহ্বল হইলেন, তাঁহার শারদ কমলবিনিন্দিত নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রুরাশি মুক্তামালার ন্যায় গণ্ড বহিয়া বক্ষে পতিত হইতে লাগিল। আর রামরায় সেই প্রেমাশ্রু পরিশোভিত শ্রীমুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাবাবেশে অধীর হইয়া প্রভুর পাদ-মূলে নিপতিত হইলেন। করুণাবিগ্রহ মহাপ্রভু রামরায়কে উঠাইয়া প্রেমাবেগে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে উভয়ের প্রেমাবেশে দীর্ঘ যামিনীর অবসান হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব।

এক দিবস পূর্ব্ব রীতি-অনুসারে শ্রীল রামরায় সন্ধ্যার সময়ে শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর নিকটে আসিয়া কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ করিয়া বলিলেন, "প্রভো আপনি কৃপা করিয়া আমার হৃদয়ে অনেক তত্ত্ব প্রকটিত করিলেন। আমি মূঢ়,—কি জানি, কি বুঝি, কিন্তু আপনি দয়া করিয়া এই অধমের হৃদয়েও কৃষ্ণ-তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব এবং লীলাতত্ত্বাদির স্ফুরণ করিয়াছেন। আপনার দয়ায় আমি অনেক শুনিলাম, অনেক জানিলাম, অনেক তত্ত্ব বুঝিতে পাইলাম। আমার হৃদয়ে আপনি বেদগুহ্য তত্ত্ব প্রকটন করিয়াছেন। কিন্তু একটি বিষয়ে আমার হৃদয়ে একটা সন্দেহ রহিয়াছে। সে সম্বন্ধে আমি কিছুই নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনি কৃপা করিয়া আমার সেই সন্দেহটির ভঞ্জন করিয়া দিউন।" এই প্রার্থনা করিয়া রামরায় বলিতে লাগিলেন :—

পঁহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসিস্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম-অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি বংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন॥
এই মত দেখি তোমা হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥

শ্রীল রামরায় প্রথমে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে সন্ন্যাসীরূপ দর্শন করেন। শ্রীল

মুরারি গুপ্ত মহোদয় কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, মহাপ্রভু যখন শ্রীল রামানন্দরায়কে অনুগ্রহ-দর্শন-করিতে কুঞ্জিলগরে (বিদ্যানগরে) গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীল রামরায় পূজাবসানে পরমব্রহ্ম ব্রজেন্দ্রনন্দনের রূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ যেন গৌরসন্ন্যাসিরূপে তাঁহার নিকট আগমন করিতেছেন। শ্রীল রামরায় ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গরূপ দর্শন করেন নাই, অথবা কখনও তাঁহার কথা শুনেন নাই। ধ্যানে সহসা শ্রীগৌরাঙ্গের রূপমাধুরী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি শ্যামরূপ ভাবিতে ভাবিতে আবার গৌরাঙ্গ রূপমাধুরী দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। আমার তিনি ধ্যানস্থ হইলেন,—ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন, শ্যামসুন্দরের পরিবর্ত্তে গৌরসুন্দর তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া উদিত হইয়াছেন। শ্রীল রামরায় বিস্মিতভাবে চক্ষু মেলিলেন, চক্ষু মেলিয়া আরও অধিকতর বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন তিনি ধ্যানচক্ষে যে শ্রীমূর্ত্তির সন্দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার বহিশ্চক্ষের সম্মুখেও সেই শ্রীমূর্ত্তি সমুদিত। সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম সন্ন্যাসিরূপে তাঁহার সম্মুখস্থ। রামরায় কৃতাঞ্জলিপুটে সন্ন্যাসিবেশ পরব্রহ্ম শ্রীগৌরাঙ্গচরণে মস্তক লুটাইলেন। (*) তিনি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন "একি স্বপ্ন না জাগরণ! একি! আমি শ্যামরূপ পরব্রহ্ম ভিন্ন অপর ব্রহ্ম জানি না, শ্যামসুন্দরের একি লীলা!"

(*) স স্বগৃহে কৃষ্ণপূজাবসানে
ধ্যায়ন্ পরং ব্রহ্ম ব্রজেন্দ্রনন্দনম্।
দদর্শ বারত্রয়মদ্ভুতং মহদ্
গৌরাঙ্গমাধুর্য্যমতীববিস্মিতঃ॥
উন্মীল্য নেত্রে চ তদেব রূপং
দৃষ্ট্বা পরং ব্রহ্ম সন্ন্যাসবেশম্।
ক্ষণং মূর্চ্ছাং বিহিতঃ কৃতাঞ্জলিঃ
[illegible] ভবানিতি প্রভো॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পঞ্চদশ সর্গ তৃতীয় প্রক্রম।

শ্রীপ্রভু সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। রামরায়ের মনে সন্দেহ হইল। তিনি প্রভুর আপাদ মস্তক দর্শন করিতে লাগিলেন। মদনমন্থরা গোপরামাগণ নেত্রাঞ্চল দ্বারা সতৃষ্ণভাবে যে শ্যামামৃত পান করেন, রামরায়ের সেই চিরসেবিত শ্যামরূপ সন্ন্যাসিদেহ অধিকার করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি সোণার পুত্তলী বিরাজমানা, তাঁহার বর্ণপ্রভায় শ্যামসুন্দরের শ্রীঅঙ্গ সুবর্ণ দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন।

শ্রীল রামরায়ের এই শ্রীমূর্ত্তিদর্শন আধ্যাত্মিক জগতের এক মহা-ব্যাপার। শ্রীরাধার কাঞ্চনগৌর-কান্তির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে শ্রীল রামরায়ের শ্যামরূপ পরব্রহ্ম গৌরবর্ণে আবৃত হইলেন। (*) প্রেমিক ভক্তের ভক্তি-চক্ষুর নিকট শ্রীগৌরসন্ন্যাসীর তাত্ত্বিক মূর্ত্তি বিশ্লিষ্ট হইলেন। তিনি যেন সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, শ্রীল রামরায় তাঁহার প্রাণবল্লভ প্রিয়তম প্রভুকে দেখিয়া প্রথমেই চিনিতে পারিয়া-ছিলেন। তথাপি তিনি সন্দেহ-ব্যপদেশে যে প্রশ্নোত্থাপন করিলেন ইহা কেবল বচনভঙ্গী মাত্র। প্রচ্ছন্ন শ্রীভগবানকে বাহিরে প্রকটিত করিবার জন্য ভক্তগণের চিরপিপাসা। রামরায় প্রভুর স্বীয় শ্রীমুখ হইতে তাঁহার নিজের এই অদ্ভুত অবতার তত্ত্ব প্রকটন করিতে প্রয়াস পাইলেন। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন :—

(*) এই স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত :—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

এই শ্লোক উল্লেখযোগ্য। এতৎসহ শ্রীল গোস্বামি চরণের লিখিত শ্লোকটিও সবিশেষ উল্লেখ্য, তদ্‌যথা :—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

এই মত দেখি তোমা হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥

ইহাতে জানা যাইতেছে শ্রীল রামরায় শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন মাত্রেই বুঝিয়াছিলেন ইনি সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম। কিন্তু প্রভু সন্ন্যাসি-ছলনায় তাহাকে দর্শন দান করিয়াছেন, তাই তিনি এখানে "অকপট" শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রভু ইহাতেও প্রকৃত কথা না বলিয়া বাগ্‌ভঙ্গীতে বলিলেন :—

——কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥
রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেমা হয়।
যাহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥

চতুর চূড়ামণি তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব বাগ্‌বৈদগ্ধীতে শ্রীল রামরায়কে অন্তরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। প্রভু বলিলেন, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম। গাঢ় প্রেমের এমনই স্বভাব যে ইহার বলে প্রেমিক সর্ব্বত্র আপনার প্রিয়জনকেই দেখিতে পায়। মহাভাগবতগণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানেই দৃক্‌পাত করেন, সেই স্থানেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পান না। তাঁহাদের সম্মুখে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান থাকিলেও প্রেমের দিব্য চক্ষের বলে তাঁহারা সমগ্র বিশ্বে কেবল শ্রীভগবানের মধুর মূর্ত্তিই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভেদ-দৃষ্টি তিরোহিত হইয়া যায়। জ্ঞানীরা যেমন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া নিশ্চয় করেন, সেইরূপ ভাগবত পরমহংসগণের নিকট সর্ব্বদাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার পরমপ্রেম,—সর্ব্ব পদার্থেই যে তোমার সেই লীলা-রসময় আনন্দ-বিগ্রহযুগলের শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হইবে, ইহা অতি স্বাভাবিক।

এই স্থলে প্রভু মায়াবাদীদের একটি কল্পনার উচ্ছেদ করিয়াছেন। মায়াবাদীরা বলেন "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এই স্থাবর জঙ্গমাদি মায়াকল্পিত। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে সর্ব্বত্রই ব্রহ্মানুভব হইয়া থাকে, মায়া-কল্পিত অসৎ জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়।" কিন্তু প্রভু বলিতেছেন "ভগবৎপ্রেমের এমনই স্বভাব যে, যদিও মহাপ্রেমিক পরমহংস ভাগবতগণের নিকট এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ বিদ্যমান, তথাপি তাঁহারা অত্যধিক প্রেমাবেশে জগৎ প্রপঞ্চের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপিনী মাধুর্য্যময়ী শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শনে বিভোর থাকেন।" জগৎ যে মিথ্যা নহে, মায়াবিলসিত ভ্রান্তিমাত্র নহে, এই বাক্যে তাহা স্পষ্টতই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল রামরায়ের মুখে অনেক তত্ত্ব জগতে প্রকটন করিলেন, কিন্তু একটী তত্ত্ববিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিলেন না, অথচ শ্রীল রামরায়ের হৃদয়ে সেই প্রশ্নের আভাস ইঙ্গিতে উপস্থিত করিয়া দিলেন। শ্রীল রামরায় শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলেন, সে শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার অন্তঃপটে উদিত হইলেন, তিনি চক্ষু মেলিয়াও সেইরূপ দেখিলেন, তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে নয়নাভিরাম কনকবিনিন্দিত রসময় শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি বিরাজ করিতে লাগিলেন। মদনমন্থরা গোপীগণের মনচোরা যে সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহার ধ্যানাবস্থিত নেত্রসমক্ষে অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে প্রকাশিত, তখনও তাঁহার সে ধারণা হইল না। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু চতুরচূড়ামণি শ্রীভগবান্ তখন কনকপুত্তলী শ্রীমতীকে সম্মুখে করিয়া শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি প্রকটন করিলেন। শ্রীল রামরায় বিস্মিত হইলেন, যাঁহাকে তিনি একটী সন্ন্যাসীর মূর্ত্তিতে

দেখিয়াছিলেন, এখন সেই সন্ন্যাসী কষিতকাঞ্চন গৌরী, শ্রীরাধিকা ও শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন। তিনি বুঝিলেন ইনি সন্ন্যাসী নহেন—ইনি গোলকের প্রভু, সাক্ষাৎ রসময় বিগ্রহ;—সন্ন্যাসবেশ কেবল ছলনা মাত্র। বুঝিয়াও সংশয়ীর ন্যায় প্রশ্ন করিয়া বলিলেন "প্রভো, তুমি সন্ন্যাসীর মূর্ত্তিতে আমায় দর্শনদান করিয়াছ, কিন্তু এখন এ কি দেখিলাম! তোমার সম্মুখে কাঞ্চনপুত্তলী, তুমি গোপবেশী মুরলীধর শ্যামসুন্দর, কিন্তু কাঞ্চন গৌরীর বর্ণচ্ছটায় তোমার নিজের শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গে পরিণত হইয়াছে। শ্রীমুখে বেণু, ভাব-তরঙ্গে শ্রীমুখমণ্ডল টলমল করিতেছে। প্রভো বুঝাইয়া দাও,—মূঢ় আমি বুঝাইয়া দাও, একি ব্যাপার!"

প্রচ্ছন্নবেশ, বিদগ্ধশিরোমণি বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভজনানন্দপরায়ণ মহাভক্ত মহানুভাব। তুমি সর্ব্বদাই ঐ যুগলরূপের ধ্যানপরায়ণ, সুতরাং সর্ব্বস্থলে সকল পদার্থেই শ্রীযুগলমূর্ত্তি সন্দর্শন কর, তুমি যে যুগলরূপ দেখিয়াছ উহা তোমার ইষ্ট শ্রীমূর্ত্তির স্মরণ ভিন্ন আর কিছু নয়।"

মহানুভাব শ্রীরামরায়ের হৃদয়পটখানিতে স্বরূপ-তত্ত্বচ্ছবি-প্রকটনের জন্য মহাশিল্পী ধীরে ধীরে রং ফলাইয়া উহা প্রস্তুত করিতেছিলেন, প্রকৃত তত্ত্বের মহচ্ছবি শ্রীল রামরায়ের হৃদয়ে তখন পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত হইয়াছে, রামরায়ের প্রত্যক্ষ তখন প্রমা প্রত্যক্ষ—উহা মরুমরীচিকার ন্যায় চক্ষুর ধাঁধা নহে, উহা অভ্রান্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। তখন শ্রীল রামরায় পূর্ণ সত্য পরিজ্ঞানের দুর্দ্দম্য ও অনিবার্য্যবলে মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিয়া যাহা বলিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজ রূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥

নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
অনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর তোমার কোন ব্যবহার॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় এই অষ্টম পরিচ্ছেদের উপসংহারে লিখিয়াছেন ঃ—

দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ মিলন লীলা করিল প্রচারে॥

শ্রীগৌরলীলায় শ্রীল রামরায় ও শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর—একে অপরের প্রাণের সখা। শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীল রামরায় বিশাখা, স্বরূপদামোদর ললিতা, সুতরাং এক অপরের অভিন্নহৃদয় প্রিয় সখী, সখিত্বসূত্রে একে অপরের হৃদয়ের ভাব যেরূপ জানেন, অপরের পক্ষে তদ্রূপ জানা অসম্ভব। শ্রীপাদ স্বরূপ, শ্রীল রামরায়ের শ্রীমুখে এই সকল তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া নিজের কড়চায় উহা গ্রথিত করেন। শ্রীল রামরায় শ্রীগৌরাঙ্গের যে তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন এ জগতের জীবদের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর তাহার কিছু আভাস প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বের বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর যে দুইটী সংস্কৃত পদ্যের অবতারণা করিয়াছেন, এই স্থলে পাঠক মহোদয়গণের অবশ্যই সেই দুইটী পদ্য স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে। কৃপাময় পাঠক মহোদয়গণ এখানে তৎসম্বন্ধে চিন্তা করুন। আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব।

এস্থলে শ্রীল রামরায় যাহা বলিলেন তাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে ইহাই বোধ হইতেছে যে তিনি শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত নিজ রসাবাদী আনন্দময়কেই সম্মুখে দেখিতে পাইতেছেন। সুতরাং

শ্রীভগবান্ সন্ন্যাসিরূপে যে উহার নিকট সমুপস্থিত, উহা কেবল ছলনা-মাত্র, নিজরূপ গোপন করা মাত্র। শ্যামরূপই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ।

কিন্তু এখানে একটী কথা আছে,—প্রভু যখন বুঝিলেন রামরায় তাঁহার প্রকৃত রূপতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন, রামরায় যখন "শ্যাম এব পরং রূপম্" এই স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিলে বলিতে পারিতেন যে "তুমি আমার যে রূপ দেখিয়াছ, প্রকৃতপক্ষে তাহাই আমার স্বরূপ, কিন্তু আমি যে সেই ব্রজের পীতধড়াপরিহিত বংশীধারী গোপীর মনচোরা শ্যামসুন্দর, ইহা কাহাকেও বলিও না।"

কিন্তু স্বরূপতত্ত্বপিপাসু শ্রীল রামরায়ের নিকট স্বরূপ-তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার জন্যই প্রভু পদার্পণ করিয়াছেন। শ্রীল রামরায় যুগলরূপ ধ্যান করিতেন, যুগলরূপের সেবা করিতেন, যুগলরূপই শ্রীভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব, শ্রীল রামরায়ের ইহাই ধারণা। কিন্তু ভজনকারীর চিত্ত-শক্তির ক্রমবিকাশানুসারে শ্রীভগবানের নিত্য রূপ-প্রকটনের তারতম্য ঘটে। প্রভু দেখিলেন, শ্রীল রামরায়ের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের আরও চমৎ-কারজনক বিকাশ-প্রকাশক স্বরূপতত্ত্বগ্রহণে সমর্থ ও উপযুক্ত; তখন তিনি তাঁহার নিকট যে স্বরূপতত্ত্ব প্রকটন করিলেন, আর কেহ কখনও সে রূপের কথা শুনেন নাই বা দেখেন নাই, সে প্রকাশ অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥
দেখি রামানন্দ হইল আনন্দে মূর্চ্ছিত।
ধরিতে না পারি দেহ, পড়িলা ভূমিতে॥

ইহা প্রকৃতই এক অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার। শ্রীল রামরায় অন্তরে বাহিরে অনুক্ষণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও স্পষ্টতই সেই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং প্রভু তাঁহাকে এখন যে

স্বরূপ দেখাইলেন, তাহা শ্রীল রামরায়ের পূর্ব্বদৃষ্ট শ্রীমূর্ত্তি নহেন, বিশেষতঃ ইতঃপূর্ব্বে মহাপ্রভু তাঁহার বাহ্য দৃষ্টিগোচরে সেই রূপেরই স্ফূরণ করিয়াছিলেন। অপরন্তু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীল রামরায়ের সতত নিরীক্ষ্য, তদ্দর্শনে তাঁহার বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। এখানে তিনি যাহা দেখিলেন তাহা :—

"রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ।"

এইরূপ দেখিয়া তিনি আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন। যে রূপ দর্শনে তিনি আনন্দবেগে মূর্চ্ছিত হইলেন, সেরূপ নিত্য দৃষ্ট নহে, নিত্য দৃষ্ট পদার্থে বিস্ময় বা আশ্চর্য্যের ভাব আসিতে পারে না।* অপিচ সে বিস্ময় যেমন-তেমন বিস্ময় নহে, সেই বিস্ময়ে তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। তিনি এই শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু উহা তাঁহার হস্তে স্পৃষ্ট হইলেন না। রামরায় আনন্দ-মূর্চ্ছায় ভূমিতে অচেতনবৎ পড়িয়া রহিলেন। প্রভু তাঁহার দেহ নিজ হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া তাঁহার বাহ্য জ্ঞান প্রদান করিলেন, রামরায় তখন পুরোভাগে আবার সেই কাঞ্চনগৌর নররূপী নবীন গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত ভাবে তাঁহার দিকে অনিমিষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। মন্ত্রমুগ্ধবৎ রামরায়ের নিকটে এই ব্যাপার একটা ক্ষণিক স্বপ্নের স্থায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। তিনি সহসা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমি ভিন্ন আমার এইরূপ আর কেহ কখনও দেখে নাই।" যথা—শ্রীচরিতামৃতে—

আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন॥

---

* আশ্চর্য্যমনিত্যে—পাণিনি।

মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপে দেখাইলুঁ তোমারে॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ ও অসংখ্য ভক্তগণের মধ্যে এক শ্রীরামরায় ব্যতীত শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এ অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি অপর কাহারও সমীপে প্রকট করেন নাই।

ফলতঃ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌর-দেহে শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তিই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু "রসরাজ মহাভাবে দুই এক রূপ" এই স্বরূপ মূর্ত্তি সন্দর্শন করেন নাই। শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ষড়্ভুজ মূর্ত্তি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন, এমন কি সাক্ষাৎ বলরামস্বরূপ শ্রীপাদ নিত্যানন্দকেও দয়াময় মহাপ্রভু ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। অন্ত্যলীলার নিত্য সঙ্গী শ্রীল স্বরূপদামোদরকেও শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কড়চাপদ্য-পাঠে জানা যায়। কিন্তু শ্রীল রামরায় যে রূপের সন্দর্শন পাইলেন, সেরূপ দর্শন অপর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"তুমি বিনা এই রূপ না দেখে কোন জন।"

এখন মনে স্বতঃই প্রশ্ন হয় যে "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" দেখাইয়া শ্রীল রামানন্দ রায়কে শ্রীমহাপ্রভু নিজের স্বরূপ দেখাইলেন, সেই রূপ কি প্রকার? এ তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় হইলেও এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। এই শ্রীমূর্ত্তি দেখাইবার সময়ে প্রভু হাসিয়াছিলেন। তাঁহার হাস্যেরই বা কারণ কি? এই স্বরূপ-বিগ্রহই বা কি?

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক পাঠে জানা যায়, শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য শ্যামসুন্দর রূপ দেখিবার অভিলাষ করেন, কিন্তু পাছে বা শ্যামরূপ-দর্শনের বলবতী স্পৃহায় গৌররূপে প্রেমহানি হয়, এই আশঙ্কায় তাহা স্পষ্টরূপে বলিতে সাহসী হন নাই। তাই শ্রীবাস বলি-

লেন "গৌররূপ আপনার স্বরূপ, তাঁহাতেই আমাদের পরম প্রীতি, কিন্তু আপনি স্বয়ং শ্রীমুখে আচার্য্যকে বলিয়াছেন যে তাঁহাকে শ্যামরূপ দেখাইবেন। এখন এই শ্যামরূপ দেখিবার জন্য আচার্য্যের কৌতুহল হইয়াছে। আপনি আচার্য্যকে সেইরূপ দেখান।"

তখন শ্রীভগবান্, আচার্য্যকে ধ্যানস্থ হইতে বলিলেন। আচার্য্য ধ্যানস্থ হইয়া যে অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিলেন তাহা শুধু শ্যামরূপ নয়,—তাহা রাসমণ্ডল মধ্যস্থ শ্রীভগবানের স্নিগ্ধশ্যামজ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি হ্লাদিনীশক্তিসমূহের সুচারু নৃত্য-মিশ্রণে অধিকতর সমুজ্জ্বল। এই আত্ম জ্যোতিঃ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতকার শ্রীমদ্বিল্বমঙ্গলের প্রত্যক্ষীভূত রাসমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি মরকতমণিবিনিন্দ্য সমুজ্জ্বল নীলজ্যোতিঃ। আচার্য্য এইরূপ দেখিয়া আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। শ্রীবাসের হৃদয়ে যুগপৎ আশঙ্কা ও কৌতুহল জাগিয়া উঠিল। আশঙ্কা এই যে—অদ্বৈতাচার্য্য যেরূপ প্রগাঢ়ভাবে আনন্দনিমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহার বা আর বাহ্য জ্ঞান না হয়। কৌতুহলের কারণ এই যে, আচার্য্য আনন্দনিমগ্ন ভাবে কি প্রত্যক্ষ করিতেছেন? তাহা জানিবার জন্য তাঁহার লোলতা উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, "প্রভো ইহাকে বাহ্যজ্ঞান প্রদান করুন।" শ্রীভগবান্ তখন শ্রীল আচার্য্যের হৃদয় হইতে সেইরূপ অন্তর্হিত করিলেন। আচার্য্য হৃদয়ে সেই মনোহর শ্যামসুন্দরের মধুর মূর্ত্তি না দেখিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, তখনও সেইরূপের ছটা তাঁহার দৃষ্টির সমক্ষে বিরাজিত। ধীরে ধীরে আচার্য্যের নেত্রসমক্ষ হইতে সেই মনোহর মূর্ত্তি তিরোহিত হইলেন।

তখন চতুরচূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গ আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আচার্য্য, একি আপনার জাগ্রৎস্বপ্ন?" আচার্য্য বলিলেন, "ইহা আমার অন্তরে প্রত্যক্ষ। আমি অতি স্পষ্ট বোধিতে পাইতেছি, আপনার এই শ্রীঅঙ্গ হইতে মনোহর জ্যোতির্ম্ময় শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি বহির্গত

হইয়া আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, আবার সেই মূর্ত্তি আমার হৃদয় হইতে বহির্নিস্থত হইয়া আপনার দেহে প্রবিষ্ট হইলেন। ইহা কি জাগ্রৎ স্বপ্ন? সেই ত্রিভঙ্গভঙ্গিম শ্যামসুন্দরে ও আপনাতে তো কোনও পার্থক্য বোধ হইতেছে না। সেইরূপ আর এইরূপই এক রূপ।"

শ্রীঅদ্বৈত "অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর" রূপের সাক্ষিস্বরূপ। কিন্তু তিনি শ্রীভগবানের যে রূপ দর্শন করিলেন, তাহা "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" নহে, ইহাতে রাসমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শ্যামসুন্দরে আভাস আছে বটে, কিন্তু ইহাতে মহাভাবত্ব ও রসরাজত্বের অভিব্যক্তি নাই, উভয়ের একত্বের কথা তো আরও স্বতন্ত্র।

শ্রীল মুরারি গুপ্ত ঠাকুর, পূজ্যপাদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর, শ্রীল রামানন্দ রায়, শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীমৎসনাতন, শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী, শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীল গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীল কবি কর্ণপুর, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতি মহানুভাব-বৃন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব সম্বন্ধে ন্যূনাধিক পরিমাণে উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই সকল মহানুভাবের অনুভূয়মান শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বের বিশদ আলোচনা করা এক বৃহৎ ব্যাপার। এই ব্যাপার বহু সময় সাপেক্ষ, বহুবিদ্যা সাপেক্ষ, এবং সর্ব্বোপরি শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের চরণারবৃন্দে অকৃত্রিম ভক্তি সাপেক্ষ এবং তজ্জনিত তাঁহাদের কৃপাসাপেক্ষ।

শ্রীপাদ কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকখানি সিদ্ধান্তপূর্ণ পরমারাধ্য শ্রীগ্রন্থ। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব-বিষয়েও অনেক সিদ্ধান্তরত্ন নিহিত আছে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তত্ত্ব-বিনির্ণয়ের নিমিত্ত শ্রীল গোস্বামিপাদগণ যে সকল শ্লোক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে। শ্রীজীব গোস্বামির ষট্-

সন্দর্ভ গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণেব অতি আদবেব ধন। এইরূপ দার্শনিক সুবিচাবপূর্ণ সুন্দব গ্রন্থেব সংখ্যা সংস্কৃত ভাষাতে অতি বিরল। নিমি-নৃপতিপৃষ্ট করভাজন যোগী কলিযুগে উপাস্যদেবেব যে স্বরূপ বর্ণন কবিয়াছেন, এই ষটসন্দর্ভেব মঙ্গলাচবণে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী সেই শ্লোক উদ্ধৃত কবিযাছেন, তদযথা শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে :—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

সর্ব্বসংবাদিনীতে বা সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ বৈষ্ণবদার্শনিক শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় এই শ্লোকেব বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নে উহাব কিঞ্চিৎ মর্ম্মলিখিত হইয়াছে :—

তিনি বলেন মহাভাগবতগণেব হৃদয়ে অন্তর্বহির্দ্দৃষ্টিতে শ্রীগৌবাঙ্গ স্বয়ং ভগবান বলিযা নিষ্টঙ্কিত হইযাছেন, তাঁহাব এই অবতাব-প্রকটনে তদীয় নিজস্বরূপ ভগবৎপদকমলাবলম্বি দুর্ল্লভ প্রেমপীযূষরূপ সহস্র সহস্র গঙ্গা প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তাঁহাব শ্রীপাদপদ্ম অনন্ত প্রেমরূপপীযূষ-গঙ্গাব অক্ষয় উৎস। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়েব সহস্রাধিদেব স্বরূপ। এই কলিযুগে ইনিই জীবেব উপাস্যাবতাব। উল্লিখিত শ্রীভাগবত পদ্যে এই গৌব-ভগবানেবই অবতাবত্ব লক্ষণ-সূচক।

উহাব অর্থ এই যে যিনি কান্তি দ্বাবা অকৃষ্ণ, অর্থাৎ গৌর, যিনি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপবিষৎসমন্বিত, কলিতে প্রাজ্ঞব্যক্তিরা সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ দ্বারা সেই গৌরভগবানেরই যজন কবেন। এস্থলে "অকৃষ্ণ" শব্দের যে "গৌব" অর্থ করা হইল তাহা কল্পিত নহে। শ্রীভাগবতেই ইহার প্রমাণ আছে। তদ্‌যথা—

আসন্ বর্ণ ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম অধ্যায় ১৩শ শ্লোক।

দ্বাপরযুগে গর্গমুনি নন্দ মহারাজকে বলিতেছেন,"হে নন্দ, তোমার এই পুত্র যে-সে পুত্র নহেন, ইনি কোন মহাপুরুষ হইবেন। ইনি যুগে যুগেই তনু ধারণ করেন। সত্যযুগে ইহাঁর শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, কলিকালে পীতবর্ণ এবং দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ। কলিতে পীতত্ব বা গৌরত্ব পারিশেষ্য-প্রমাণলব্ধ। অর্থাৎ সত্যে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে কৃষ্ণ এই তিন যুগে তিন বর্ণ স্থিরীকৃত হইল, সুতরাং পীতবর্ণত্ব কলিকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় এই শ্লোকের যে টীকা করিয়াছেন, তাহাতেও যথেষ্ট শাস্ত্রযুক্তির সমাবেশ আছে। সত্যযুগের উপাস্য অবতারের বর্ণ শুক্ল, ত্রেতায় রক্তবর্ণ। দ্বাপরে উপাস্যাবতারের শ্যামবর্ণত্বাদি নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥
তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥

শ্রীভাগবত একাদশ স্কন্ধে।

বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে দ্বাপরের অবতার শুকপক্ষিবর্ণসদৃশ, এবং কলির অবতারের বর্ণ নীলঘন। ইহা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাবতারের বর্ণ নহে, যুগাবতারের বর্ণ। যুগাবতার ও অবতারী এক কথা নহে। সকল দ্বাপরে বা সকল কলিতেই অবতারী প্রকটিত হয়েন না। যে দ্বাপরে শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন প্রকটিত হয়েন, তৎপরবর্ত্তী কলিতেই গৌরসুন্দর শচীনন্দন প্রকটিত হইয়া থাকেন। দ্বাপরে যে তত্ত্ব কৃষ্ণচন্দ্ররূপে পরিচিত, সেই তত্ত্বই কলিতে সবিশেষ উৎকর্ষসহকারে গৌরচন্দ্র নামে বিশিষ্টভাবে আবির্ভূত হয়েন। প্রেমিক ভক্তগণ এই চরমাবির্ভাবে নিরতিশয় ঔদার্য্যাদি

প্রত্যক্ষ করেন। কলির যে যুগাবতার আছেন তিনি কৃষ্ণবর্ণ। শ্রীহরিবংশ বলেন, "কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ।" লঘুভাগবতামৃতে লিখিত আছে—

কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥

শ্রীভাগবতের শ্লোকে "তথাপীতঃ" এইরূপ পাঠ আছে। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন শ্যামপদেরই পীতত্ব অর্থ হউক, অথবা পীত পদেরই শ্যামত্ব অর্থ হউক, কিংবা তথা+অপীত (শ্যাম) এইরূপ পদবিশ্লেষণ দ্বারা শ্যামত্বই অপীত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হউক।"

কিন্তু যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ কলির অবতার নহেন, ইনি দ্বাপরে প্রাদুর্ভূত। "ইদানীং" শব্দ দ্বারা কলির আদিভাগে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব নিরাকৃত হইয়াছে। কেননা শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব দ্বাপরেই প্রসিদ্ধ। শ্রীভাগবত বলেন—

যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎসসর্জ্জ গাং।
তদৈবেহানুবৃত্তোঽসাবধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ॥

অর্থাৎ যেদিন শ্রীভগবান্ এই ধরাধাম ত্যাগ করিলেন, সেইদিন অধর্ম্ম প্রভব কলি ধরাধামে প্রবেশ করিল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের পরেই কলির প্রবৃত্তি, ইহাই জানিতে হইবে।

ইহাতে আর একটী সিদ্ধান্ত হইতেছে যে দ্বাপরে যে শ্যামবর্ণ যুগাবতারের উল্লেখ আছে, সেই যুগাবতারও,—স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইলে তাঁহার অন্তর্ভূত হয়েন। শ্রীপাদ সনাতনের সিদ্ধান্ত এই যে—

"যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ যো যো রক্তঃ প্রাদুর্ভাবঃ যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরতাম্। স সর্ব্বোঽপি ইদানীং অস্য আবির্ভাব-সময়ে কৃষ্ণতামেবতদ্রূপতামেব তস্মিন্নন্তর্ভূততামেব গতঃ সর্ব্বাংশমেবাদায় স্বয়মবতীর্ণত্বাৎ। অতঃ স্বয়ং কৃষ্ণত্বাৎ নিজাংশস্য কৃষ্ণীকর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্বাকর্ষকত্বাচ্চ কৃষ্ণং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন—

পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্য অবতার।
যুগ মন্বান্তরাবতারও যত আছে আর॥
সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতার কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥

কলিতে এক কৃষ্ণাবতারের প্রসিদ্ধি আছে। ইনি যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ নহেন, ইনি যুগাবতার কৃষ্ণ। কিন্তু গর্গোক্তির বিচারে পারিশেষ্য-প্রমাণে কলির যে উপাস্যতত্ত্বনির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, সেই পীতবর্ণ উপাস্যদেব স্বতন্ত্র-স্বয়ং ভগবান্। তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই রসময় সমুজ্জ্বল কনকগৌর আবির্ভাববিশেষ। শ্রীকৃষ্ণামৃতের টীকায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"যস্মিন কলৌ স্বর্ণগৌরঃ কৃষ্ণচৈতন্য স্যাৎ তদা কৃষ্ণ স তত্রান্তর্ভবেদিতি বোধ্যম্।" অর্থাৎ যে কলিতে স্বর্ণগৌর কৃষ্ণচৈতন্য অবতার করেন, সেই কলিতে যুগাবতার কৃষ্ণ তাঁহার অন্তর্ভূত হয়েন।

শ্রীগৌর ভগবান্ অবতারী। কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্মে একটী বচন আছে, তাহাতে লিখিত হইয়াছে প্রত্যক্ষরূপধারী ভগবান্ কলিতে আবির্ভূত হয়েন না তদ্‌যথা :—

প্রত্যক্ষরূপধৃগ্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।
কৃতাদিষেব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে॥
কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনং।
অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎ স্থিতিম্॥

কিন্তু অমর্য্যাদৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বাক্য নহে,—এই বচন আবেশা-বতার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

ভাগবতামৃতের টীকায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন

"অয়মবতারঃ শ্বেতবরাহকল্পগতাষ্টাবিংশতিতমবৈবস্বতমন্বন্তরীয়ে কলৌ বোধ্যঃ তত্রত্যে শ্রীচৈতন্যে এব পদ্যোক্ত ধর্ম্মাণাং দর্শনাৎ।" অর্থাৎ শ্বেতবরাহকল্পগত অষ্টাবিংশতিতম বৈবস্বত মন্বন্তরীয় কলিতেই অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার কাল। শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যোক্ত-ধর্ম্ম এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেই দৃষ্ট হয়। অন্যান্য কলিতে কোথাও যুগাবতার শ্যামবর্ণ, কোথাও শুকপত্রাভ বর্ণ বলিয়া বর্ণিত হয়েন। কিন্তু সেই অবতার আবেশাবতার। তদাবিষ্ট জীববিশেষই উহার লক্ষ্য। তাঁহাদেরই কথা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুধর্ম্ম বলিয়াছেন যে কলিতে প্রত্যক্ষ রূপধারী হরি দৃষ্ট হয়েন না। কিন্তু জীবের প্রতি অশেষ করুণাশালী সর্ব্বাবতারবীজ অমর্য্যাদৈশ্বর্য্য শ্রীভগবানের প্রকটন সম্বন্ধে আদৌ কোন বিধি-নিষেধ থাকিতে পারে না। তিনি স্বতন্ত্র ভগবান্। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি লিখিয়াছেন বিষ্ণুধর্ম্মের প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটনের বাধক নহে, কেননা "তদপ্যমর্য্যাদৈশ্বর্য্য কৃষ্ণত্বেনৈববতিক্রান্তম্। তস্য কলিব্যাপ্তিদর্শনাৎ।"

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতকারের উক্তি দ্বারা ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। তাঁহার স্তুতি শ্লোক এই :—

স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা
ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্॥
বিশুদ্ধস্বপ্রেমোন্মদমধুর পীযূষলহরীং
প্রদাতুং চান্যেভঃ পরপদনবদ্বীপপ্রকটম্॥

আনন্দি টীকার মর্ম্মানুসারে এই শ্লোকের অর্থ করা যাইতেছে,—"ঘনীভূত সচ্চিদানন্দময় গৌরনরাকৃতি পরব্রহ্মকে আমরা স্তব করি। তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দরূপ নিজের বিশুদ্ধ প্রেমমাধুরী স্বয়ং আস্বাদনের নিমিত্ত এবং ভক্তগণকে বিশেষরূপে প্রদান করার জন্য নবধাভক্তির আশ্রয়স্থলী সর্ব্বস্থানোৎকৃষ্ট নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েন। তিনি অপরকে প্রেম প্রদান

করার জন্য অবতীর্ণ হইলেন কেন, তাহা বুঝাইবার জন্য এই পদে অতি-বিমর্য্যাদ পরমদ্ভুতৌদার্য্য” এই হেতুগর্ভ বিশেষণের উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত পদের এইরূপ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে যথা :—

“অতিশয়ং মর্য্যাদাতিরিক্তং পরমমদ্ভুতং ঔদার্য্যং অতিশয়দাতৃত্বং যস্য তম্”।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের ঔদার্য্য মর্য্যাদাতিরিক্ত। ইনি দেশ কাল পাত্রাদির অপেক্ষা করেন না। এ সম্বন্ধে শ্রীল প্রকাশানন্দের গ্রন্থ হইতে আরও একটি পদ্যের উল্লেখ করা যাইতেছে, তদ্‌যথা :—

পাত্রাপাত্রবিচারণাং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষতে
দেয়াদেয়বিমর্ষকো নহি নবা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।
সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণপ্রণমন ধ্যানাদিনা দুর্লভং
দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ॥

সুতরাং তাদৃশ স্বতন্ত্র এবং অমর্য্যাদৈশ্বর্য্য অকাল-প্রতীক্ষ প্রভু শ্রীগৌর ভগবান্ যে প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করিয়া কলিতে আবির্ভূত হইবেন তাহাতে আর বাধা কি হইতে পারে? এই জন্যই পদকর্ত্তৃগণ বলিয়াছেন

সর্ব্বাবতার-সার গোরা-অবতার।”

কলিতে এই গৌর ভগবান্‌ই যে উপাস্য ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায়।

ফলতঃ অনুমানাদি লৌকিক প্রমাণাদি দ্বারা ঈশ্বর সাধ্য হইয়া থাকেন, কিন্তু লৌকিক প্রমাণ দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের প্রমাণ করা যায় না। উহা ভগবদনুগ্রহ জন্য জ্ঞানবিশেষলব্ধ অলৌকিক প্রমাণের সাধ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ব্রহ্মা বলিতেছেন :—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

সুতরাং শাস্ত্রাদি বস্তুসমূহে চিরকাল অনুসন্ধান করিলেও শ্রীভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞান-সম্ভবপর হয় না। তথাপি শাস্ত্র মধ্যে শ্রীগৌর ভগবানের অবতরণের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও শ্রীভগবান্ কলিতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকটিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ নানাবিধ ব্যাপারে তাঁহাকে চিনিয়া লইয়া তদীয় শ্রীচরণেই দেহ মন আত্মা সমর্পণ করিলেন। পরমবিদ্বৎশিরোমণি শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পর্য্যন্ত এই শ্রীগৌরভগবান্‌কেই কলির একমাত্র উপাস্য জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণ-কমলকর্ণিকায় স্বচিত্তরূপ ভ্রমরকে লীন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি এই—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্ত-ভৃঙ্গঃ॥

এখন শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের অবশিষ্টাংশের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে—

১। কৃষ্ণ বর্ণম্—কৃষ্ণ ইতি, এতৌ বর্ণৌ যত্র যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণ যুগলং প্রযুক্তং অস্তীত্যর্থঃ।

অর্থাৎ "কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয় আছে যাহাতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে কৃষ্ণ শব্দ প্রকাশের নিমিত্তই "কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয় প্রদত্ত হয়। এইরূপ ব্যাখ্যা নূতন নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পদ্যের "শ্রিয়ঃ সবর্ণেন" এই কথার ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন:—শ্রিয়ঃ রুক্মিণ্যাঃ বর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য স শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মী তেন। "রুক্মিণী" এই শব্দের সমান-বর্ণদ্বয় রুক্মী শব্দে আছে। সেইরূপ "কৃষ্ণ চৈতন্য" নামেও কৃষ্ণ এই বর্ণযুগল আছে। প্রচ্ছন্নাবতারত্বের জন্য স্পষ্টরূপে কৃষ্ণচৈতন্য নাম না বলিয়া মহর্ষি "কৃষ্ণবর্ণ" পদ দ্বারা ইঙ্গিতে পূর্ণ নামের প্রকটন করিয়াছেন।

২। সংস্কৃত ভাষায় একটী নিয়ম আছে "একদেশেন সমুদায়োপচারাৎ যথা সত্যা—সত্যভামা, ভীমো—ভীমসেনঃ।" এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ বলায় এখানে কৃষ্ণচৈতন্যই বুঝিতে হইবে।

৩। অথবা "কৃষ্ণং বর্ণয়তি—তাদৃশস্বপরমানন্দবিলাসস্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি, পরমকারুণিকতয়াচ সর্ব্বেভ্যোপি লোকেভ্য স্তমুপদিশতি য স্তম্"অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন,—নিজের পরমানন্দবিলাসস্মরণোল্লাস বশতঃ নিজেই নিজের নাম গান করেন এবং পরম কারুণিক স্বভাববশতঃ সকল লোককেই সেই উপদেশ প্রদান করেন।

৪। অথবা "স্বয়ম্ অকৃষ্ণং (গৌরম্) ত্বিষা স্বশোভাবিশেষেণ কৃষ্ণোপদেষ্টারম্ চ যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ কলিকালে সুবুদ্ধি ব্যক্তির সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উপাসনা করেন। যিনি স্বীয় শোভাবিশেষ দ্বারা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণোপদেশ প্রদান করেন এবং যাহাকে দেখিলেই জীবের শ্রীকৃষ্ণ স্ফুর্ত্তি হয়

৫। "কিংবা সর্ব্বলোকদৃষ্টৌ অকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশবিশেষণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃশং শ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থ।" অর্থাৎ সকল লোকে যাহাকে অকৃষ্ণরূপ অর্থাৎ গৌরবর্ণ দর্শন করিতেন, ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে প্রকাশ-বিশেষে তিনি শ্যামসুন্দররূপে প্রতিভাত হইতেন।

তাঁহাতে সর্ব্ব প্রকারে শ্রীকৃষ্ণরূপেরই প্রকাশ প্রতিপন্ন হইতেছে, সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ, ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীচরিতামৃতকার এতদবলম্বনে লিখিয়াছেন :—

"কৃষ্ণ" এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের এই দুইত প্রমাণ।
কৃষ্ণবিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন॥

কেহ তাঁরে বলে যদি "কৃষ্ণবরণ"।
আর বিশেষণে তারে করে নিবারণ॥
দেহ কান্ত্যে হয় তেঁহ অকৃষ্ণ বরণ।
অকৃষ্ণ বরণে কহে পীতবরণ॥

শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি মহোদয় তদীয় স্তবমালায় লিখিয়াছেন :—

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরাদ্
অকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।

এই শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবতীয় "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকের অনুবাদ (Paraphrase) মাত্র। বিদ্বাংসঃ (সুমেধসঃ) দ্যুতিভরাৎ অকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণম্ (কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্) তৎকীর্ত্তনময়ৈর্মখবিধিভিঃ (যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈঃ) অভিযজন্তে (যজন্তি)। ইনি সাত্ত্বিকগণের উপাস্য। এতাদৃশ চৈতন্যদেব আমাদের প্রতি অতিশয় কৃপা করুন।

"সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্" বাক্যের ব্যাখা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে তদ্‌যথা :—

অন্য অবতারে সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে॥

অঙ্গোপাঙ্গের অবতারবত্তা সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামিমহোদয়ও একটী স্তোত্রে লিখিয়াছেন :—

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈ গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশো র্যাস্যতি পদম্।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাবতারে শিববিরিঞ্চি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, শ্রীগৌর-অবতারে সেই শিববিরিঞ্চি অদ্বৈতাচার্য্য ও হরিদাসের রূপধারণ করিয়া পরম প্রীতির সহিত যে গৌর শ্রীভগবানের উপাসনা নিরত হয়েন, এবং যিনি স্বরূপদামোদর প্রভৃতি নিজের ভক্তগণকে স্বীয় ভজনমুদ্রার উপদেশ করেন—সেই গৌরাঙ্গদেব কি আমার নেত্রপথের পথিক হইবেন ?"

অঙ্গোপাঙ্গঅস্ত্রাদি সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতকারের ব্যাখ্যা এইরূপ :—

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য সাধন।
অঙ্গ শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন॥
অঙ্গ শব্দের অর্থ কহে শাস্ত্র পরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ ব্যাখ্যান॥
জলশায়ী অন্তর্য্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ তুমি মূল নারায়ণ॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে সেহ সত্য হয়।
মায়া কার্য্য নহে সব চিদানন্দময়॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিবে উপাঙ্গ॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥
নিত্যানন্দ গোসাঞী সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞী সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
শ্রীবাসাদি পরিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া॥
পাষণ্ডদলন বাণা নিত্যানন্দ রায়।

আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী পলায়॥
সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেই ত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ-নাম-যজ্ঞ সার॥
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ-নাম-সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥
ভাগবত সন্দর্ভ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এই শ্লোক জীব গোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে॥
"অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ।"

"দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবম্" এই পদের অর্থ "দর্শিতং আবির্ভাবিতং অঙ্গাদীনাং নিত্যানন্দাদ্বৈতাদীনাং বৈভবং পাষণ্ডদলনপ্রেমপ্রচাররূপং যেন।" অর্থাৎ যদ্দ্বারা অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি অঙ্গাদির পাষণ্ডদলন প্রেমপ্রচাররূপ বৈভব দর্শিত, যিনি অন্তঃকৃষ্ণ এবং বহির্গৌর, আমরা সেই শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় এতদবলম্বনে অঙ্গোপাঙ্গাদির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ যথাঃ—অঙ্গ—নিত্যানন্দাদ্বৈত। উপাঙ্গ—শ্রীবাস পণ্ডিতাদি। অস্ত্র—অবিদ্যারূপ বন্ধচ্ছেদের নিমিত্ত শ্রীভগবানের নামই অস্ত্র। পার্ষদ—শ্রীগদাধর গোস্বামি প্রভৃতি।

এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে কলির উপাস্যদেব—শ্রীগৌরাঙ্গ। সঙ্কীর্ত্তনরূপ পূজাসম্ভার (যজ্ঞ) দ্বারা তাঁহার উপাসনা করা হয়। ফুল তুলসী দ্বারা তাঁহার উপাসনা করা হইবে না, ইহাতে এমন কোন নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয় নাই। আমরা শুনিতে পাই, "শ্রীগৌরাঙ্গের স্বতন্ত্র পূজা নাই যেহেতু

সেরূপ বিধান নাই। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির পূজা করিলেই তাঁহার পূজা হইল।"
যিনি শিব-বিরিঞ্চির উপাস্য,—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীল রূপ সনাতনের উপাস্য,—সহস্র সহস্র মহাভাগবত যাঁহার নাম জপ করিয়া,—যাঁহার চরিত পাঠ করিয়া, যাঁহার রূপ ধ্যান করিয়া চিন্তা করিয়া,—পরমপুরুষার্থ প্রেমধন লাভ করিয়া গিয়াছেন, তিনি ফুল-তুলসীর অযোগ্য নহেন, ধ্যানধারণা বা প্রণম-মননাদিরও অযোগ্য নহেন। তবে তদাশ্রিত-গণের মধ্যে উপাসনায় সঙ্কীর্ত্তন-প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং তন্নিমিত্ত সঙ্কীর্ত্তনরূপ পূজাসম্ভারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যে তত্ত্ব কৃষ্ণরূপে দ্বাপরে উপাস্য, কলিতে সেই তত্ত্বই আবির্ভাববিশেষ দ্বারা গৌররূপে সুবুদ্ধি সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ভক্তগণের উপাস্য।

শ্রীভগবান্ অমর্য্যাদৈশ্বর্য্য। তিনি দয়া করিয়া গৌররূপে আবির্ভূত হইলেন, তাঁহার এই শ্রীমূর্ত্তির উপাসনা না হইবে কেন? তাঁহার এই শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান পূজা না হইবে কেন? শ্রীবাস ও শ্রীঅদ্বৈতা-চার্য্য শ্যামরূপ দর্শনের নিমিত্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন পাছে বা ইহাতে গৌররূপে প্রেমের হানি হয়। শ্রীভগ-বানের গৌররূপের এমন কোন ক্রটী নাই যাহাতে এই শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান-পূজাদি নিষিদ্ধ হইতে পারে। আমরা লোকমুখে শুনি শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের অর্চ্চনা নাকি শ্রীজীব গোস্বামীর সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামিপাদের প্রচররূপ কয়েকখানি গ্রন্থে বহু অনুসন্ধান করিয়াও এরূপ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাইলাম না।

অপর পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ যে কলির উপাস্য, শ্রীজীবের গ্রন্থের অনেক স্থলে স্পষ্টতঃই এরূপ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ। ইনি কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীমদনগোপালও কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, বালগোপাল কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন,

গোবিন্দও কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, তথাপি ধ্যানাদির পার্থক্য আছে। তিনি যখন হামাগুড়ি দিয়া হাতখানা প্রসারণ করিয়া নবনীত-গ্রহণে উদ্যত হয়েন, তখন এক প্রকার ধ্যান ও মন্ত্রের প্রয়োজন হয়; আবার তিনি যখন বেণু ধারণ করিয়া ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হইয়া দাঁড়ান, তখন আবার অন্যরূপ ধ্যান মন্ত্রের ব্যবস্থা আছে। ইহাতে যদি ভেদ-সাধকত্ব-অপবাদ না ঘটে, তবে তাঁহার আবির্ভাববিশেষে যে শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত হয়েন তাঁহার, ধ্যান মন্ত্রাদি বিভিন্ন হইলেই বা শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ বিভিন্ন হইবেন কেন? শ্রীগৌরাঙ্গ পরম দয়াময় অবতার; এবং তিনিই কলির উপাস্য। তাঁহার এই আবির্ভাববিশেষ-শ্রীমূর্ত্তির পূজাদি অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত। এই আবির্ভাবেও রূপের বিভিন্নতা যখন স্পষ্ট, তখন এই শ্রীমূর্ত্তির স্বতন্ত্র পূজা অবশ্যই স্বীকার্য্য। নচেৎ কলির উপাসনার নিমিত্ত পীতবর্ণত্ব স্বীকারের কি প্রয়োজন ছিল?

আর এক আপত্তি,—শাস্ত্রীয় মন্ত্রের। সে সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথাই বলিবার আছে। আমাদের পরম কারুণিক শাস্ত্রকারগণের শাস্ত্র কল্পতরুবিশেষ। শাস্ত্রকল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণে যুক্তি-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। শাস্ত্র অনাদি, অনন্ত ও অপার। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় সে বিচারে আমরা পূর্ণমাত্রায় সমর্থ।

যাহা হউক, এখন অপর প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যাউক। শ্রীল কবিরাজ, শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয়ের স্তবমালা হইতে যে দুইটী পদ্য শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব আলোচনার নিমিত্ত শ্রীচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন সেই দুইটী পদ্য এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে তদ্‌যথা:—

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা॥

বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং।
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশো র্য্যাস্যতি পদম্॥

অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রাদিদেবতাবর্গের অভয়দাতা, উপনিষৎসমূহের এক মাত্র লক্ষ্য, মুনিগণের সর্ব্বস্বধন, প্রেমিক ভক্তগণের মধুরিমা এবং নিখিল ব্রজদেবীগণের প্রেমের বিনির্য্যাস, সেই শ্রীচৈতন্য কি আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন?

এতদ্দ্বারা শ্রীপাদ গোস্বামিমহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে নিখিল ব্রজবনিতাগণের প্রেমঘনমূর্ত্তিরূপে বর্ণন করিয়াছেন। "প্রেমের বিনির্য্যাস" পদটী হেতু-অলঙ্কারসূচক। হেতু ও স্বরূপ পদার্থ,—এক। যথা কাব্যকৌস্তভে :—

হেতোরেকাত্মকাখ্যানং হেতুরিত্যভিধীয়তে।

সুতরাং এই বস্তু যুগাবতার নহেন। যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশ। কিন্তু ইনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ। ইহার পরের স্তব-পদ্যটিও উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা :—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

যিনি প্রণয়িনী ব্রজবালাগণের কোন অদ্ভুত মধুর রস হরণ করিয়া স্বয়ং তদ্ভাবে উহা আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহাদের দ্যুতি প্রকটন এবং নিজ দ্যুতি আবরণ করিয়াছেন, পরম কুতুকী সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন।

কলিতে এক শ্যামাঙ্গ যুগাবতারের কথা শাস্ত্রে আছে যেমন :—

কৃতে শুক্লো ধর্মমূর্ত্তিঃ রক্তস্ত্রেতাযুগে মতঃ।
দ্বাপরে চ কলৌচাপি শ্যামাঙ্গঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

কিন্তু এই শ্রীগৌরাঙ্গ যুগাবতার নহেন, ইনি সাক্ষাৎ অবতারী। এই প্রেমঘনদেবের পীতমূর্ত্তির কথা শ্রুতিতেও ধ্বনিত হইয়াছে যথা :—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনি" মিত্যাদি।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় বহুস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব-বিনির্ণয়ে এই শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভাব ও স্বীয় কান্তি আবৃত করিয়া ছন্নভাবে বৈবস্বতমন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম কলি-সন্ধ্যায় অবতীর্ণ হয়েন ইহাও পূজ্যপাদ গোস্বামিমহোদয়-গণের সিদ্ধান্ত। তাঁহাদের যুক্তি এই যে বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবানকে ত্রিযুগ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদের স্তবে লিখিত আছে :—

ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।

নিজের রূপ প্রেয়সীর বর্ণে আচ্ছাদন করিয়াই তিনি প্রচ্ছন্ন বেশে কলিতে অবতীর্ণ হয়েন। মহানুভাবগণের প্রত্যেক অনুভবই সত্য। কিন্তু এই অনুভবের যথেষ্ট তারতম্য আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভক্ত-বিশেষের এইরূপ অনুভবের তারতম্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার মহোদয় লিখিয়াছেন :—

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্র কুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥
অতএব চৈতন্য গোসাঞী পরতত্ত্ব সীমা।
তারে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তার মহিমা ॥
সেহো তো ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে,—কৃষ্ণ যাতে অবতারী ॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনরূপে কহে যেমন যার মতি ॥

কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর-নারায়ণ।
কেহো কহে কৃষ্ণ হয়েন সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥
কেহ কহে পরব্যোমনারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে, কৃষ্ণে যাতে অবতারী॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ পরতত্ত্বের সীমা। তাঁহার বস্তু নির্দ্দেশসূচক পদ্য এই যে—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।

এই পরতত্ত্ব ভক্ত-বিশেষের নিকট ভক্তি-বিশেষের প্রভাবে এক এক রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। কেহ ইঁহাকে সন্ন্যাসিরূপে দেখিয়াছেন, কেহবা কূর্ম্মরূপে, কেহবা নরসিংহরূপে, কেহবা বামনরূপে, কেহবা বলরামরূপে, কেহবা ষড়্ভুজরূপে সন্দর্শন করিয়াছেন, কেহবা জ্যোতির্ম্ময়ী রাসরসনর্ত্তকীগণের মধ্যে শ্যামসুন্দররূপে দর্শন করিয়াছেন, কেহ বা এই শ্রীমূর্ত্তির মধ্যে যুগলমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এইজন্যই বলিতে হয়—

অবতারীর মধ্যে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনরূপে কহে যার যেমন মতি॥

ব্রজবধূগণ শ্রীকৃষ্ণে যে সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথরূপ সন্দর্শন করিলেন, সখারা সে আবির্ভাব অনুভব করেন নাই। মা যশোদা বা পিতা নন্দও সেই শৃঙ্গাররসোজ্জ্বল নিকুঞ্জবিহারীর মধুর শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করেন নাই। তিনি

এক হইয়াও ভক্তিবিশেষের নিকট বিভিন্ন ভাবে আবির্ভূত হয়েন, ইহা অতি সত্য ঘটনা।

সুতরাং রসময়বিগ্রহ পরমতত্ত্ব,—যুগলরসভজনের একান্ত নিষ্ঠাবান্ ভক্তের প্রতি পরম কৃপাপ্রদর্শনের নিমিত্ত যে অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তির প্রকটন করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান ভগবৎ রাজ্যের নিয়ম বহির্ভূত নহে। শ্রীভগবানের অনন্তমূর্ত্তি—তিনি অনন্ত। চক্ষুভেদেই দর্শন-ভেদ, এবং ভাবভেদেই উপাসনা ভেদ। হিরণ্যকশিপুর নেত্রসমক্ষে নরসিংহ মূর্ত্তি ব্যতীত গোপবেশ প্রকটনীয় নহে। গোপীগণ নরসিংহ মূর্ত্তি দেখিলে হয়ত গোগণের ন্যায় ভয়সন্ত্রস্ত চিত্তে পলায়ন করিতেন। এস্থলে বস্তু-বিচারে কৃষ্ণের কোনও পার্থক্য নাই। অপিতু শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-তত্ত্ব কিন্তু তাঁহার অবতার-পার্থক্য বা আবির্ভাব-পার্থক্য নিবন্ধন তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের নিকট ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধ্যেয় হইয়া থাকেন। জগতে যেমন ভক্ত অনন্ত,—দয়াময় শ্রীভগবানের রূপও তেমনই অনন্ত, তাঁহার নামও তেমন অনন্ত। সুতরাং ভিন্নপ্রকৃতিক ভক্তগণ তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপের ধ্যান করিবেন, ভিন্ন ভিন্ন নামে তাঁহার পূজা ও জপ করিবেন ইহা শাস্ত্রযুক্তি বহির্ভূত নহে। শ্রীকৃষ্ণ যখন কংস-সভায় উপস্থিত হইলেন তখন এক এক শ্রেণীর লোক তাঁহাকে এক একরূপ দেখিতে পাইলেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে :—

মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপীনাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতে র্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতিবিদিতো রঙ্গংগতঃ সাগ্রজঃ॥

অর্থাৎ কংসসভায় শৃঙ্গারাদিসর্ব্বরসকদম্বমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ দ্রষ্টাদিগের মনোগত ভাবানুসারে পরিলক্ষিত হইতে লাগিলেন। মল্লগণ দেখিলেন

শ্রীকৃষ্ণ যেন বজ্রসার মূর্ত্তি, কেননা মল্লগণ রৌদ্ররসপ্রিয় বা রৌদ্ররসের সাধক। জনসাধারণ দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ যেন পুরুষশ্রেষ্ঠ, কেননা ইহারা অদ্ভুতরসে মগ্ন হইয়া রঙ্গস্থলে আসিয়াছিলেন। স্ত্রীগণ শৃঙ্গাররসে পরিপ্লুত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সাক্ষাৎ কামদেব বলিয়া মনে করিলেন। শ্রীদামাদি গোপদের মনে হইল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরই একজন। বয়স্যোচিত হাস্যরসে আপ্লুত হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেই গজরক্তাদিশোভিত তৎকালিক মূর্ত্তিতে হাস্যের উদ্দীপক ভাব দেখিতে পাইলেন। অসৎ রাজারা মনে করিলেন শ্রীকৃষ্ণ যেন অসৎদিগের শাস্তা। এখানে বীররসের আবির্ভাব সূচিত হইল। বসুদেব-দেবকীর মনে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া এই সকল ভাবের কোনও ভাবের উদ্রেক হইল না। দেবকী মনে করিলেন "এই যে আমার কোঁকচেরা কোলের ধন শ্রীকৃষ্ণ এখানে উপস্থিত"! তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার স্তনের দুগ্ধ পুত্র-স্নেহে ক্ষরিত হইতে লাগিল, আর পাছে বা কোমল শিশু-বাছার উপরে বজ্রসার মল্লগণ কোন প্রকার দৌরাত্ম্য করে, দেবকীর হৃদয়ে এই আশঙ্কার উদয় হইল। ইহা করুণরসের প্রভাব।

দেখুন কি আশ্চর্য্য ভাব! মল্লগণ যাঁহাকে বজ্রসার ভীষণতম পদার্থ বলিয়া মনে করিয়া ভীত হইতেছে, স্নেহময়ী জননী তাঁহাকেই কুসুম-কোমল কোলের শিশু মনে করিয়া মল্লগণের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কত আশঙ্কাই করিতেছেন; এদিকে ভীত কংসের হৃদয়ে ভয়ানক রস প্রবাহিত। কংস দেখিতেছেন, কৃষ্ণ যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ। নারী-গণ যাঁহার মদনমোহন রূপ-সন্দর্শনে আলিঙ্গন-লাভের জন্য উপাস্যদেবতার নিকট শত প্রার্থনা করিতেছেন, কংস তাঁহাকেই সাক্ষাৎ মৃত্যু বলিয়া ভীত হইতেছেন। আবার অপরদিকে যোগিগণ দেখিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মবিগ্রহ। কেননা শান্তিরসেই ইহাদের সাধনা। বৃষ্ণি-গণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ পরমারাধ্য প্রীতিময় বিগ্রহ বলিয়া প্রতিভাত হইলেন।

লোকে কথায় বলে "যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।" ফলতঃ রসভেদেই ভগবদ্দর্শনে তারতম্য ঘটে। এস্থলে রসসংগ্রহের একটী পদ্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

রৌদ্রোঽদ্ভুতঃ শুচিরথোধৃত সখ্যহাসো
বীরোঽথ বৎসলযুতঃ করুণো ভয়াঙ্কঃ।
বীভৎস সংজ্ঞ উদিতোঽথ তথৈব শান্তঃ
সপ্রেম ভক্তিরিতি তে হ্যধিকা দশ স্যুঃ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে এই রসের যথেষ্ট বিচার করা হইয়াছে। সেই বিচার মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতত্ত্বে পূর্ণ। শ্রীভগবদ্দর্শনে অথবা তদনুভবে যে তারতম্য ঘটে তাহার হেতু হৃদয়নিহিত রসের তারতম্য ও জ্ঞানের তারতম্য। এই জ্ঞান সাধারণতঃ চতুর্ব্বিধ তদ্‌যথা—প্রতিকূল জ্ঞান, অজ্ঞান, সজ্ঞান, এবং অনুকূলজ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ পরমসুখবিগ্রহ। এই বিগ্রহদর্শনে কংসের মৃত্যুভয় উপস্থিত হইল কেন? যেহেতু কংস প্রতিকূল জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেন। শর্করাখণ্ড স্বভাবত মিষ্ট হইলেও দূষিত জিহ্বায় উহা তিক্তবৎ বলিয়াই অনুভূত হইয়া থাকে। অপর কেহবা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের ন্যায় অজ্ঞানতা বশতঃ তাঁহার পরম পুরুষত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাধারণ নরবালক বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু জ্ঞানযোগিগণ তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপ পরম ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন। অপরপক্ষে নারীগণ তাঁহাকে আপন জন বলিয়া তাঁহার মাধুরী অস্বাদনে সমর্থ হইলেন। বৃষ্ণিগণের নিকট তিনি আপন বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাঁহারা ঐশ্বর্য্য ভাবে বিভাবিত হইয়া ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত প্রীতির চক্ষে তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বরসকদম্বমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ রূপমাধুর্য্যরসবিশেষসেবী ভক্তগণের নিকট ভিন্ন ভিন্ন-ভাবে আস্বাদ্য ও অনুভূয়মান হইয়া থাকেন। সিদ্ধভক্ত

শ্রীল বিল্বমঙ্গলের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্য প্রকটিত হইল, অপরের নিকট তাঁহার সেরূপ প্রকাশ না হইতে পারে। শ্রীভগবান্ নিজেই গীতায় বলিয়াছেন :—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।

"অর্থাৎ যোগমায়াসমাবৃত আমি সকলের নিকট প্রকটিত হই না" আবার পাত্রভেদে এই প্রকটনেরও তারতম্য আছে। সুতরাং তিনি রসিকভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীল রামানন্দ রায় মহোদয়কে যেরূপ মাধুরী দেখাইয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় অপর কাহারও নিকটে তাঁহার সেইরূপ প্রকাশ করেন নাই, ইহা তাঁহার স্বীয় শ্রীমুখেরই উক্তি।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলাবিহার-সময়ে তদীয় নিষ্ঠাবান্ ভক্তগণ তাঁহাকেই কলিযুগের একমাত্র উপাস্য বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছিলেন। পরমবিদ্বৎশিরোমণি শ্রীল সার্ব্বভৌম শ্রীগোরাঙ্গনামজপে ও শ্রীগোরাঙ্গরূপধ্যানে বিভোর থাকিতেন। বেদান্তসাংখ্যবৈশেষিকপাতঞ্জলমীমাংসা-আগম-নিগম-মহাপুরাণ-ইতিহাস-পঞ্চরাত্র-অলঙ্কারকাব্যনাটকাদিরহস্যসিদ্ধান্তের অনর্গল বক্তা,—অসংখ্য সন্ন্যাসিবর্গের পরমারাধ্য—পরিব্রাজকরাজ শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রকেই এক মাত্র উপাস্য বলিয়া ভজনা করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে তাঁহার নিষ্ঠাবুদ্ধি নিরতিশয় দৃঢ় ছিল। শ্রীশ্রীনদীয়াবিহারীর রূপরসে তাঁহার চিত্ত এমন আসক্ত হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার অন্যরূপ হৃদয়ে স্থানদান করাও ক্লেশকর মনে করিতেন :—

শ্রবণ-মনন-সঙ্কীর্ত্তাদি ভক্ত্যা মুরারে-
র্যদি পরমপুমর্থং সাধয়েৎ কোঽপি ভদ্রম্।
মম তু পরমপারপ্রেমপীযূষসিন্ধোঃ
কিমপি রসরহস্যং গৌরধাম্নো নমস্যম্॥

অর্থাৎ যদি কোন কৃষ্ণভক্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণমননকীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তি

দ্বারা পরমপুরুষার্থ প্রেমের সাধন করেন, তাহা করুন, ভালই। কিন্তু সেই অপারপ্রেমসিন্ধুস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিরসে যে অতি অদ্ভুত রহস্য আছে, তাহাই আমার নমস্য। তিনি আরও বলেন :—

ঈশং ভজন্তু পুরুষার্থচতুষ্টয়াশা
দাসা ভবন্তু চ বিহায় হরেরুপাস্যান্।
কিঞ্চিৎরহস্যপদলোভিতধীরহন্তু
চৈতন্যচন্দ্রচরণং শরণং করোমি॥

অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় অভিলাষী হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনাই করুন বা অন্য উপাস্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের একান্ত দাসই হউন, কিন্তু আমি সেই অতি দুর্লভ শ্রীচৈতন্যচরণারবিন্দ মকরন্দলুব্ধ হইয়া সেই চরণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রকে অদ্বিতীয় পরমতত্ত্বরূপে বুঝিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতগ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব যেরূপ পরিস্ফুটরূপে বর্ণিত হইয়াছে, অন্যত্র সেরূপ বর্ণনাচ্ছটা প্রকৃতই সুদুর্লভ। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট উপাস্যদেব। তিনি স্বচক্ষে তাঁহার রূপমাধুরী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং অনুমান ও অনুভাব দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ণরসতত্ত্বের অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ স্পষ্টতঃ বুঝিয়াছিলেন, পরমতত্ত্ব শ্রীভগবান্ জগতে যে সকল রূপ প্রকট করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ঐশ্বর্য্য, তাঁহার অবাধ ঔদার্য্য, তাঁহার সর্ব্বচিত্তাকর্ষক রূপমাধুর্য্য, তাঁহার স্বীয় প্রেমরসাস্বাদনচাতুর্য্য,—প্রেমময়ধামের অত্যদ্ভুত ব্যাপার। তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ বলিয়াছেন :—

অতুলসকলশক্ত্যাশ্চর্য্যলীলাপ্রকাশৈ-
রনধিগতমহত্বঃ পূর্ণ এবাবতীর্ণঃ।

ইহাও বহিরঙ্গ তত্ত্বের খ্যাপনামাত্র। শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বের যে নিগূঢ় ভাব শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কি অতঃউর্দ্ধে শ্রীল রামরায় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, পূজ্যপাদ মহানুভাব গ্রন্থকার সরস্বতী ঠাকুরের বর্ণনাচ্ছটায় তাহারও আভাস এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যাতা, তাঁহার ব্যাখ্যা সর্ব্বজনসম্মত। শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব প্রকটন করার আর অধিকারীই বা কে? শ্রীপাদ স্বরূপ "সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ।" তাঁহার সুবিখ্যাত শ্রীগৌরতত্ত্ব-প্রকাশক পদ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের মর্ম্মগত মহাসিদ্ধান্ত। শ্রীপাদ স্বরূপ জগৎসমক্ষে এই নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিলেন "তোমরা এই যে শ্রীগৌর-বিগ্রহ দেখিতেছ, জান, উনি কি পদার্থ? তোমরা শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিয়াছ; শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদিনীশক্তি তাহাও তোমরা শুনিয়াছ। শক্তি ও শক্তিমান্ যে একাত্ম, ইহাও তোমাদের অবিদিত নাই। সুতরাং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলারসাস্বাদনের নিমিত্ত যদিও অনাদিকাল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যলীলাময় যুগলবিগ্রহ বিদ্যমান, কিন্তু উহাঁদের তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার এই শ্রেষ্ঠতমা শক্তি শ্রীরাধা এক। তদ্‌যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

রাধাপূর্ণ শক্তি কৃষ্ণপূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নিও জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি॥

রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।

সুতরাং শক্তি-শক্তিমদ্ভাবে এই দুই বস্তু তত্ত্বতঃ এক। তত্ত্বতঃ এক হইয়াও লীলারসাস্বাদনের নিমিত্ত এই একই তত্ত্বের দুই দেহ। এই আনন্দময় দেহদ্বয়ও নিত্য। এই দুই বস্তু এক হইয়াও দুই ;—আবার দুই হইয়াও এক। শ্রীগৌরাঙ্গরূপে এই দুই এক হইলেন। ইহাই শ্রীভগবদ্দেহের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য। অধুনা কলিকালে এই দুই বস্তু একাকারে গৌরাঙ্গরূপে প্রকট হইলেন। সুতরাং হে জীব, যাঁহাকে তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া জানিতেছ ইনি সেই দুয়ের ঐক্যপ্রাপ্ত মিশ্রিত অদ্ভুত শ্রীমূর্ত্তি। শ্রীপাদ স্বরূপের এই সিদ্ধান্তটী যে পদ্যে গ্রথিত হইয়াছে তাহা এই :—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।

শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিলাসের নিজানন্দ সাধনরূপা স্বরূপভূতা আহ্লাদিনী শক্তি। শক্তি-শক্তিমদ্ভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্ম কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে লীলাবিলাসের নিমিত্ত অনাদিকাল হইতে এই এক বস্তু দুই শ্রীমূর্ত্তিতে প্রকটিত। অধুনা কলিকালে রাধাকৃষ্ণদ্বয় একাধারে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রকটিত হইয়াছেন। যদি বল ইহারা যে একাধারে মিলিত হইলেন তাহা কি প্রকারে বুঝিতে পার? সেই জন্য শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন শ্রীমতীর ভাবদ্যুতিসুবলিত দেহই তদ্দ্বয়ের ঐক্যানুমোদনের হেতু। ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাকরণাপাটবশূন্য মহানুভাব ভাগবতগণের অনুভবই এ সম্বন্ধে প্রধানতম প্রমাণ।

ফলতঃ শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহে ভাবকান্তি-দ্বারা শ্রীরাধা প্রকটিত হইয়াছেন॥

তাই মহানুভাবশিরোমণি শ্রীপাদ প্রকাশানন্দের গ্রন্থের উপক্রমে (১৩ শ্লোকে) লিখিত হইয়াছে :—

সিংহস্কন্ধং মধুরমধুরস্মেরগণ্ডস্থলান্তং
দুর্ব্বিজ্ঞেয়োজ্জ্বলরসময়াশ্চর্য্যনানাবিকারম্।
বিভ্রৎ কান্তিং বিকচ কনকাম্ভোজগর্ভাভিরামা
মেকীভূতং বপুরবতু বো রাধয়া মাধবস্য॥

অর্থাৎ যাঁহার স্কন্ধদেশ সিংহ তুল্য, যাঁহার গণ্ডস্থলের প্রান্তভাগ মধুরাদপিমধুর হাস্যযুক্ত, ও দুর্বিজ্ঞেয় উজ্জ্বলরসময় বহুল-আশ্চর্য্যভাববিশিষ্ট, যাঁহার কান্তি প্রফুল্ল কনককমলের কেশর অপেক্ষাও মনোহর, শ্রীরাধা-মাধবের এই একীভূত শ্রীবিগ্রহধারী সেই শ্রীগৌরাঙ্গহরি তোমাদের রক্ষা করুন।

শ্রীপাদ গ্রন্থকার উপসংহারেও (১০৯ শ্লোকে) এই "একীভূত বপুর" কথা বলিয়াছেন, তদ্‌যথা :—

বিভ্রদ্বর্ণং কিমিহ দহনোত্তীর্ণসৌবর্ণসারং;
দিব্যাকারং কিমপি কলয়ন্ দৃপ্তগোপালবালঃ।
আবিষ্কুর্ব্বন্ ক্বচিদবসরে তত্তদাশ্চর্য্যলীলাং।
সাক্ষাৎ রাধামধুরিপুবপুর্ভাতি গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ॥

শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ তদীয় গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের একীভূত বপু বলিয়া নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীচন্দ্রামৃত গ্রন্থের সুবিখ্যাত টীকাকার, বৈষ্ণবসিদ্ধান্ততত্ত্বে পূর্ণ অভিজ্ঞ। তিনি উক্ত দুই শ্লোকের যে অনুবাদ শ্লোক-রচনা করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য, তদ্‌যথা :—

কনকাম্ভোজগর্ভাভং রাধামাধবয়োর্ বপুঃ।
একং বা পাতু হর্য্যক্ষগ্রীবং শুচিবিকারকম্॥ ১৩

বৃষভানুসুতাবপুরেকতনুঃ
কনকোজ্জ্বলভা-জিতপুষ্পধনুঃ।
কৃতগোপকুমার-বিলাসভরঃ
পরিভাতি বিধূজ্জ্বলগৌরবরঃ॥

সুপ্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ মহাশয়ও এই ভাবের আভাস লইয়া লিখিয়াছেন :—

অদ্ভুত এ লীলা!
এক অঙ্গে রাধাশ্যাম!
আহ্লাদিনী শক্তিসার—
আহ্লাদিনী শক্তির আধার
গৌর আকার।

তাঁহার রচিত একটী গান এই :—

একাধারে রাধাকৃষ্ণ বিরাজে
শ্যাম সেজে কাঁদালে রাধা,
কাঁদছে গৌরসাজে!
দেখরে প্রেমের খেলা মন আমার :
আনন্দে ভাসলো ধরা
এলো গোরাচাঁদ!
মন মজালে মোহনবেশে
প্রেম বিলাবে প্রেমনীরে ভেসে,
পিবে সুধা প্রাণ পদরাজীব রাজে॥

এই অত্যদ্ভুত অভূতপূর্ব্ব অবতরণের হেতু কি? পরম কারুণিক শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, যথা :—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-

স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

"অর্থাৎ যে প্রেম দ্বারা শ্রীরাধা আমার অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদন করেন, শ্রীরাধাব সেই প্রণয়-মহিমাই বা কীদৃশ, শ্রীমতীর আস্বাদ্য আমাব মাধুর্য্যই বা কীদৃশ, আমায় অস্বাদন করিয়া শ্রীমতীর যে সুখাতিশয় হয়, তাহাই বা কীদৃশ," এই তিন বাসনা-পরিপূরণের নিমিত্ত মহাভাবে ভাবিত হইয়া শচীর গর্ভসিন্ধু হইতে শ্রীগৌরচন্দ্রমা উদিত হইলেন।

শ্রীচরিতামৃতের আদির চতুর্থে এই শ্লোকেব অতি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীচন্দ্রামৃতের টীকাকার ; শ্রীল স্বরূপদামোদরের শ্লোকের ভাব লইয়া লিখিয়াছেন :—

কদাচিৎ কৃষ্ণো রহসি স্বগতং বদতি, "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো যেন প্রণয়মহিম্না অনয়া রাধয়া মমাদ্ভুতমাধুর্য্যমাস্বাদ্যতে, মমৈব মাধুর্য্যং কীদৃক্ যদাস্বাদ্যতে রাধিকা সুখমনুভবতীতি বাঞ্ছাত্রয়ং যত্নেনাপি যদি ন সিদ্ধং, তর্হি বুদ্ধম্, আশ্রয়ীভূতরাধাগতপ্রণয়মহিমমাধুর্য্যাস্বাদসুখানি প্রণয়াদি-বিষয়েণ ময়ানুভবিতুমনস্থত। প্রকাশভেদেন প্রকাশভিন্নং রাধিকাস্বরূপ-মাত্মন্যেকীকৃত্যাবতীর্য্য স্বয়ং তদাস্বাদ্য তদুভয়ভজনপরিপাটীং দর্শয়িষ্যামী"তি তথাভবৎ। এবং তস্মিন্ সময়ে শ্রীরাধিকা পাদমীহিতবতী, "মৎপ্রাণনাথ শ্যামসুন্দরমদ্বিরহেণ কীদৃক্ ভবতীতি জ্ঞাস্যামীতি। কিন্তু তৎস্বরূপং বিনা মদভীষ্টং ন সিদ্ধ্যতীতি, তৎস্বরূপা ভবিষ্যামী"তি। তচ্চিন্তনসমকালএব কৃষ্ণ আত্মানং তস্যামাবেশ্য তামাত্মন্যাবেশ্যৈকীভূতঃ। অতো রাধাকৃষ্ণদ্বিতয়ত্বে-নান্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌর ইতি। অতএব কৃষ্ণত্বেন রাধে রাধে"ইত্যাদি বদতি, রাধিকাত্বেন কৃষ্ণকৃষ্ণেতি বদতি। এবং মহামন্ত্র প্রচারেহপোষ ক্রমঃ। কৃষ্ণাবেশাদ্ধরে হরে ইতি রাধাবেশাৎ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি বীপ্সা, তদৈব

কৃষ্ণাবেশাৎ হরে হরে ইতি বীপ্সা। নিগূঢ়প্রেমবিলাসচাতুর্য্যেণ কৃষ্ণমনো-হরতীতি হরা,—রাধা।”

ইহার মর্ম্মার্থ উপরোক্ত শ্লোকের বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ইহাতে একটি সবিশেষ কথা এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” নাম করিতেন, আবার ক্বচিৎ কচিৎ কৃষ্ণ-ভাবে বিভাবিত হইয়া “রাধে রাধে” ধ্বনি করিতেন। তিনি যে, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-হরে-হরে এই মহামন্ত্র জপ করিতেন তাহাও কৃষ্ণভাবের ও রাধাভাবের আবেশসূচক “হরে” বলিতে “রাধে” বুঝায়। “ইনি কৃষ্ণের মন হরণ করেন” এই অর্থে—‘হরা’ অর্থাৎ রাধা। এই “হরা” পদের সম্বোধনে “হরে” পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দও লিখিয়াছেন :—

ক্বচিৎ কৃষ্ণাবেশান্নটতি বহুভঙ্গীমভিনয়ন্
ক্বচিৎ রাধাবিষ্টো হরি হরীত্যার্ত্তিরুদিতঃ।
ক্বচিদ্রিঙ্গন্ বালঃ ক্বচিদপি চ গোপালচরিতো
জগদ্ গৌরো বিস্মাপয়তি বহুগম্ভীরমহিমা॥

অর্থাৎ কখনও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কখনও বা পৌগণ্ডলীলা, কখনও বা কৈশোরলীলাভিনয়ে, আবার কখনও রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া “হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া রোদনের আর্ত্তিতে গম্ভীরমহিম শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জগৎকে বিস্মিত করেন।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর একটি সহজ ভাব পরিলক্ষিত হইত। সেটী ভক্তভাব। শ্রীপাদ মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন :—

“গোপীভাবৈ রীশ ভাবৈ র্দাসভাবৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।”

শ্রীভগবান্ তদীয় ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া বহুল নাম-রূপ প্রকটন করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক নাম এবং প্রত্যেক রূপই নিত্য। তাঁহার

শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভৃতি নামও তারক ও পারক। ভক্তভূষণ শ্রীল হরিদাস, হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমূর্ত্তির ধ্যান এবং মুখে তাঁহার শ্রীনাম শ্রবণ করিতে করিতে অপ্রকট হইলেন। শ্রীল হরিদাস, আচার্য্যবর্য্য শ্রীল অদ্বৈত, শ্রীপাদ রূপসনাতনপ্রভৃতি পার্ষদ ভক্তবৃন্দ তাঁহার যে মূর্ত্তি সন্দর্শন করেন, ভাববলের তারতম্যানুসারে একই শ্রীমূর্ত্তিতে তাঁহারা যে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য অনুভব না করিয়াছিলেন, তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়।

এখন মনে স্বভাবতঃই যে প্রশ্নের উদয় হয় তাহা এই :—শ্রীগৌর ভগবান্ শ্রীল রামরায়কে যে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন তাহা কীদৃশ। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কড়চা অবলম্বনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিলেন :—

তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ-মহাভাব দুই এক রূপ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দ মূর্চ্ছিত।
ধরিতে না পারি দেহ পড়িলা ভূমিতে॥

এই পয়ারের প্রথম কথা এই যে প্রভু "হাস্য" করিয়া শ্রীল রামরায়কে স্বরূপ দেখাইলেন। প্রভু হাসিলেন কেন, এই কথা আমাদের সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতব্য। কিন্তু জানিবার বাসনা হইলে কি হইবে? আগে জানিবার উপ-যুক্ত হওয়া প্রয়োজনীয়। আমরা প্রভুর লীলারহস্য বুঝিবার উপযুক্ত নহি, সুতরাং তাঁহার গম্ভীর লীলার ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া প্রকৃতই বাতু-লতামাত্র। তথাপি কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া জানিবার ও লিখিবার ইচ্ছা হয়। আমাদের এ সম্বন্ধে যাহা মনে হইতেছে একে একে তাহাই প্রকাশ করিতেছি, পরম কারুণিক ভক্তগণ সময়ে আমাদের ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যই সংশোধন করিয়া দিবেন।

১। প্রভু হাসিলেন কেন? লোক ব্যবহারে হাস্যোৎপত্তির কতক

গুলি হেতু দৃষ্ট হয়। প্রীতিকর ব্যাপারবিশেষে লোকের হাস্যোৎপত্তি হইয়া থাকে।

(ক) শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয়ভক্তের দৃষ্টিগোচরে স্বীয় অদ্ভুতরূপ প্রকটন করিবেন ইহা তাঁহার পক্ষে এক সুখকর ব্যাপার, ইহার নিমিত্তও তাঁহার হাস্যের উদ্রেক হইতে পারে।

(খ) অথবা এমনও হইতে পারে—ভক্তের প্রীতিতেই তাঁহার প্রীতি। শ্রীল রামরায় তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রীতির হেতুস্বরূপ, সুতরাং এই প্রীতিকর ব্যাপারের কথা মনে হওয়ায় প্রভুর হাস্যরসের উদ্রেক হইল। প্রভু রামরায়ের মানসনেত্র গোচরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি প্রকটন করিলেন, আর রামরায় তৎক্ষণাৎ সেই রূপমাধুর্য্য দর্শন করিয়া প্রভুর নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন রামরায় স্পষ্টতঃ দেখিলেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলে গৌরদেহ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীমতী তাঁহার নিজের গৌরকান্তি সংবৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আপনরূপে প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন, রসলীলার যুগলমূর্ত্তি স্বতন্ত্র ভাবে প্রকটিত হইয়াছেন। রামরায়ের সন্দেহজাল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি রসময় প্রভু তাঁহাকে অপর কথায় বুঝাইতে সচেষ্ট হইলেন। রামরায় প্রত্যুত্তরে বলিলেন "তুমি কি মনে করিতেছ? আর কি আমাকে ফাঁকি দিয়া এড়াইতে পারিবে? আমি এবার চিনিয়াছি। তুমি নবগৌরাঙ্গ-বেশে সন্ন্যাসী সাজিয়াছ, এ কিছুই নহে—ঐ যে তোমার সন্ন্যাস-মূর্ত্তি বিশ্লিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীযুগলরূপ প্রকাশ পাইতেছেন! আমি প্রত্যক্ষ সেই যুগলরূপমাধুর্য্য সন্দর্শন করিতেছি। সন্ন্যাসবেশ তোমার স্বরূপ নহে, ঐ যুগল-মূর্ত্তিই তোমার স্বরূপ। আর তোমার ভারিভুরি ছলচাতুরি খাটিবে না, আমি তোমায় চিনিয়াছি।"

২। প্রভু শ্রীল রামরায়ের বাক্যে হাসিলেন। হয়ত সুরসিক প্রভু এই

মনে করিয়া হাসিলেন যে, রামরায়! তুমি যেরূপ দেখিয়া মনে মনে ঠিক করিয়াছ—উহাই আমার স্বরূপ, উহাও তোমার সম্যক্‌জ্ঞানের ফল নহে, এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে অত্যদ্ভুত অনন্যদৃষ্ট নিগূঢ়প্রেমরস-মাধুর্য্যময়ী অভিনব মূর্ত্তি সন্দর্শন করাইয়া চমৎকৃত করিয়া ফেলিতেছি।" তৎক্ষণাৎ প্রভু সেই অনন্যদৃষ্ট অত্যদ্ভুত স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। রামানন্দ রায় চকিতের ন্যায় এই স্বরূপ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অপরাপরের নিকট যে ভাবেই আবির্ভূত হউন, কিন্তু শ্রীরাম রায় দেখিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎরসরাজ-মূর্ত্তি। শ্রুতি যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া জ্ঞান-তৃষ্ণার পরম তৃপ্তি লাভ করেন, যাঁহাকে রস-স্বরূপ জানিয়া ঋষিগণ অপার অনন্ত অসীম আনন্দসাগরে মজ্জিত হইয়া যান, শ্রীকৃষ্ণ সেই রসের রাজা। শ্রীরূপগোস্বামী এই জন্য ইহাকে "অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। "রসতীতি রসঃ।" যিনি সকলকে সরস করেন তিনি রস। রস পরমব্রহ্মস্বরূপ। শ্রুতি বলেন,—"স এব ব্রহ্মরূপো ভর্গোরসঃ তৃণবৃক্ষৌষধাদিষু স্থাবরেষুচ স এব রস-রূপেণ বসতি।" সুতরাং রস পরমব্রহ্মস্বরূপ। সাহিত্যদর্পণকার বলেন :—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥

পরম ব্রহ্ম যে রসস্বরূপ সকল শাস্ত্রই এই উক্তির সমর্থক। কিন্তু শ্রীভগবান্ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি—তিনি শৃঙ্গারাদিসর্ব্বরসকদম্বময়মূর্ত্তি। শ্রীরাম-রায় নিজেই অন্যত্র বলিয়াছেন :—

শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥

"রসরাজময়" পদের ময়ট্ প্রত্যয়টী স্বরূপার্থে বুঝিতে হইবে। শ্রীভগ-

বানের রসরাজ-মূর্ত্তি কেবল গোপীগণের আস্বাদ্য। শ্রীল রামরায় সাক্ষাৎ বিশাখা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের রসরাজমূর্ত্তি-সন্দর্শন করিতে সমর্থ। আমরা সাক্ষাৎমন্মথ-মন্মথ-মূর্ত্তির কথা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শৃঙ্গার-রসরাজমূর্ত্তি কীদৃশ, গোপীর অনুগতাগণ তাহা মূকাস্বাদনবৎ আস্বাদন করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু উহা কেহ ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন না।

অতঃপর "মহাভাব" সম্বন্ধে আমরা একটীমাত্র কথা বলিব। শ্রীউজ্জল নীলমণিতে মহাভাবের উল্লেখ আছে। এখানে আমরা তাহার আলোচনা করিব না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দুই একটী সুবিখ্যাত পংক্তিই প্রেমিক ভক্তগণের এ রস আস্বাদনের পক্ষে যথেষ্ট। শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন :—

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি॥

হ্লাদিনী, প্রেম, ভাব ও মহাভাব এই সকল পদার্থ জড়াতীত, এমন কি চিন্ময় জগতেরও অতীত। কেবল অজড়বিদ্ধ বিশুদ্ধ প্রেমময় ধামের প্রেমরসাস্বাদিগণ এই সকল সূক্ষ্মতর পদার্থের অনুভবে সমর্থ। এখানে আমাদের চর্ম্মচক্ষুর অধিকার নাই, বৈজ্ঞানিকের টেলিস্কোপ বা মাইক্রোস্কোপেরও এই সকল পদার্থ অপ্রেক্ষ্য। জ্ঞানযোগীও যোগবলে এই অতি সূক্ষ্মতম প্রেমময় ধামের পদার্থনিচয়ের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হয়েন না। মহামাদনী শক্তিময়ীর মহাভাব মানব বুদ্ধিবৃত্তির অতীত।

এস্থলে রসরাজ ও মহাভাবের শাস্ত্রীয় সংস্কার মর্ম্ম উল্লিখিত হইল মাত্র। রসরাজ ও মহাভাব এই পদ দুইটী রসভজন-শাস্ত্রের চরম তত্ত্বের

অভিব্যঞ্জক। শ্রীল রামরায় রসিকভক্ত। তিনি যুগল-সেবার অধিকারী। তিনি যুগলরূপ দেখিয়াছেন, হৃদয়ে যুগলরূপ ভাবিয়াছেন কিন্তু রস-ভজনায় মিলনই—পরমাতৃপ্তি। মিলন-সন্দর্শনই রসিক ভক্তের চির আকাঙ্ক্ষা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বামে দণ্ডায়মান হইলেন, ইহার অর্থ এই যে লীলারাজ্যের বিপ্রযোগ বা বিরহ অন্তর্হিত হইল। এই মিলন অর্থ সন্নিকর্ষ-লাভ। কিন্তু এই সন্নিকর্ষও রসরাজ্যে দূরত্বব্যঞ্জক। যুগল-মূর্ত্তির উপাসক শ্রীল রামরায়কে মহাপ্রভু এমন যুগলমিলন দেখাইলেন যে রাসায়নিক মিলনেও তেমন মিলন সম্ভাবিত হইতে পারে না। এইরূপ যুগলের মিলনে যুগলকে আর "দুই" বলিয়া চিনিয়া লইবার উপায় রহিল না। দুই এক হইয়া গেলেন, রসরাজও মহাভাবের মহামিলনে রামরায় আর "দুই" দেখিতে পাইলেন না। রামরায়ের চিরদিনের অভিলাষ অতি চমৎকারভাবে পূর্ণ হইল।

এমন অপূর্ব্ব মহামিলন শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জেও বিশাখা সখী আর কখনও সন্দর্শন করেন নাই। সখীগণ শ্রীবৃন্দাবনের যমুনাতীরে নির্জ্জন নিকুঞ্জে কত শতবার শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের মিলন দেখিয়াছেন, মিলন-সেবা করিয়াছেন কিন্তু এমন অপূর্ব্ব মিলন আর কখনও দেখেন নাই। বিশাখা চকিতের ন্যায় চাহিয়া দেখিলেন, রসরাজ রসময়ী মহাভাবময়ীকে স্পর্শ করা মাত্রই তিনি যেন কর-প্রসারণ করিয়া আপনার প্রিয়তম প্রাণবল্লভকে আপনার হৃদয়ে লুকাইয়া তাঁহাকে আত্মময় করিয়া লইলেন। গৌরাঙ্গে শ্যামাঙ্গ মিশিল, শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গে পরিণত হইল, মহাভাবস্বরূপিণী স্বীয় ভাবতরঙ্গে শ্যামজলধিকে স্বীয় ভাবে বিভাবিত করিলেন। রসরাজ ও রসময়ী মিলিয়া মিশিয়া এক অত্যদ্ভুত অভিনব মূর্ত্তিতে শ্রীল রামরায়ের দৃষ্টি-সমক্ষে প্রকটিত হইলেন। শ্রীল রামরায় এই অপূর্ব্ব-চিন্তিত অপূর্ব্বশ্রুত ও অপূর্ব্ব-দৃষ্ট উজ্জ্বল কনক-

কান্তিময় শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। * তাঁহার নয়ন-সমক্ষে নয়ন-পলকে এই বিশাল ব্যাপার সংঘটিত হইল। তড়িৎ-স্পর্শে জীব যেমন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এই অপূর্ব্বদৃষ্ট রূপের ঝলকে রামরায় সহসা অচেতন হইয়া পড়িলেন।

---

* এই শ্রীমূর্ত্তি শ্রীপাদপ্রবোধানন্দের অনুভূত। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের এই অত্যদ্ভুত রূপ দেখিয়া শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতি ভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতে॥ ৬২

অর্থাৎ আমার চিত্ত নবদ্বীপধামে বিলাসিত হইতেছে। এই নবদ্বীপে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপু প্রকটন করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। নবদ্বীপের প্রতি ভবনই ভক্তি-উৎসবে পূর্ণ। বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রীধাম নবদ্বীপ অধিকতর মাধুর্য্যময় (এই শ্লোকের "মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ" এই পদের টীকায় শ্রীল আনন্দি লিখিয়াছেন, "আনন্দস্বরূপং শৃঙ্গাররসস্বরূপং বপুর্যস্য সঃ, মহাপ্রেম মহাভাবস্তৎস্বরূপমানন্দস্বরূপমুজ্জ্বলরসস্বরূপঞ্চ বপুর্যস্য সঃ শ্রীরাধিকাস্বরূপত্বাৎ।"

ইহার অর্থ এই যে আনন্দস্বরূপ ও শৃঙ্গাররসস্বরূপ দেহ যাঁহার, এতাদৃশ শ্রীগৌরাঙ্গ। অথবা মহাপ্রেমা শব্দের অর্থ মহাভাব, সেই মহাভাব শব্দ দ্বারা শ্রীরাধা দ্যোতিত হইয়াছেন। শ্রীল রামরায়ের দৃষ্ট রসরাজ-মহাভাবমিলিত মূর্ত্তি যে "মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ" শ্রীগৌরাঙ্গভিন্ন অপর কোন শ্রীমূর্ত্তি নহেন, তাহা অতি স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের রসিকাস্বাদিনী টীকাকার বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিষয়ে অতীব সুপণ্ডিত। বিশেষতঃ তাঁহার সূক্ষ্মবুদ্ধি, বিচারপ্রতিভা, অসামান্য পাণ্ডিত্য এবং সর্ব্বোপরি ভক্তিবৈভবে তিনি বৈষ্ণবপণ্ডিতমণ্ডলীর [illegible] মানাস্পদ, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। এই সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বপ্রবর পণ্ডিতাগ্রগণ্য টীকাকারের সিদ্ধান্ত এই যে শ্রীগৌরাঙ্গই রসরাজ-মহাভাবমিলনের অলৌকিক শ্রীমূর্ত্তি। আমাদের ক্ষুদ্র ধারণায় এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর রামরায়কে মূর্চ্ছিত দেখিয়া নিজের শ্রীকরে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন। শ্রীল রামরায়ের চেতনা হইল, তিনি ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলেন। অপ্রাকৃত রূপের ঝলক তখন তিরোহিত হইয়াছে। সম্মুখে প্রাকৃতবৎ বেশে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সহাস্যমুখে বিরাজিত। রামানন্দ বিস্মিত হইলেন, তখনও তাঁহার নয়নসমক্ষে সেই "মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরস-বপুঃ" অলৌকিক অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হইতেছিলেন। শ্রীল রামরায় প্রাকৃতবৎ নবসন্ন্যাসিমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গে যে অলৌকিক মূর্ত্তি দেখিয়া-ছিলেন তখনও সেই স্মৃতি প্রত্যক্ষবৎ বিরাজমানা। শ্রীল রামরায় তাই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া প্রভুর শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল-মূর্ত্তি দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, তিনি হয়ত প্রভুর স্বরূপ-ত্বের চরম ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু অনন্ত ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যের পূর্ণতম নিকেতন,—শ্রীভগবান্ যখন তাঁহাকে এই মিলিত শ্রীমূর্ত্তি দেখাইলেন, তখন রামরায় বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া সেই রূপসাগরে ডুবিয়া গেলেন। প্রভু-তাঁহাকে সচেতন করিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহার বিস্ময় তিরোহিত হইল না। রামরায়ের কণ্ঠ তখনও স্তম্ভিত, সুতরাং কথা ফুটিল না, তিনি কেবল বিস্মিতভাবে মহাপ্রভুর আপাদমস্তক শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

দয়াময় প্রভু রামরায়কে টানিয়া আনিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং মৃদুমধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "রামানন্দ, আজ তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, জগতে আর কেহ কখনও এরূপ দেখে নাই। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে :—

আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন॥
মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইনু তোমারে॥

ফলতঃ শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিরহলীলান্তে যে মিলন-লীলা সখীগণ প্রত্যক্ষ করেন, সে মিলন হইতে এই মিলন অতি পৃথক্। সে মিলনে উভয়ের সন্নিকর্ষাতিশয় দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এ মিলনে দেহ-পার্থক্য পর্য্যন্ত তিরোহিত হইল, এমন কি মহাভাবময়ীর মহাপ্রেমের প্রভাবে এবং তাঁহার প্রগাঢ় আলিঙ্গনস্পর্শে স্পর্শমণি-স্পর্শনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর তনু গৌরকান্তি ধারণ করিলেন। শ্রীমতী সাক্ষাৎ স্পর্শমণি। তাঁহার প্রগাঢ় পরিরম্ভে শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গে পরিণত হইলেন। শ্রীরামরায় এই ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত না হইবেন কেন? পরমদয়াল মহাপ্রভু শ্রীরামরায়কে এই লীলাতত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত বলিলেন :—

গৌরদেহ নহে মোর,—রাধাঙ্গ-স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা সেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥
তোমার ঠাই আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সব মর্ম্ম॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্যামসুন্দর। কিন্তু শ্রীল রামরায় দেখিলেন শ্যামসুন্দর গৌরসুন্দররূপে প্রকট হইলেন। তিনি পরমবিস্মিত হইলেন। এই অভিনব আবির্ভাব তিনি আর কখনও দেখেন নাই। শ্রীভগবানের এই অত্যাশ্চর্য্য স্বরূপের বিষয় তিনি আর কখনও শুনেন নাই। শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শে অর্থাৎ যুগলের অদ্ভুত আলিঙ্গন-সম্মিলনে যে অভিনব শ্রীমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকট হইলেন, মহাপ্রভু শ্রীল রামরায়কে তাহা বুঝাইয়া বলিলেন, "শ্রীরাধা ব্রজেন্দ্রসুত ভিন্ন শ্রীভগবানের অপর শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করেন না। আমি শ্রীকৃষ্ণরূপে নিজ মাধুর্য্যরসআস্বাদন করিতে বাসনা করিলাম, কিন্তু শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত না হইলে সে রস আস্বাদন

করার অন্য উপায় নাই। তাই শ্রীরাধা-স্বরূপ সহ এই অভিনব মূর্ত্তিতে তোমার সমক্ষে প্রকটিত হইয়াছি।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের এই রসাস্বাদন-বাসনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমরা এস্থলে উহার অংশমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি ;—

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময়পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না-জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম,—গুরু ; আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানানৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ॥
সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়।
বিষয় জাতীয়সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আস্বাদ।

আশ্রয়েই অভোগ। আশ্রয়ে আকাঙ্ক্ষা ; বিষয়ে উহার তৃপ্তি। শ্রীরাধার প্রেম আশ্রয়জাতীয়, কৃষ্ণরসাস্বাদ-সম্ভোগের নিমিত্ত শ্রীমতীর হৃদয় সতত ব্যাকুল। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥

শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়জাতীয় প্রেমার আশ্রয়ীভূত হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ হই-

লেন। কিন্তু শ্রীরাধিকাস্বরূপ হওয়া ভিন্ন ইহার অন্য উপায় নাই দেখিয়া তিনি শ্রীরাধিকাস্বরূপে সম্মিলিত হইলেন। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥

তিনি যে শ্রীরাধিকা-স্বরূপ গ্রহণ করিলেন, তাহা তাঁহার ভাব ও কান্তিতেই পরিব্যক্ত হইল। যদি বলা যায় যে, তিনি শ্রীরাধাস্বরূপে সম্মিলিত না হইয়া কেবল তাঁহার ভাবও বর্ণমাত্র অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ হইলেন, তাহা হইলে প্রেম-স্বারস্য বিনষ্ট হয়। অপিতু কেবল ভাব-অঙ্গীকার করিলেই শ্রীরাধার ন্যায় মাধুর্য্য আস্বাদন করা সম্ভাবিত হইতে পারিত, কিন্তু তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-কান্তিসহ প্রকটিত হইলেন কেন? প্রকৃত কথা এই যে তিনি শ্রীমতীর ভাবে আত্মমন বিভাবিত করিয়া শ্রীমতীর ধ্যানে বিভোর হইলেন। ধ্যানই মিলনের হেতু। মহাযোগী ধ্যানের বলে যেমন জীবাত্মাকে পরমে সংযুক্ত করিয়া তাঁহার সহিত অভিন্ন প্রতীয়মান হয়েন, আশ্রয় জাতীয় সুখ-লাভের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমতীর ধ্যানে সেইরূপ বিভোর হইয়া শ্রীমতীর সহিত প্রগাঢ় রূপে যুক্ত হইলেন। নিজের ভাবও কান্তি শ্রীমতীর ভাব ও কান্তিতে নিমিলিত করিয়া তিনি এক অতি চমৎকার অভিনব শ্রীমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইলেন,—ইহাই আমাদের সেই "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" অথবা "প্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ" শ্রীগৌরাঙ্গ। ইহা অপেক্ষা প্রেমের গভীর মিলন আর কি হইতে পারে? প্রেম-সাধনার পূর্ণসিদ্ধি,—শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপেই প্রতিফলিত, ইহাই সিদ্ধভক্ত মহানুভবগণের অনুভব। এই অনুভব শাস্ত্রের বলে বলবান্, রস-তত্ত্বের সরলতায় সম্পূর্ণ এবং মহানুভাবগণের অনুভাবময়ী উক্তির দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অবিশ্বাসী তার্কিকগণ ইহার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে পারেন, সে তর্ক সত্যের বিচারে

টিকিবে না, প্রেমিক ভক্তের উহা গ্রাহ্য হইবে না। শ্রীগৌরাঙ্গের অপার গম্ভীর চরিত্র অভক্তের অপ্রবেশ্য। শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন :—

হৃদয়ে ধরিবে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥
এ সব সিদ্ধান্তরস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহাপেক্ষা কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥

সুতরাং অশ্রদ্ধাবান্ অবিশ্বাসীকে বুঝাইতে প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রীল কৃষ্ণদাস আরও বলেন

তিঁহো শ্যাম বংশীমুখ গোপ বিলাসী।
ইহঁ গৌর কভু দ্বিজ কভুত সন্ন্যাসী॥
অতএব আপনি প্রভু গোপী ভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্র নন্দনে কন প্রাণনাথ করি॥
তেঁহ কৃষ্ণ, তেঁহ গোপী পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ॥
ইতে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এই মত হয়॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণ-চৈতন্য-বিহার।
তর্কে ইহা মানে যেই সেই দুরাচার॥

সুতরাং ইহা তর্কের বিষয় নহে। শাস্ত্র বলেন :—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ যে সকল ভাব অচিন্ত্য, সে সকল ভাবে তর্ক যোজনা করিবে না। যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য। সুতরাং এই অত্যদ্ভুত শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব প্রেমরসশাস্ত্রবিরোধিতর্কের অপ্রবেশ্য। শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ মহাভাবময় শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তি। শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব পরম রহস্যময়। এই নিগূঢ়তত্ত্বে প্রবেশ করা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের সামর্থ্যায়ত্ত নহে। শ্রীল রামানন্দরায়-মিলন প্রসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় শ্রীল রামানন্দ-রায়-মিলন-পরিচ্ছেদের অন্তে লিখিয়াছেন :—

সর্ব্ব তত্ত্ব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি শুন, তর্ক না করিয়া চিতে॥
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইবে, তর্কে হয় বহুদূর॥

মহাভাব-রসরাজের প্রগাঢ় মিলনোত্থ এই মহাপ্রেমোজ্জ্বলরসবপু-প্রেমানন্দ-রসঘন অত্যদ্ভুত শ্রীমূর্ত্তি প্রেমিক ভক্তগণের হৃদয়-সর্ব্বস্ব, শ্রীমূর্ত্তি-তত্ত্বের চরম তথ্য, রসভজনশীল প্রেমিকদিগের একমাত্র উপাস্যদেবতা। এই রসমাধুর্য্যময় দেবের শ্রীশ্রীচরণাম্বুজে অনন্ত কোটি প্রণাম করিয়া এই অতি অভীষ্ট দুষ্প্রয়াস হইতে অবসর লইলাম।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে—

পরমরসরহস্যং গৌরতত্ত্বামৃতং তদ্
রসরসিকগণানাং মোহনং, তৈশ্চ লভ্যম্।
অরসিকজনশুষ্কব্যূহ-তর্কপ্রিয়াণাম্
নহি খলু সুখসিন্ধৌ গৌরতত্ত্বে প্রবেশঃ॥

অতঃপর আর একটি কথা এই যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল রামরায় মহানুভাবকে অনন্যদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন :—

তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্বমর্ম্ম ॥
গুপ্ত রাখিও কথা, না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা, লোকে উপহাস ॥
আমি এক বাউল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব আমায় তোমায় হই সমতুল ॥

প্রভু বিনয়ের খনি, ও ভক্তানুগ্রাহী। শ্রীল রামরায় সাক্ষাৎ বিশাখা সখী। দ্বাপর-লীলায় যে মিলন অভিব্যক্ত হয় নাই, কলিতে তিনি সেই মিলনলীলার চমৎকার-স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। প্রিয় নর্ম্মসখীর নিকট শ্রীযুগলকিশোরের প্রেমলীলা সম্বন্ধে গোপ্য কি আছে? আর গোপন করিলেই বা সে কথা গুপ্ত থাকিবে কেন? গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।'

আমি যোগমায়া সমাবৃত, সুতরাং সকলে আমার প্রকাশ জানিতে পারে না। কিন্তু ভক্তের নিকট শ্রীভগবান্ কখনও লুকাইয়া থাকিতে পারে না। শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন :—

অসুর স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি চিনে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তগণ স্থানে ॥
অপনাকে লুকাইতে নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥

শ্রীযমুনাচার্য্য একটী স্তোত্রে লিখিয়াছেন :—

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িম স্বভাবম্।

আত্মাবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ।

অর্থাৎ হে ভগবন্, তোমার প্রভুত্ব-স্বভাব ত্রিভুবনের সীমাতীত। ইহা লুকাইয়া রাখা সহজ কথা নহে। কিন্তু যোগমায়াবলে তুমি তোমার স্বীয় ঐশ্বর্য্যপ্রভাব লুকাইয়া রাখিলেও তোমার অনন্যশরণ একান্ত ভক্তগণ তোমাকে জানিতে পারেন।"

তাৎপর্য্য এই যে, রূপগ্রহণযোগ্য দর্শনেন্দ্রিয়ের পক্ষে রূপ-গ্রহণ যেমন স্বাভাবিক,—কিন্তু প্রয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে, ভক্তগণের ভক্তিচক্ষুর নিকটেও ভগবান্ তাদৃশ দৃশ্যমান হয়েন। তাই প্রভু বলিলেন :—

"লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্ব মর্ম্ম ॥

ফলতঃ শ্রীল রামরায়ই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ জানিবার উপযুক্ত পাত্র। স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি এই রসরাজ-মহাভাব-একীভূত-শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন-যোগ্য।

রসিকভক্ত শ্রীল রামরায়ের যোগ্যতা এবং শ্রীভগবানের অনুগ্রহ—এই উভয়ই এই অভিনব শ্রীমূর্ত্তি-প্রাকট্যের সম্ভবপর হেতু। প্রভু রামরায়কে সাবধান করিয়া বলিলেন "রামরায় তুমি আমার পরম ভক্ত, আমার এইরূপ আর কখনও কেহ দেখে নাই, কেবল তোমায় দেখাইলাম। দেখাইয়াই বা গোপনে রাখিব কিরূপে? তোমার নিকট আমার গোপ্যই বা কি? গোপ্য রাখিলেই বা তাহা গুপ্ত থাকিবে কেন? তুমি প্রেম-বলে সকলই জানিতে পার। আমি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে জগতে প্রকটিত হইয়াছি। ভক্তগণ আমার এইরূপ দর্শন করিতেছে। কিন্তু এই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে যে অতি নিগূঢ় রসরহস্যময় রসরাজমহাভাব-মিলিত এবং ভক্তসাধারণের দর্শনেন্দ্রিয়ের অনধিগম্য স্বরূপ-তত্ত্ব বিদ্যমান, তাহা কেবল তোমাকেই দেখাইলাম। ইহা আমার বাতুলতাবিশেষ। তুমিও

যেমন অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমে বাউল, আমিও সেইরূপ শ্রীরাধাপ্রেম-মাধুর্য্যাদিআস্বাদনের নিমিত্ত বাউল হইয়াছি। তোমাকে যে রূপ দেখাইলাম, ইহা সেই বাতুলতারই কার্য্যমাত্র। নচেৎ এমন মিলন কি কখনও সহজে হয়? তুমি যে মিলন দেখিলে ইহা অলৌকিক, অদ্ভুত ও অনন্যদৃষ্ট। সাবধান! যাহা দেখিলে, ইহা কাহাকেও বলিও না। ইহা শুনিলে জগতের বুদ্ধিমানেরাই বা কি মনে করিবে? যে রূপ সাধারণের অশ্রুত, অদৃষ্ট ও অননুভূত, তাহা সাধারণের গ্রাহ্য হইবে না, গ্রাহ্য হইবারও বিষয়ও নহে। বিশেষতঃ এই রহস্য অতীব নিগূঢ়, ইহা প্রকাশ করিও না।"

পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, শ্রীভগবান্ তাঁহার লীলারহস্য লুকাইবার যতই কেন চেষ্টা করুন না, কিন্তু ভক্তের ভক্তি চক্ষুর সমক্ষে,—ভক্তের ভক্তিময় স্বচ্ছ-চিত্তের সমক্ষে—সেই রূপ ও সেই ভাব প্রকটিত হইয়া পড়ে। ইহা তাঁহারই ভক্তানুগ্রহের অচিন্ত্য মহিমা। এই অতি নিগূঢ় রহস্যময় স্বরূপ-প্রদর্শনরূপ অলৌকিক ব্যাপার অচিরেই ভক্তগণের সুবিদিত হইল। গোদাবরীর পুণ্যতটে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীল রামরায়ের নিকট তদীয় শ্রীরূপের যে রসময়-মহাভাবময় মূর্ত্তত্ব প্রকটিত করিলেন, তদীয় ভক্তগণ তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন, কেহ কেহ সেই রূপের ধ্যানে বিভোর হইয়া পড়িলেন। পরবর্ত্তী লীলালেখকগণ এই ধ্যেয় রূপের আভাষ প্রদান করিতেও ক্ষান্ত হইলেন না। সুতরাং ভক্তগণের আনন্দবৃদ্ধিরূপ অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত তিনি যে নিগূঢ় রহস্যময় তত্ত্ব অতি সংগোপনে প্রকটিত করিলেন, ভক্তগণ সমক্ষে সে সংবাদ গুপ্ত রহিল না। এইরূপে শ্রীরামানন্দ রায় মিলন ব্যাপারে শ্রীগৌরাঙ্গের এক অতি নিগূঢ় স্বরূপতত্ত্ব জগতে প্রকাশিত হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দশ দিবস পর্য্যন্ত শ্রীল রামরায়ের সদনে অবস্থান করিলেন। রামরায় দিবাভাগে বিষয় কার্য্য করিতেন, সন্ধ্যার পরে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হইতেন, ব্রজরস-লীলা-কথায় সুধাতরঙ্গে প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হইত, বাহ্য জগৎ ভুলিয়া উভয়ে সেই কৃষ্ণ-কথার আনন্দে মগ্ন থাকিতেন। দশম দিবস সন্ধ্যার পরে যথাসময়ে রামরায় আসিয়া প্রভুর চরণান্তিকে উপস্থিত হইলেন। প্রভু বলিলেন "রামানন্দ, আমি সন্ন্যাসী। দীর্ঘকাল কোন গৃহস্থের আলয়ে সন্ন্যাসীর থাকিতে নাই, তোমার অনুরোধ-আগ্রহ এড়াইতে না পারিয়া দশদিন তোমার এখানে থাকিলাম। কিন্তু আর থাকিতে পারি না। আমি আগামী প্রাতে অন্যত্র যাইব। কয়েক দিন তোমার মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনিয়া পরম আনন্দে ছিলাম। তোমাকে ছাড়িয়া যাইব মনে করিয়া বড় কষ্ট হইতেছে। কি করিব, আর থাকিতে পারি না। আমার মনে হইতেছে আমি চলিয়া গেলে তোমারও কম যাতনা হইবে না। ধনে জনে তোমার মন নাই, তাহা আমি জানি। আমি যে উদ্দেশ্যে উদাসী; সেই উদ্দেশ্যই তোমারও জীবনের লক্ষ্য। এখানে বিষয়ের মধ্যে তোমার আর থাকিবার প্রয়োজন নাই। তুমি অচিরেই বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাচলে চলিয়া যাইও। আমি আরও কতিপয় দিন তীর্থস্থল পর্য্যটন করিয়া সত্বরেই নীলাচলে পঁহুছিতেছি। নীলাচলে দুই জনে একত্র থাকিব, আর মধুর কৃষ্ণ-কথায় পরমসুখে কাল কাটাইব।" [illegible]

বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাহা আসিব অল্পকালে॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে।
সুখে কাল গোঙাইব কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গে॥

রসময় বৈষ্ণবভজনে কৃষ্ণকথা প্রকৃতই সুখ-সুধা। নীলাচলে অনবচ্ছিন্ন অষ্টাদশ বৎসরকাল পর্য্যন্ত ইঁহারা কৃষ্ণকথার সুখ-সুধা-রস-তরঙ্গে যে ভাবে যাপন করিয়াছেন, শ্রীচরিতামৃতে অন্ত্যলীলায় তাহার বিবরণ সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে। প্রভু শক্তি দিলে এবং এই ভজনবিহীন অধমজনের সুখ-সৌভাগ্য উদিত হইলে "গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ" সন্দর্ভে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিয়া আত্মতৃপ্তির প্রয়াস পাওয়া যাইবে।

যাহা হউক, প্রভু উক্ত কথা বলিয়া রামরায়কে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর বিরহ-চিন্তায় রামরায় ম্রিয়মাণ হইলেন, তাঁহার ঢল ঢল নয়ন সলিলে আপ্লুত হইল, ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্ষার প্রবাহের ন্যায় নয়নধারা বহিতে লাগিল। প্রভু বলিলেন "রামানন্দ, বিহ্বল হইতেছ কেন? তোমাতে ও আমাতে বিরহ অসম্ভব। তুমি সত্বরেই নীলাচলে চলিয়া যাইও। এখন ঘরে যাও" প্রভুর আজ্ঞায় রামরায় অশ্রুপূর্ণনেত্রে বিদায়-প্রণাম করিয়া মন্দিরের বাহির হইলেন। প্রভু শয়ন করিলেন। নিশার অবসান হইতে না হইতেই প্রভু গাত্রোত্থান করিলেন, বিদ্যানগরের গ্রাম্যদেবতা হনুমানজীকে দর্শন করিয়া ভক্ত-অবতার ভক্তিপ্রদর্শক মহাপ্রভু তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অন্যত্র যাত্রা করিলেন।

এদিকে প্রাণারাম হৃদয়-দেবতা প্রেমানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের চরণ-কমল না দেখিতে পাইয়া শ্রীল রামরায় দুর্ব্বহ বিরহতাপে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। প্রতিদিন তাঁহাকে বিষয়াদি দেখিতে হইত, এখন শ্রীগৌরাঙ্গই তাঁহার একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইলেন। রামরায় বিষয়চিন্তা

ছাড়িয়া দিবানিশি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর রূপচিন্তা করিতে লাগিলেন। রামরায় প্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ। তাঁহার এইরূপ দশা উপস্থিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? বিদ্যানগরবাসী অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকেরাও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সন্দর্শনে স্বীয় ধর্ম্মমত ছাড়িয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে না দেখিয়া তাঁহারাও বিরহ-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। প্রভুর প্রয়াণ-সংবাদে সমগ্র বিদ্যানগর শোক-বিষাদের অবসাদ-ছায়ায় সহসা যেন মলিন হইয়া পড়িল। কিন্তু প্রভুর প্রেমমূর্ত্তি প্রত্যেক হৃদয়ে প্রগাঢ় ধ্যানে গাঢ়তররূপে অঙ্কিত হইলেন। যদিও বিদ্যানগরবাসীরা বাহিরে শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনমোহন মধুরমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তাঁহদের প্রত্যেকের হৃদয়েই সেই আনন্দ-ঘন সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বিদ্যানগরবাসীরা পঞ্চম পুরুষার্থদাতা প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ-রজ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

শ্রীরামানন্দ মিলনলীলা শ্রীগৌরাঙ্গলীলাতরঙ্গসমূহের এক অতি বড় প্রধান তরঙ্গ। এই মিলনেই প্রেম-রস-তত্ত্বের মহামিলন প্রকটিত হইয়াছে, অতি নিগূঢ়তম ব্রজরহস্যের মহারহস্য এই লীলাতে এ জগতের ভক্ত-সমাজের ভক্তিময় অনুভবের যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ীভূত হইয়াছে। প্রেমতত্ত্ব, রস-তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব এই মিলন-লীলায় ভক্ত-সমাজে শিক্ষা-সূত্রবৎ প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই লীলার যে ফলশ্রুতি লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে অবশ্য উল্লেখযোগ্য, তদ্‌যথা :—

সহজে চৈতন্যচরিত ঘনদুগ্ধপুর।
রামানন্দ চরিত্র তাহা খণ্ড-প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা তাতে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান্ যেবা সেই করে আস্বাদন॥

যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে।
সর্ব্বতত্ব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় লিখিয়াছেন, তিনি শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের কড়চা গ্রন্থ অনুসারে এই লীলা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, মূলগ্রন্থ-দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। কিন্তু পরমকারুণিক শ্রীল কবিরাজ আমাদে জন্য যাহা মূলগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত করিয়াছেন, তাহাই আমাদের পক্ষে অতি যথেষ্ট বলিতে হইবে।

শ্রীল রামানন্দরায়-মিলন শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার এক অতি প্রধান ব্যাপার, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যদিও ভক্ত ও ভগবানের মিলন অবশ্যম্ভাবি-ব্যাপার, তথাপি প্রাকৃতিক নিয়ম-অনুসারে প্রত্যেক ব্যাপারেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীভগবদনুগ্রহই ইহার নিত্য কারণ নৈমিত্তিক কারণ,—শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। ১৪৩২ শকের বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণ পরিভ্রমণ করিতে বাসনা প্রকাশ করেন। এই সংবাদ শুনিয়া নীলাচলের ভক্তগণ দুঃখিত হইলেন, বিশেষতঃ শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাপ্রভুর দক্ষিণ যাত্রার সংবাদ পাইয়া শোকাকুলের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের ইচ্ছা স্বতন্ত্র। সার্ব্বভৌম বুঝিতে পাইলেন প্রভু দক্ষিণ-তীর্থ-ভ্রমণের নিমিত্ত দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহাকে বাধা দেওয়া সম্ভবপর নহে। তখন সার্ব্বভৌম তাঁহার মনের একটা অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। প্রিয়জনকে প্রিয়বস্তু প্রদর্শন করার অভিলাষ মানব হৃদয়ের এক স্বাভাবিক বৃত্তি। শ্রীল রামরায়ের কথা তাঁহার মনে হইল।

শ্রীল রামরায় বিষয়কার্য্য-ব্যপদেশে বিদ্যানগর হইতে উড়িষ্যায়

রাজ-দরবারে আগমন করিতেন। তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের অমাত্য ও সুপণ্ডিত। এই সময়ে রাজপণ্ডিত সার্ব্বভৌমমহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। কিন্তু সার্ব্বভৌম তখনও বৈষ্ণবতা জানেন না, বৈষ্ণবের ভজনসাধন বুঝেন না, বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা তাঁহার তখনও অজ্ঞাত। তিনি রামরায়ের পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধি-প্রতিভায় যথেষ্ট আনন্দিত হইতেন কিন্তু বৈষ্ণব ভাব ও বৈষ্ণবাচার দেখিয়া উপহাস করিতেন। দার্শনিক-আচার্য্য সার্ব্বভৌম অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেমের ভাবলহরী তখনও ধারণায় আনিতে পারেন নাই। সুতরাং রাম-রায়ের ভাব, বেশ ও ভজনাদির উচ্চ তত্ত্ব তাঁহার নিকট কেমন-কেমন বোধ হইত, তাই তিনি উপহাস করিতেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপানুগ্রহে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভক্তির উদয় হওয়ায় তিনি রামরায়ের ভাব ও ভজন বুঝিতে পাইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, শ্রীল রামরায় ভজনের উচ্চতম তত্ত্বের অধিকারী।

প্রভুর দক্ষিণ তীর্থ যাত্রার সময়ে শ্রীল সার্ব্বভৌমের হৃদয়ে শ্রীল রামরায়ের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "প্রভো, আপনার বিরহ সহ্য করা সহজ হইবে না, ইহা অপেক্ষা পুত্রশোকও সহনীয়। যদি নিতান্তই আমাদের এই আনন্দ মহামহোৎসব তুলিয়া দিয়া আপনি দক্ষিণ-ভ্রমণে যাত্রা করেন, তবে আমার একটী নিবেদন শুনিতে হইবে। আপনি গোদাবরীতটবর্ত্তি বিদ্যানগরনিবাসী শ্রীল রামরায়কে একবার শুভদর্শন-দানে অনুগৃহীত করিবেন। তাঁহার ন্যায় রসিক, প্রেমিক এবং প্রেমভজনের প্রকৃত অধিকারী, আমি আর কোথাও দেখি নাই। তিনি আপনার সঙ্গলাভের উপযুক্ত। দয়া করিয়া তাঁহাকে কৃপাদর্শন দান করিবেন, তাঁহাকে বিষয়ী মনে করিয়া উপেক্ষা করিবেন না; ইহাই আমার নিবেদন"; যথা শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গে :—

কথং মমাভূন্নহি পুত্রশোকঃ কথং মমাভূন্নহি দেহপাতঃ।
বিলোক্য যুষ্মৎপদপদ্মযুগ্মং সোঢ়ুং ন শক্তোঽস্মি ভবদ্বিয়োগম্॥
যত্র ক গন্তাসি পথা নু কেন কথং পথক্লেশসহোঽথভাবী।
যস্তেব গন্তাসি তদা কৃপালো গোদাবরীতীরভুবং সমীয়াঃ॥
তত্রাস্তি কশ্চিৎ পরমো মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজমত্তভৃঙ্গঃ।
নোপাজিহীথা বিষয়ীতিরামানন্দং ভবানন্দতনূজরত্নম্॥

অর্থাৎ প্রভো, আমার পুত্রশোক কেন না হইল, আমার দেহপাতই বা কেন না হইল, আপনার পাদপদ্ম-দর্শন-বিরহ আমার পক্ষে একান্তই দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। আপনি কোন্ পথে যাইবেন, কিরূপেই বা পথের ক্লেশ সহ্য করিবেন, যদি নিশ্চয়ই গমন করেন, তবে আমার নিবেদন এই, হে কৃপাসিন্ধো, গোদাবরী তীরভূমিনিবাসী শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের মত্তভৃঙ্গ ভবানন্দরায়ের পুত্র মহাত্মা রামানন্দরায়কে দর্শন দিয়া যাইবেন বিষয়ী মনে করিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন না।”

শ্রীচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস ইহার তাৎপর্য্যানুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন :—

শুনিয়া সার্ব্বভৌম হইল অত্যন্ত কাতর।
চরণ ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর॥
বহুজন্মের পুণ্যফলে পাইনু তোমাসঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোরে করিলেন ভঙ্গ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি, পুত্র মরি যায়।
তাহা নাহি গণি, বিচ্ছেদ সহন না হয়॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিন কত রহ হেরি তোমার চরণ॥

ভট্টাচার্য্যের এইরূপ আর্ত্তি শুনিয়া প্রভু কয়েক দিনের জন্য যাত্রা

স্থগিত রাখিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প অবিচলিত রহিল। তিনি আবার যাত্রা করার জন্য উদ্যত হইলেন, সার্ব্বভৌম এবার আর বাধা না দিয়া প্রভুর চরণে মনের একটা বাসনা জানাইলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে॥
রামানন্দরায় আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহ বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুঁহের তিনি সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তার না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তার তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ত্ব॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা।

শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে পূর্ব্বে শ্রীল রামরায়কে উপহাস করিতেন, তাহা সম্ভবতঃ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত নাটকে সার্ব্বভৌম, রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট বলিতেছেন :—

"মহারাজ, নখলু সহজবৈষ্ণবো ভবতি। পূর্ব্বমস্মাকমুপহাসপাত্রমাসীৎ, সংপ্রতি ভগবদনুগ্রহে ব্যক্তে তন্মহিমজ্ঞতা নো জাতা।"

অর্থাৎ মহারাজ, শ্রীল রামানন্দ সহজ বৈষ্ণব। আমরা তো ইহার মহিমা জানিতাম না, তাই ইনি ইতঃপূর্ব্বে আমাদের উপহাসের পাত্র ছিলেন, এখন শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-সঞ্চারে আমরা ইহার মহিমা জানিতে পারিয়াছি।" সহৃদয় সার্ব্বভৌম তাই স্পষ্টরূপে বলিয়া দিলেন "রামরায়ের ন্যায় রসিকভক্ত জগতে আর দ্বিতীয় নাই।"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল রামরায়কে দর্শন দান করিয়া এই উক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

প্রভু কহে তুমি মহা ভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন॥
অন্যের কি কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥

* * * *

প্রভু কহে আইলাম শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণ কথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন॥
যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-জ্ঞানে তুমি সীমা॥

প্রভু ফিরিয়া আসিয়াও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট রামরায়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন "দক্ষিণপথে যে সকল বৈষ্ণব দর্শন লাভ করিলাম, তাঁহাদের মধ্যে এক রামানন্দ রায়ের নামই উল্লেখ যোগ্য। তিনি অত্যন্ত আনন্দদান করিয়াছেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।"
ভট্ট কহে "এই লাগি মিলিতে কহিল॥"

এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে শ্রীল রামরায় সহ মহাপ্রভুর মিলনে শ্রীল সার্ব্বভৌমই ঘটক বা নিমিত্ত-কারণ এবং শ্রীল রামানন্দ অসাধারণ মহাপুরুষ।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পুনর্ম্মিলন ও নীলাচলে আগমন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল রামরায়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অভিলষিত তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন, দেখিতে দেখিতে প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত হইল, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তথাপি নীলাচলে প্রত্যাগত হইলেন না। শ্রীল রামরায় তাঁহার আশাপথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দিনযামিনী ব্যাকুল ভাবে যাপন করিতে লাগিলেন, প্রভু কোথায় কি ভাবে ভ্রমণ করিতেছেন তিনি তাহার কোনও সংবাদ পাইলেন না। শ্রীল রামরায়ের উৎকণ্ঠা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এক দিবস সহসা তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল, বিরহবিষাদে অন্ধকার হৃদয়ে সহসা যেন আশার আলোকরেখা প্রতিভাত হইল। শ্রীল রামরায়ের মনে হইল, প্রভু তাঁহার আঁধার গৃহ আলোকিত করিবার জন্য, গোদাবরীতট পবিত্র করার জন্য, আবার বুঝি এদিকে পদার্পণ করিতেছেন। আঁধার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হইবার পূর্ব্বক্ষণে গগনপটে যেমন তাহার আলোকরেখা বিকীর্ণ হয়, ঠিক সেই প্রকার শ্রীশ্রীগৌর-সুধাকরের জ্যোতির্ম্ময়ী শ্রীমূর্ত্তির কিরণাবলী সম্পাতে শ্রীল রামরায়ের হৃদয় যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি চারিদিকেই শুভ লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। শ্রীল রামানন্দ যেন নিশ্চয়রূপ বুঝিতে পাই-

লেন যে প্রভু আবার বিস্তানগরে আসিতেছেন। কার্য্যতঃও তাহাই ঘটিল। প্রভু একদিবস বিস্তানগরে পদার্পণ করিলেন, প্রভুর শুভাগমে বিস্তানগরে সহসা আনন্দ-কোলাহলের তুমুল রব পরিব্যাপ্ত হইল, বিস্তা-নগরের অধিবাসিবৃন্দ আবার এই প্রেমময় মহাপ্রভু পীযূষবর্ষিণী শ্রীমূর্ত্তি-মাধুর্য্যে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। দক্ষিণ ভ্রমণের পথশ্রমে যদিও লৌকিক নিয়মে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ পরিমৃদিত কমলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল, কিন্তু শ্রীমূর্ত্তির সেই নয়নাভিরাম মাধুর্য্য সকলের নিকটেই প্রতিমূহূর্ত্তে নবনবায়মান ভাবে পরিলক্ষিত হইলেন। শ্রীল রামরায় অনেক দিনের পরে আবার তাঁহার হৃদয়বল্লভকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন, প্রভুর শ্রীচরণের সমীপবর্ত্তী হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় ঢলিয়া পড়িলেন। প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর অনেক দিনের পরে প্রিয়তম ভক্তকে দেখিয়া বিবশপ্রায় হইলেন, বহু ক্লেশে তিনি আত্মভাব-সংবরণ করিয়া শ্রীল রামরায়কে ধরিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন। তখন প্রেমানন্দে উভয়েই বিবশ, উভয়েই আত্মহারা এবং উভয়ের হৃদয়নিহিত প্রেমসুধা যেন হৃদয় হইতে উছলিয়া উঠিয়া নয়নপথে অবিরাম ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেহ বিবশ, কণ্ঠ স্তম্ভিত ; বাক্যে মনের ভাব প্রকাশিত হইল না, কিন্তু ঝলকে ঝলকে নয়ন-সলিল উভয়ের নয়নযুগল হইতে শত-ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীচরিতামৃতে ইহার এইরূপ বর্ণনা আছে—

সপ্ত গোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিস্তানগর॥
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন॥
দণ্ডবৎ হৈঞা পড়ে চরণ ধরিয়া।

আলিঙ্গন করে প্রভু তাঁরে উঠাইয়া॥
দুইজনে প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন।
প্রেমাবেশে শিথিল হইল দুইজনের মন॥

এইরূপ অনেক সময় অতিবাহিত হইলে পর উভয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন, প্রভু বিশ্রামান্তে শ্রীরামরায়ের নিকট দক্ষিণ ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। শ্রীল রামরায় হর্ষোৎফুল্ললোচনে প্রভুর শ্রীমুখমণ্ডলের দিকে একতানে দৃষ্টি করিয়া যেন তাঁহার বচনামৃত পানে বিভোর হইলেন।

এই সময়ে প্রভু তাঁহার ঝুলি হইতে দুইখানি গ্রন্থ বাহির করিয়া বলিলেন, "রামানন্দ, দক্ষিণ তীর্থে ভ্রমিতে ভ্রমিতে যে দুইটী অপূর্ব্ব রত্ন পাইয়াছি, তোমাকে তাহা দেখাইব। এই যে গ্রন্থখানি দেখিতেছ ইহার নাম—ব্রহ্মসংহিতা, আর এইখানির নাম—"শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত।" প্রভু যেন শ্রীগ্রন্থদ্বয়ের নাম বলিতেই প্রেমানন্দে উছলিয়া উঠিলেন। তিনি প্রেমভরে বলিতে লাগিলেন "রামানন্দ তোমার নিকট যে সকল সিদ্ধান্ত শুনিয়াছি এই দুইখানি পুঁথিতেও সেই সকল সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য পাইয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।" তখন শ্রীল রামরায় পুঁথির ডুরি খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, আর এক একটী পদ্য পাঠ করিয়া উভয়ে তাহার রসাস্বাদনে বিভোর হইতে লাগিলেন। দণ্ডের পর দণ্ড চলিয়া যাইতে লাগিল, প্রভু ও রামরায় কৃষ্ণরসসুধার্ণবে আত্মহারা ভাবে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। শ্রীল রামরায় এই দুই গ্রন্থ আর কখনও দেখেন নাই। প্রভুর এই অতি সাধের গ্রন্থ দুইখানি শ্রীল রামরায় নকল করিয়া লইলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এবারও প্রায় সপ্তাহ কাল শ্রীল রামরায়ের ভবনে অবস্থান করিয়া সুমধুর কৃষ্ণকথায় দিনযামিনী অতিবাহিত করিলেন। প্রভু বলিলেন "রামানন্দ প্রায় দুই বৎসর হইল, শ্রীনীলাচলচন্দ্রের দর্শনানন্দ

লাভে বঞ্চিত আছি, এখন বিদায় দাও, একবার নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করি, আর তুমিই বা নীলাচলে কখন যাইবে?”

রামরায় বলিলেন “প্রভো, যখন আপনার কৃপা হইয়াছে, তখন আমি ছায়ার স্থায় শ্রীচরণের সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, ইহার তুল্য সৌভাগ্য আর আমার কি হইতে পারে? আপনি যখন শ্রীমুখে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমার এ বিষয়ে আর অপেক্ষা কি? তথাপি লৌকিকভাবে মহারাজ শ্রীল প্রতাপরুদ্রদেব মহোদয়কে আপনার কৃপানুমতির কথা জানাইয়াছিলাম। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে আমার প্রর্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। আমি এদিকের বন্দোবস্ত করিয়া নীলাচলে যাত্রা কবার জন্ম প্রস্তুত হইতে ছিলাম, আর প্রভুর পুনর্দ্দর্শনের আশায় উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতেছিলাম। প্রভুর শুভাগমনে ও কৃপাদেশে কৃতার্থ হইলাম। এই আমি প্রস্তুত হইতেছি। যথা শ্রীচৈতন্মচরিতামৃতে:—

রামানন্দ কহে গোসাঞী তোমার আজ্ঞা পাঞা।
রাজাকে লিখিলুঁ আমি বিনতি করিঞা॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচলে যাইতে।
চলিবারে সজ্জা আমি লাগিয়াছি করিতে।

শ্রীল রামরায় সুবিস্তৃত রাজ্যের শাসনকর্ত্তা বিপুল বৈভবের অধীশ্বর। এই সকল তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া তিনি সহসা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে নীলাচল-অভিমুখে যাত্রা করিতে পারিতেন। কিন্তু পরম কারুণিক মহাপ্রভুর লীলায় এই এক নিয়ম পরিলক্ষিত হয়, যে, প্রভুর একান্ত ভক্তগণের মধ্যে সকলেই নিজ নিজ অধিকার ও কর্ত্তব্যতার পূর্ণ সামঞ্জস্ত রাখিয়া কার্য্য করিতেন। রামরায় মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী, সুতরাং প্রভুর আজ্ঞা পাইয়াও তিনি তাঁহার পার্থিব প্রভুর আজ্ঞার অপেক্ষা রাখিলেন। ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের এই এক সুন্দর সামঞ্জস্ত। আবার এদিকে রামরায়ের হৃদে

যে সকল গুরুতর কার্য্যভার অর্পিত আছে, তিনি যদি সে সকল কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া না যান, তবে তাঁহাকে কর্ত্তব্যতারূপ গুরুতর দায়িত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়, সুতরাং প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে নীলাচলে গমন করা নিরতিশয় সুখকর হইলেও শ্রীল রামরায় কর্ত্তব্যতার দায়ে এই রূপ সুখাস্বাদ-বাসনা পরিহার করিয়া বলিলেন, "আমি নীলাচলে যাওয়ার উদ্যোগে আছি।" কিন্তু প্রভু রামরায়কে আরও একটু পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন "রামরায়, আমি তোমার জন্যই পুনরায় এ পথে আসিয়াছি, আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না, তুমি আমার সঙ্গে চল," যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে :—

প্রভু কহে এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।
তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন॥

কিন্তু রামরায় ইহাতেও পার্থিব কর্ত্তব্যতা হইতে বিচলিত হইলেন না। রামরায় বলিলেন—প্রভো আপনি অগ্রসর হউন, আমি এথাকার জঞ্জালগুলির সমাধা করিয়া দশদিন পরেই শ্রীচরণ নিকটে উপস্থিত হই-তেছি। রাজ্য-শাসনের জন্য এখানে হাতী ঘোড়া ও সৈন্যাদি অনেক ব্যাপার আছে। এই সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াই চরণ নিকটে পঁহুছিতেছি।"

শ্রীল রামরায় উড়িষ্যার মহারাজের মন্ত্রী। রাজমন্ত্রীকে কোথাও যাইতে হইলে তাঁহার পদোচিত আসবাব সহিতেই যাইতে হয়, নচেৎ তাঁহার প্রভুর সম্মান বিনষ্ট হয়। সুতরাং নীলাচলে যাইতে হইলে রামরায়কে হাতীঘোড়া সৈন্যসামন্ত লইয়া না গেলে উড়িষ্যার মহা-রাজের সম্মানের পক্ষে হানি হয়, বৈষ্ণব কখনও কাহার মানের হানি করিবেন না, ইহাও প্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞা। সম্ভবতঃ শ্রীল রামরায় এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া কয়েক দিন পরে যাত্রা করার জন্যই মহাপ্রভুর

নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। বৈষ্ণবচিত্তপরীক্ষক মহাপ্রভু "তথাস্তু" বলিয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র আবার সহসা নীলাচলে উদিত হইলেন। নীলাচলের ভক্তগণ দুইবৎসর পরে আবার সেই প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, পরম প্রিয়তম, প্রেমের সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহকে প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘ-কালের বিরহতাপ এক মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের শুভ প্রত্যা-গমনে নীলাচল যেন সহসা এক আনন্দময়ী উষার তরুণ-অরুণ-আনন্দ-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া জাগিয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু পুরুষোত্তমে প্রত্যাগত হইলে পুরুষোত্তমবাসী ভক্তগণ তাঁহার সন্দর্শন-লাভের জন্য তৃষিত চাতকের ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইলেন। শ্রীল সার্ব্বভৌম ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রভুর পরিচিত করিয়া দিলেন। এই সময়ে রামরায় মহাশয়ের পিতা তাঁহার অপর চারি পুত্রসহ আসিয়া মহা-প্রভুর শ্রীচরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পড়িলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন "ইনি শ্রীল ভবানন্দ রায়—আপনার প্রিয়তম রামরায়ের পিতা। আর এই চারিজন ইঁহার পুত্র। ইঁহার পাঁচ সহোদর।" রামরায় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

হেনকালে আইলা তথা ভবানন্দ রায়।
চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়॥
সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ।
ইঁহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ॥

মহাপ্রভু শ্রীল সার্ব্বভৌমের মুখে শ্রীল ভবানন্দের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন :—

রামানন্দ হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহিলে না হয়॥

সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপুত্র পাণ্ডব তোমার পাঁচ পুত্র মহামতি॥

দ্বাপর যুগ-লীলায় ভবানন্দ যে পাণ্ডুরাজা ছিলেন মহাপ্রভু এই উক্তি দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিলেন।

বৃদ্ধ শ্রীল ভবানন্দ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মুখে এই প্রশংসাবাক্য শুনিয়া দীন-বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি শূদ্র, বিষয়ী ও জীবাধম, আপনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্, আপনি যে জীবাধমকে স্পর্শ কবিলেন, ইহা আপনাবই দয়া। আমার বাড়ীঘর বিষয়-আশয়, ভৃত্য পুত্রাদি সহ আমি আপনাব ঐ পতিত-উদ্ধাবণ রাতুলচরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। আমরা ও আমাদেব যাহা কিছু আছে—সে সকলই আপনার। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

রায় কহে আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ তুমি,—এই ঈশ্বর-লক্ষণ॥
নিজগৃহ বিত্তভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে।
আত্মসমর্পিনু আমি তোমার চরণে॥

ফলতঃ যিনি রামরায়ের ন্যায় পুত্ররত্নের জনক, ইহা তাঁহারই উপযুক্ত বাক্য। রায় ভবানন্দ কেবল এই বাক্য বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি নিজের পুত্র শ্রীমান্ বাণীনাথকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পরিচারকরূপে নিযুক্ত কবিয়া দিয়া বলিলেন :—

এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে॥
আত্মীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যেই হবে ইচ্ছা তোমার, সেই আজ্ঞা দিবে॥

শ্রীল ভবানন্দ রায় মহাশয় বংশানুক্রমে পুরুষোত্তমে অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; ইনি রাজমন্ত্রী সুপণ্ডিত শ্রীরামানন্দের পিতা। বাণীনাথ এই সমৃদ্ধিশালী অতি সম্ভ্রান্ত বংশের আদুরে ছেলে, বাণীনাথের সেবার জন্য হয়ত দুই চারি-

জন পরিচারক ছিল। কিন্তু রায় ভবানন্দ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পরিচর্য্যার জন্য নিজের সেই স্নেহের ধন উৎসর্গ করিয়া দিলেন,—দিয়া বলিলেন "প্রভো, তোমার যখন যাহা মনে হয়, বাণীনাথকে বলিও। রামানন্দকে তুমি কৃপা করিয়া বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তজ্জন্য কোন সঙ্কোচ করিও না। বাণী-নাথকে তোমার চরণসেবার দাসরূপে নিযুক্ত করিয়া দিলাম। তুমি যখন যাহা বলিবে, বাণী শুনামাত্র অমনি সেই কার্য্য করিবে।"

প্রভু বলিলেন, তুমি ত আমার পর নও, যে সঙ্কোচ করিব?" যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রভু কহে কি সঙ্কোচ? নহ তুমি পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশ কিঙ্কর॥

ব্যাপার দেখুন, ভক্তের নিকট প্রভুর আত্মপ্রকাশ কেমন সরলতা-মাখা—কেমন সুস্পষ্ট! কেহ কেহ মনে করেন, সময় বিশেষে মহাপ্রভু নিজকে ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিতেন, সে ভাব অস্বাভাবিক। পাঠক দেখুন, এখানে কোনও অস্বাভাবিকতা নাই। শ্রীল ভবানন্দের সহিত প্রভু সরল ভাবে কথা বলিতে বলিতে প্রকাশ করিলেন :—

"জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর।"

এই উক্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ সন্ন্যাসীর উক্তি নহে,—এই উক্তি সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের। শ্রীল রাম রায়ের পিতা অতি সরল ভক্ত, তাঁহার প্রাণ সরল ভক্তিতে পরিপূর্ণ। প্রভু তাঁহার সহিত ছল বা কোন কথার গোপন করিতে পারেন না। তাই স্পষ্ট কথায় বলিয়া দিলেন "তুমি জন্মে-জন্মেই সবংশে আমার কিঙ্কর। তোমরা আমার নিত্যদাস—প্রতি জন্মেই তোমরা আমার পরিচারক। বাণীনাথ যে কেবল এই জন্মে আমার সেবায় নিযুক্ত হইল তাহা নহে—সে চিরদিনই আমার পরিচারক। সঙ্কোচ করিব কেন? তোমরা কি আমার পর?"

শ্রীল ভবানন্দ প্রাকৃত মানুষ। তাঁহার আভিজাত্য বিজ্ঞা ছিল না; পূর্ব্ব-

জন্মে তিনি কি ছিলেন, তাহা তিনি জানেন না। মহাপ্রভু বুঝাইয়া দিলেন, রায় ভবানন্দ জন্মে-জন্মেই তাঁহার দাসত্ব করিয়া আসিতেছেন। তিনি চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইয়া মহাপ্রভুর শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ভবানন্দ মনে করিয়াছিলেন তিনি বাণীনাথকে বুঝি একটী অতি হিতকর অভিনব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু মহাপ্রভুর কথায় বুঝিলেন তিনি সবংশে তাঁহার পুরাতন ভৃত্য, জন্মে জন্মেই তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, প্রভুরও কোন সঙ্কোচের বিষয় নাই। পুরাতন আজ্ঞাবহ পরিচারকের প্রতি আজ্ঞা করিতে কে কবে সঙ্কোচ করে? বৃদ্ধ ভবানন্দ অপ্রতিভ হইয়া মহাপ্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মহাপ্রভু আরও বলিলেন :—

"দিন পাঁচ সাত ভিতরে আসিবে রামানন্দ।"
তার সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ॥

এই কথা বলিয়া তিনি শ্রীল ভবানন্দ রায়কে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহার পুত্রগণ মহাপ্রভুর চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। ভবানন্দ এইরূপে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ নিকটে বিদায় লইয়া তিন পুত্রসহ গৃহে গমন করিলেন, শ্রীমান্ বাণীনাথকে প্রভু নিকটে রাখিলেন। ইহার কয়েক দিবস পরে শ্রীল রামানন্দ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।* পাঠকগণের মনে হইতে পারে, তিনি সর্ব্বপ্রথমেই সম্ভবতঃ মহা-

* শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে শ্রীল রামরায়ের পুরুষোত্তমে আগমন সম্বন্ধে আর এক প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মর্ম্ম এই যে মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে পৌঁছিয়া কতিপয় দিবস অন্তরে শ্রীল রামরায়কে আনয়ন করার জন্য পুনর্ব্বার বিদ্যানগরে গমন করেন এবং সেখানে চারি মাসকাল অতিবাহিত করিয়া রামরায় সহ হেমন্তকালে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, যথা :—

প্রভু স্তথা [illegible] গতেন গোদাবরীং [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible]

প্রভুর চরণ দর্শন করিয়াছিলেন, কেননা তাঁহার পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি তাহা না করিয়া প্রথমতঃ মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইহার কারণ কি? ইহার একটী কারণ এই যে সুপণ্ডিত শ্রীল রামানন্দ জানিতেন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন। শ্রীগৌরাঙ্গ

হেমন্তকালে তথৈব তেন সমং সমস্তাৎ করুণাং বিচিন্বন্।
সমাববৌ ক্ষেত্রবরং বরীয়ান্, জানাতু কস্তচ্চরিতং বিচিত্রম্॥

১৩ সর্গ ৬০।৬১ শ্লোক

এই বিষয়ে কবিকর্ণপুরের এই বাক্যের সহিত শ্রীচরিতামৃতের মত-বৈষম্য দৃষ্ট হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় শ্রীল কর্ণপুরের গ্রন্থ উত্তমরূপেই পাঠ করিয়াছিলেন, এমন কি তিনি এই মহাকাব্য হইতে অনেক ঘটনা সংগ্রহ করিয়া স্বীয় গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহাপ্রভু যে ভবানন্দকে পাণ্ডুরাজার তুল্য বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাঠক তাহা পাঠ করিয়াছেন। শ্রীল কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যেও ঐ কথার উল্লেখ আছে, যথা :—

অথ শুদ্ধমতি র্মহাশয়ো গুণবান্ সচ্চরিতস্তদা প্রভুঃ।
প্রদদর্শ সুখৌঘভূষিতঃ স ভবানন্দ ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ॥
প্রভুরপ্যতিশুদ্ধমানসং ভুজযুগ্মেন দৃঢ়ং সমাশ্লিষৎ।
অয়ি পাণ্ডুসমোঽসি ভাগ্যবানিতিবাচং মধুরং জগাদ চ॥
মুদ্রুর্মহাত্মা পরমপ্রিয়োঽসৌ শান্তঃ সুহৃৎ সর্ব্বজনস্য শশ্বৎ।
চৈতন্যচন্দ্রাঙ্ঘ্রিরতশ্চবাণীনাথ স্তমেব প্রতিসেবমানঃ॥

১৩৩।১৩৪।১৩৬ শ্লোক।

সুতরাং মহাকাব্যলিখিত বিবরণ শ্রীচরিতামৃতের অবিদিত ছিল না। সম্ভবতঃ শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা-অবলম্বনেই শ্রীল কবিরাজের উক্ত বিবরণ লিখিত হইয়া থাকিবে এবং শ্রীল কবিরাজের লিখিত বিবরণই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও ঠিক বলিয়া গৃহীত হইতেছে। রায় রায়ের সহিত মহাপ্রভুর প্রথম মিলনকাল সম্বন্ধেও এই মহাকাব্যের বিবরণ বিভিন্ন। এই গ্রন্থে লিখিত আছে মহাপ্রভু দক্ষিণ তীর্থ ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে রামানন্দের সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা শ্রীচরিতামৃতে লিখিত বিবরণেরই পোষক।

স্বয়ং ভগবান্ ও অন্তর্য্যামী। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং তাঁহার প্রতি যে রামরায়ের একান্ত ভক্তি আছে, ইহা তাঁহার সুবিদিত অপিচ প্রভু জানেন যে তিনিই রামরায়ের হৃদয়ের একমাত্র অধীশ্বর এবং রামরায় তাঁহাকে ভিন্ন অপর কাহাকে জানেন না; এই অবস্থায় রাজদর্শনের পরে ভগবদ্দর্শন করিলে তাহাতে শ্রীভগবান্ অসন্তুষ্ট হইবেন না, কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর প্রতি কি পরিমাণে বিশ্বাসী, রামরায় তখনও তাহা উত্তমরূপ জানিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিলে রাজার মনে দুঃখের কারণ হয়, ইহাও তাঁহার হয় ত এক চিন্তার বিষয় হইতে পারে, অপরন্তু তাঁহার সঙ্গে তখন রাজকীয় ঠাঠ বর্ত্তমান ছিল এবং সেই ঠাঠেই তাঁহাকে রাজধানীতে পৌছিতে হইয়াছিল, সেই ভাবে ভগবদ্দর্শন অসঙ্গত। সর্ব্বোপরি কথা এই যে শ্রীল রামরায় লোক-ব্যবহারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন; যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে শ্রীরাম রায় বলিতেছেন :—

"মহারাজ, দুস্তজো হি ব্যবহার-মার্গঃ যতঃ———

তমপি পরমদীনোদ্ধারিকারণ্যসিন্ধুং

শিব শিব পরিহায় ত্বদ্ভয়েরাগতোঽহম্।"

অর্থাৎ শ্রীল রামরায় কোন সময়ে প্রতাপরুদ্র দেবকে বলিতেছেন, "মহারাজ, আমি ভদ্রক পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে ছাড়িয়া আসিবার সময়ে প্রাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কেবল আপনার ভয়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। লোকব্যবহার নিশ্চয়ই দুস্তজ্য।" শ্রীল রামানন্দ রায় প্রথমে গজপতি প্রতাপরুদ্রের রাজধানীতে গমন করিয়া তৎপরে মহারাজের সমভিব্যাহারে পুরুষোত্তমে আগমন করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই ঘটনা নিম্নলিখিত ভাবে লিখিত হইয়াছে :—

হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা॥

রামানন্দ রায় আইল গজপতি সঙ্গে।

প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে॥

রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজন প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন॥
রায় সনে প্রভুর দেখি স্নেহ-ব্যবহার।
সব ভক্তগণ মনে হৈল চমৎকার॥

রামানন্দ প্রতাপরুদ্রকে রাজধানী হইতে পুরুষোত্তমে লইয়া আসিলেন এবং প্রথমে মহাপ্রভুর নিকটে একাকী গমন করিলেন।

রামরায় প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রথম দেখা করিয়াছিলেন কেন, তাহার আরও একটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাহা এই যে তিনি রাজার নিকট কার্য্যত্যাগের অনুমতি লইয়া একবারেই অবকাশ গ্রহণ করিয়া প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিবেন, ইহাও তাঁহার মনোগত ভাব ছিল। প্রভুর কৃপায় কার্য্যতঃও শ্রীল রামানন্দ রায় এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াই আসিয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

রায় কহে তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল॥
আমি কহিনুঁ আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্য চরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয়॥
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈল।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল॥
তোমার নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশ।
মোর হাত ধরি কহে পীরিতি-বিশেষ॥
"তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাহ সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ প্রভুর চরণ॥"

রামরায় মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কার্য্য করিয়া যে জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন, সে জায়গীর বজায় রহিল। ভরণপোষণ প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্যের জন্য তাঁহার যাহাতে কোন চিন্তা না থাকে, মহারাজ এই নিমিত্ত

বলিয়া দিলেন "তোমাকে আমি রাজকার্য্য হইতে অবসর দিলাম, কিন্তু তোমাকে যে জমিদারী দিয়াছিলাম, তাহা তোমারই থাকিল, তুমি নিশ্চিন্ত চিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণসেবা কর।" ধন্য মহারাজ প্রতাপরুদ্র!

কিন্তু প্রভুর লীলা বুঝা ভার। এমন ভক্ত প্রতাপরুদ্রকেও প্রভু বিষয়ী মনে করিয়া দর্শনদানে কার্পণ্য প্রকাশ করিতেছিলেন, আর তদ্দারা প্রতাপরুদ্রের হৃদয়ে অসীম আর্ত্তি ও প্রগাঢ়তর অনুরাগের উদ্ভব করিতেছিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র স্বয়ং মহারাজ হইয়াও তাঁহার কর্ম্মচারীর ভাগ্য দেখিয়া আত্মধিক্কার করিয়া বলিলেন :—

"আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে তার সফল জীবনে॥
পরম কৃপালু তিঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবে দরশন॥"

রামানন্দের নিকটে প্রতাপরুদ্র তাঁহার দুরদৃষ্টের বিষয় বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর সন্দর্শন-লাভের জন্য যে তাঁহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা, তাহাও রামরায়কে বলিয়া দিয়াছিলেন। রামরায় প্রতাপরুদ্রের সরলতামাখা কথা শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন মহাপ্রভুতে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ, তাই তিনি বলিলেন :—

যে তাঁর প্রেম আর্ত্তি দেখিনু তোমাতে।
তার একলেশ প্রীতি নাহিক আমাতে॥

ইহার অর্থ এই যে "প্রভো আপনি প্রতাপরুদ্রকে বিষয়ী মনে করিয়া পরিহার করিতেছেন, কিন্তু আপনাতে তাঁহার যেমন প্রগাঢ় অনুরাগ, আমাতে তাহার লেশাভাসও নাই। যদি আমি-বিষয়ী আপনার কৃপার পাত্র হইলাম, তবে প্রতাপরুদ্রকে বঞ্চনা করিবেন কেন?" প্রভু চতুর্চূড়ামণি, এক কথায় ইহার সর্ব্বতোভাবে উত্তর করিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

প্রভু কহেন তুমি কৃষ্ণ-ভকত প্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্॥
তোমাতে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবেন অঙ্গীকার॥

ফলতঃ রাজমন্ত্রী রামরায় মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে যেমন নিশ্চিন্তভাবে প্রভুর চরণ-ভজনের নিমিত্ত অবসর প্রদান করিলেন, রামরায়ও ইহার প্রতিদানে প্রতাপরুদ্রকে গোলোক-পতির প্রীতিদান করিতে পরম সহায় হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

——(:*:)——

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের উদ্ধার।

ভক্তের অনুগ্রহ না হইলে বিষয়ীর পক্ষে ভগবানের অনুগ্রহলাভ দুর্লভ। যাঁহারা শ্রীভগবৎকৃপা-লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়েন, তাঁহাদিগকে শ্রীভগবান্ ভক্তরূপ গুরু দ্বারা কৃপা করেন। উড়িষ্যার রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর সন্দর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন, কিন্তু প্রভু বিষয়ীর সহিত আলাপ সম্ভাষণ করেন না। তিনি বলেন :—

"আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।"

অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও বিষয়ীদের আকার দেখিয়াই ভয় করিতে হয়। প্রভু অপর কোন বিষয়ীকে এরূপভাবে নিগৃহীত করিতেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর সন্দর্শনপ্রার্থী হইলে তিনি এই বচনটী বলিয়া প্রস্তাবকারীকে নীরব করিলেন।

এদিকে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের ব্যাকুলতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট এবং শ্রীল রামরায়ের নিকট স্বীয় হৃদয়ের আর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন। এই উভয় মহাত্মাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকে মহারাজের সাক্ষাৎকার-লাভের নিমিত্ত অনুনয়-বিনয়পূর্ণ বাক্যে প্রতাপরুদ্রের ভক্তিমাখা উৎকণ্ঠার কথা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীল রামরায়ের বাক্যবিন্যাসে মহাপ্রভু আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তুমি কৃষ্ণভক্ত, তোমাতে যখন রাজার এইরূপ প্রীতি হইয়াছে, তখন শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তাঁহাকে অঙ্গীকার করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ, ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

অর্থাৎ হে পার্থ যাহারা কেবল আমার ভক্ত, তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে, আমার ভক্তের ভক্তই আমার শ্রেষ্ঠতম ভক্ত।

ইহাতে শ্রীল রামরায় বুঝিলেন প্রভুর কৃপালাভে এখন সম্ভবতঃ আর অধিক বিলম্ব হইবে না। ফলতঃ শ্রীল রামরায়ের বাক্যে প্রভুর মন দ্রবীভূত হইল, তিনি প্রকারান্তরে প্রতাপরুদ্রকে অঙ্গীকার করিলেন। শ্রীল সার্ব্বভৌম অন্য সময়ে এই কথা বলিয়াই রাজাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

রায় রামানন্দ আজি তোমার প্রেমগুণ।
প্রভু আগে কহিল, তাহে ফিরিয়াছে মন॥

শ্রীল রামরায় পরম ভক্ত, প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু। অতি অল্প কথাতে তিনি তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। প্রতাপরুদ্রদেবের সময় ফিরিল। অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বলিলেন, "রামরায়, শ্রীশ্রীকমললোচন জগন্নাথদেবের দর্শন করিয়া আসিয়াছ তো?" রামরায় বলিলেন, "এই এখনি শ্রীমন্দিরে যাইতেছি।" প্রভু ইহাতে যেন একটু অপ্রীতিচিহ্ন

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "একি করেছ, শ্রীভগবান্‌কে দর্শন না করিয়া আগে এখানে এসেছ কেন? এরূপ কার্য্যও কি করিতে আছে?" ভক্তপ্রবর উত্তর করিলেন, "প্রভো আমার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, এই দেহ আমার অধীন নয়। চরণ ইহার রথ, সারথী হৃদয়। জীব ইহার রথী। হৃদয়ের প্রণোদনায় ও পরিচালনে এই চরণ জীবকে যেথানে বহন করিয়া লয়, জীব সেইখানেই উপনীত হয়। জগন্নাথ দর্শন করা যে আগে কর্ত্তব্য, হৃদয় সে বিচার না করিয়া আমাকে এখানে আনিয়া হাজীর করিল, আমার দোষ কি? আমি কি করিব, প্রভো?" যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

রায় কহে চরণ রথ—হৃদয় সারথী।
যাহা লঞে যায় তথা যায় জীব রথী॥
আমি কি করিব মন ইহা লঞা আইল।
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল॥

প্রভু বলিলেন "যাও, আর কথায় কাজ নাই, শীঘ্র গিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন কর এবং আপন গৃহে যাইয়া আত্মীয়স্বগণের সহিত দেখা কর।"

রামরায় প্রভুর শ্রীচরণে প্রণত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেব সন্দর্শন করার নিমিত্ত প্রভুর চরণান্তিক হইতে বিদায় লইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞাক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিলেন। রামরায়ের প্রেমভক্তি অসাধারণ। তাঁহার বিবেচনায় শ্রীজগন্নাথদেবে ও শ্রীগৌরাঙ্গে কোন বিভিন্নতা নাই। তাঁহার জ্ঞানে যিনি শ্রীজগন্নাথরূপ অচলব্রহ্ম, তিনিই আবার শ্রীগৌরাঙ্গরূপ সচলব্রহ্ম। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গরূপ সচলব্রহ্মেই তাঁহার হৃদয়ের প্রবল রতি; সুতরাং হৃদয় তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণাভিমুখে আনিয়া উপনীত করিয়া দিল। রামরায়ের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রীতি প্রকৃতই অদ্ভুত। তাঁহার প্রেমভক্তি-রীতি অন্যের দুর্জ্ঞেয়, তাই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

"রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জন?"

এই দিন হইতে রামরায় প্রভুর সহচররূপে ছায়ার স্থায় তাঁহার শ্রীচরণ-সমীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এদিকে মহাপ্রভুর সন্দর্শন-লাভের জন্ত রাজার উৎকণ্ঠা দিন দিন অধিকতর বাড়িতে লাগিল। প্রতাপরুদ্র একদিন রামরায়কে ডাকিয়া বলিলেন, "রামরায়, তোমার প্রতি মহাপ্রভুর মহাকৃপা। আমি যাহাতে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনলাভে সমর্থ হই, তোমাকে অবশ্যই তাহা করিতে হইবে। তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিবে, এ ভিখারী একটীবার তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনের নিমিত্ত একান্ত লালায়িত।"

প্রতাপরুদ্র কটক হইতে আবার রামরায়কে লইয়া পুরুষোত্তমে আসিলেন। তিনি স্বীয় প্রাসাদে রহিলেন, রামরায় মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া আবার প্রতাপরুদ্রের কথা তুলিলেন। শ্রীল রামরায় রাজ-মন্ত্রী, ব্যবহার শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট নিপুণতা, দেশকালপাত্রভেদে কি প্রকারে বাক্যবিন্তাস করিতে হয়, কি প্রকার বাক্‌কৌশলে কার্য্যোদ্ধার হয়,—এই সকল বিষয়ে তিনি যথেষ্ট দক্ষ। রামরায় মহাপ্রভুর চরণাস্তিকে শ্রীল প্রতাপরুদ্রদেবের নিমিত্ত এমন ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন যে তাহাতে মহাপ্রভুর মন হইতে পূর্ব্বধারণা অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইল। ফলতঃ তিনি যে কঠোর সঙ্কল্পের কথা সার্ব্বভৌম মহোদয়কে জানাইয়াছিলেন, (অর্থাৎ রাজার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করার কথা পুনর্ব্বার কেহ বলিলে মহাপ্রভু পুরুষোত্তম হইতে চলিয়া যাইবেন) সেই সঙ্কল্প কিয়ৎ পরিমাণে শ্লথ হইল। ইতঃপূর্ব্বে অন্যান্য ভক্তগণ, এমন কি স্বয়ং প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দও প্রতাপরুদ্রের প্রতি করুণা করার জন্ত মহাপ্রভুর মন কোমল করিয়াছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর একখানি বহির্ব্বাস আনিয়া লইয়া প্রতাপরুদ্রকে উহা আশীর্ব্বাদস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। অতঃপর ব্যবহারনিপুণ রায় রামানন্দ যখন ভক্তিশাস্ত্র যুক্তিতে

এই প্রস্তাব তুলিলেন, তখন ধীরে ধীরে মহাপ্রভুর মন দ্রবীভূত হইতে লাগিল ; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহার নিপুণ।
রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় মহাপ্রভুর মন॥

রামানন্দ প্রভুর পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "রাজার প্রতি আপনাকে দয়া করিতেই হইবে, প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা করিয়া আপনাকে শ্রীচরণধূলি অবশ্যই দিতে হইবে। প্রতাপরুদ্র "রাজা" হইলেও আপনার চরণে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি।" ভক্তের আবদারে এবং বচনমাধুর্য্যে মহাপ্রভুর মন টলিল। স্নেহময়ের হৃদয়ে স্নেহের উৎস উৎসারিত হইল। প্রভু লোক-ব্যবহারের কথা তুলিয়া বলিলেন "রামরায়, আমি সন্ন্যাসী, রাজার সহিত কি করিয়া দেখা করিতে পারি? জান ত, সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন নিষিদ্ধ। রাজার সহিত মিলনে সন্ন্যাসীর দুই কুলই নষ্ট হইয়া যায়। পরকালের কথা দূরে রহুক, ইহজগতেই এইরূপ কার্য্যের জন্য লোক-সমাজে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।" রামানন্দ এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "প্রভো, আপনি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের কথা তুলিতেছেন। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ তো মানুষের নিমিত্ত। ভগবন্, আপনি বিধিনিষেধের অতীত। আপনি স্বতন্ত্র, আপনার আবার কি ভয়? যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

প্রভু কহে "রামানন্দ কহ বিচারিঞা।
রাজারে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসি হইঞা?
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই কুল নাশ।
পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস॥"
রামানন্দ কহে "তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয়? তুমি নহ পরতন্ত্র?

শ্রীনিত্যানন্দ ও দামোদর পণ্ডিতের সহিতও প্রভুর এইরূপ কথোপ-কথন হইয়াছিল, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

তোমা সবার ইচ্ছা এই আমাকে লইঞা।
রাজারে মিলহ ইহোঁ কটকেতে গিয়া।
পরমার্থ থাকুক, লোকে করিবে নিন্দন।
লোক রহু, দামোদর করিবে ভর্ৎসন।
তোমা সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি তবে মিলি তাঁরে॥

মহাপ্রভুর বচনভঙ্গী শুনিয়া সুচতুর দামোদর স্পষ্টরূপে তাহার উত্তর দিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর॥
আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব তোমায় বিধি দিব?
আপনি মিলিবে তাঁরে, তাহাও দেখিব!

ভক্ত দামোদরের নিকট প্রভুর বাক্‌চাতুর্য্য পরাস্ত হইল। যাহার যেরূপ ভাব, তাহার সহিত তিনি সেইরূপ বাক্য ব্যবহার করিতেন। দামোদরের শেষের কথাটীর প্রতি লক্ষ্য করুন। দামোদর বলিতেছেন, "এখন ইহারা সকলে বলিতেছেন, আর তুমি হঠ করিতেছ, নানাপ্রকার আপত্তি তুলিতেছ, আমার প্রতিও কটাক্ষ করিতেছ। আমি যদি তোমায় বিধি দিই, তবে তুমি প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিবে, নচেৎ দিবে না! এ সকল বাক্‌চাতুর্য্য আমি যথেষ্টই বুঝিতে পারি। এখন প্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃতির বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া আমার কথাই বড় বলিয়া কটাক্ষ করিতেছ। এমন সময় আসিবে, যখন কাহারও কিছু বলিতে হইবে না, তুমি নিজেই প্রতাপরুদ্রের সহিত মিলিত হইবে, আমরা এই চক্ষে তাহাও দেখিব! কেন এরূপ হইবে তাহার কারণও আমার অজানা নাই, কেননা, :—

রাজা তোমায় স্নেহ করে তুমি স্নেহবশ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ॥

যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেমপরতন্ত্র॥

পণ্ডিত দামোদরের নিকট প্রভুর বাক্‌চাতুর্য্য বিফল হইয়া গেল। কিন্তু শ্রীল রামরায় রাজার পক্ষের ওকালতী লইয়া প্রভুর সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন, কার্য্যসিদ্ধিই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। রামরায় ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রভো আপনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্, আপনার আবার একটা বিধিনিষেধের ভয় কি?"

কিন্তু তিনি রামরায়ের উক্তি অস্বীকার করিয়া বলিলেন "রামানন্দ, আমি মনুষ্য, তাহাতে আবার সন্ন্যাসী। আমি লোকব্যবহারের অন্যথা করিতে পারি না। সন্ন্যাসীর অল্প দোষ দেখিতে পাইলে লোকে তাহার অপবাদ করে। মলিন বস্ত্রে মসীর দাগ থাকিলে উহা লোকের চক্ষে পড়ে না, কিন্তু শুক্লবস্ত্রে একবিন্দু কালী পড়িলেই উহা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। গৃহস্থাশ্রমে সময়ে সময়ে বিধিনিষেধের বাধা পড়িলেও তাহাতে বড় অপযশ হয় না। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, আমার ব্যবহারে একটুকু ত্রুটী হইলেই লোকে অপযশ করিবে। তদ্‌যথা :—

প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥

লোকবর্গের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এইরূপ উপদেশ সর্ব্বত্রই অতি পরিস্ফুট। রামরায়কে প্রভু ইচ্ছা করিয়া স্বীয় স্বরূপ দেখাইয়াছেন, স্বীয় শ্রীমুখে তাহা প্রকাশ করিয়াও বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে আবার সেই রামরায়ের নিকটেই বলিতেছেন "আমি মনুষ্য, সন্ন্যাস আমার আশ্রম। আমি আশ্রমবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে লোকে কি বলিবে?"

ফলতঃ এখানে প্রভু শাস্ত্রবাক্য ও লোকব্যবহারের মর্য্যাদা-সংরক্ষণ

করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বধর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ, এবং সর্ব্বধর্ম্মের রক্ষক। তিনি স্বতন্ত্র হইলেও যখন মানবদেহ গ্রহণ করিয়াছেন, সন্ন্যাস আশ্রম পবিত্র করিয়াছেন, এমত অবস্থায় প্রিয়তম ভক্তগণের অনুরোধেও জনসমাজের লৌকিক আচার ও সন্ন্যাসধর্ম্মের বিধিভঙ্গে বা অবহেলনে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু শ্রীল রামরায় পরমকারুণিক, কৃতজ্ঞহৃদয় ও পরমকর্ত্তব্যতাপরায়ণ। প্রভু যতই আপত্তি করুন না কেন, তাঁহার আপত্তি ভাঙ্গিয়া রাজাকে তাঁহার শ্রীচরণপঙ্কজ দেখাইতে হইবে ইহাই রামানন্দের মনের বাসনা।

তাই রামানন্দ আবার বলিলেন "আপনি কত পাপীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, গজপতি আপনার ভক্ত রাজা, তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন না? সকলে উদ্ধার পাইলেন আর প্রতাপরুদ্র কি পড়িয়া থাকিবেন? তিনি প্রকৃতই ভক্ত, আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে না পারিলে তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া ভিখারী হইবেন, এমন কি প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত। এমন একান্তভক্ত শ্রীচরণ-দর্শন না পাইবেন কেন?"

মহাপ্রভুর হৃদয় আরও দ্রবীভূত হইল। শ্রীল রাম রায়ের উক্তি কেবল বাহ্য অনুরোধ নহে, উহা যেন প্রাণের অন্তস্তল-নিহিত মহাশক্তির সাক্ষাৎ প্রণোদনা। রামরায়ের যুক্তিময়ী উক্তিতে প্রভুর আপত্তির ভিত্তি যেন শিথিল হইয়া উঠিল। তিনি তখন আর কোন যুক্তি দেখিতে না পাইয়া কেবল লোকব্যবহারের কথা তুলিয়া বলিলেন, "রামরায় কি করিব, শাস্ত্রে সন্ন্যাসীর রাজদর্শন নিষিদ্ধ। তোমার কথায় বুঝিলাম প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণে গুণী, তাঁহার সহিত দেখা করিতে কোন বাধা নাই, কিন্তু তিনি "রাজা" এই উপাধিতে খ্যাত। শাস্ত্রবাক্য ও লোকব্যবহারের অবহেলন করা ভাল নয়। তবে যদি তোমাদের নিতান্ত আগ্রহ হয়, তবে প্রতাপরুদ্রের পুত্রকে আমার নিকট আনিতে পার। শাস্ত্র

লিখিত আছে "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ,"। তাঁহার পুত্র আমার দর্শন পাইলেই তিনি আমার দর্শন পাইলেন বলিয়া যেন মনে করেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু স্পর্শে কেহ না করে পরশ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্ব গুণবান্।
তাঁহারে মলিন করে এক "রাজা" নাম॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ মোরে তাঁহার তনয়॥
"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি॥

ইহার পরে শ্রীল রামানন্দ আর কোন আপত্তি করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিলেন না। রামরায় এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজার নিকট গেলেন এবং এই সকল কথা রাজাকে বলিলেন। রাজা বলিলেন "তাঁহার যাহা আজ্ঞা, তাহা অবশ্যই পালনীয়। তিনি যেরূপে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক, তাহাই করিবেন, এ বিষয়ে আমার আর অধিক কথা কি হইতে পারে?"

রাজা তখন স্বীয় পুত্রকে শ্রীল রামরায়ের হস্তে অর্পণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "আজ আমি পুত্র হইতে শ্রীভগবৎ-কৃপালাভ করিব, সৌভাগ্যক্রমে শ্রীভগবান্ আমায় এহেন রত্ন দান করিয়াছিলেন তাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক, গৌণভাবেও আমি শ্রীভগবৎকৃপা প্রাপ্ত হইলাম। হায় আমার এই বিষময় বিষয় শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্‌কে দর্শন করার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। আজ যদি আমি রাজা না হইয়া—ভিখারী হইতাম তাহাও আমার পক্ষে শতগুণে শ্রেয় ছিল।"

এদিকে শ্রীল রামরায় মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্রকে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া দিলেন। উঁহার কৈশোর বয়স্, বর্ণ শ্যামল, নয়ন যুগল সুদীর্ঘ, আকর্ণবিশ্রান্ত, ভাসা-ভাসা ও ঢল-ঢল ; নাসিকা তিল ফুলের ন্যায়, পরিধানে পীত পট্টবস্ত্র। প্রেমময় মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রের পুত্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তাঁহার শরীর সহসা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, পুত্রটীকে দেখামাত্রই তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপের উদ্দীপনা হইল, তিনি প্রেমানন্দে বিবশ হইয়া বলিলেন :—

এই মহাভাগবত,—যাহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে।
কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে॥

প্রভু এই বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন-লাভে রাজপুত্রের সাত্বিক বিকার উপস্থিত হইল। বালক কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে লাগিলেন, রোদন করিতে লাগিলেন। বালকের এইরূপ অদ্ভুত অষ্টসাত্বিকবিকার দেখিয়া ভক্তমাত্রেই বিস্মিত হইলেন। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা বুঝিলেন, ইহা মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারের ফল। প্রতাপরুদ্র পুত্র হইতে প্রেমলাভ করিবেন, প্রেমলাভ করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হইবেন এবং তৎপরে প্রভুর সহিত মিলিত হইবেন, ইহাই প্রভুর ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাভঙ্গী মনে করিয়া সূক্ষ্মদর্শী ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন প্রতাপরুদ্রের পরিত্রাণের আর বিলম্ব নাই।

মহাপ্রভু রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া দিলেন "তুমি প্রত্যহ আমাকে আসিয়া দেখিয়া যাইবে ত?" পুত্র মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলেন। তখন রামরায় বলিলেন "গোসাঞীকে প্রণাম করিয়া এখন ঘরে চল।" পুত্রটী অমনি শ্রীগৌরাঙ্গের কোমল রাতুল চরণে মস্তক রাখিয়া দণ্ডবৎ প্রণত রহিলেন। মহাপ্রভু উঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন

করিয়া বিদায় দিলেন, শ্রীল রামরায় রাজপুত্রকে রাজার নিকট লইয়া আসিলেন।

পুত্রের হাবভাব আকার প্রকার দেখিয়া প্রতাপরুদ্রের ধারণা হইল, তিনি যে পুত্রকে মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন, সে পুত্র বিষয়ীর পুত্র ; কিন্তু এখন যে পুত্র প্রাপ্ত হইলেন, এ পুত্রের সেই আকৃতি বটে, কিন্তু বর্ণ যেন শতগুণে সমুজ্জ্বল, নয়নে যেন এক অমানুষিক অদ্ভুত প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি, কথাগুলি যেন সহস্রগুণে মধুর। পুত্র দেখিয়া রাজার পুত্রস্নেহ সহস্রগুণে বাড়িয়া উঠিল। তিনি প্রবৃদ্ধ প্রেমবেগে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গন করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার বোধ হইল যেন যুগযুগান্তরে সঞ্চিত—জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত—হৃদয়তাপ মুহূর্ত্ত মধ্যে দূরীকৃত হইয়া গেল। তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ পাইল। এমন ভাব তিনি জীবনে আর কখনও অনুভব করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে মহানন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার দৃঢ়ধারণা হইল যেন তিনি সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর স্পর্শ-লাভে কৃতার্থ হইতেছেন। ফলতঃ মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রের পুত্রকে আলিঙ্গন দ্বারা উহার দেহে স্বীয় শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়া প্রতাপরুদ্রকে অনু-গৃহীত ও মিলন-যোগ্য করিয়া লইলেন। শ্রীল রামরায়ের এই মিলন-সাধনায় মহারাজ প্রতাপরুদ্র পরম উপকৃত হইলেন এবং তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। অতঃপরে কোনও সময়ে প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ স্পর্শলাভও করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা।

মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়াই শ্রীবৃন্দাবনে যাই-বেন বলিয়া বাসনা প্রকাশ করিলেন। এই কথায় ভক্তগণের প্রাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি প্রতিপদের চাঁদের মত দেখা দিয়াই আবার তাঁহাদিগকে অন্ধকারে ফেলিয়া অন্তর্দ্ধান করিবেন, ভক্তগণ ইহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইলেন, বিশেষতঃ রাজা প্রতাপরুদ্র এই সংবাদে মর্ম্মাহত ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। তিনি রামরায় ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আহ্বান করিয়া বলিলেন "এই তো শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সেদিন দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন, আমি যদিও তাঁহার শ্রীচরণদর্শনে অধিকারী নহি, তথাপি তিনি যে এখানে বিরাজ করিতেছেন, তাহা মনে করিয়াই আমার হৃদয় আনন্দানুভব করে। কিন্তু তিনি এ স্থান হইতে চলিয়া গেলে আমি কোন ক্রমেই তিষ্ঠিতে পারিব না। তাঁহাকে ছাড়া এখন আমার এই রাজ্য-বৈভবাদি কিছুই ভাল লাগে না। আপনারা তাঁহাকে অনুনয় করিয়া এই স্থানেই রাখিবেন, যথা—শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে শ্রীবৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইল বিমন॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুইজনে।
দোঁহাকে কহেন রাজা বিনয় বচনে॥
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করিহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে॥

তাঁরে বিনা এই রাজ্য মোর নাহি ভায়।
গোসাঞী রাখিতে দোঁহে করিহ উপায়॥

ইঁহারা উভয়েই এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার উপর আবার রাজার অনুনয়। মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইতেছেন, তাঁহাকে বাধা দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু ইঁহারা একটী নীতি অবলম্বন করিলেন; প্রভুর সঙ্কল্পে বাধা না দিয়া মধ্যে মধ্যে এক একবার গমনের দিন-সম্বন্ধে এক একটা আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে উদ্যত হইলেন, রামরায় ও সার্ব্বভৌম তাঁহার শ্রীচরণ সমীপে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে যাইবে, তাহাতে কে তোমায় বাধা দিবে? আর বাধা দিলেই তুমি তাহাতে বাধ্য হইবে কেন? আমরা এখন সেরূপ বাধা দিতে আসি নাই। আমরা বলি, এইত রথযাত্রা আসিয়া পড়িয়াছে, এখন তুমি এখানে না থাকিলে আমাদের মনে কষ্ট হইবে, রথযাত্রা দেখিয়া তারপরে যাইও, আমরা আর আপত্তি করিব না।"

প্রভু তাহাতে সম্মত হইলেন। রথযাত্রা চলিয়া গেল, তিনি আবার গমনোদ্যত হইলেন। সার্ব্বভৌম ও রামরায় আবার তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "যাবে বই কি, আমরা কি আর তোমায় ধরিয়া রাখিতে পারিব? তবে এখন অত্যন্ত বৃষ্টি বাদল। তোমার তো কিছুতেই ক্লেশ নাই, কিন্তু আমাদের মনে অত্যন্ত ক্লেশ হইবে। আমাদের সততই মনে হইবে বন জঙ্গলের পথে তুমি কোথায় ভিজিতেছ, কোথায় কত কষ্ট পাইতেছ। বৃষ্টি বাদলের দিন যাউক, কার্ত্তিকমাসে যাইও।" শ্রীগৌরাঙ্গ মৌনাবলম্বন করিলেন। আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্রমাস চলিয়া গেল, কার্ত্তিকমাসে প্রভু বলিলেন "তবে এখন বিদায় দাও," ইঁহারা করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে বিদায় দেওয়া অসম্ভব। এই ত শীতকাল উপস্থিত হইল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভয়ানক শীত, তুমি ভীষণ শীতে নগ্নদেহে বনে বনে বেড়াইবে

আর আমরা শীতবস্ত্রে দেহাবৃত করিয়া ঘরে আরাম ভোগ করিব, ইহা মনে করিয়াও প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। শীতকাল যাউক, শুভ বসন্তের প্রারম্ভে দোলযাত্রার পরে শ্রীবৃন্দাবনে যাইও। এখন কিছুতেই যাইতে দিব না।" যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

দোঁহে কহে রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক মাস আইলে করিহ গমন॥
কার্ত্তিক আইলে কহে এবে মহাশীত।
দোলযাত্রা দেখি যাইও এই ভাল রীত॥

*　　*　　*　　*

যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নাহি নিবারণ।
ভক্ত ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন॥

এইরূপ বাধায় বাধায় দুই বৎসর চলিয়া গেল, প্রভু রামরায়াদির অনুরোধে দুই বৎসর কাল নীলাচলেই অবস্থান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে আবার রথযাত্রা সমুপস্থিত হইল, গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ সন্দর্শনের নিমিত্ত আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে আবার নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। নীলাচলের রথোৎসব স্বভাবতঃই ভক্তগণের প্রগাঢ় আনন্দপ্রদ। শ্রীল কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন :—

উৎপক্ষ্মাক্ষিসরোরুহাঞ্জলিপুটে নীলাদ্রিচূড়ামণেঃ
শ্রীমূর্ত্তিচ্ছুরিতামৃতানি পিবতামুল্লাসধন্যাত্মনাম্।
নিস্পন্দং পুলকাবলীবিলসতামানন্দ-মন্দাকিনী-
কল্লোলৈঃ কিল তত্রতত্র ভবতামাসীন্মহামুৎসবঃ॥

নীলাচলবাসীর এই মহামহোৎসব ভক্তজনের হৃদ্য ও আস্বাদ্য এবং সুকবির বর্ণনীয়। কিন্তু গৌড়ীয় ভক্তগণ কেবল শ্রীরথযাত্রার উৎসব-সন্দর্শনের নিমিত্ত আকুল নহেন। তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মুখশশিসন্দর্শন করাই তাঁহাদের হৃদয়ের পূর্ণাকাঙ্ক্ষা।

বৎসরান্তে ভক্তগণ নীলাচলে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হইলেন, রথযাত্রার আনন্দ উপভোগ করিলেন, নৃত্য কীর্ত্তনে গোলোকরস উছলিয়া উঠিল। কিন্তু সংসারে ঘটনার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবি। রথযাত্রার উৎসব অতিবাহিত হইল। প্রভু আবার শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। প্রস্তাব শুনিবামাত্রই ভক্তগণের মুখ বিশুষ্ক হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই, তাঁহাকে আর বাধা দিয়া রাখা অসম্ভব। প্রভু আবার সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ রায়কে আহ্বান করিলেন, তাঁহাদিগকে প্রীতি-পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া মধুর সম্ভাষণে বলিলেন, "শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করার জন্য আমি একান্ত উৎকণ্ঠিত, কিন্তু তোমাদের আপত্তিতে প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিল, আর বাধা দিও না, এখন অনুমতি কর, তোমাদের অনুমতি ভিন্ন আমি কিছুই করিতে পারি না। গৌড়ের পথে যাইব; গমনকালে জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া যাইব। যথা :—

> গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
> জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥
> গৌড়দেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিয়া।
> তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥

ইহার পরে সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ আর আপত্তি করা সঙ্গত বোধ করিলেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে বর্ষাকালে ছাড়িয়া দিবেন না,—বলিলেন, "প্রভো আর তোমায় বাধা দিব না, তুমি ইচ্ছাময়, তুমি স্বতন্ত্র, আমরা ক্ষুদ্রজীব, তুমি দয়া করিয়া আমাদের বাঞ্ছা পূরণ না করিলে আমরা কি এই কয়েক মাস তোমার দর্শনানন্দ আস্বাদন করিতে পারিতাম? তবে একটা কথা এই চাতুর্ম্মাস্যের অন্তে বিজয়াদশমীর দিনে যাত্রা করিও, আর কোন বাধা দিব না।" প্রভু বলিলেন,—"তথাস্তু"।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন, এই দুঃসহ বিরহ-চিন্তায় শ্রীল রামরায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি চাতুর্ম্মাস্যের শেষে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা

করিবেন, চাতুর্ম্মাস্য অবসান প্রায়। শ্রীল রামরায়ের বিরহ-বেদনা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। রামরায় আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "আর কত দিন তাঁহার গমনে বাধা দিব, আর কতদিন কি বলিয়া রাখিব? তিনি যখন শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন আর কত দিনই বা তাঁহাকে বাধা দিয়া রাখিব? ইনি বিজয়াদশমীর পরে যাত্রা করিবেন, কিন্তু আমি তাহার পূর্ব্বেই দশমী দশায় পতিত হইয়া রহিয়াছি। প্রভুর বিরহে কিরূপেই বা প্রাণধারণ করিব?" * এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া রামরায় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন।

মহাপ্রভু জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিবেন এই প্রস্তাব স্থির হইল। নীলাচলে আবার এক বিষাদের ঘনকৃষ্ণছায়া দেখা দিল। ভক্তগণের মুখমণ্ডল পরিম্লান; সকলেরই ইচ্ছা তাঁহারা প্রভুর সহিত গমন করেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও সঙ্গে লইবেন না। বায়ু-সন্তাড়নে মধুগন্ধি মৃণালশোভা কমলকুসুম চঞ্চল হইলেও ভ্রমরগণ যেমন উড়িয়া উড়িয়া সেই কুসুমের দিকেই ধাবিত হয়, শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণার-

---

* যথা শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে :—

দক্ষিণাদাগতো যাবত্তাবত্তত্র মহাপ্রভুঃ।
মথুরায়াং চলত্যেব রামানন্দোঽত্রবাধতে॥
চাতুর্ম্মাস্যান্তরে নাথং কহিচিদগমনোদ্যতং।
উবাচ বহুদুঃখেন শ্রীরামানন্দ রায়কঃ॥
দশম্যাং বিজয়ায়াং তু গমনং ভবিতা প্রভোঃ।
দশম্যাং বিজয়ায়াং তু দশায়ামহমগ্রতঃ॥

বিরহে যে দশ দশা উপস্থিত হয়, উহার শেষ-দশার নাম মরণ যথা :—

চক্ষুরাগস্তস্য মনসঃ সঙ্গতির্ভাবনা চ।
ব্যাবৃত্তিঃ স্যাৎ অনুবিষয় গ্রামিতশ্চেতসোহপি॥
নিদ্রাচ্ছেদ তনুকৃশতা নির্ত্রপতা ততোহনু।
ব্যাধো মূর্ছা উন্মাদঃ প্রাণনাশঃ ক্রমেণ॥

বিন্দ-মকরন্দলুব্ধ ভক্তমধুপগণও সেই প্রকার গমনশীল শ্রীগৌরাঙ্গের পদ-যুগলাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শ্রীনীলাচলচন্দ্রের শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে স্তব পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, আর তৃষিত চকোরের ন্যায় তাঁহার শ্রীমুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রদক্ষিণের পর দীর্ঘকাল মহাপ্রভু নির্নিমেষলোচনে জগন্নাথদেবের মুখপঙ্কজ-অভিমুখে তদগতভাবে চাহিয়া চাহিয়া যেন কত কথা বলিলেন, তাঁহার নেত্রযুগল হইতে বিন্দুবিন্দু অশ্রু মণিমুক্তার মোহনমালার ন্যায় বক্ষ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন, নীলাচলচন্দ্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, জননীর নিমিত্ত প্রসাদী বস্ত্র লইয়া শ্রীধাম হইতে গৌড় দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈলা সমাধান।
বিজয়া দশমী দিনে করিলা পয়ান॥
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিল।
কড়ার চন্দন ডোর সব সঙ্গে লইল॥
জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়াভক্তগণ সবে পাছে চলি আইলা॥

ভক্তগণের হৃদয় অনুদিন শ্রীভগবানের প্রতি আকৃষ্ট। প্রিয় পাঠক, আপনি ব্রজগোপীদের প্রেমাকর্ষণের কথা শুনিয়াছেন। গোপীগণ বাঁশীর রবে শ্রীকৃষ্ণের জন্য উন্মাদিনী হইয়া নিবিড় বনে গমন করিতেন। কুল-শীল-বিপদাপদের কথা মনে রাখিতেন না। বাঁশরীর মোহন মধুর বিনোদাহ্বানে তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট ও আকুল হইত। কিন্তু শ্যামের বাঁশী না বাজিলেও গোপিকাকুল আকুল হইয়া কৃষ্ণের অনুসরণ করিতেছেন, শ্রীবৃন্দাবনে প্রেমলীলার এরূপ ঘটনা অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। কুল, মান, লজ্জা ও রমণী-স্বভাবসুলভশীলতায় ব্রজপ্রেমকে গিরিজয়-প্রবা-

হিনী নির্ঝরিণীর ন্যায় প্রচাপে রাখিয়া দিত। শত শত পাষাণ-বাধার অন্তরাল দিয়া ব্রজপ্রেম প্রবাহিত হইত। কিন্তু অত্যুদার শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় সেই প্রকার বাধাবিঘ্ন কিছুই ছিল না। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গভক্তগণ কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রভুর পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবৃন্দাবনদর্শনার্থ যাত্রা করিলেন, আর ভক্তগণ ব্যাকুল হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। এই সম্বন্ধে অমর কবি শ্রীল কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে একাক্ষরময় একটী অদ্ভুত শ্লোক রচনা করিয়াছেন, যথা :—

"ললল্লীলো ললল্লীলো লোলো লোলো ললল্ললঃ।
লীলালোলোঽলিলীলালীং লীলালীং লোললাং ললুঃ॥

অর্থাৎ মহাপ্রভু নীলাচল-লীলা পরিহার করিয়া ব্রজগমনরূপ লীলায় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য চঞ্চল ও আকুল হইলেন এবং সমস্ত ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। এদিকে মধুলুব্ধ ভ্রমরগণের ন্যায় ভক্তগণও সেই চঞ্চলমনা গৌরচন্দ্রকে ধরিবার জন্য ব্যাকুলভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভ্রমরগণ যেমন বায়ুচালিত পদ্ম হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়াও পুনঃ পুনঃ উহাতে বসিতে চেষ্টা পায়, প্রভুর পদানুরক্ত ভক্তগণও তদ্রূপ গমনচঞ্চল প্রভুর পাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভু কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। তিনি একাকী শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। সুতরাং সকলকেই অনুগমন করিতে নিষেধ করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

"উড়িয়া ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা।
নিজগণ সঙ্গে প্রভু ভবানীপুরে আইলা॥"

তদ্‌যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে :—

"কাশীমিশ্রমুখাঃ সর্ব্বে পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমায়যুঃ।

সমমুব্রজতস্তাং স্তান্ বিসসর্জ্জ কৃপানিধিঃ ॥
নিশাবসানে তৈরেতৈঃ কীর্ত্তয়দ্ভির্মুহুর্মুহুঃ।
প্রতস্থে গানকলয়া লোলঃ শ্রীগৌরসুন্দরঃ ॥
গোবিন্দো জগদানন্দঃ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ।
যতিশ্রেষ্ঠ পুরী স্বামী কীর্ত্তয়ন্তঃ সমাযযুঃ ॥”

মহাপ্রভু কাশীমিশ্র প্রভৃতি উড়িষ্যাবাসী ভক্তগণকে পুরীক্ষেত্র হইতেই বিদায় দিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কেবল গোবিন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত এবং পণ্ডিতবর পরমানন্দপুরী কীর্ত্তন করিতে করিতে ভবানীপুর পর্য্যন্ত শুভাগমন করিলেন।

অতঃপর রায় রামানন্দ কটক হইতে দোলায় চড়িয়া ভবানীপুরে উপস্থিত হইলেন এবং প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে :—

ততোঽনু দোলামারুহ্য শ্রীরামানন্দরায়কঃ।
প্রতদীয়াশ্চ যে চান্যে সমেতাস্তে ত আযযুঃ ॥
শ্রুত্বা সর্ব্বে জনাস্তত্র স্ত্রীপুমাংসঃ সমন্ততঃ।
হরিং বদেতি সোৎকণ্ঠং বদন্তো ভূয় আযযুঃ ॥

অর্থাৎ তৎপরে শ্রীরামানন্দ রায় দোলারূঢ় হইয়া উপনীত হইলেন এবং অন্যান্য ভক্তগণও আগমন করিলেন। তথায় কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত পুনঃ পুনঃ হরিধ্বনি করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছেন :—

রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া ॥

রামানন্দ কটকে ছিলেন। তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত কটকেই থাকিতেন, তখনও তিনি সম্পূর্ণরূপে রাজার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন

করেন নাই। রাজা তখনও পূর্ণরূপে মহাপ্রভুর প্রেমপাত্র হন নাই। তিনি জানিতেন রামরায়ের দ্বারাই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত রামরায়কে ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। মহাপ্রভু যখন ভবানীপুরে পৌছিলেন, রামরায় কটক হইতে তখন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পরদিবস মহাপ্রভু ভুবনেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রামরায় প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু রসকোন্দল করিতে করিতে বলিলেন "রামরায়, তুমি আমার সঙ্গে কেন? কটকে যাও," এই বলিয়া প্রভু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন,—দাঁড়াইয়া বলিলেন "তুমি আমার সঙ্গে গেলে আমি যাইব না।" রামরায় বলিলেন, "প্রভো, ভৃত্যকে ত্যাগ করিবেন না। আমি আপনার দাসানুদাস, সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে সঙ্গে লউন।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন,—"চল তবে"।

রামরায় প্রভুর বিরহ ক্ষণকালও সহিতে অসমর্থ। সুতরাং তিনি যতক্ষণ পারেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন, এই মনস্থ করিলেন। ফলতঃ প্রভু যখন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিরহ প্রকৃতই দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীল কবি-কর্ণপুর লিখিয়াছেন :—

"কিয়দ্দূরং ততো গত্বা বিররাম মহাপ্রভুঃ।
শ্রীরামানন্দরায়েন প্রণয়দ্বন্দ্ববান্মিথঃ॥
স ত্যক্ত্বা গচ্ছতা তেন প্রভুর্নাম্নৈব হ।
তর্পিতোঽপি ন বৈ তৃপ্তিং জগাম ক্ষণমপ্যত॥
মনোজ্ঞদৃগ্ নামনোজ্ঞবিভ্রমভ্রমণাকুলঃ।
স তু প্রেমাস্পদস্তস্য রামানন্দো মহানিধিঃ।
তদালোকন দুঃখেন কথঙ্কারং ভবিষ্যতি॥"

অতঃপরে যথাসময়ে ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু শ্রীভুবনেশ্বর-

দর্শন এবং সেই স্থানে বিশ্রাম করিলেন। তাঁহার বিশ্রামের জন্য ইতঃপূর্ব্বেই রামরায় নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই গৃহে মহাপ্রভু পরমানন্দপুরী ও রামরায় কৃষ্ণকথায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। যথা :—

তত্র নূতন গেহাদি কারয়িত্বা নিদেশতঃ।
পুরা রামানন্দ রায়ো নিনায় প্রভুমঞ্জসা॥
লেপিতং শুদ্ধমালোক্যং গৃহং তত্র কৃপানিধিঃ।
উবাস পরম প্রীত্যা পরমানন্দপূরিণা॥
তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ প্রেম্নোপাস্য চ তৈঃ সমং।
শ্রীরামানন্দ রায়েন কথয়া রজনীং যযৌ॥

পর দিবস প্রাতঃকালে পরমানন্দপুরী ও মহাপ্রভু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রামরায় পশ্চাৎগামী হইলেন। অনন্তর তিনি গোপীনাথকে দর্শন করিয়া কটকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে করুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র আসিতেছেন, গজপতি প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ শ্রবণে নিজ হস্তে সমস্ত ঘাট পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু পরমানন্দপুরী প্রভৃতি ভক্তগণকে কটকে যাইতে অনুমতি করিয়া স্বয়ং কোনও ভক্তের আলয়ে বিশ্রাম করিলেন। তথা হইতে কটকে শুভাগমন করিয়া শ্রীগোপাল দর্শন করিলেন। রায় রামানন্দ তাঁহার বাসাবাড়ীর উদ্যানে মহাপ্রভুর সঙ্গীয় ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কটকের প্রসন্ন বাগানে তখন যে শুভ দৃশ্যের উদয় হইয়াছিল, সুকবির বর্ণনাতেও তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

রায় রামানন্দের প্রসন্নতর উদ্যান। তাহাতে বিবিধ বৃক্ষ, চারিদিকে চম্পক মালতি কুরুবক প্রভৃতি বিবিধ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। একটী প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ, সুদীর্ঘ উচ্চ ঘনসন্নিবিষ্ট বাহু শাখা বিস্তার করিয়া উদ্যানের মধ্যদেশে বিরাজমান। এই বিবরণ কবিকর্ণপুর অতি সুন্দর ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। উঁহার

তলদেশে গোলাকার প্রস্তর বেদিকা। ভোজনান্তে প্রভু তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন, আর চারিদিকে ভক্তগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন।

এদিকে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ রামরায় রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "রাজন্, মহাপ্রভু সমাগত, এক্ষণে ভোজনান্তে এ অধমের বহিরুদ্যানে বকুল-বেদিকায় উপবিষ্ট। আমি মনে করি তাঁহার শ্রীচরণ সন্দর্শনের এখনই উপযুক্ত সময়। প্রতাপরুদ্র আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলেন না। শ্যাম-চাঁদের বাঁশীর রবে বিবশা ব্রজবালার ন্যায় আকুল হইয়া তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ-দর্শনের জন্য রামরায়ের উদ্যানাভিমুখে ধাবিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, বকুলমূলে নটবর রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যেন মূর্ত্তিমান রসের দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন। সে রূপলাবণ্য-মাধুরী দেখিয়া প্রতাপরুদ্র বিস্মিত ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাব সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। প্রেমের বৈদ্যুতিক শক্তি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি অবশ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মহাপ্রভুর শ্রীচবণ তলে পতিত হইলেন। আব তৎক্ষণাৎ আবিষ্টের ন্যায় উত্থিত হইলেন, আবার দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পড়িলেন। প্রতাপরুদ্র প্রেমবিহ্বল ভাবে এইরূপ বহুবার উত্থিত ও প্রণত হইয়া মহাপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ প্রেমে পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল। প্রেমাশ্রুতে বক্ষ পরিপ্লুত হইল। প্রতাপরুদ্র অচেতন ভাবে প্রভুর পাদমূলে আবার দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু এবার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্তের ভগবান্ ভক্তের আর্ত্তি দেখিয়া দয়ার্দ্র হইলেন। যে প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহিলে তিনি "আকারদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িনামপি" এই শ্লোক বলিয়া অমত প্রকাশ করিতেন, আজ সেই প্রতাপরুদ্রকে তিনি প্রীতিময় আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থ করি-লেন। প্রভুর নয়নযুগল হইতে দরবিগলিত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। আর সেই অশ্রুজলে প্রতাপরুদ্রের মস্তক পরিস্নাত হইল।

এদিকে প্রতাপরুদ্র সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা। তিনি আকাশে কি ভূমিতে, তাহার কিছুই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলেন না, উন্মাদ বা গ্রহগ্রস্তের ন্যায় আবিষ্ট ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। রায় রামানন্দ দেখিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র সম্পূর্ণ আত্মহারা। তখন তিনি তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন ও সুস্থ করিলেন। মহাপ্রভু এইরূপে প্রতাপরুদ্রকে প্রেমদান করিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

"শুনিয়া আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা॥
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে হইয়া বিহ্বল।
ধৌত করি পুলকাঙ্গ বহে অশ্রুজল॥
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হইল মন।
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভুর কৃপাশ্রুতে তার দেহ হৈল স্নান॥
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইল।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে শান্ত কৈল।
ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌরধাম।
"প্রতাপরুদ্র" সংত্রাতা-জগতে হইল নাম॥

এ সম্বন্ধে কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন :—

প্রণম্য বহুধা দৃগ্‌ভ্যামপিবদ্বদনাম্বুজং।
নচ তৃপ্তিমভূদ্ ভূপশ্চিত্রং গৌরাঙ্গচেষ্টিতং॥
বহুধা গৌরচন্দ্রোঽপি প্রেম্না ভাব্য বচোঽমৃতৈঃ।
সিষেচ তস্য সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বাঙ্গীনমিবাম্নিষন্॥

রায় রামানন্দের যে বিখ্যাত উদ্যানে গজপতি প্রতাপরুদ্র ভবদাবানল হইতে পরিত্রাণ পাইলেন, সেই স্থানে এক মহাতীর্থ। কিন্তু আমাদের

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এই স্থান চিরস্মরণীয় পবিত্র তীর্থ স্থানরূপে পরিগত করার জন্য গজপতি প্রতাপরুদ্র কোনও চিহ্ন রাখিয়া যান নাই। রায় রামানন্দের এই উদ্যান কোথায় ছিল, ভুবনপাবন পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কোন্ স্থানে উপবেশন করিয়া উড়িষ্যার গজপতি প্রতাপরুদ্রকে প্রেমদান করিয়াছিলেন, এখন সেই মহাপুণ্য স্থানের নিদর্শন নাই এবং তাহা নির্ণয় কবিবারও উপায় নাই।

যদিও রাজা প্রতাপরুদ্রের পরিত্রাণস্থল,—কটকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কোন পুণ্যতীর্থ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্র চিত্রোৎপলা নদীতটে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নামে যে স্তম্ভ রোপণ করেন, সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহা মহাতীর্থরূপে খ্যাত ছিল। মহাপ্রভু চিত্রোৎপলা নদীর (কটকের নিকটবর্ত্তী মহানদীর অংশের নাম চিত্রোৎপলা নদী) যে ঘাট পার হইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করেন, প্রতাপরুদ্র সেই ঘাটে যে স্তম্ভ রোপণ করিয়াছিলেন, সেই ঘাট এক মহাতীর্থ। এখন সেই স্তম্ভের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে কি না, অথবা নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার ও নির্ণয় করিতে পারি নাই, কিন্তু ঐ স্থানটী প্রতাপরুদ্র মহাতীর্থরূপে পরিণত করেন। যথা শ্রীকবিকর্ণপুর-রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে :—

আজ্ঞাপয়তি দেবো যঃ শ্রূয়তাং তন্মহত্তমাঃ।
আরোপ্যোঽত্র স্তম্ভ একো যেন তীর্থং ভবেদিদম্॥
ইতি শ্রুত্বা নৃপাজ্ঞাং তে স্তম্ভ মারোপ্য তত্রচ।
নৌকামারোপ্য মুদিতাঃ প্রভুং হর্ষাদ্বগাগত॥

অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের আদেশক্রমে তদীয় কর্ম্মচারিগণ বলিলেন, "হে মহত্তমগণ, মহারাজের আদেশ শ্রবণ কর। তাঁহার আদেশ এই যে এই স্থানে একটী স্তম্ভ রোপণ করিতে হইবে তদ্বারা এই স্থান তীর্থরূপে

চিহ্নিত হইবে।" নৃপের আজ্ঞায় সেই স্থানে স্তম্ভ আরোপিত হইয়াছিল। শ্রীচরিতামৃতে ইহার এইরূপ বঙ্গানুবাদ দৃষ্ট হয় যথা :—

এক নব নৌকা আনি রাখ নদীতীরে।
মহাপ্রভু স্নান করি যাইবেন নদী পারে॥
তাহা স্তম্ভ রোপণ কর, মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি॥

অতঃপর মহাপ্রভু নদী পার হইয়া চতুর্দ্দার নামক স্থানে শুভাগমন করিলেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে নিম্নলিখিত পদ্য লিখিত হইয়াছে :—

ইত্থং পারেনদি স তু চতুর্দ্বারমাগত্য তৈ স্তৈ।
রাত্রৌ চন্দ্রাতপমধুরিম ব্যাবৃতায়াং সমন্তাৎ॥
স্বাপং চক্রে প্রভুরথ জগন্নাথ সম্মণ্টপান্ত-
র্লৌকৈর্লক্ষাবধিভিরপিতু স্থানমেবাত্র নাপে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার এইরূপ বঙ্গানুবাদ লিখিত হইয়াছে :—

নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈল নদীপার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, চলি আইলা চতুর্দ্দার।

রাজার আদেশে শ্রীল রামরায়ও প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দ্দারে আসিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র জানিতেন শ্রীল রামরায়ের তুল্য মহাপ্রভুর সেবক অতি দুর্ল্লভ। তিনি মহাপ্রভুর সেবার বন্দোবস্তের নিমিত্ত আজ্ঞা করিলেন, যথা :—

চতুর্দ্দারে করহ উত্তম নব্য বাস।
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু-পাশ।

শ্রীল রামানন্দ মহাপ্রভুর অনুবর্ত্তী হওয়ার আদেশে পরমানন্দ লাভ করিলেন। এদিকে পুরীধাম হইতে মহাপ্রসাদ আনাইয়া রাজা চতুর্দ্দার বা চৌদ্বার নামক স্থানে পাঠাইলেন, মহাপ্রভুর ভক্তগণ প্রসাদ পাইয়া

পরিতৃপ্ত হইলেন। পরদিন প্রাতে মহাপ্রভু চৌদারা হইতে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে সেবক চলিলেন রামরায়, মঙ্গরাজ ও হরিচন্দন। ইঁহারা তিনজনই রাজপাত্র ও রাজার প্রেরিত। এতদ্ব্যতীত স্বরূপদামোদর, পুরী-গোসাঞী, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, পণ্ডিত বক্রেশ্বর, গোপীনাথ আচার্য্য দমোদর পণ্ডিত, রামাই ও নন্দাই প্রভৃতি অনেকেই পশ্চাদ্গামী হইলেন।

এইরূপে ভক্তগণসঙ্গে মহাপ্রভু যাজপুরপর্য্যন্ত শুভাগমন করিয়া রাজপাত্র মঙ্গরাজ ও হরিচন্দকে বিদায় দিলেন। প্রভু বলিলেন "রামরায়, তুমিও এখন ফিরিয়া যাও। আমার সঙ্গে ক্লেশ করিয়া আর কত দূর যাইবে?" রামরায় বলিলেন "প্রভো যতক্ষণ আপনার নিকটে রহিব, ততক্ষণই গোলকানন্দ অনুভব করিব, এ সুখে এ অধমকে বঞ্চিত করিবেন না।" প্রভু বলিলেন, "তোমাকে ছাড়িয়া থাকা আমার কি কম ক্লেশজনক? কিন্তু তোমার উপরে রাজকার্য্যের ভার আছে। যদি দুঃখিত হও তবে এস, আরও কতদূর তোমার সহিত একত্র যাইব। তোমার সঙ্গলাভ এবং কৃষ্ণকথা-রসাস্বাদ একই কথা। তোমার মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনিবার সময়ে আমার মনে হয় যেন অমৃতের শতধারা প্রবাহিত হইতেছে।"

অপর দুই রাজপাত্র বিদায় হইলেন, রামানন্দ প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। দিবারাত্র উভয়ে কৃষ্ণকথা-রস-রঙ্গে এইরূপে গোলোকানন্দ-সুধা আস্বাদন করিতে করিতে ভদ্রক নামক স্থান পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন "রামরায় আর নয়, এখন ফিরিয়া যাও" এই বলিয়া প্রভু দাঁড়াইলেন। রামরায় প্রভুর আদেশ শুনামাত্রই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন, যথা শ্রীকবিকর্ণপুরকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে :—

রামানন্দো ভদ্রপর্য্যন্তমেত্য
প্রত্যাবৃত্তস্তেন সম্যগ্ বিসৃষ্টঃ।

বিচ্ছেদার্ত্তঃ ক্ষেত্রমেব প্রতস্থে

গৌরাঙ্গোঽয়ম্ সোঽপ্যপেয়াদুদীচীম্॥

অর্থাৎ রামানন্দ ভদ্রক নামক স্থান পর্য্যন্ত আসিলে পর মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ করিলেন, তিনি এই আদেশে বিচ্ছেদার্ত্ত হইলেন এবং ক্ষেত্র-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর উত্তর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে:—

এই মত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ রায় বিদায় দিলা॥
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করেন ক্রন্দন॥
রায়ের বিদায় কথা না যায় কহন।
বলিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥

শ্রীল রামানন্দ রায় অতঃপর আর রাজার বিষয়-কার্য্যে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি শ্রীক্ষেত্রে নিভৃত স্থানে বাস করিয়া মহাপ্রভুর চরণচিন্তায় মগ্ন হইলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রামরায়কে বিদায় দিয়া ধীরে ধীরে গৌড়দেশে আগমন করিলেন। জন্মভূমি, জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার মনন করিয়াছিলেন। কিন্তু সনাতনের ইঙ্গিতবাক্য চিন্তা করিয়া প্রভু কানাইর নাটশালা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, আবার সেই পথে ধীরে ধীরে নীলাচলে উপনীত হইয়া শ্রীল রামরায় প্রভৃতির নেত্রানন্দ বর্দ্ধন করিলেন। তিনি তাঁহাদের সমক্ষে শ্রীপাদ সনাতনের উপদেশের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। অর্থাৎ গৌড়দেশ হইতে যাত্রাকালে তাঁহার সঙ্গে বহু লোক সংঘট্ট হইয়াছিল। এত লোক লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া অনুচিত, পথিমধ্যে শ্রীপাদ সনাতন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

এই উপদেশ করায় তিনি বৃন্দাবনে না যাইয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দেখিতে দেখিতে শরৎকাল উপস্থিত হইল। প্রভু তখন শ্রীল রাম-রায় ও শ্রীপাদ স্বরূপকে ডাকিয়া বলিলেন :—

মোর সহায় কর যদি তোমরা দুইজন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন॥
রাত্রি উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব॥
কেহ যদি সঙ্গে যাইতে পাছে উঠে যায়।
সবারে রাখিও যেন কেহ নাহি ধায়॥

শ্রীল রামানন্দ ও শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বলিলেন :—

উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে পাত্র বহি॥

মহাপ্রভু অগত্যা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শ্রীল বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেওয়া হইল। মহাপ্রভু পূর্ব্বরাত্রিতে জগন্নাথের নিকট হইতে বিদায় লইলেন, শেষ রাত্রিতে লুকাইয়া প্রসিদ্ধ পথ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবার আর লোকসংঘট্টের আশঙ্কা রহিল না। আবার শ্রীনীলাচলে বিষাদের তামসী ছায়া পতিত হইল, ভক্তগণের শ্রীমুখমণ্ডল প্রভুর বিরহে দিন দিন পরিম্লান হইতে লাগিল। কেবল আশার বুক বাঁধিয়া তাঁহারা প্রাণধারণ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পুনর্ম্মিলন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিরহে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের ভক্তগণের যাতনা বর্ণনাতীত। শ্রীল রামরায় এই মহাবিরহে একবারেই মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার মত নীরবে নির্জ্জনে সময় কর্ত্তন করিতেন, উৎসবাদিতে যোগ দিতেন না, লোকসমাজে বাহির হইতেন না, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না। যিনি গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের বিদ্যা-নগরের শাসনকর্ত্তা, যিনি উক্ত অঞ্চলে গবর্ণর-জেনারলের ন্যায় সম্মানিত, সহসা সেই তেজোদৃপ্ত রাজপুরুষের এইরূপ নির্ব্বেদে জনসাধারণ তাঁহার অস্তিত্বেই সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। ফলতঃ শ্রীল রামানন্দ রায় এই মহাবিরহে জীবন্মৃতবৎ হইয়া রহিলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শুভাগমন করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দের নিষ্প্রাণ হৃদয় সহসা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। মহাপ্রভু নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে আসিয়া বসিলেন, ভক্তগণ এইখানে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

আঠার নালাতে আসি ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণে।
পাঠাইয়া বোলাইলা নিজ ভক্তগণে॥
শুনিয়া সকল ভক্ত পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইলে যৈছে ইন্দ্রিয় উঠিলা॥
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা।
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা॥

মহাপ্রভুর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া নরেন্দ্রতীরে যে সকল ভক্তের সমাগম হয়, তন্মধ্যে পুরী, ভারতী, স্বরূপদামোদর, পণ্ডিত গদাধর, জগদানন্দ পণ্ডিত, কাশীশ্বর, বক্রেশ্বর, গোবিন্দ, কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, দামোদর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, শঙ্কর পণ্ডিত প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ রায় তখনও এ সংবাদ শুনিতে পান নাই। মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবদর্শনে যাত্রা করিলেন। তখন চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। "মহা-প্রভু আসিয়াছেন",—সকলের মুখেই এই এক কথা। তখন পুরীক্ষেত্রে যত কিছু আনন্দ হইত, সকলই মহাপ্রভুকে লইয়া। মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রের বাহিরে গেলেই পুরুষোত্তমক্ষেত্র নিরানন্দের বিষাদে ডুবিয়া যাইতেন, আবার তাঁহার শুভ প্রত্যাবর্ত্তন হওয়ামাত্রই সমগ্র পুরীতে আনন্দের কল্লোলকোলাহল সাগর-কল্লোলকেও পরাহত করিয়া প্রবাহিত হইত। মহাপ্রভু পৌছিয়াছেন, মুহূর্ত্তমাত্রে চারিদিকে এই সংবাদ বিস্তৃত হইয়া পড়িল, সঙ্কীর্ত্তনের শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে মধ্যে লইয়া কীর্ত্তন-সম্প্রদায় হরিনামের হুহুঙ্কার তুলিয়া শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নগরে বিশাল কোলাহল উপস্থিত হইল, সকলের মুখেই এক কথা,—"মহাপ্রভু আসিয়াছেন।" শ্রীল সার্ব্বভৌম ও শ্রীল রামরায় এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন, যথা :—

মহাপ্রভু আইলা গ্রামে হলো কোলাহল।
সার্ব্বভৌম রামানন্দাদি মিলিলা সকল॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ-সন্দর্শনে শ্রীল রামরায়ের মৃতদেহে যেন পুনরায় প্রাণ আসিল। শ্রীচরিতামৃতকারের দুইটীমাত্র পংক্তিতেই তাৎ-কালিক অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

শুনিয়া সকল ভক্ত পুনরপি জীলা।

দেহে প্রাণ আইলে যৈছে ইন্দ্রিয় উঠিল ॥

ইহাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে, রামরায় জীবন্মৃতের ন্যায় প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-সুধাকরের সন্দর্শনে শ্রীল রামরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর দেখিয়া রামানন্দ আনন্দে অধীর হইলেন। কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রভু শ্রীকাশী-মিশ্রের আলয়ে শুভাগমন করিলেন। আবার শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীল রামরায় দিনযামিনী সুখময় কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

শ্রীরূপ-মিলন।

শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র অপার অনন্ত নীলজলধিতটে অবস্থিত। সেই জলধির বিশালদৃশ্য এবং উহার অনন্ত উত্তালতরঙ্গমালা দর্শকগণের হৃদয়ে এক বিশাল ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। শ্রীশ্রীমহা-প্রভু যখন এই সমুদ্রতটস্থ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে লীলাবিহার প্রকটন করিতেছিলেন, তখন অন্তর্দৃষ্টিশালী ভক্তগণ এই পুরুষোত্তমে প্রেমের উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল যে অপর মহাসমুদ্র মানসিকনেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেন, তাহা এই প্রাকৃত সমুদ্র অপেক্ষা অধিকতর বিশাল ও অধিকতর বিস্ময়কর। এই প্রেমসমুদ্রে প্রতি অনুপলে যে আনন্দ-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইত, তাহা বাক্যাতীত,—প্রাকৃত ভাবময় জনগণের ধারণার অতীত। সেই আনন্দতরঙ্গে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর ও শ্রীল রামরায় নিরন্তর ভাসিয়া বেড়াইতেন, এবং অনেক সময়েই অন্যান্য ভক্ত-গণও তদ্দর্শনে বিস্মিত হইতেন।

শ্রীল রামরায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত সুধাময় কৃষ্ণকথায় দিনযামিনী বিভোর। সেরূপ আনন্দ ইহজগতের কোনও আনন্দের সহিত তুলিত হইবার নহে—উহা অপার, অনন্ত ও অমেয়। এই সময়ে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে শুভাগমন করিলেন। রথ-যাত্রার সময়ে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করাই তাঁহার এই সময়ে শুভা-গমনের উদ্দেশ্য। তিনি শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের পুণ্য নিকেতনে সর্ব্ব-

প্রথমে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উপলভোগ সন্দর্শন করিয়া প্রত্যহ শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরেকে দর্শন দিয়া যাইতেন। নিয়মিত সময়ে প্রভু হরিদাসভবনে আসিলেন, পশ্চাদ্দিক হইতে শ্রীপাদ রূপ আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। প্রভু তাহা দেখিতে পান নাই। হরিদাস বলিলেন, "প্রভো, ঐ যে শ্রীরূপ আপনার পদতলে।" করুণাসাগর শ্রীগৌরাঙ্গ তৎক্ষণাৎ শ্রীরূপকে তুলিয়া লইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিদাস-ভবনেই শ্রীপাদ রূপের বাসা নির্দ্দেশ করিয়া প্রভু সে দিনের নিমিত্ত চলিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি নীলাচলবাসী ভক্তদের সহিত ক্রমশঃ শ্রীরূপের আলাপ পরিচয় করিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে হরিদাস-ভবনে শুভাগমন করিতেন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীরূপের সহিত আলাপ করিয়া যাইতেন।

দেখিতে দেখিতে রথযাত্রার দিন উপস্থিত হইল। প্রভু প্রেমে মত্ত হইয়া "যঃ কৌমারহরঃ" পদ্য বলিতে বলিতে রথাগ্রে নাচিতে লাগিলেন। সে নৃত্য দেখিয়া এবং প্রভুর ভাবময় মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীরূপ প্রেমানন্দে পুলকিত হইলেন। শ্রীরূপ প্রভুর শ্রীমুখে "যঃ কৌমারহরঃ" পদ্য শুনা-মাত্রই তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং সেইখানে দাঁড়াইয়া উক্ত পদ্যের অর্থানুগ একটী পদ্য লিখিলেন, যথা :—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া ললিতাকে বলিতে-ছেন, "সহচরি এই সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, আমিও সেই রাধা, এখানে

তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছি, এই সেই সঙ্গমসুখ, কিন্তু মধুরমুরলীরব-মুখরিত সেই কালিন্দীতটবর্ত্তি বিপিনের নিমিত্তই চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে।

মহাপ্রভু "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক শ্রীমুখে পাঠ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্তে শ্রীরূপ-রচিত এই শ্লোকের ভাবই উথলিয়া উঠিতেছিল। শ্রীহরিদাসবাসে যথাসময়ে যাইয়া গৃহের চালায় প্রভু একখানি লিখিত তাল-পত্র দেখিতে পাইলেন। অক্ষর দেখিয়া বুঝিলেন উহা শ্রীরূপের লিখিত; পাঠ করিয়া দেখিলেন, কিয়ংক্ষণ পূর্ব্বে তিনি রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে যে শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, এই পদ্য সেই পদ্যেরই ভাবানুগত। যে ভাবের প্রবাহে তিনি উক্ত পদ্য পাঠ করিতেছিলেন, শ্রীরূপের পদ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই ভাবে বিরচিত। প্রভু পুলকিত হইলেন, শ্রীরূপ স্নানার্থ সমুদ্রে গিয়াছিলেন। তিনি শ্রীরূপের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিলেন, শ্রীরূপ সমাগত হইলে প্রভু আনন্দে তাঁহার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিলেন, "রূপ তুই আমার মনের ভাব কি করিয়া জানিলি?" রূপ একটুকু মৃদু হাসিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন। মহাপ্রভু শ্রীপাদ স্বরূপকে এই শ্লোকের কথা বলিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন "ইহা তোমারই অনুগ্রহ। নচেৎ অন্যে তোমার মনের ভাব কি করিয়া জানিবে?"

প্রভু বলিলেন, "তবে তোমাকে রহস্য কথা বলিতেছি। উহাকে আমি প্রয়াগে দেখিয়াছিলাম। শ্রীরূপকে যোগ্য মনে করিয়া আমি তখন উহাতে শক্তিসঞ্চার করিয়াছি। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

> প্রভু কহে ইহো আমায় প্রয়াগে মিলিলা।
> যোগ্যপাত্র জানি ইঁহায় মোর কৃপা হৈলা॥
> তবে শক্তিসঞ্চারি উঁহায় কৈল উপদেশ।
> তুমিও কহিও ইহায় রসের বিশেষ॥

রথযাত্রার পরে একে একে অন্যান্য ভক্তগণ বিদায় লইলেন। শ্রীরূপ শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকেই রহিলেন। এই সময়ে শ্রীরূপ গৌড়িয়া ও

উড়িয়া ভক্তগণের চিত্তে যথেষ্ট আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীরূপের মিষ্ট কথায়, সলজ্জ নম্রব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইতেন। শ্রীরূপের ভাষা মধুময়, ভাব মধুময়, ব্যবহার মধুময়—শ্রীরূপের হৃদয় যেন মাধুর্য্যের অফুরন্ত উৎস। তাঁহার রচিত এক একটী পদ্য শুনিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে মাধুর্য্যের উৎস উছলিয়া উঠিত। এইরূপে ভক্তবৃন্দ পরমানন্দে চাতুর্ম্মাস্য অতিবাহিত করিলেন। অহো, আমি জীবাধম, কোটি জন্মেও সে আনন্দের লেশাভাস কল্পনাক্ষেত্রেও আনয়ন করিতে সমর্থ হইব না।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে শ্রীল রামরায় যে শ্রীরূপের নাটক-সমালোচনা করেন, তাহা ভক্তিরসের অনন্ত উৎস। তাই এস্থলে শ্রীরূপের নাটক সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

নাটক শ্রবণ।

শ্রীরূপ অসাধারণ কবিত্বপ্রতিভা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ছন্দোবৈচিত্র্যে, শব্দালঙ্কারে, অর্থালঙ্কারে, বিবিধ কাব্যগুণে ও কাব্য-রীতিতে শ্রীরূপের কবিত্ব সংস্কৃত সৎসাহিত্য-সেবিগণের পরম আদরের ধন। কিন্তু সর্ব্বোপরি যাহা কাব্যের "আত্মা" বলিয়া অভিহিত, সেই রসাভিব্যক্তিই শ্রীরূপের কাব্যের প্রধানতম গুণ। যদিও কাব্য-লক্ষণে আলঙ্কারিকগণের যথেষ্ট মতবৈষম্য * পরিদৃষ্ট

* কাব্য লক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নে কতিপয় বিভিন্ন সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(ক) "কাব্যশব্দোঽয়ং গুণালঙ্কারযুক্তয়োঃ শব্দার্থয়ো র্বর্ত্ততে—ইতি বামনবৃত্তিঃ॥

(খ) নির্দ্দোষং গুণবৎ কাব্যমলঙ্কারৈরলঙ্কৃতং।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্ব্বন্ কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ বিন্দতি॥
ইতি সরস্বতীকণ্ঠাভরণম্।

(গ) সাধুশব্দার্থসন্দর্ভং গুণালঙ্কারভূষিতং।
স্ফুটরীতিরসোপেতং কাব্যং কুর্ব্বীত কীর্ত্তয়ে॥
ইতি বাগ্ভটালঙ্কারঃ।

(ঘ) নির্দ্দোষা লক্ষণবতী সরীতির্গুণভূষিতা।
সালঙ্কাররসানেক বৃত্তির্বাক্ কাব্যনামভাক্॥
ইতি চন্দ্রালোকঃ॥

হয়, কিন্তু যে কোন আলঙ্কারিকের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন, শ্রীরূপের কাব্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে অত্যুত্তম কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

সুললিত শব্দবিন্যাসনৈপুণ্য, অলঙ্কারের সমাবেশে এবং রসসংযোগ-প্রাচুর্য্যে শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামীর কবিত্ব কবিজনেরও পরম স্পৃহনীয় সামগ্রী। কালিদাসাদির কাব্যে বিবিধ প্রকার কবিত্ব গুণাদি আছে, তাহা সকলেরই বিদিত। কিন্তু শ্রীরূপের কবিত্বে আরও যে একটী বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। যিনি সাক্ষাৎ রস, শ্রুতি যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া অভিহিত করেন, সেই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণই শ্রীপাদ রূপের কাব্যনিচয়ের নায়ক, স্বয়ং রাসেশ্বরী রসময়ী শ্রীরাধা—নায়িকা। কাব্যস্থল—চিরকবিতাময়ী কুসুমসুষমা-পরিশোভিত কালিন্দীতটাস্তশোভি শ্রীরাধামাধবের কেলীনিকেতন,—শ্রীবৃন্দাবন। সাক্ষাৎ প্রেমরসে শ্রীপাদ রূপের কাব্য উচ্ছ্বসিত। কিন্তু এই মহাকবি মহা-পণ্ডিত,—ভক্তি-নম্রতার মূর্ত্তিমান্ অবতার হইয়াও এই নাটকের প্রারম্ভে লিখিতেছেন :—

মমাস্মিন্ সন্দর্ভে যদপি কবিতা নাতি ললিতা
মুদং ধাস্যন্ত্যস্যাং তদপি হরিগন্ধাদ্‌বুধগণাঃ।
অপঃ শালগ্রামাপ্লবন-গরিমোদ্গার-সরসাঃ
সুধীঃ কো বা কৌপীরপি নমিতমূর্দ্ধা ন পিবতি॥

(ঙ) কাব্যং রসাদিমদ্ বাক্যং শ্রুতং সুখবিশেষকৃৎ।
ইতি শৌদ্ধোদনি সূত্রম্।

(চ) "ইষ্টার্থপেতা পদাবলী কাব্য"মিতি দণ্ডিমতম্।

(ছ) "রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকশব্দঃ কাব্যম্"
ইতি জগন্নাথ-মতম্।

(জ) "রসাত্মকং বাক্যং কাব্যম্" ইতি মহিমভট্টমতম্।

(ঝ) "রসালঙ্কারযুক্তং সুখবিশেষসাধনং কাব্য"মিতি কেশবমিশ্রমতম্।

অর্থাৎ আমার এই সন্দর্ভে যদিও কাব্যের লালিত্য নাই কিন্তু তথাপি ইহাতে ভক্তগণের প্রীতি লাভ হইবে। কেননা ইহাতে হরিগুণগন্ধ উপলব্ধ হইবে। কূপের জলেও শালগ্রাম স্নাত হইলে ভক্তগণ নমিতমস্তকে তাহা পান করেন।

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রণীত বিদগ্ধমাধব নাটকখানি ব্রজলীলার সুধারসে পরিপ্লুত। শ্রীমতী সত্যভামা দেবীর স্বপ্নাদেশে এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীরূপ পৃথক্ পৃথক্ নাটকে ব্রজলীলা ও পুরলীলা বর্ণনা করার নিমিত্ত নাটকীয় ঘটনার ভাবনা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। রথযাত্রা চলিয়া গেল। গৌড়ের অনেক ভক্ত চাতুর্ম্মাস্য পর্য্যন্ত নীলাচলে রহিলেন। নীলাচলের কীর্ত্তনানন্দ সমানভাবেই বহিয়া গেল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়ের ভক্তগণ গৌড়ে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু শ্রীরূপ নীলাচলেই রহিলেন। তিনি হরিদাসের নির্জ্জন বাসস্থানে অবস্থান করিয়া ব্রজলীলার অনুধ্যান করিতে করিতে ব্রজলীলার মহামাধুর্য্যময় নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিদগ্ধমাধব নাটক।

দিবানিশি শ্রীরূপের কেবল ঐ নাটক লেখার ভাবনা। কখনও ব্রজলীলার নাটক প্রণয়ন-কার্য্যে, কখনও বা পুরলীলার নাটক প্রণয়ন-কার্য্যে তাঁহার দিন রজনী অতিবাহিত হইত। লীলার অনুধ্যানই তাঁহার প্রধানতম কার্য্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। হরিদাসের নিভৃত আবাসে অন্ত কাহারও গমনাগমন হইত না। সেখানে গ্রাম্যবার্ত্তার লেশমাত্রও শুনা যাইত না। সেই নিভৃত নিবাসে মহাপ্রভুর শুভাগমন হইত। তিনি এখানেই শুভদর্শন দানে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে কৃতার্থ করিতেন।

এই সময়ে এক দিবস শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সহসা শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিবাসে উপনীত হইলেন। শ্রীল হরিদাস জপ করিতেছিলেন, আর শ্রীরূপ একপ্রান্তে বসিয়া নাটক লিখিতেছিলেন। মহাপ্রভুর শুভাগমন মাত্রই উভয়ে ব্যস্তভাবে উঠিয়া প্রণত হইলেন, উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া

তিনি শ্রীরূপের নিকটস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীরূপের পুঁথির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বলিলেন,—"এ কি পুঁথি লিখিতেছ", এই বলিয়া পুঁথি হইতে একখানি পাতা তুলিয়া লইলেন। শ্রীরূপের হস্তাক্ষর গুলি দেখিয়াই মহাপ্রভু নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন :—

শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥

গুণগ্রাহী প্রভু গুণের লেশমাত্র দেখিলেও তাঁহার যথাযোগ্য মর্য্যাদা-সূচক প্রশংসা বাক্য না করিয়া নীরব থাকিতে পারিতেন না। এমন মহোদার ভগবদাবির্ভাব আর কোন লীলায় প্রত্যক্ষ হয় নাই। মহাপ্রভু শ্রীরূপের হস্তাক্ষরেরই বা কত প্রশংসা করিলেন। এই পত্রে মহাপ্রভু একটী পদ্য দেখিতে পাইলেন, দেখামাত্রই তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের মহাসাগর উথলিয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উচ্ছ্বসিত আনন্দ-বেগে একটুকু উচ্চৈঃস্বরে পদ্যটী পড়িতে লাগিলেন, তদ্‌যথা :—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্॥
চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং।
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

বিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্কে এই পদ্যটী আছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, এই সময়ে শ্রীরূপ বিদগ্ধমাধব নাটক লিখিতেছিলেন। কিন্তু ইহাতে এরূপ মনে করা যাইতে পারে না যে, শ্রীরূপ একখানি গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিয়া অপর গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেন। তাহা হইলে ১৪৫৪ শক হইতে ১৪৭০ শকের মধ্যে বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলীকৌমুদী ও ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থগুলি পরিসমাপ্ত হইত না। এখনকার দিনে যেমন গ্রন্থকারগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করেন, তখনকার

গ্রন্থকারগণের সে দুঃসাহস ছিল না। তাঁহারা ধ্যানস্তিমিত যোগীর ন্যায় গ্রন্থের বিষয় ভাবিতেন, বৃহস্পতির ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধিতে স্বীয় গ্রন্থে লিখিত বিষয়ের বিচার করিতেন, একবার লিখিয়া বহুবার সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেন। শ্রীরূপের গ্রন্থ-রচনার প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে অনুধাবন করিলে মনে হয় তিনি বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব যুগপৎ কড়চার আকারে লিখিয়াছিলেন। নীলাচলে এই দুই গ্রন্থের প্রায় সকলগুলি পদ্যই বিরচিত হইয়াছিল।

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব নাটকের আলোচনাই পূর্ব্বে দৃষ্ট হয়। ফলতঃ এই নাটকখানি ললিতমাধবের পূর্ব্বেই পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। আমরাও এস্থলে শ্রীচরিতামৃতের ক্রমানুসারে পূর্ব্বেই এই নাটকখানির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই নাটকের প্রত্যেক কথা ও প্রত্যেক পদ্য যেন সুধাধারায় পরিসিক্ত। এই নাটকের "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" পদ্য শুনিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুর আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। নামরূপের মূর্ত্তিমান্ অবতার হরিদাস বলিলেন :—

কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধু মুখে জানি।
নামের মাধুরী ঐছে কাহা নাহি শুনি॥

মহাপ্রভুর এক নিয়ম ছিল, তিনি শ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনান্তে শ্রীল হরিদাসকে দর্শন দান করিতেন। শ্রীরূপের অবস্থানকালে এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীপাদ স্বরূপ, শ্রীল রামানন্দ ও শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া হরিদাসের ভজন-কুটীরে শুভাগমন করিলেন। ইহাঁদের সমক্ষে শ্রীরূপের পরিচয় দিবার জন্যই এই দিনের শুভাগমনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। ভক্তবৎসল প্রভু পথে পথেই ইহাঁদের নিকটে শ্রীরূপের গুণের কথা বলিতে বলিতে আসিতেছিলেন। প্রভু বলিলেন শ্রীরূপের প্রেমভক্তিমাধা কবিত্বের কথা আর কি বলিব, আজ তোমাদিগকে শ্রীরূপের দুইটী পদ্য শুনাইব। এমন ভাবপূর্ণ পদ্য অতি অল্পই দেখিয়াছি

পাওয়া যায়। শ্রীরূপ সুপণ্ডিত, সুকবি, সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্, বিনয়ী, সর্ব্বোপরি পরমপ্রেমিক ভক্ত এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস-তত্ত্বজ্ঞ। তোমরা একবার শ্রীরূপের কবিত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখ, ইহাই আমার বাসনা।”

এইরূপ বলিতে বলিতে সকলে শ্রীল হরিদাসের ভজন-কুটীরে উপস্থিত হইলেন। হরিদাসের ভজনকুটীরে ভক্তরূপ সমুজ্জ্বল নক্ষত্রগণ সহ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রিমা উদিত হইলেন। তাঁহাদের দর্শন-প্রাপ্তিমাত্র শ্রীল হরিদাস ও শ্রীরূপ সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন, প্রভু ভক্তগণসহ পীড়ার উপরে উপবিষ্ট হইলেন, সুদীন ভক্ত শ্রীল হরিদাস ও শ্রীরূপ পীড়ার উপরে উপবেশন না করিয়া উহার নীচে বসিলেন। শ্রীরূপ দীনতার খনি এবং মর্য্যাদা-সংরক্ষণে একান্ত ব্যগ্র।

শ্রীরূপের দর্শন মাত্রই সার্ব্বভৌম, রামানন্দ ও শ্রীপাদ স্বরূপ অতীব আহ্লাদিত হইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, “রূপ, একবার “প্রিয়ঃ সোঽয়ং” শ্লোকটী পাঠ কর, শুনি।” শ্রীরূপ স্বভাবতঃই নম্র ও লজ্জাশীল। নিজের রচিত শ্লোক সর্ব্বজনসমক্ষে পাঠ করিতে তাঁহার লজ্জা হইল। তিনি মাথা হেট করিয়া সলজ্জভাবে নীরব রহিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, “আচ্ছা আমিই ঐ শ্লোকটী শুনাইতেছি।”—এই বলিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ উক্ত শ্লোকটী পাঠ করিলেন। স্বরূপ ইতঃপূর্ব্বেই এই পদ্যটীর রসাস্বাদ করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ এই শ্লোক শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। মহাপ্রভু রথাগ্রে নর্ত্তন করিতে করিতে যখন “যঃ কৌমারহরঃ” পদ্যটী পাঠ করিতেছিলেন, শ্রীরূপ তখন মহাপ্রভুর মনের ভাব জানিয়াই এই পদ্য রচনা করেন, শ্রীল রায় রামানন্দ ও শ্রীল সার্ব্বভৌম শ্রীরূপের উক্ত পদ্য রচনার এই বিবরণ ইতঃপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। শ্রীল রামরায় শ্লোক শুনিয়া বলিলেন “প্রভো, ইহা তোমারই কৃপাপ্রসাদ। নচেৎ তোমার মনের ভাব আর কে জানিতে পারে? ব্রহ্মাণ্ড যে সকল সিদ্ধান্তের সন্ধান জানে না, তুমি আমাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া সেই সকল সিদ্ধান্ত জগতে

প্রকটন করিয়াছ। ইহাতেই আমার অনুমান হইতেছে, শ্রীরূপ পূর্ব্বেই তোমার কৃপাপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তাহা ভিন্ন তোমার হৃদয়ের অনুবাদ কে করিতে পারে? যথা শ্রীচরিতামৃতে—

আমারে সঞ্চারি পূর্ব্বে কহিলে সিদ্ধান্ত
যে সব সিদ্ধান্তের ব্রহ্মা না পায় অন্ত॥
তাতে জানি পূর্ব্বে তোমার পাইয়াছে প্রসাদ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ের অনুবাদ॥

শ্রীল রামরায় এখানে স্পষ্টরূপে নিজের কথা বলিয়াছেন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাব এবং দুর্জ্ঞেয় সিদ্ধান্তসমূহ তাঁহার শক্তি-সঞ্চার লব্ধজ্ঞান ভিন্ন অপরের জানিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। শ্রীল রামরায়ের মুখে যে সকল সিদ্ধান্ত-তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তৎসমস্তই মহাপ্রভুর শক্তি-সঞ্চারের ফল। তাই শ্রীল রামরায় বলিয়াছিলেন :—

———যেই কহাও সেই কহি বাণী।
কি যে কহি ভালমন্দ কিছুই না জানি॥
মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা॥

মহাপ্রভু ভক্তের মান-বর্দ্ধনের নিমিত্ত ভক্তগণের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাদের দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রকটন করিয়াছেন। তাঁহার লীলার ইহাও একটী গূঢ় নিয়ম।

শ্রীল রামরায়কে ও শ্রীপাদ সার্ব্বভৌমকে শ্রীরূপের নাটকের শ্লোক শুনাইবার নিমিত্ত মহাপ্রভু বলিলেন "শ্রীরূপ, নাটকের সেই শ্লোকটী আবার পড় শুনি। তোমার রচিত সেই শ্লোকটী শুনিলে লোকের দুঃখ শোকাদিময় ভব-যাতনার খণ্ডন হয়। সেই নামমাহাত্ম্যের শ্লোকটী একবার পাঠ কর।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীরূপ স্বভাবতঃ লজ্জাশীল ছিলেন, তিনি আত্মপ্রশংসার কথা শুনিলে ম্রিয়মাণ হইতেন। মহাপ্রভুর আদেশ

সত্বেও তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। প্রভু বলিলেন,—শ্রীরূপ আমি বলিতেছি, তুমি সেই শ্লোকটী একবার পাঠ কর। শ্রীরূপ তখন পড়িতে লাগিলেন :—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী ॥

এই পদ্যটী বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রথম অঙ্কে পৌর্ণমাসীর উক্তি। নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলিলেন "ভগবতি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগ অতীব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পৌর্ণমাসী বলিলেন; "কি প্রকারে বুঝিলে?" নান্দীমুখী বলিলেন, যখন কথা প্রসঙ্গে শ্রীরাধা "কৃষ্ণ" এই নাম শ্রবণ করেন, তখন রোমাঞ্চিত হয়েন এবং তাঁহার কি জানি-কেমন এক ভাবের উদয় হয়। পৌর্ণমাসী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "ঠিক কথা, কৃষ্ণ-নামের এমনই মহাত্ম্য বটে।" এই বলিয়া পৌর্ণমাসী উক্ত পদ্য পাঠ করিলেন। উহার অর্থ এই যে,—"কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয়ী যদি মুখরূপ রঙ্গভূমিতে নটীর ন্যায় তাণ্ডবে নৃত্য করিবার সুবিধা পান, তখন কোটি কোটি বদনে কৃষ্ণনাম করার জন্য ইচ্ছার উদ্রেক করিয়া তোলেন। একমুখে কৃষ্ণনাম করিয়া তৃপ্তি জন্মে না, কৃষ্ণনাম করিবার জন্য শত শত মুখ-প্রাপ্তির বাসনা হয়। এই বর্ণদ্বয় কর্ণযুগলে অঙ্কুরিত হইলে কোটি কোটি কর্ণলাভের স্পৃহা জন্মে। ইহা চিত্তের প্রাঙ্গণে আবির্ভূতা হইলে ইন্দ্রিয় ব্যাপার বিজিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সমগ্র ইন্দ্রিয় বিশেষরূপে নামাকৃষ্ট হয়, উহাদের বহির্মুখীক্রিয়া নিরস্ত হয়। নান্দীমুখি "কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয়ী যে কত অমৃতরাশিতে নির্ম্মিত, তাহা বলিতে পারি না।"

শ্রীমদ্ যদুনন্দন দাস এই শ্লোকের যে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, সেই সুমধুর বঙ্গপদ্যানুবাদও এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা :—

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম,
আরতি বাঢ়ায় অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পাঞা, ধরিবারে নারে হিয়া,
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥
কি কহব নামের মাধুরী,
কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানি গঢ়ল ইহা,
কৃষ্ণ এই দুই আখর করি॥
আপন মাধুরী গুণে, আনন্দ বাঢ়ায় কাণে,
তাতে কাণে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষকাণ, যবে হয় তার নাম,
মাধুরী করিতে আস্বাদনে॥
কৃষ্ণ দু আখর দেখি, যুড়ায় তাপিত আখি
অঙ্গ দেখিবারে আখি চায়।
যদি হয় কোটি আখি, তবে কৃষ্ণরূপ দেখি,
নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥
চিত্তে কৃষ্ণনাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে,
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন,
নাচে করে প্রেম-উনমাদ॥
যে কাণে পরশে নাম সে তেজেয়ে আন কাম,
সব ভাব করায় উদয়।
সকল মাধুর্য্য স্থান, সব রস কৃষ্ণ-নাম,
এ যদুনন্দন দাস কয়॥

শ্রীল রামানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণ এই শ্লোক শুনিয়া সকলেই আনন্দে বিস্মিত হইলেন। নামমাধুর্য্য অনেক স্থলে অনেকে অনেক ভাবে বর্ণন

করিয়াছেন, কিন্তু এমন মহামাধুর্য্যময়ী নাম-মাহাত্ম্য-রচনা তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও শুনেন নাই। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

সবে বলে নাম মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর॥

শ্রীল রামরায় বলিলেন, "শ্রীরূপ, আপনি কি গ্রন্থ লিখিতেছেন, যাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্তরত্নসমূহ নিহিত হইতেছে ?" লজ্জাশীল শ্রীরূপ মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। প্রশ্নপরিসমাপ্তি হইতে না হইতেই শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন "শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলা নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়া ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্র লিখিতেছিলেন, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞায় এখন বিদগ্ধমাধব ও ললিত মাধব এই দুই নাটকে দুই লীলা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই পদ্যটী বিদগ্ধ-মাধবে লিখিত হইয়াছে। এই দুইখানি নাটকই প্রেমরসের সুধাধারায় পরিপ্লুত।"

শ্রীরূপ কৃষ্ণলীলার নাটক লিখিতেছেন শুনিয়া রায় রামানন্দ আনন্দিত হইলেন। শ্রীল রামরায় সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবীণ পণ্ডিত। সার্ব্বভৌম ভট্টা-চার্য্য মহাশয়ও তাঁহার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। রায় মহাশয় জানিতেন, দুই চারিটী মাধুর্য্যপূর্ণ সংস্কৃত পদ্য লেখা সবিশেষ কঠিন কার্য্য নহে, কিন্তু নাটক লেখা অতি কঠিন ব্যাপার। তিনি নিজেও শ্রীজগন্নাথবল্লভ নামক একখানি নাটকের রচয়িতা। শ্রীল রামরায় বিশেষরূপেই জানিতেন, গ্রন্থকারের অবাধ কল্পনা ও কবিত্বপ্রতিভা থাকিলে খণ্ডকাব্যাদি সহজেই রচিত হইতে পারে, কিন্তু নাটক রচনায় মানব হৃদয়ের অন্তস্তল দর্শিতার প্রয়োজন। যাহার মুখে যে কথাটী শোভা পায়, বিশুদ্ধ রসের সহিত তাহার মুখে সেই কথা প্রকটিত করিয়া তুলিতে হইলে নাটকের পাত্রাদির চরিত্রে পূর্ণজ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয়। শ্রীকৃষ্ণলীলার নাটক লেখা আরও কঠিন। কেননা, শ্রীভগবানের, তাঁহার শক্তিসমূহের ও পার্ষদগণের

গম্ভীর গূঢ় রহস্যময় চরিত্র-বিশ্লেষণ মানববুদ্ধির পক্ষে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা অসম্ভব। তাই শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর বলিয়াছেন :—

যদ্বা-তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
রস-রসাভাস যার নাহিক বিচার।
ভক্তি-সিদ্ধান্তসিন্ধুর নাহি পায় পার॥
ব্যাকরণ নাহি জানে, না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিষম দুর্গম এই চৈতন্য বিহার॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করু বর্ণন।
গৌর পাদপদ্ম হয় যার প্রাণধন॥
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয় কাব্য শুনিতে হয় সুখ॥

সুতরাং রসাভাস, সিদ্ধান্তবিরোধ, নাটকালঙ্কারজ্ঞানাভাব,—নাটক-রচনার প্রধান অন্তরায়। ইহার উপরে ভক্তিভাবিত হৃদয় ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় অপরের প্রবেশাধিকার জন্মে না, অতএব শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় নাটক লেখা সুবিজ্ঞ ভক্তের কার্য্য। এই কথা বলিয়াই শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর শ্রীপাদ রূপের নাটকের কথা বলিয়া তাহার প্রশংসা করিতেছেন, যথা :—

রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ॥

এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে নাটক-রচনা যে-সে লোকের কর্ম্ম নহে। যে-সে লোকের রচিত নাটক পাঠে রসগ্রাহী পাঠকগণের পরি-তৃপ্তি জন্মে না। উল্লিখিত রসাভাসাদি শ্রবণে সুবিজ্ঞ পাঠকের অতীব

ক্লেশের কারণই হইয়া থাকে। শ্রীরূপের নাটকের মুখবন্ধ শুনিয়াই সুবিজ্ঞ ভক্তগণ পরম আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরূপ নিজে সুপণ্ডিত, ইহার উপরে তিনি প্রেমভক্তির আদর্শ। কিন্তু এই দুইটী অলোকসামান্য গুণও শ্রীরূপের নাটক রচনোৎকর্ষের প্রধানতম হেতু নহে। তিনি স্বভাবতঃই সুকবি ছিলেন। কিন্তু এইরূপ স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি থাকিলেই যে শ্রীকৃষ্ণলীলা নাটক ভক্তজনের প্রীতিকরী হয়, আমরা তাহাও মনে করিতে পারি না। শ্রীরূপের লিখিত নাটক শুনিয়া শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ সমালোচক প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, শ্রীল রামানন্দের ন্যায় প্রবীণ ভক্ত ও সাহিত্যিক বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, শ্রীল সার্ব্বভৌমের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যাপক পুলকিত হইয়াছিলেন। শ্রীরূপের নাটক যে অসাধারণ ও অলোকসামান্য কবিত্বমাধুর্য্যে পরিপ্লুত, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। এইরূপ হইবার হেতু কি? এই হেতু শ্রীচরিতামৃতেই লিখিত হইয়াছে। ইহার একমাত্র হেতু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চার। শ্রীশ্রীভগবৎশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া,—অনুপ্রবিষ্ট ও আবিষ্ট হইয়াই—শ্রীরূপ এই সকল গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে শক্তিসঞ্চারিত করিয়াই তাঁহা দ্বারা ভক্তহৃদয়রঞ্জন নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণলীলার নাটক প্রকটিত করেন এবং তাঁহার হৃদয়ে বৈষ্ণবতত্ত্বের পূর্ণ আলোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

লোক ভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা।
রূপ গোসাঞীকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইলা প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥

শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিলা॥

শ্রীল রামানন্দের শ্রীমুখের কথাও শুনুন। শ্রীল রায় মহাশয় বলিতে-ছেন :—

———তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিল কেমনে॥
আমাতে সঞ্চারি পূর্ব্ব কহিলে সিদ্ধান্ত।
যে সব সিদ্ধান্তের ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত॥
তাতে জানি পূর্ব্বে তোমার পাঞাছে প্রসাদ।
তাহা বিনু নহে তোমার হৃদয়ের অনুবাদ॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাই শ্রীরূপের এই অলোকসামান্য কবিত্বের হেতু। পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে, শ্রীল রামরায় সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্রের একজন প্রবীণ পণ্ডিত। জগদ্বিখ্যাত শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও রায় মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতেন। শ্রীরূপগোস্বামী নাটক লিখিতেছেন, শ্রীপাদ স্বরূপের নিকট এই কথা বিশেষরূপে শুনিয়া রায় মহাশয় শ্রীপাদ গোস্বামিপাদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, আপনার নাটকের নান্দী শ্লোকটী শুনিতে ইচ্ছা করি, দয়া করিয়া পাঠ করুন।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীরূপ স্বভাবতঃই লজ্জাশীল, নিজের শ্লোক অপরকে শুনাইবেন, ইহাতে কে কি মনে করিবেন, বিশেষতঃ তিনি এমন কি-ই বা লিখিয়াছেন যাহা অন্যের শ্রুতিযোগ্য,—এইরূপ ভাবিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর আজ্ঞার কথা মনে করিয়া শ্রীরূপ তৎক্ষণাৎ পড়িতে লাগিলেন :—

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্।

সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসারসরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী ॥

এই পদ্যটিতে বারটী পদ আছে, সুতরাং এটি দ্বাদশপদা নান্দী। ইহাতে আশীর্ব্বাদ আছে, পরম মঙ্গল বস্তুর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই পদ্য চন্দ্রনামাঙ্কিত মঙ্গলার্থপদে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। নাটক চন্দ্রিকায় নান্দীশ্লোকের যে সকল লক্ষণ লিখিত আছে, এই পদ্যটী সেই সকল লক্ষণের অতি সুন্দর উদাহরণ। ইহার ভাবার্থ এই যে,—শ্রীকৃষ্ণের উদারবিলাস, মন্দহাস্য, প্রেমাবলোকন, রমণীয় নর্ম্মবাক্যভঙ্গী প্রভৃতি পরমানন্দময়ী লীলাবিশেষ। এই লীলা "শিখরণী" সদৃশী সুধামধুরা। "শিখরিণী" শব্দের অর্থ "রসালা" ও ছন্দোবিশেষ। এ স্থলে শিখরিণী শব্দটী দ্বারা এক দিকে এই পদ্যের ছন্দের নাম প্রকাশিত হইয়াছে, অপর দিকে হরিলীলাকে শিখরিণী অর্থাৎ রসালা (দধি চিনি ও এলাচি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত তৃষ্ণাপ্রশমক পানীয়বিশেষ) সদৃশ সুপেয়রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হরিলীলা-শিখরিণীর মাধুর্য্য অলৌকিক ও সর্ব্বমাধুর্য্যাপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষশালী। কবিপ্রসিদ্ধি এই যে চন্দ্রসুধার মাধুর্য্যের ন্যায় আর মাধুর্য্য নাই। কিন্তু তাহা ভ্রান্তিমাত্র। এই হরিলীলা-শিখরিণীর মধুরতা চন্দ্রসুধার অহঙ্কারকেও নিরস্ত করিয়া দেয়। এই হরিলীলা-রসালার আর একটী মাধুর্য্যবর্দ্ধক গুণ এই যে ইহা শ্রীরাধাদির প্রণয়স্বরূপ কর্পূরে সুবাসিত। এতাদৃশ হরিলীলারূপিণী সুধামধুরা শিখরিণী তোমার সর্ব্বপ্রকার সন্তাপোদ্গম-বিষম-সংসার পথভ্রমণজনিত তৃষ্ণার প্রশমন করুন।

নান্দীশ্লোকে ইষ্টদেব বর্ণনেরও রীতি আছে। কাব্যশাস্ত্রবিদ্ শ্রীল রায় মহাশয় তাই আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ, এখন ইষ্টদেবের বর্ণনসূচক শ্লোকটী বলুন।" শ্রীরূপ সলজ্জভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের শ্রীমুখমণ্ডলের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টি করিলেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর

মনের ভাব জানিতেন। মহাপ্রভু প্রচ্ছন্নাবতার, তিনি সকলের নিকটে সকল সময়ে আত্মপ্রকাশ করিতেন না, তাঁহার তাদৃশ প্রকাশ-বাসনাও ছিল না। এই ইষ্টদেব বর্ণন শুনিয়া পাছে তিনি কি মনে করেন, পাছে বা অসন্তুষ্ট হয়েন, শ্রীরূপ এইরূপ বিতর্ক করিয়া তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডলের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে যেন কৃপানুমতির নিমিত্ত চাহিয়া রহিলেন। ভক্ত-বৎসল মহাপ্রভু শ্রীরূপের মনের আশা পূরণার্থ বলিলেন, "শ্রীরূপ গ্রন্থ লিখিয়াছ, ভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকট সেই গ্রন্থের শ্লোক শুনাইবে, ইহাতে তোমার লজ্জা কি? রামরায় তোমার গ্রন্থের ইষ্টদেব বর্ণন শুনিতে অভি-লাষী হইয়াছেন। একবার উঁহাকে পড়িয়া শুনাও।"

শ্রীরূপ প্রভুর কৃপানুমতি শুনিয়া পড়িতে লাগিলেন :—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে কেহ কখনও উন্নতোজ্জ্বলরস প্রধান ভক্তি এ জগতে প্রচার করেন নাই। কপিলদেবাদি ভগবদ্ভজনের উপদেশ প্রদান করিয়া-ছেন বটে, কিন্তু উজ্জ্বলরসপ্রধান ভক্তির প্রচার আর কেহ কখনও করেন নাই। মনুষ্যসমাজে এই অনর্পিতচরী উজ্জ্বলরসপ্রধান ভক্তিশ্রী প্রদানার্থ কনককান্তি সমুজ্জ্বল কিরণকদম্বসন্দীপিত শ্রীগৌরহরি কলিকালে করুণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই শচীনন্দন হরি আমাদের হৃদয়কন্দরে সতত স্ফুরিত হউন।"

শ্রীপাদ গ্রন্থকার এই পদ্যে হৃদয়কে কন্দররূপে বর্ণন করায় পদ্যোক্ত "হরি" শব্দের আরোপিত অর্থ সিংহ। অর্থাৎ পর্ব্বতকন্দরে সিংহের বিদ্য-মানতায় সেখানে যেরূপ হস্তী প্রভৃতির সমাগম সম্ভাবিত হইতে পারে না, তদ্রূপ স্বর্ণকান্তি অপেক্ষাও সমুজ্জ্বলসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিত শ্রীশচী-

নন্দনরূপ সিংহ হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত থাকিলে তমোরূপ হস্তী প্রভৃতি দ্বারা হৃদয় কলুষিত হওয়ার আর আশঙ্কা থাকে না। হরি শব্দের চন্দ্র অর্থও এস্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে *।

এই পদ্যটী শ্রবণ করা মাত্রই মহাপ্রভু বলিয়া উঠিলেন "একি! এ অতিস্তুতি † কেন ?"

শ্রীল রামরায়াদি ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, প্রভো অতিস্তুতি কোথায়, যাঁহার স্বরূপবর্ণনাই অসম্ভব, তাঁহার আবার অতিস্তুতি কি ?"

বিদগ্ধমাধব নাটকের ইষ্টদেবের বর্ণন-শ্রবণান্তর শ্রীল রামরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ, কোন্ আমুখে পাত্রসন্নিধান করা হইয়াছে, বলিতে আজ্ঞা হয়।"

সংস্কৃত ভাষার নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে কোন্ প্রস্তাবনায় বা কোন্ আমুখে পাত্রপ্রবেশ করার কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাই শ্রীল রামরায় মহাশয়ের জিজ্ঞাস্য।

---

* "হরি" শব্দের অনেক অর্থ আছে, যথা :—

হরিরিন্দ্রো হরির্ভানু হরির্বিষ্ণু হরির্মরুৎ।
হরিঃ সিংহো হরির্ভেকো হরির্বাজী হরিঃ কপিঃ॥
হরিরংশু হরিভীরু হরিঃ সোম হরির্যমঃ।
হরিঃ শুক্রো হরিঃ সর্পঃ সুবর্ণোঽপি হরিঃ স্মৃতঃ॥

† এ স্থলে যে "অতিস্তুতি" শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা অলঙ্কার শাস্ত্রের "অত্যুক্তি" অর্থবোধক। অত্যুক্তি অর্থ, অতিরঞ্জন। কুবলয়ানন্দকারিকায় অত্যুক্তির যে লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহা এই :—

অত্যুক্তিরদ্ভুতাথ্যশৌর্য্যবীর্য্যাদিবর্ণনম্।
"ত্বয়ি দাতরি রাজেন্দ্র! যাচকাঃ কল্পশাখিনঃ॥"

অর্থাৎ শৌর্য্যবীর্য্যাদি সম্বন্ধে অদ্ভুত ও মিথ্যা বর্ণনের নামই অত্যুক্তি। দৃষ্টান্তস্থলে বলা হইয়াছে, হে রাজেন্দ্র! তুমি যখন দান কর, তখন কল্পবৃক্ষও তোমার নিকট দানপ্রার্থী হয়।

ইহার উত্তরে শ্রীরূপ বলেন, প্রবর্ত্তক নামক আমুখে তিনি বিদগ্ধমাধব নাটকের পাত্রপ্রবেশ কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীপাদ গ্রন্থকার তদীয় নাটকচন্দ্রিকায় প্রবর্ত্তক আমুখের যে লক্ষণ লিখিয়াছেন তাহা এই :—

আক্ষিপ্তঃ কাল-সাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকম্।

প্রবৃত্তকাল বর্ণনের সাদৃশ্য সূচনায় যে স্থলে পাত্রের প্রবেশ হয়, উহারই নাম প্রবর্ত্তক আমুখ।

বিদগ্ধমাধব নাটকখানি নাটক-নির্ণায়ক লক্ষণাবলীর সর্ব্ববিধ উদাহরণে সমলঙ্কৃত। শ্রীল রামানন্দ রায় প্রবীণ সাহিত্যিক পণ্ডিত, তিনি বিদগ্ধ-মাধব নাটক পরীক্ষা করিতে বসিয়াছেন। শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামীর নাটকে নাট্যশাস্ত্রোক্ত বিধিসমূহ কি পরিমাণে প্রতিপালিত হইয়াছে, শ্রীল রামরায় তাহার পরীক্ষা করিতেছেন, তিনি কেবল লক্ষণ-পরীক্ষা করিয়াই তৃপ্ত হইতেছেন না, এক একটী উদাহরণ শুনিয়াও তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিরসের সুধাধারা প্রবাহিত হইতেছে। শ্রোতৃবর্গ শ্রীপাদ রূপের এক এক শ্লোক শুনিয়াই আনন্দে উল্লাসিত হইয়া উঠিতেছেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিভৃত ভজনস্থলীতে প্রেমানন্দের পূর্ণ উৎসব আজ উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। পুরীধামে সকলই যেন পূর্ণতার প্রতিচ্ছবি। শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির সততই ভক্তসমাগমে পরিপূর্ণ, আনন্দবাজার আনন্দের পূর্ণ-বাজার। ওদিকে অনন্তবিসারি উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল বিশাল নীলাম্বু, যেন মহাপূর্ণতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। এই কল্লোলকোলাহলময় মহোদধির তটপ্রান্তে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনকুটির। এই কুটির উচ্চপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং নগরের প্রান্তদেশে অবস্থিত; এখানে সমুদ্রের তরঙ্গগর্জ্জন অথবা নগরের লোককোলাহল প্রায়শঃ পরিশ্রুত হয় না। শান্তির সুখময় পবিত্রতাময় এক প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা এই ভজনকুটিরে সততই অনুভূত হইয়া থাকে।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এই নিভৃতস্থলে বসিয়া নাটক লিখিতে-

ছিলেন, আনন্দময় মহাপ্রভু প্রিয়তম পার্ষদগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরূপের নাটক পরীক্ষার ছলে এই স্থলে যে আনন্দের তরঙ্গ বিস্তার করেন, সে তরঙ্গ বিশাল সমুদ্রতরঙ্গ হইতেও বিশালতর। উহা ভক্ত পাঠকগণের ধ্যানচক্ষুর সন্দর্শনীয় বিষয়। আমাদের মত হীনমতি অধমেরা সে আনন্দসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ নহে।

যাহা হউক অতঃপরে শ্রীল রামরায় আনন্দবিহ্বল চিত্তে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীপাদ আপনার নাটকে প্ররোচনাদি * সম্বন্ধে যে উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে সেই শ্লোক জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

এই কথায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "ভাল, শ্রীরূপ, তোমার নাটকের প্ররোচনা বাক্য শুনিতে আমারও সাধ হইতেছে একবার সেই অংশ পাঠ কর!" তখন শ্রীপাদ রূপ পাঠ করিলেন :—

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ।
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ॥
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধে র্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকোঽয়মুন্মীলতি॥

অর্থাৎ বিশুদ্ধচেতা স্বভাবতঃ সমুজ্জ্বল ভক্তবর্গ এই সভায় সমুদিত হইয়াছেন, গোপীবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের এই নাটকপ্রবন্ধও স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে

---

* প্ররোচনা নাটকশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। সাহিত্যদর্পণকার এই শব্দটী দুই স্থানে দুই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। এক স্থানে লিখিত হইয়াছে :—

"প্ররোচনাতু বিজ্ঞেয়া সংহারার্থ-প্রদর্শনী।"

অর্থাৎ উপসংহ্রিয়মাণ প্রয়োজন-প্রতিপাদিকা প্রোৎসাহ বাক্য প্ররোচনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীল রামরায় এইস্থলে এই প্ররোচনার কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি যে প্ররোচনার কথা বলিয়াছেন তাহার লক্ষণ এই "অক্লাভ্যোন্মুখীকারঃ প্রশংসাতঃ প্ররোচনা"। অর্থাৎ অভিনয় দর্শনাদিতে দর্শকমণ্ডলীর প্রবৃত্তি উন্মুখীকরণসূচক প্রশংসা বাক্যাদিই প্ররোচনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সুসজ্জীকৃত। শ্রীবৃন্দাবন মধ্যস্থ রাসপীঠ রঙ্গস্থলীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে মনে হইতেছে মাদৃশ ব্যক্তির সৌভাগ্যের পরিণামফল আজ বুঝি প্রকটিত হইল।

শ্রীল রামরায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নাটকের বিবিধ লক্ষসূচক বাক্যাদি সম্বন্ধে বিদগ্ধমাধব নাটকে যে সকল উদাহরণ আছে, তাহা শ্রবণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, বিদগ্ধমাধব নাটকখানি নাটকীয় লক্ষণাবলীর পূর্ণ আদর্শ। ইহার উপরে এই নাটকখানি প্রেমভক্তি রসের মহাসাগর সদৃশ। একদিকে শ্রীল রামরায় উদাহরণাবলীর প্রশ্ন করিতেছেন, অপর দিকে শ্রীরূপ ভক্তিভরে তদুত্তরসূচক শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন; অপর একদিকে সপার্ষদ মহাপ্রভু শ্লোকসমূহের রসাস্বাদ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইতেছেন। প্রিয় পাঠক, শ্রীরূপের নাটক-বিচারের এই ভক্তিময় দৃশ্য মানসনেত্রে সন্দর্শন করুন, আর সেই ভাব হৃদয়ে লইয়া বিদগ্ধমাধব নাটকখানি পাঠ করুন, দেখিতে পাইবেন, আপনার অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রেমভক্তির এক বিশাল মহাসাগর তরঙ্গে তরঙ্গে কল্লোলময় হইয়া উঠিতেছে।

যাহা হউক, শ্রীল রামরায় নাটক-লক্ষণের উদাহরণ-প্রশ্নাবলীর পরিসমাপ্তি করিয়া নূতন প্রশ্ন সূচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "শ্রীপাদ, নাটক-লক্ষণের উদাহরণগুলি শুনিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিলাম। সাহিত্যক্ষেত্রে নাটক উচ্চতম আসনে অবস্থিত। নাটক-রচনা অতীব কঠোর ব্যাপার, কিন্তু আপনি যে নাটকখানি লিখিতেছেন, আমি যতদূর শুনিতে পাইলাম, তাহাতে আমার মনে হইতেছে, নাটকীয় লক্ষণবিচারে আপনার এই নাটকখানি আদর্শরূপে গৃহীত হইবার উপযুক্ত। ইহার উপরে, এই নাটকে প্রেমভক্তি রসের বিশালপ্রবাহ সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়াছে। এখন প্রেম-উৎপত্তির হেতু সম্বন্ধে 'আপনি যে সকল উদাহরণ শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তাহা শুনিতে বড় সাধ হইতেছে; কৃপা করিয়া

তৎসম্বন্ধে উদাহরণ শ্লোকগুলি শুনাইলে কৃতার্থ হইব। প্রথমতঃ পূর্ব্ব-রূপের উদাহরণসূচক পদ্যটী শ্রবণ করিতে বলবতী বাসনা হইতেছে, দয়া করিয়া পাঠ করুন।" শ্রীরূপ পাঠ করিলেন :—

"একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥"

অমরকবি শ্রীল গোবিন্দদাস এই পদ্যটীর ভাব লইয়া যে অতি মধুর মনোহর অপূর্ব্বপদ রচনা করিয়াছেন, এ স্থলে তাহাও উদ্ধৃত করা হই-তেছে, তদ্‌যথা :—

সজনি মরণ মানিয়ে বহুভাগী।
কুলবতী তিন পুরুখে ভেলি আরতি
জীবন কিয়ে সুখ লাগি॥
পহিলে শুনলুঁ হাম শ্যাম দুই আঁখর
তৈখনে মন চুরি কেল।
না জানি কো ঐছে মুরলী আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল।
না জানিয়ে কো ঐছে পটে দরশায়লি
নব জলধর জিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম, যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে
তাঁহা তাঁহা রোখয়ে মাতি॥
গোবিন্দ দাস কহয়ে শুন সুন্দরী
অতএব কয়হে বিশোয়াশ।
যাকর নাম মুরলী রব তাকর
পটে ভেল লো পরকাশ॥

শ্রীপাদ রূপের উক্ত পদ্যের ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর ও রসময় ব্যাখ্যা আর কি সম্ভবপর হইতে পারে? শ্রীমতী বলিতেছেন "সখি, আমার দুর্দ্দশা দেখ, আমি কুলবতী, কিন্তু আমার অবাধ্য মন তিনটী পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হইয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এ কি বিপদ্। একজন পুরুষের নাম কৃষ্ণ, তাঁহার নামমাত্র শুনিয়াই আমার মন অধীর হইয়া উঠিয়াছে। আবার আর একটী পুরুষের মুরলীর কলধ্বনিতে প্রাণ মাতিয়া পড়িয়াছে, সখি আমাতে যেন আর আমি নাই। আবার এই চিত্র-পটে যে নবজলধরকান্তি পুরুষের শ্রীমূর্ত্তি দেখিতেছি, এই মূর্ত্তি দেখামাত্রই উহা যেন আমার হৃদয়ে একবারে অঙ্কিত হইয়া গেল। আমি কুলবতী রমণী, এই অবস্থায় এখন আমার মরণই ভাল।"

অতঃপর রামরায় অনুরাগ, বিকার, চেষ্টা ও কামলেখন্ প্রভৃতির উদা-হরণ শ্লোক শুনিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীরূপ তৎসমস্তের উল্লেখ করেন।

তৎপর রামরায় বলিলেন, "শ্রীপাদ আপনি ভাব-স্বভাবের উদাহরণ-সূচক পদ্যটী পাঠ করুন।" তখন শ্রীরূপ এই পদ্যটী পাঠ করিলেন ঃ—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিষ্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা, সুন্দরি, নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ।

অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যাঁহার অন্তরে জাগে, কেবল তিনিই ইহার বক্র-মধুর বিক্রম জানিতে পারেন। ইহার যাতনা নবকালকূটের কটুতা গর্ব্বকেও পরাজিত করে, আবার ইহাতে আনন্দও এত অধিক যে তাহার নিকট সুধামধুরিমার অহঙ্কারও পরাস্ত হয়।

তৎপরে স্বারসিক বা সহজ প্রেমের উদাহরণ সূচক শ্লোক শুনিয়া রাম-রায় প্রীতিলাভ করিলেন। এই স্বারসিক প্রেম, কোথাও সহজ প্রেম, কোথাও নিরুক্তিসিদ্ধ প্রেম, কোথাও অকৈতব প্রেম, কোথাও নিরুপাধি

প্রেম, কোথাও বা নিরপেক্ষ প্রেম নামে অভিহিত হয়। কেননা দোষ-গুণদর্শনে এই প্রেমের ক্ষয় বৃদ্ধি হয় না। ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মধুমঙ্গল পৌর্ণমাসীদেবীর নিকট জিজ্ঞাসা করেন, "দেবি নিরভিসন্ধি প্রেম কেমন?" তদুত্তরে পৌর্ণমাসীদেবী বলেন :—

জগতি কিল বিচিত্রে কুত্রচিন্নিশ্চলাত্মা
ভবতি নিরভিসন্ধিঃ কস্যচিৎ প্রেমবন্ধঃ।
বিলসতি সমুদীর্ণে কুম্ভজে খঞ্জনালী
কলিতবতি তথাস্তং হন্ত নাশং প্রযাতি॥

অর্থাৎ "এই বিচিত্র জগতে স্থলবিশেষে কাহারও কাহারও অভিসন্ধি-বিরহিত নিশ্চল প্রেম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দেখুন অগস্ত্য উদয় হইলে খঞ্জন পক্ষী সকল আনন্দে সর্ব্বত্র বিরাজ করে, কিন্তু হায় অগস্ত্য অস্ত হইলে সেই সকল খঞ্জন পক্ষীকে আর দেখা যায় না।"

অভিসন্ধিশূন্য প্রেমের ইহাও একটা দৃষ্টান্ত স্থল।

ফলতঃ ইহাই সহজ প্রেম। দেহের প্রতি আমাদের যে প্রীতি আছে সেই প্রেমের কোন হেতু বা অভিসন্ধি নাই, জন্মমাত্রেই আমাদের আত্ম-দেহের প্রতি প্রেমের ভাব পরিলক্ষিত হয়। অতি শৈশব সময় হইতেই এই প্রেম পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যখন এই প্রেম উপজাত হয়, এই অবস্থায় ইহাই সহজ প্রেম। এই প্রেম হইতেই জীবন-যোনি-যত্ন উদ্ভূত হইয়া থাকে। শারীর ক্রিয়াতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই জীবন-যোনি-যত্নকে "রিফলেক্স একসন" (Reflex action) প্রভৃতি কথার দ্বারা যেরূপেই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করুন না কেন অথবা বৈশেষিক দার্শনিক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ জীবন-যোনি-যত্নের হেতু সম্বন্ধে যাহাই বলুন না কেন, আমাদের মনে হয়, এই জীবন-যোনি-যত্নের মূল কারণ দেহের প্রতি জীবাত্মার সহজ প্রেম। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই রোদন করে কেন? কেননা মাতৃগর্ভে সে যে

প্রকার সুরক্ষিত ভাবে সংরক্ষিত ছিল, যে প্রকার উষ্ণতা সম্ভোগে তাহার দেহ পরিবর্দ্ধিত হইতে ছিল, যে প্রকার অবস্থানে সে সুখস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিল, বহির্জগতে অবতরণ মাত্রেই এই জগতের অবস্থা তাহার সুখস্বচ্ছন্দতার সম্পূর্ণ প্রতিকূল বলিয়া উহার অনুভব হইল। শিশুর দেহ বহির্ব্বায়ুতে ক্লিষ্ট হইল, শিশু কাঁদিল। শিশুর এই ক্রন্দন উহার দেহের প্রতি জীবাত্মার সহজ প্রেমেরই পরিচায়ক। দেহকে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য জীবাত্মার যে সহজ যত্ন প্রকাশ পায়, তাহা দেহের প্রতি জীবাত্মার সহজ প্রেমপ্রকাশক। এইরূপ প্রেম তর্কবিচারের অপেক্ষা করে না, ভালমন্দের বিচার জানে না, উহা আত্মার একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পৌর্ণমাসী দেবীর রাধাপ্রেম এই জাতীয় হইলেও ইহা অপেক্ষা বহু উচ্চ গ্রামে অবস্থিত। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব গ্রন্থের বহুস্থলে এই সহজ প্রেম বা নিরুপাধি প্রেমের বিশদ ও সূক্ষ্ম আলোচনা দৃষ্ট হয়।

এই গ্রন্থ হইতে প্রেম-পরাভবের লক্ষণসূচক একটী শ্লোকও উদ্ধৃত করা যাইতেছে ; বিরহবিধুরা শ্রীমতীকে প্রবোধ দিবার জন্য বিশাখাদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুঃখের সময়ে প্রিয়জনকে দেখিতে পাইলে দুঃখের বেগ শতধারে উছলিয়া উঠে। এই নিদারুণ বিরহের সময়ে বিশাখাকে দেখিয়া শ্রীরাধার শোকবেগ উথলিয়া উঠিল, তিনি সজলনেত্রে কাতরকণ্ঠে গদ্‌গদবাক্যে বলিতে লাগিলেন :—

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিগ্ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥

অর্থাৎ "সখি, যাহার সরস সঙ্গসুখ-লালসায় গুরুজনের নিকট গুরুতর লজ্জা শিথিল করিলাম, আর তোমরাই বা আমার জন্য কত কষ্টভোগ করিলে। আরও দেখ, এ জগতে ধর্ম্ম অপেক্ষা মহৎ বস্তু আর কি

আছে? সাধ্বীগণের অনুষ্ঠিত সেই পাতিব্রত্য ধর্ম্মও আমি গণ্য করিলাম না। কিন্তু হায় এত করিয়াও আমি শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষিতা হইয়াছি। অধিকতর পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার উপেক্ষিতা হইয়াও এই পাপীয়সী আমি জীবনধারণ করিতেছি। সখি আমার ধৈর্য্যকে ধিক্!" এই বলিয়া শ্রীমতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

রায় রামানন্দ বলিলেন, শ্রীপাদ উপেক্ষাসূচক শ্লোকটীও পাঠ করুন। শ্রীরূপ বলিতে লাগিলেন "আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীমতী আকুল প্রাণে অঞ্জলিবদ্ধা হইয়া বলিতেছেন :—

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি নহি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী॥

"হে কৃষ্ণ, আমরা সরলপ্রাণা গোপবালিকা, ঘরের কোণে পড়িয়া থাকি, ভালমন্দ কিছুই জানি না। আমাদিগকে নিরাশ্রয় দশায় আনিয়া এখন তুমি আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছ, এই কি তোমার উচিত?" ইহার সহিত নিম্নলিখিত আধুনিক সরস গীতটীও পাঠযোগ্য যথা :—

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়?
আমি ভবে একা দাওহে দেখা,
প্রাণসখা রাখ পায়
কালশশী বাজালে বাঁশী;
আমি ছিলেম গৃহবাসী
তুমি করলে উদাসী;
এখন কুল ত্যজে অকূলে ভাসি।
হৃদবিহারী বংশীধারী
পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়

অতঃপরে শ্রীল রামরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ" বিদগ্ধমাধব নাটক সম্বন্ধে আমার আরও কয়েকটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। শ্রীবৃন্দাবনের বর্ণনা, মুরলী নিঃস্বনের প্রভাব ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বর্ণনাসূচক পদ্যগুলি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনার কবিত্ব শুনিয়া আমি প্রকৃতই চমৎকৃত হইয়াছি। এমন সরস, সুন্দর ও সুসিদ্ধান্তিত স্তুতি-কবিতা আর কখনও কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে :—

রায় কহে বৃন্দাবনে মুরলী-নিঃস্বন।
কৃষ্ণ রাধিকার যৈছে করিয়াছ বর্ণন॥
কহ তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।
ক্রমে রূপগোসাঞি কহে করি নমস্কার॥

শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী তখন শ্রীবৃন্দাবন বর্ণনসূচক পদ্য-সমূহ পাঠ করিলেন, তাহাতে রামরায় ও ভক্তবর্গ পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধুররসের নিত্য উৎস। শ্রীচরিতামৃতে উহা হইতে কতিপয় পদ্য উদ্ধৃত করিয়া ঐ গ্রন্থের কবিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে বাহুল্য-ভয়ে উক্ত গ্রন্থের দুই একটীমাত্র পদ্য উদ্ধৃত করা হইল।

শ্রীল রামরায় বিদগ্ধমাধব নাটকের কবিত্ব শুনিয়া বলিলেন :—

——তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার॥

এই দ্বিতীয় নাটক,—শ্রীললিতমাধব। রায় মহাশয়, শ্রীললিতমাধব নাটকের নান্দী-শ্লোক শ্রবণ করার বাসনা প্রকাশ করিলেন। তদুত্তরে শ্রীরূপ বলিলেন, "রায় মহাশয়, আপনার প্রেমভক্তি-প্রতিভা-গৌরব সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জল, আমি আপনার তুলনায় জোনাকী পোকার ন্যায় ক্ষুদ্র। আপনার সমক্ষে মুখব্যাদন করাও

ললিতমাধব নাটক।

আমার পক্ষে অতীব ধৃষ্টতা। তথাপি আপনি আদেশ করিতেছেন সে আদেশ আমার অবশ্যই প্রতিপাল্য।" এই বলিয়া শ্রীরূপ পাঠ করিতে লাগিলেন :—

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্
মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী
দিশতু মুকুন্দ যশঃশশী মুদং বঃ॥

অর্থাৎ অসুর রমণীগণের স্তনরূপ চক্রবাক ও মুখকমলসমূহের বিষণ্ণতা উৎপাদন করিয়া এবং সুহৃচ্চকোরের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড কীর্ত্তিচন্দ্র তোমাদের আনন্দ সম্পাদন করুন।

অতঃপরে শ্রীল রায় মহাশয় বলিলেন, "নান্দী শ্লোক অতি সুন্দর হইয়াছে। নান্দী-লক্ষণের পূর্ণতা ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে। এখন অভীষ্ট দেবের স্তুতি পদ্যটী পাঠ করুন।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীরূপ স্বভাবতঃ লাজুক ছিলেন। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমক্ষে এবং প্রবীণ ভক্তগণ-সমক্ষে তাঁহার নিজের কাব্য পাঠ করা তাঁহার পক্ষে এক গুরুতর লজ্জার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কি করেন, কোন ক্রমেই তিনি শ্রীল রামরায়ের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। অথচ সম্মুখেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বিরাজমান। মহাপ্রভুর বর্ণনাই শ্রীরূপের অভিষ্টদেব-স্তুতি-বর্ণনা। শ্রীরূপের মুখে সঙ্কোচের ভাব দেখা দিল, তিনি কিয়ৎকাল মস্তক অবনত করিয়া লজ্জিত ভাবে নীরব রহিলেন। শ্রীল রামরায় বলিলেন, "আপনার সঙ্কোচ কি, অভীষ্টদেবের স্তুতি পাঠ করিবেন তাহাতে আপত্তিই বা কি?"

শ্রীরূপ তখন পাঠ করিতে লাগিলেন :—

নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।

স লুপ্তিতমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্তু ॥

অর্থাৎ যিনি এই ধরাধামে উদিত হইয়া নিজপ্রেমামৃত-সুধাবর্ষণ করিতেছেন, যিনি দ্বিজকুলসম্রাট্, যিনি জগতের তমোনাশক, সমগ্র জগতের মন যাঁহার বশীভূত, সেই শ্রীশচীনন্দন-শশী আমার সম্বন্ধে কোন অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল বিধান করুন।*

এই পদ্যটী শ্রবণ করামাত্রই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে রোষাভাসের চিহ্ন প্রকটিত হইল। তিনি বলিলেন, "শ্রীরূপ এ কি করেছ? তোমার কবিত্ব কৃষ্ণ-রস-সুধাসিন্ধু সদৃশ, উহাতে মিথ্যাস্তুতিরূপ ক্ষারবিন্দু মিশায়েছ কেন?" যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কবিত্বসুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে কেন মিথ্যাস্তুতিক্ষারবিন্দু ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে এই কথা বাহির হইতে না হইতেই শ্রীল রায় মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "শ্রীরূপের বাক্য অমৃতের পূর সদৃশ, তিনি ইহাতে এই অভীষ্টদেব-স্তুতিরূপ কর্পূর মিশ্রণ করিয়া উহা অধিকতর সুস্বাদু করিয়াছেন। তাহাতে কাব্যের উৎকর্ষই সাধিত হইয়াছে।" যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

রায় কহে রূপের বাক্য অমৃতের পূর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর ॥

---

* এস্থলে চন্দ্রের সহিত শ্রীশচীনন্দনের তুলনোৎকর্ষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। চন্দ্র যৎকিঞ্চিৎ সুধাবর্ষণ করেন, তাহাও কেবল চকোরের ভাগ্যে ঘটে। কিন্তু শ্রীশচীনন্দন-শশী যে প্রেমসুধাবর্ষণ করেন, তাহা সমগ্র জগতের সম্ভোগ্য। চন্দ্র দ্বিজরাজ, কিন্তু ইনি দ্বিজকুলাধিরাজ। চন্দ্র কেবল বাহ্য তমের নাশক, কিন্তু ইনি অন্তস্তমের অপহর্ত্তা। ইহা ব্যতিরেক অলঙ্কার।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিস্মিতভাবে বলিলেন, "রামরায়, ইহাতেও তোমার উল্লাস হইতেছে? এরূপ কথা শুনিতেও লজ্জাজনক, লোকেও ইহাতে উপহাস করিবে।"

শ্রীল রায় মহাশয় বলিলেন, "ইহাতে উপহাস করা ত দূরের কথা, মঙ্গলাচরণে অভীষ্টদেবের এই স্তুতি শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। ইহাতে লজ্জারই বা কারণ কি, উপহাসেরই বা হেতু কি?" শ্রীমন্মহাপ্রভু নীরব রহিলেন। শ্রীরূপের মুখমণ্ডলে ঈষৎ আনন্দের রেখা দেখা দিল।

শ্রীল রামরায় এই নাটক সম্বন্ধে বহুপ্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উদাহরণ শ্লোকগুলি প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন। শ্রীল রামরায় এই পদ্যগুলি শ্রবণে বিস্মিত হইলেন। তিনি নিজে অতি সুপণ্ডিত, কেবল সুপণ্ডিত নহেন,—তিনি তৎসময়ে একজন সুবিখ্যাত সুকবি বলিয়াই জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। ইহার উপরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্তিরসে তাঁহার চিত্ত সততই পরিপ্লুত থাকিত। কয়েকটী পদ্যে তিনি শ্রীরূপের কবিত্বশক্তির যে পরিচয় পাইলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিস্মিত হইয়া উঠিল। তিনি বিস্ময়প্রফুল্ল নেত্রে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"প্রভো আপনার শ্রীচরণকৃপায় এ দাস অনেক কাব্য পাঠ করিয়াছে, অনেক প্রকার কাব্য-শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছে কিন্তু এমন অপূর্ব্ব কবিত্ব আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই,—যেমন শব্দালঙ্কার, তেমনই অর্থালঙ্কার, আর তেমনই ছন্দের লালিত্য। এতদ্ব্যতীত নাটক-লক্ষণের এমন পূর্ণতা আর কোথাও দেখিতে পাই নাই। প্রভো, এতো কবিত্ব নয়,—যেন কাব্যের আকারে অমৃত-মন্দাকিনীর শতধারা এই কাব্যহৃখানি হইতে উধাও-ভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে। কি অদ্ভুত, অপূর্ব্ব কবিত্ব! কিন্তু প্রভো এ সকল সৌন্দর্য্যও কাব্যের বহিরঙ্গ সৌন্দর্য্যমাত্র। রসই কাব্যের আত্মা। শ্রীপাদ গোস্বামী প্রেমরসের যে অদ্ভুত বর্ণন করিয়াছেন তাহা আমার

মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া আনন্দবেগে আমার মস্তক বিঘূর্ণিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীনেরা বলেন :—

* কিং কাব্যেন কবে স্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥

অর্থাৎ যে কাব্য পর-হৃদয়ে লগ্ন হইয়া পাঠকের মস্তক বিঘূর্ণিত করিয়া না তোলে, আর যে কাণ্ড পর-হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আহতকে মূর্চ্ছিত না করে, সেই কাব্যের এবং সেই কাণ্ডের প্রয়োজন কি? প্রভো শ্রীপাদ শ্রীরূপের কাব্যই প্রকৃত সার্থক। এমন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তসম্মত এত সুন্দর সবল ও সারগর্ভ কাব্য অতি বিরল। এইরূপ কাব্য-রচনা মানুষের সামর্থ্যাতীত। আমার মনে হয়, আপনার শক্তিসঞ্চারেই শ্রীরূপ এইরূপ কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ এই সিদ্ধান্তের সার॥
প্রেমপরিপাটি এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন॥
তোমার শক্তিবিনে জীবের নহে এই বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি॥

শ্রীল রামরায়ের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, "রামরায়, তোমার এই অনুমান অতি ঠিক্। প্রয়াগে ইহার সহিত যখন আমার দেখা হয়, তখন ইহার গুণগ্রামে আমার চিত্ত নিরতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। ইহার কাব্য অলঙ্কারে ও মধুররসে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। এইরূপ কবিরভিন্ন প্রেম-রস-প্রচারের আর উপায় নাই। প্রেমরসাস্বাদনভিন্ন প্রেমের ভজন অসম্ভব। শ্রীরূপের কাব্য দ্বারা প্রেমরস প্রচারিত হইবে। তোমরা

কৃপা করিয়া ইহাঁকে এই বর প্রদান কর, শ্রীরূপ যেন নিরন্তর নির্ব্বিঘ্নে ব্রজলীলা-প্রেমরস বর্ণন করিতে পারে।” যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রভু কহে প্রয়াগে ইহার হইল মিলন।
ইহাঁর গুণে ইহাঁয় আমায় তুষ্ট হৈল মন॥
মধুর প্রসঙ্গ ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥
সবে কৃপা করি ইহাঁরে দেহ এই বর।
ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর॥

অতঃপরে করুণাময় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল রামরায়ের নিকটে শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর পরিচয় প্রদানার্থ বলিতেছেন :—

ইহাঁর যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তার সম॥
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তার রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্য তাহাতেই স্থিতি॥
এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥

প্রভু বলিলেন “রামরায়, তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ তাহা অতি ঠিক।” শ্রীল রামরায় বলিলেন, “প্রভো, আপনার ইচ্ছা অমোঘ। শ্রীরূপ তো পরম পণ্ডিত, সুকবি ও ভক্ত, ইহার দ্বারা আপনি প্রেমরস প্রচার করিবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

——ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতুল তুমি পার নাচাইতে॥
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে।
সেই সব রস দেখি এই ইহাঁর লিখনে॥

ভক্ত কৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও, সেই করিবে, জগৎ তোমার বশ॥

নাটক-সমালোচনায় উক্ত কয়েক ছত্রই শ্রীল রামরায়ের উপসংহার বাক্য। পূজ্যপাদ শ্রীল রায়মহাশয়ের এই বাক্য যেমন মধুর, তেমনই সরস ও সারগর্ভ। রামরায় স্পষ্টতঃ বুঝিয়াছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে তিনি মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন সে সকল বাক্য তাঁহার নিজের নহে,—উহা ব্রজরস প্রকাশার্থ মহাপ্রভুরই প্রেরণা। এখন তিনি বুঝিলেন শ্রীপাদ রূপের যে কাব্য তিনি আলোচনা কবিতে বসিয়াছেন, তাহা মানুষেব শক্তিতে রচিত হয় নাই, উহাও মহাপ্রভুর প্রেবণা,—তাঁহাবই শক্তি সঞ্চাবেব ফল। এখন শ্রীল বামরায়েব বিস্ময়ের ভাব অপনোদিত হইল। তাই শ্রীল রায় মহাশয় প্রশান্ত চিত্তে বলিলেন :—

ভক্ত-কৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজবস।
যাবে কবাও, সেই কবিবে, জগৎ তোমাব বশ॥

শ্রীল বামরায় কৃপা করিয়া আমাদিগকে জানাইলেন,—শ্রীরূপের নাটক দুইখানি ব্রজরস-প্রকাশের উপায়স্বরূপ। ভক্তগণকে ব্রজরসের সুধা-মাধুরী আস্বাদিত করাইবার নিমিত্ত পরম দয়াল মহাপ্রভু শ্রীরূপ দ্বারা ইহজগতে ব্রজরসের সুধামন্দাকিনীব প্রসন্ন ধারা এই নাটক-আকারে প্রবাহিত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর অধিক লেখা বাহুল্য। এই দুই গ্রন্থের যাহা উদ্দেশ্য, রামরায় সর্ব্বপ্রথমে এ জগতে তাহা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। প্রেমিক ভক্তগণ শ্রীল রায়মহাশয়ের ভাবপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই এই গ্রন্থদ্বয়ের রসাস্বাদন করুন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রদ্যুম্নমিশ্র ও কৃষ্ণকথা।

পাঠক মহোদয়গণের অবিদিত নহে যে, মহানুভাব শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত। শ্রীচরিতামৃতে ইনি নীলাচলীয় ভক্ত-বৃন্দের মধ্যে গণিত হইয়াছেন, যথা :—

নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণ এবে করিয়ে গণন॥
বড় শাখা এক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তার ভগিনীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য॥
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইল আনন্দ॥

আদি ১০ম পরিচ্ছেদ।

বলা বাহুল্য, এই প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নহেন, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী স্বতন্ত্র ভক্ত। এই ভক্তপ্রবরে সময়ে সময়ে মহাপ্রভুর আবেশ হইত। ইনি শ্রীনৃসিংহোপাসক ছিলেন। শ্রীনৃসিংহে ইঁহার পরম প্রেম ছিল। তাই মহাপ্রভু ইঁহার অপর নাম রাখিয়াছিলেন—শ্রীনৃসিংহানন্দ, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর আগে নাম ছিল।
নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছেতে রাখিল॥
তাহাতে হইল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব॥

কিন্তু এস্থলে যে প্রদ্যুম্নের কথা বলা হইতেছে ইনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র,—প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নহেন। প্রদ্যুম্ন নীলাচলে অবস্থান করিতেন। ইঁহার হৃদয় অতি সরল ছিল, ইনি গৃহস্থ অথচ বহুদিন হইতেই সংসারসুখে বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন। ইদানীং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সুশীতল চরণছায়া লাভ করিয়া ইঁহার সরল পবিত্র হৃদয়ে ভক্তির মন্দাকিনী সুধাপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল। ভক্তির প্রথম সঞ্চারেই হৃদয় কৃষ্ণপ্রেম লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। প্রদ্যুম্নেরও তাহাই হইল। কোথায় গিয়া কাহার নিকট কৃষ্ণকথা শুনিবেন, দিনযামিনী প্রদ্যুম্নের কেবল ইহাই চিন্তা। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করাই তাঁহার তৃষিত চিত্তের বলবতী পিপাসা, কিন্তু প্রথমতঃ তাঁহার হৃদয়ে সে সাহস হইল না। তিনি কি কবিয়া প্রভুর সমীপস্থ হইবেন, কি করিয়া তাঁহাকে বলিবেন "প্রভো আমি আপনার শ্রীমুখে কৃষ্ণকথা শুনিব"—মহাপ্রভুর নিকট এই বিষয়ে অনুরোধ কবাও প্রদ্যুম্ন বেয়াদবী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণেব পিপাসা উত্তরোত্তর অধিকতর বলবতী হইতে লাগিল, উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিল, উৎকণ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার-জ্ঞানও তিরোহিত হইতে লাগিল, সুতরাং সঙ্কোচ কমিয়া গেল।

এক দিন উৎকণ্ঠার প্রবল আবেগে প্রদ্যুম্ন সহসা মহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হইলেন, দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া বলিলেন :—

> মহাপ্রভো, মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
> কোন ভাগ্যে পাইয়াছোঁ তোমার দুর্ল্লভচরণ॥
> কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
> কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয়॥

মিশ্রের সরল প্রাণের সাদাসিধে এই নিবেদন শুনিয়া দয়াময় মহাপ্রভু অবশ্যই তাঁহার প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গলীলার অভিনব পাঠকগণের এরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু গম্ভীরচরিত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-

লীলারহস্য বৃহস্পতিরও দুর্জ্ঞেয়। প্রদ্যুম্নের প্রার্থনা বাক্য তদীয় মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে না হইতেই মহাপ্রভু বলিলেন—"মিশ্র, আমি ত কৃষ্ণকথা জানি না। কেবল এক রামানন্দই কৃষ্ণকথা জানেন। তবে আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে পাই। কৃষ্ণকথা শুনিবার যে ইচ্ছা হয়, ইহাও ভাগ্যের কথা। কৃষ্ণকথা শুনিতে হইলে রামানন্দের নিকট যাও। তিনি তোমায় কৃষ্ণকথা শুনাইবেন। সৌভাগ্য না হইলে কৃষ্ণ-কথায় রুচি হয় না। তোমার যখন কৃষ্ণকথা শুনিতে এত রুচি, ইহা তোমার সৌভাগ্যেরই পরিচয়। শ্রীভাগবত বলেন :—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম সুন্দররূপ অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি শ্রীকৃষ্ণকথায় রুচি উৎপাদন না করে, তবে তাহা কেবল বৃথা শ্রমমাত্র।

তোমার যখন কৃষ্ণকথায় রুচি হইয়াছে, তখন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের ফল তোমাতে বর্ত্তিয়াছে। তুমি দীন বলিয়া এবং গৃহস্থ অধম বলিয়া নিজকে অতি তুচ্ছ মনে করিতেছ, কিন্তু তোমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে? মিশ্র, তুমি রামরায়ের নিকট যাও। তিনি তোমাকে কৃষ্ণকথা শুনাইবেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রভু কহে কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানেন, তাঁর মুখে শুনি॥
ভাগ্য তোমার—কৃষ্ণকথা শুনিতে হইল মন।
রামানন্দ পার্শে যাই করহ শ্রবণ॥
কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার, বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্॥ *

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে "কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-মাহাত্ম্য" বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে।

প্রভু সরলপ্রাণ প্রত্যুম্নকে এক কথায় বিদায় করিলেন। তিনি যখন বলিলেন, "আমি কৃষ্ণকথা জানি না, কেবল রামানন্দ জানেন, আমি তাঁহারই মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া থাকি, তুমি তাঁহার কাছে যাও।" তখন প্রত্যুম্ন এই উক্তি কি ভাবে বুঝিয়াছিলেন বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যুম্ন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ রামরায়ের নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। প্রত্যুম্ন পরম ভক্ত। প্রভুর অভিপ্রায়-বিচার তাঁহার কার্য্য নহে, তাঁহার আজ্ঞাই প্রত্যুম্নের শিরোধার্য্য এবং অবিচারিত চিত্তে প্রতিপাল্য। ভক্ত-হৃদয়ের ইহাই এক বিশেষ বিশিষ্টতা। আমাদের ন্যায় লোকের হৃদয়ে ইহা লইয়া একটা অসঙ্গত অবৈধ আন্দোলনের উদ্রেক হইতে পারে। আমরা হয় ত মনে কবিতে পারি, প্রভু আমাকে অধম মনে করিয়া তুচ্ছ করিলেন, প্রভু আমাকে তাড়াইয়া বিদায় করিলেন। কিন্তু বিদগ্ধ-শিরোমণির বাক্যচ্ছটায় সেই আশঙ্কার কারণ নাই। প্রত্যুম্ন নিজকে দীন গৃহস্থ অধম বলিয়া জ্ঞাপন কবিলেন। কিন্তু স্পষ্ট-বক্তা সত্যবাদী নিরপেক্ষ প্রভু তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তব করিলেন, "তুমি অধম নও,—ভাগ্যবান্। কেননা, কৃষ্ণকথায় তোমার রুচি জন্মিয়াছে। কৃষ্ণকথা শ্রবণে যাঁহার রুচি জন্মে, তিনি অধম নহেন। তিনি অতি ভাগ্যবান্ লোক।" সুতরাং প্রত্যুম্ন মিশ্রকে গৃহস্থ-অধম মনে করিয়া প্রভু দায়সারা ভাবে রামানন্দের নিকট পাঠান নাই। প্রত্যুম্ন দয়াময় প্রভুর কৃপাদেশে তেমন আশঙ্কা করেন নাই। করুণাময় মহাপ্রভু রামরায়ের নিকটে যাইয়া কৃষ্ণকথা শুনিতে আদেশ করিলেন, প্রত্যুম্ন আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

প্রত্যুম্নমিশ্রের সন্দেহ।

প্রত্যুম্নমিশ্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাদেশে শ্রীল রামরায়ের বাসভবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া শুনিতে পাইলেন, রায় মহাশয় বাড়ীতে নাই, নিভৃত উদ্যানে আছেন। প্রত্যুম্ন বলিলেন, "নিভৃত উদ্যানে কেন?" ভৃত্য বলিল, "তিনিপ্রায়শঃই

বাগানে থাকেন। আপনি শুনিয়া থাকিবেন, রায় মহাশয়ের একখানি নাট্যগীতি-কাব্য আছে। তিনি সেই নাটকের গানগুলি দুইজন কিশোর-বয়স্কা পরম সুন্দরী দেবদাসীকে (শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সমক্ষে নর্ত্তকী ও গায়িকা) শিক্ষা দিয়া থাকেন। কেবল গান নয়, তিনি উহাদিগকে বিবিধ প্রকার অঙ্গভঙ্গী এবং নৃত্যাদিও শিক্ষা দেন। সেখানে আর কাহারও যাইবার অধিকার নাই। আপনি কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম করুন, তিনি ফিরিয়া আসিলে যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই হইবে।”

ভৃত্যের কথায় প্রদ্যুম্ন মিশ্রের হৃদয় চমকিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—একি কথা! রায় মহাশয় পরম বৈষ্ণব, সংসারবিরাগী কৃষ্ণ-ভক্ত;—রমণীদ্বয়কে নাট্যগীতি শিক্ষা দিবার তাঁহার কি প্রয়োজন? তিনি কৃষ্ণনাম জপ করিবেন, লীলাগ্রন্থ পাঠ করিবেন, সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা কহি-বেন। নারী লইয়া নিভৃত উদ্যানে যাইবার কি আবশ্যক? উহারা বয়সে কিশোরী, তাহাতে আবার পরমা সুন্দরী। উহাদিগকে ইনি বিবিধ অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যগীতাদি শিক্ষা প্রদান করেন, এ কেমন কথা! নিভৃত উদ্যান, তাহাতে রমণী, সেই রমণী দুইজনও বয়সে কিশোরী ও পরমা সুন্দরী। ইহার উপরে সে উদ্যানে প্রবেশ করার অপর কাহারও অধি-কার নাই। এ কেমন নৃত্যগীত-শিক্ষা? শ্রীভাগবত বলেন, যোষিৎসঙ্গ নরকের হেতুস্বরূপ। মহাভাগবত শ্রীল রামরায় রূপবতী দুইটী কিশোরী সহ নিভৃত উদ্যানে সময়ক্ষেপ করেন কেন?—প্রদ্যুম্নমিশ্রের হৃদয়ে সহসা সন্দেহের তুফান উঠিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি মনে করিতে লাগিলেন, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু কি শ্রীল রামরায়ের এই রহস্যময় ব্যাপারের কথা জানিতে পান নাই? যিনি কিশোরী দেবদাসী লইয়া নিভৃত উদ্যানে সময়ক্ষেপ করেন, তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে আমাকে পাঠাইলেন কেন? এই মনে করিয়া অতীব দুঃখের সহিত প্রদ্যুম্নমিশ্র তৎক্ষণাৎ স্বগৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতে মনন করিলেন—আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া গমনোন্মুখ হই-

লেন—আবার একটুকু চিন্তা করিয়া বসিলেন। মিশ্রের বোধ হইতে লাগিল, যেন সমগ্র জগৎটা আন্দোলিত হইতেছে, তিনি চক্ষে আঁধার দেখিতে লাগিলেন, আর মনে করিতে লাগিলেন "এই কি মহাভাগবতের কার্য্য,—যোষিৎ লইয়া নিভৃত প্রমোদোদ্যানে বিহরণ! যাহা হউক, যখন আসিয়াছি, তখন একবার দেখা করিয়া যাওয়া উচিত। নচেৎ প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়।"

প্রদ্যুম্ন মিশ্র বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, দণ্ডের পর দণ্ড চলিয়া যাইতে লাগিল, শ্রীরামরায় ফিরিলেন না। যখন বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতিবাহিত হইল, তখন শ্রীল রামরায় গৃহে আসিলেন, আসিবামাত্রই তাঁহার ভৃত্য তাঁহাকে মিশ্রের কথা জানাইলেন। রায় মহাশয় আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মিশ্র মহাশয়ের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিলেন—রায় মহাশয় যেন শশব্যস্ত, যেন কত অপরাধী। তিনি ব্যস্তভাবে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর এতক্ষণ হইল আপনার আগমন হইয়াছে, অথচ আমাকে কেহ এ সংবাদ দেয় নাই, এ কথা কেহই আমাকে বলে নাই, আপনার চরণে আমার না-জানি কত অপ-রাধই ঘটিল! যাহা হউক আপনার চরণস্পর্শে আজ আমার বাড়ী পবিত্র হইল। এখন আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, আমি আপনার দাসানুদাস।"

রামরায়ের আকার-প্রকার ও ভক্তিভাবিত মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া এবং তাঁহার অলৌকিক বিনম্র-মধুরবাক্য শুনিয়া প্রদ্যুম্নমিশ্রের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এতক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীল রামরায়ের সম্বন্ধে যে এক প্রকার সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, শ্রীরামরায়ের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই যেন সেই ঘনীভূত সন্দেহ লঘুতর হইয়া গেল। মিশ্র বলিলেন, "রায় মহাশয়, "আপনাকে দর্শন করার নিমিত্ত আমি এখানে আসিয়াছি, দেখিয়াই কৃতার্থ হইলাম—আপনাকে দেখিয়া পবিত্র হইলাম।"

অনেক বেলা হইয়াছে দেখিয়া মিশ্র মহাশয় আর কোন কথা না তুলিয়া শ্রীল রামরায়ের নিকট হইতে বিদায় লওয়ার প্রয়াসী হইলেন। শ্রীল রামরায় বহুপ্রকারে মিশ্র মহোদয়কে অভ্যর্থিত করিলেন, এবং কিয়ৎকাল তাঁহার অনুগমন করিয়া উভয়ে আপন আপন গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীল রামরায় পরম বৈষ্ণব,—বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমহাভুর একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত, তিনি নিভৃত উদ্যানে কিশোরী সুন্দরীদ্বয়ের সহিত বিচরণ করেন, এই কথায় শ্রীমৎ প্রদ্যুম্নমিশ্রেব ভাবান্তব হওয়া অতীব স্বভাবিক। কেন না, মহাভাগবত ভক্তগণের মধ্যে তিনি কখনও এইরূপ আচার দেখেন নাই। ধর্ম্মার্থী সাধুগণ পরস্ত্রীব স্মরণ ও তাঁহাদেব সহিত গুহ্যালাপ প্রভৃতিও পতনের কাবণ মনে কবিয়া এ সম্বন্ধে সততই সাবধান থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেও বহুস্থলে এইরূপ সাবধানতা-সূচক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বহুবার বহুজনকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, প্রদ্যুম্নমিশ্রের তাহা অবিদিত ছিল না। শ্রীপাদ সনাতনের শিক্ষাতেও করুণাময় মহাপ্রভু বিশিষ্টরূপে এই অত্যুপাদেয় উপদেশ প্রচার করিয়া ধর্ম্মার্থীদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। প্রদ্যুম্নমিশ্রের হৃদয়ে সেই সকল উপদেশ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। সুতরাং কিশোরী রমণীদ্বয়সহ শ্রীরামবায়ের নিভৃত উদ্যানে অবস্থান করার কথায় প্রদ্যুম্নমিশ্রের সন্দেহ হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক নহে।

শ্রীমৎ প্রদ্যুম্ন মিশ্র সতত সাধুসঙ্গ করিতেন, সদাচারসম্পন্ন সাধক ভক্তদিগের আচার-নিয়ম তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ বহুবার শ্রবণ করিয়াছেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে এ সম্বন্ধে যে সকল বচন প্রমাণস্বরূপ স্বীয় শ্রীমুখে বলিতেন, প্রদ্যুম্ন অনেক সময়ে তাহা মনোযোগের সহিত শুনিতেন। শ্রীপাদ সনাতনের উপদেশকালে দয়াময় মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন :—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তে
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তা প্রশান্তাঃ
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যঃ॥

অর্থাৎ যাঁহাবা সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধবিবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতেব সুহৃদ্ ও সদাচাব সম্পন্ন, তাঁহাবাই মহান্। এই সাধুগণের সেবাই বিমুক্তির দ্বার এবং যোষিৎ সঙ্গীব সঙ্গ নরকেব দ্বারস্বরূপ। অপিচ—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ এবং উহাব সঙ্গীর সঙ্গ দ্বারা লোকের যাদৃশ মোহ এবং সংসাবনন্ধ ঘটিয়া থাকে, অন্য কিছুতেই তাদৃশ হয় না। এস্থলে গৃহস্থগণেব পক্ষে "যোষিৎ" শব্দে "কামপত্নী" বুঝিতে হইবে। শাস্ত্র এস্থলে অতি সতর্ক। স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পর্য্যন্ত মোহবন্ধের হেতুরূপে গণ্য হইয়াছে। কামপত্নীর সঙ্গ যে নরকের হেতু, ইহা ত অতি স্পষ্ট। কিন্তু যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গও তাদৃশ। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ক্রমসন্দর্ভ টীকায় ইহার ব্যাখ্যা কবিয়া লিখিয়াছেন, "সঙ্গোঽত্র তদ্বাসনয়া তদ্বার্ত্তাদিময়ঃ"। ফলতঃ যোষিৎসঙ্গীর হৃদয় সর্ব্বদা সেই সঙ্গলালসায় বিভোর থাকে, তাঁহাব নিকট ঐ সকল আলাপ অতি মধুর বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাহার সঙ্গীর নিকটেও সে ঐ প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে ভালবাসে। এই পাপালাপে যোষিৎ-সঙ্গীর চিত্ত পাপময় হইয়া উঠে। সুতরাং যোষিৎ সঙ্গীর সঙ্গও নরকের হেতু। প্রভুর এই উপদেশ শ্রীমৎ প্রদ্যুম্নের স্মৃতি-পথে বিরাজিত ছিল।

অপিচ রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনলাভের নিমিত্ত যখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন, তখন শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজার প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া করিবার জন্য প্রভুর শ্রীচরণ সমক্ষে কাতরকণ্ঠে

কত অনুনয় বিনয় করিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "সার্ব্বভৌম, তোমার এই বাক্য আমি রাখিতে পারিব না। আমি নিষ্কিঞ্চন, ভব-সাগর পার হইতে ইচ্ছুক, এই নিমিত্ত ভগবদ্ভজনে উন্মুখ হইয়াছি। আমার পক্ষে রাজদর্শন ও স্ত্রীদর্শন, বিষভক্ষণ হইতেও অহিতকর। যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে :—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষো র্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥
আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্ম্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি।

শ্রীচরিতামৃতকার ইহার ভাবানুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন :—

প্রভু কহে তথাপি রাজা কাল সর্পাকার।
কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥

অর্থাৎ স্ত্রী ও বিষয়ীদের প্রতিমা দেখিয়াই ভগবদ্ভজনোন্মুখজনের ভয় করা কর্ত্তব্য। যেহেতু সর্প দেখিয়া যেমন মনক্ষোভ হয়, সর্পের আকার দেখিয়াও সেইরূপ মনক্ষোভ জন্মে।

প্রভু যে এইরূপ উপদেশজনক আপত্তি দেখাইয়া পরম পণ্ডিত সার্ব্ব-ভৌমকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, মিশ্র মহাশয়ের হৃদয়ে সে উপদেশ-বাক্য পাষাণ-রেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছিল তিনি নিজেও কতবার কত জনের নিকট শ্রীগৌরচন্দ্রের এই সাবধানতাসূচক শিক্ষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ পরম ভক্ত, পরম পণ্ডিত রামানন্দ যোষিৎ-সঙ্গে বিচরণ করেন, ইহাতে প্রদ্যুম্নের হৃদয়ে সংশয় উপস্থিত না হইবে কেন? প্রভুর সুস্পষ্ট উপদেশ এই যে, নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনোন্মুখ ব্যক্তি-দের পক্ষে স্ত্রী-প্রতিমা-দর্শনও অহিতকর। কিন্তু মিশ্র শুনিলেন, "শ্রীল

রামরায় দুইজন তরুণবয়স্কা দেবদাসীসহ নিভৃত উদ্যানে বিচরণ করিতেছেন। প্রভুর উপদেশে এবং প্রভুর একজন প্রিয়তম ভক্তের আচরণে ঘোরতর অসামঞ্জস্য দেখিয়া শ্রীমৎ প্রদ্যুম্নমিশ্রের হৃদয় যে সন্দেহাকুল হইবে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এ সম্বন্ধে কেবল দুই একটী উদাহরণ নহে, আরও অনেক সময়ের অনেক কথা মিশ্রের মনে উদয় হইতে লাগিল—মিশ্রের মনে হইল,—ছোট হরিদাসের কথা। তদ্‌যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন॥

যথা শ্রীভাগবতে (৯।২১।১৫); মনুসংহিতায় (২।২১৫) :—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

অর্থাৎ মাতা, ভগিনী, এমন কি কন্যার সহিতও সঙ্কীর্ণ আসনে একত্র উপবেশনাদি করিবে না। কেননা ইন্দ্রিয়গণ অতীব বলবান্, উহারা বিদ্বান্‌কেও আকর্ষণ করে।* এই সকল স্থলে বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত অপর রমণী দর্শন স্পর্শন, তৎসম্বন্ধে চিন্তন, এবং উহাদের সহিত এক

---

* শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"স্ত্রীসন্নিধানন্তু সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যাহ্" অর্থাৎ স্ত্রীসন্নিধান সর্ব্ব প্রকারেই ত্যাজ্য ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায়। অবিবিক্তাসনঃ—সঙ্কীর্ণাসনস্থঃ। শ্রীমদ্বীররাঘবও তদীয় ভাগবতচন্দ্রিকা টীকায় এই অভিপ্রায়ের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। শ্রীমদ্বিজয়ধ্বজ তদীয় পদরত্নাবলী ব্যাখ্যায় অবিবিক্তাসনের অর্থ করিয়াছেন—একশয্যাসন। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সারার্থদর্শিনী টীকায় অবিবিক্তাসনের অর্থ লিখিয়াছেন অপৃথগ্‌ভূত আসন। শ্রীমদ্ শুকদেব সিদ্ধান্তপ্রদীপে অবিবিক্তাসনের ব্যাখ্যায় বাসিকৃত ব্যাখ্যারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

শয্যাসনে অবস্থানোপবেশন কিংবা একত্র বিচরণ যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর একান্ত নিষেধসূচক উপদেশ, তাহা প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভৃতি ভক্তমাত্রেরই সুবিদিত ছিল। সুতরাং মিশ্রের হৃদয়ে এই সন্দেহ অতীব স্বাভাবিক।

যদিও শ্রীল রায় রামানন্দের সহিত কিয়ৎক্ষণমাত্র আলাপেই মিশ্র মহাশয়ের ঘনীভূত সন্দেহ কিয়ৎ পরিমাণে লঘুতর হইল, কিন্তু তদীয় হৃদয় হইতে সন্দেহরেখা একেবারে অপগত হইল না। আর একদিন মিশ্র মহাশয় মহাপ্রভুর চরণান্তিকে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। দেখামাত্রই মহাপ্রভু বলিলেন, "মিশ্র রামরায়ের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়াছ তো? মিশ্রের মুখমণ্ডল একটুকু ম্লান হইল, মহাপ্রভুর নিকট তিনি কি করিয়া রামরায়ের কথা বলিবেন, ইহাতে মহাপ্রভুই বা মনে কি করিবেন, মিশ্র এইরূপ মনে করিয়া কিঞ্চিৎকাল অধোবদনে মহাপ্রভুর শ্রীচরণের দিকে চাহিয়া একটুকু ভাবিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু সাহস দিয়া বলিলেন, "মিশ্র কি ভাবিতেছ? যাহা শুনিয়াছ, অকুতোভয়ে সকল কথা আমার নিকট বল।"

সন্দেহ-ভঞ্জন।

মিশ্র যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে ও সঙ্কোচিতভাবে মহাপ্রভুর নিকট বলিয়া নীরব হইলেন। মহাপ্রভুর সমীপে সেই সময়ে যে সকল নিষ্কিঞ্চন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন, মিশ্র মহাশয়ের কথা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন, অনেকের মুখমণ্ডলেই দুঃখের ভাব পরিলক্ষিত হইল। এমন কি কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন, "একি কথা, শ্রীল রামরায় পরম ভক্ত, তাঁহার একি ব্যবহার?" সর্ব্বসন্দেহ-ভঞ্জনকারী সর্ব্ব অসামঞ্জস্যের বিশুদ্ধ মীমাংসক পরম দয়াল মহাপ্রভু ভক্তগণের কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা বলিতেছ, তাহা অতি ঠিক। বিষয়ী-দের পক্ষে রমণীদের সহিত একত্র অবস্থান যে ভজনের একান্ত প্রতিকূল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, যথাশক্তি

সন্ন্যাসীর ভাবে দিন যাপন করিতেছি, আমি সর্ব্বপ্রকারে বিষয়-বিরক্ত, ইহাই আমার ধারণা এবং এই সকল বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিতেও আমি সতত সচেষ্ট। প্রকৃতি-দর্শন (নারী-দর্শন) দূরে থাকুক, উঁহাদের নাম শুনিলেও আমার দেহ ও মনের বিকৃতি ঘটিতে পারে। রমণী-দর্শনে কাহার চিত্ত স্থির থাকিতে পাবে। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

আমি ত সন্ন্যাসী, আপনাকে বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূবে বহুক, প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহু বিকাব পায় মোর তনু মন॥
প্রকৃতি-দর্শনে স্থিব হয় কোন জন?

মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। কিন্তু তিনি নরলীলায় নরবপু লইয়া প্রকটিত। মানুষের যাহা স্বভাব, তিনি এস্থলে আপনার কথা উল্লেখ করিয়া তাহাই প্রকাশ করিলেন। ইহাতে তাঁহাব ভগবত্তার কোন হানি হইল না। স্ত্রীমায়া যে অতি বলবতী, উহা যে অতি প্রমাথিনী শ্রীভগবদ্বাক্যে এস্থলে তাহাই ধ্বনিত হইয়াছে। পুরাণাদিতে সুললিত স্ত্রীমুখ-পঙ্কজ-দর্শনে বিশ্বামিত্র পরাশর-ব্যাস-বশিষ্ঠপ্রভৃতি মুনিদেরও মোহ প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, সুরগুরু বৃহস্পতিও এই বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন কি সাক্ষাৎ ব্রহ্মা শিবাদিও এই দুরত্যজা অতি বলবতী মায়ার চক্রে বিভ্রান্ত ও বিড়ম্বিত হইয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ নিজের নাম করিয়া এ স্থলে কেবল সেই স্ত্রীমায়ার প্রবলতম পরাক্রমের কথাই অভিব্যক্ত করিলেন। নচেৎ যিনি সর্ব্ব মায়ার নিয়ন্তা—সর্ব্ব মায়ার অধীশ্বর, তাঁহার নিকটে আবার স্ত্রীমায়ার প্রভাব কি হইতে পারে? জীব-শিক্ষার নিমিত্তই তাঁহার প্রকট লীলার প্রকাশ, জীব শিক্ষার নিমিত্তই তাঁহার এই সকল সাবধানতাসূচক অনুপদেশ। তাই তিনি বলিলেন :—

"প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোনজন।"

যোষিৎসঙ্গীর চিত্তে স্থৈর্য্য নাই, উহাতেই সততই বিক্ষিপ্তি, সততই চাঞ্চল্য—সততই কামনা-সাগরের তরল তরঙ্গ। উহাতে প্রাণ চঞ্চল হইয়া যায়, হৃদয় অস্থির হইয়া পড়ে। শ্রীভগবচ্চরণধ্যান ত অতি দূরের কথা, অধ্যয়নাদি অপরাপর কার্য্য হইতেও চিত্ত বিচলিত হয়। সুতরাং নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের পক্ষে স্ত্রীদর্শন যে বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অধিকতর আত্মহত্যাজনক অসাধু কার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু অপ্রাকৃত আনন্দচিন্ময়রসে পূর্ণাভিষিক্ত অদ্বিতীয় ভক্তবীর শ্রীল রামরায়ের কার্য্যাদি প্রকৃত জীবের কার্য্যের সহিত তুলিত হইতে পারে না এবং প্রাকৃতিক জগতের কার্য্য-বিচারের তুলদণ্ডে তাহার বিচার করা যায় না। তাই দয়াময় প্রভু বলিতেছেন :—

রামানন্দ রায়ের কথা শুনি সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য কথন॥
এক দেবদাসী তায় সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ হয় তার দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদগমে তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য! তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামরায়ের এই কার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন "রামরায়ের কথা জগতে বলিবার কথা নয়; ইহা জগতে প্রকাশেরও কথা নহে—সে এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার।" আশ্চর্য্য কি? পাণিনি বলেন, "আশ্চর্য্যমনিত্যে", অর্থাৎ যাহার নিত্যতা নাই, তাহাই আশ্চর্য্য। শ্রীরামরায়ের এই কার্য্য যে সার্ব্বভৌমিক নহে, ইহা দ্বারা তাহাই সূচিত হইল।

অপরন্তু প্রাকৃত জগতে এ কথা বক্তব্য বা প্রকাশ্য নহে, প্রভু নিজেই তাহা পরিস্ফুটরূপে বলিয়া দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যাহা এ জগতে আশ্চর্য্য, যাহা এ জগতে বক্তব্য নহে, এক শ্রেণীর লোক সেই অতি গুহ্যতম ব্যাপারের দোহাই দিয়া নিজেরা ধর্ম্মের নামে নরকের ভীষণতা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছে। মায়াবদ্ধ জীবমাত্রেই যোষিন্মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, ইহাই প্রাকৃত জগতের নিয়ম। প্রাকৃত দেহ ও মনের ইহাই নিয়ম। কিন্তু প্রভু বলিতেছেন,"মনোবিহীন শুষ্ককাষ্ঠ বা পাষাণ যেমন যোষিৎস্পর্শে অবিকৃত অবস্থায় থাকে শ্রীল রামরায়ের মনও যোষিৎস্পর্শে সেইরূপ নির্ব্বিকার। সুতরাং তাদৃশ চিত্তের আর বিকৃতির আশঙ্কা কি? আর প্রাকৃত জগতের মায়াবদ্ধ জীবদের ন্যায় তাহাতে দুষ্ট প্রবৃত্তির উদগমেরই বা সম্ভাবনা কি?" কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে কোন কোন লোক বিশিষ্ট ভক্তের অলৌকিক ব্যাপার মায়ার জগতে আরোপ করিয়া তাঁহার কার্য্যের নজীর দেখাইয়া জগতে কেবল পাপের স্রোতই সংবর্দ্ধিত করিতেছে। যাহাতে আর একটী জীবও তাদৃশ আচরণে প্রবৃত্ত না হয় এই নিমিত্ত পরম দয়াময় মহাপ্রভু অতঃপরে স্পষ্টরূপে বলিতেছেন:—

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবার আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥

মহাপ্রভুর বাক্যমাত্রই মহাবাক্য,—সে মহাবাক্য বেদের মহাবাক্য হইতেও গভীরতর—বেদের মহাবাক্য হইতেও অর্থগৌরবে অধিকতর গৌরবান্বিত। মহাপ্রভুর এই বাক্যে একদিকে যেমন সাবধানতা সূচিত হইতেছে, অপর দিকে তেমনি আবার শ্রীল রামরায়ের চিত্তের নির্ব্বিকারতার অদ্বিতীয় উদাহরণ পরিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি স্পষ্টতই আদেশ করিয়াছেন, একরূপভাবে যোষিৎসঙ্গ করিতে এ জগতে কেবল একমাত্র

শ্রীরামরায়ই অধিকারী,—অপর কাহারও এ অধিকার নাই। কেননা, তাঁহার দেহ ও চিত্ত অপ্রাকৃত, তাঁহার দেহ ও মন যোষিৎসঙ্গে বিকৃতি-লেশ মাত্রও প্রাপ্ত হয় না। স্বয়ং শ্রীভগবান্ যে বিষয়ে জীবের অধিকার প্রদান করেন নাই, জগতে উহার দ্বিতীয় অধিকারী আছে বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন নাই, শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবগণ সেইরূপ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, সেরূপ কার্য্য করার চিন্তাও মনে স্থান দিতে পারেন না।

যাহা হউক, ভক্তগণ বুঝিলেন, শ্রীল রাম রায়ের অধিকার কত উচ্চতম, ভক্তগণ আরও বুঝিলেন, শ্রীল রামরায় প্রাকৃত জগতে বিচরণ করিলেও তাঁহার দেহ মন প্রাকৃত জগতের নিয়মাধীন নহে,—তিনি আনন্দ-চিন্ময়রসে পূর্ণাভিষিক্ত। সুতরাং তিনি বাহ্যজগতের মাত্রাস্পর্শজনিত সুখ-দুঃখের ভাবাভাবের সম্পূর্ণ অতীত। তিনি অবলীলাক্রমে কালসর্প লইয়া খেলা করিতে পরেন, কিন্তু সে সর্প তাঁহার নিকট মাথা তুলিতে পারে না, প্রত্যুত সে স্পর্শই শেষে দেবপাদপদ্ম-পূজনের কুসুমে পরিণত হয়। মানুষের পক্ষে সে আচরণ একবারেই অনুষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য নহে। মহা প্রভুও তাই বলিয়া গিয়াছেন,—"এক রামানন্দ ভিন্ন এরূপ কার্য্যানুষ্ঠানের আর দ্বিতীয় পাত্র জগতে নাই। এমন কি এরূপ অনুষ্ঠান তাঁহার নিজের পক্ষেও অযোগ্য।" তাই তিনি বলিয়াছেন "আমিত সন্ন্যাসী, নিজেকে বিরক্ত বলিয়া মনে করি। প্রকৃতি দর্শন তো দূরের কথা, নাম শুনিলেও দেহ ও মনের বিকার হয়, সুতরাং অন্যের আর কথা কি? কিন্তু রামরায়ের কথা পৃথক্। তাঁহার ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভ বা ইন্দ্রিয়-ক্রীড়া নাই।"

মহাপ্রভুর মহাবাক্যে ভক্তগণের সন্দেহ দূরীকৃত হইল, তাঁহাদের হৃদয়ে বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। এই সন্দেহের নিমিত্ত প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভৃতি সকলেই নিজকে অপরাধীর ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎ-ক্ষণাৎ মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীল রামরায়ের উচ্চতম অপ্রাকৃত অধিকারিত্বের ভাবপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া শ্রীল রামরায়ের প্রতি সর্ব্বলের হৃদয়েই এক

অতুলনীয় ভক্তিরসের সঞ্চার করিয়া দিল। সকলেই "ধন্য শ্রীরামরায়" বলিয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

শ্রীল রামরায় দুইটী পরম সুন্দরী কিশোরবয়স্কা দেবদাসী লইয়া নিভৃত উদ্যানে অবস্থান করিতেন। রায় মহাশয় এই কিশোর দেবদাসী দুইটীকে লইয়া কি করিতেন দেবদাসীরই বা কার্য্য কি, এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা এস্থলে অতি প্রয়োজনীয়।

ভাব-প্রকটন-লাস্য।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এক শ্রেণীর পরিচারিকা দেবদাসী নামে অভিহিতা। দেবদাসীরা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবাদাসী ইহারা তাঁহার ব্যজনকারিণী এবং তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী, ইহারা তাঁহার গায়কী ও নর্ত্তকী। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুরোভাগে গান ও নর্ত্তনের প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। কেন্দুবিল্বের অমর কবি শ্রীপাদ জয়দেব স্বীয় সহধর্ম্মিণী পদ্মাবতী সহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুরোভাগে স্বরচিত গীতগোবিন্দের পদগান করিতেন।* তিনি এই উদ্দেশ্যে স্বীয় পত্নীকে গান ও নৃত্যশিক্ষা দিয়াছিলেন। জগন্নাথদেব গীতগোবিন্দ গান শ্রবণে অতীব প্রীতিলাভ করেন। এই নিমিত্ত উৎকলের রমণীদের মধ্যে অনেকেই গীতগোবিন্দের গান শিক্ষা করিতেন। কথিত আছে একদা এক শাকবিক্রয়িণীর মুখে গীতগোবিন্দের গান শুনিয়া শ্রীজগন্নাথ কণ্টকময় পথে তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন।† এই ঘটনার পর হইতে পুরীর রাজা শ্রীমন্দিরে প্রত্যহ গীতগোবিন্দ গানের নিয়ম করেন।

---

* ইতি নিশ্চিন্ত্য নির্ম্মায় গীতগোবিন্দ নামকম্।
গায়ংস্তু দেবদেবাগ্রে পদ্মাসহ ননর্ত্তচ॥
শ্রীজয়দেবচরিত্রম্।

† শ্রুত্বা গান তু ভগবান্ তস্যাঃ পশ্চাদিতস্ততঃ।
শুশ্রুব গীতং স বভ্রাম ব্রজন্তী সা যতো যতঃ॥
শ্রীজয়দেবচরিত্রম্।

জগন্নাথদেবের সমক্ষে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান ও নর্ত্তন দেবদাসীদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সুগায়কদের নিকট ইহারা সঙ্গীত শিক্ষা করিত, হাবভাবময় নৃত্যে ও লীলাময় গানে দেবদাসীরা দেবদেব জগন্নাথের সেবা করিত। সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ সঙ্গীত-ব্যবসায়ীরা দেবদাসী-দিগকে গান ও হাবভাবময় নৃত্য শিক্ষা দিতেন।

এখন কথা এই যে প্রেমিকভক্ত শ্রীল রামরায় দুইজন কিশোরী দেব-দাসীসহ নিভৃত উদ্যানে কি করিতেন? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেই ইহার উত্তর লিখিত হইয়াছে—তদ্‌যথা :—

দুই দেবদাসী হয় পরমা সুন্দরী।
নৃত্য গীতে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী॥
তাঁহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীতে শিখায় নর্ত্তনে॥

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীল রামরায় ইহাদিগকে স্বরচিত শ্রীজগ-ন্নাথবল্লভ নাটকের গান ও নৃত্য শিক্ষা দিতেন। রায় মহাশয় ইহাঁদিগকে কি প্রকারে নৃত্য গীত শিক্ষা দিতেন। তাহার আভাসও শ্রীচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥
সঞ্চারি সাত্ত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ।
মুখনেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥
ভাব-প্রকটন-লাস্য রায় যে শিখায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়॥

শ্রীল রামরায় কি গুরুতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকিতেন, পাঠকগণ উদ্ধৃত পংক্তিনিচয় পাঠ করিয়া অবশ্যই তাহার ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন। রায় মহাশয়ের জগন্নাথবল্লভ নাটকখানি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন,

তাঁহারা জানেন—এই নাটকে শ্রীপাদ জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুকৃতিতে অনেকগুলি গভীর গূঢ়ভাবময় গীত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্ত্য-লীলায় রায় মহাশয়ের রচিত নাটকের এই সকল গীতিরসে বিভোর থাকিতেন। তাই শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন :—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

রায়ের নাটক-গীতির কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে না করিলে এ প্রসঙ্গ নিতান্তই অপূর্ণ থাকিবে, সুতরাং এস্থলে উক্ত নাটকের দুই একটী গান উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তদ্‌যথা :—

মৃদুতর মারুত— বেল্লিত পল্লব-
বল্লীবলিতশিখণ্ডম্।
তিলক-বিড়ম্বিত- মরকত মণিতল-
বিম্বিতশশধরখণ্ডম্॥
যুবতীমনোহরবেশম্।
কলয়কলানিধি- মিবধরণীমনু-
পরিণতরূপবিশেষম্॥ ধ্রু॥
খেলাদোলায়িত- মণিময়কুণ্ডল-
রুচিরাননশোভম্।
হেলাতরলিত- মধুর বিলোচন-
জনিতবধূজনলোভম্॥
গজপতি রুদ্র- নরাধিপ-চেতসি
জনয়তু মুদমনুবারম্।

রামানন্দ- রায় কবিভণিতং

মধুরিপুরূপমুদারম্॥

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর ইহার যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন তাহা এই ঃ—

যুবতী মনোহর ওনা বেশ গো।

অবনীমণ্ডলে সখি চাঁদের উদয় যেন

সুধাময় রূপের বিশেষ গো॥

চূড়ার উপরে শোভে নানা ফুলদাম গো

তাহে উড়ে ময়ূরের পাখা।

যেন, চাঁদের উপরে চাঁদ উদয় করিল গো

ললাটে চন্দনবিন্দু রেখা॥

সঘনে দোলায় বামে মকর কুণ্ডল গো

কুলবতীর কুল মজাইতে।

উহার নয়ন কুসুমশর মরমে পশিল গো

ধৈরজ ধরিতে নারে চিতে॥

এমন সুন্দর রূপ কোথা হতে এলো গো

মনোভব ভুলিল দেখিয়া।

লোচন মজিল সই ওরূপ সাগরে গো

কিবা সে নাগর বিনোদিয়া॥

সুরসিক ভক্ত পাঠকগণ, কবিবর শ্রীল রামরায়ের নাটকগীতি আর আমাদের রসময় কবি লোচনের বঙ্গানুবাদ একবার একাধারে পাঠ করুন, আর অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন, এখানে মধুরে মধুরে কেমন চমৎকার সংমিলন! এই মধুর-উজ্জলরস গীতাভিনয়ে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্যই রামরায় কিশোরীসুন্দরীদ্বয়সহ নিভৃত-কাননচারী হইয়াছিলেন, প্রেমসাধনার লোকাতীত যজ্ঞে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিনিচয়ের পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া অপ্রাকৃত মানসিকমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বীয়

পুরুষত্বের জ্ঞান বিলুপ্ত ও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আনন্দ-চিন্ময়রস প্রতিভাবিতা সখীভাবের উন্মেষে তাঁহার হৃদয়ে ব্রজরস উথলিয়া উঠিত, তিনি দেবদাসীদ্বয়ের হৃদয়ে সেই ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতেন, নিজের মুখ-নেত্রে ভাববিশেষের প্রকটন করিয়া মুখনেত্রাদির বিলাসভঙ্গী শিক্ষা দিতেন, কণ্ঠ হইতে গান নিঃসৃত হইত এবং মুখনেত্র ও হস্ত দ্বারা বাহিরে ভাবের অভিব্যক্ত হইত। এইরূপ অভিনয় ভিন্ন গানের সজীবতা উপলব্ধি হয় না। এখানে উদাহরণচ্ছলে শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক হইতে আর একটী গান উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

চিকুরতরঙ্গক- ফেন-পটলমিব
কুসুমং দধতী কামং ॥
নটদপসব্য- দৃশা দিশতীব চ
নর্ত্তিতুমতনুমবামম্ ॥
রাধা মাধববিহরা।
হরিমুপগচ্ছতি মন্দুস্থপদগতি-
লঘুলঘুতরলিতহারা।
শঙ্কিতলজ্জিত- রসভর-মধুর
দৃগন্তলবেন।
মধুমথনং প্রতি সমুপহরন্তী
কুবলয়দামরসেন ॥
গজপতিরুদ্র- নরাধিপমধুনাতন
মদনং মধুরেণ।
রামানন্দরায় কবি- ভণিতং সুখয়তু
রসবিলয়েণ ॥

এটী শ্রীমতীর অভিসারের গানে। শ্রীরাধিকা কি সাজে ও কি ভাবে

প্রাণবল্লভের সহ মিলিত হইতে চলিয়াছেন, এই গানে কবিবর তাহাই প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন :—

১। "শ্রীরাধাকুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ চিকুরে শুভ্র কুসুম ধারণ করিয়াছেন, উহা নীলিম যমুনার মৃদুল তরঙ্গে ফেনসমূহের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তিনি তাঁহার দক্ষিণ নয়নভঙ্গীতে যেন অনুকূল অনঙ্গকে নৃত্য করিতে আদেশ করিতে মধুর বেশে হরিসমীপে অভিসার করিতেছেন।"

এ স্থলে প্রবর্দ্ধিত আনন্দবেগে অভিসারিকা শ্রীমতীর নয়নে যে রস উথলিয়া উঠিতেছিল, গানে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু গায়িকা যখন এই গান করেন, তাঁহার নয়নে তাদৃশ ভাবের অন্ততঃ লেশাভাসটুকুও অভিনীত না হইলে এই সরস গানের সজীবতা থাকে না, অপর হৃদয়েও সে ভাব সঞ্চারিত হয় না। মানুষের মনের ভাব মুখনেত্রাদিতে প্রকাশিত হয়। মনের সহিত দেহের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট, চক্ষুর সহিত সে সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর। হাসির ভাবটুকু মুখে ফুটিতে না ফুটিতে আগে চোখে ফুটিয়া উঠে। কোন্ ভাব দেহের কোন্ স্থানে কি প্রকার ক্রিয়া করে, তাহাতে কি প্রকার পরিবর্ত্তনের সঞ্চার করে তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। ইদানীং পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে প্রফেসর বেইন প্রভৃতিও এ বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি এই ব্যাপারকে Manifestation of feeling বা "ভাবপ্রকটন" নামে অভিহিত করিয়াছেন। সহজ কথায় ইহাকে "ভাওবাতান" (Expression) বলা যাইতে পারে। প্রফেসর Bell নামক অপর একজন পণ্ডিত (Psycho-physiologist) কোন্ ভাব মুখনেত্রাদিতে কি প্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে, তাহার বিবরণ লিখিয়াছেন, কিন্তু সে সকল অতি স্থূল।

কোন সময়ে ভারতবর্ষে যে এই বিষয়ে গভীর গবেষণা হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। ভাববিশেষের উদয়ে দৈহিক ও ইন্দ্রিয় পেশীন

বিশেষের আকুঞ্চন-প্রসারণ অতি স্বাভাবিক। এই আকুঞ্চন-প্রসারণ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। আকুঞ্চন-প্রসারণের অপর নাম লাস্য। ভাবের প্রভাবে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ও দৈহিক পেশীর এইরূপ যে স্থূল ও সূক্ষ্ম আকুঞ্চন-প্রসারণ হইয়া থাকে, তাহারই নাম ভাবপ্রকটন-লাস্য। মানব-দেহের এই ভাবপ্রকটনলাস্য অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যেখানে স্বাভাবিক ভাবোদ্গম হয় না, বা হওয়ার হেতুর অভাব থাকে, তৎস্থলে সেই ভাবপ্রকটন করিয়া প্রদর্শন করার নামই অভিনয়। গানে ও নাটকাদিতে এইরূপে কথার ও ভাবের অভিনয় হইয়া থাকে। প্রাচীন সময়ে ভারতে এই ভাবপ্রকটন-লাস্য-অভিনয়ের নিমিত্ত বিশিষ্ট শিক্ষার বিধান ছিল। উহাতে অভিনয় সর্ব্বাংশে সুন্দর ও স্বাভাবিক হইত, অপর হৃদয়ে অতি সহজে ভাবসঞ্চার হইত। এখন এদেশে এই বিদ্যার কিছুমাত্র চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উৎকলে এখনও ইহার বিলুপ্তপ্রায় স্মৃতি রেখার শেষ-চিহ্নটুকু কোন প্রকারে চলিয়া অসিতেছে। এখনও উড়িষ্যার কোন কোন স্থলে বালকদিগকে সখীবেশে সাজাইয়া তাহাদের দ্বারা উৎকলভাষায় রচিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদা-বলী অভিনীত করা হয়। উহা "আখড়াপিলা" নামে অভিহিত হয়। উহারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখনেত্রাদি দ্বারা ভাবপ্রকটন লাস্যের অভিনয় করিয়া থাকে। সুশিক্ষকের অভাবে এখন আর তাদৃশী শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় না। কোনও সময়ে উৎকলে ভাবপ্রকটনলাস্যাভিনয় শিক্ষার যে প্রবল চর্চ্চা ছিল, ইহা হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বঙ্গদেশে যাত্রা ও নাটকাদিতে ইহার কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হয় না।

কাব্যকলায় সুপণ্ডিত, ভাবরসে সুরসিক শ্রীল রামরায় সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। নাট্যগানাদিতে তাঁহার অপরিসীম নৈপুণ্য ছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার মধুররসে নিরন্তর পরিষিক্ত থাকিতেন। তাঁহার

সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলারসের আস্বাদানুভাবসাধনে ব্যবহৃত হইত। শ্রীল রামরায় মহাশয় অপ্রাকৃতভাবে বিভোর থাকিয়া দুইটী পরমাসুন্দরী কিশোরী দেবদাসীকে এই ভাবপ্রকটনলাস্য ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বল্লভ নাটকের গান শিক্ষা দিতেন। আমরা উদাহরণস্বরূপ যে গানটী উদ্ধৃত করিয়াছি, এখন তাহার অপরাংশের উল্লেখ করা যাইতেছে।

২। শ্রীমতীর নয়নকোণে যুগপৎ শঙ্কা ও লজ্জার প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে নেত্রপ্রান্ত রসভরে চঞ্চল-মধুর প্রতিভাত হইতেছে। তিনি যেন নয়নরূপ নীলউৎপলে নবনীরদসুন্দরকে প্রীতির উপহার প্রদান করিতেছেন। এই যে এ স্থলে নেত্রে লজ্জা ও শঙ্কার ভাবপ্রকটনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, উহা ব্যভিচারীভাবের অন্তর্গত। এই ব্যভিচারীভাব সঞ্চারীভাব নামেও অভিহিত হইয়া থাকে, যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে—

অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশৎ ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ।
বিশেষণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি॥
বাগঙ্গসত্ত্বসূচা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে॥

অর্থাৎ বাক্য ভ্রূনেত্রাদি অঙ্গ এবং সত্ত্বোৎপন্ন ভাব দ্বারা যে সকল ভাব প্রকাশিত হয় তাহারাই ব্যভিচারী। ইহারা ভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া সঞ্চারী ভাব নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যা তেত্রিশটী, তদ্‌যথা :—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, হর্ষ, উৎসুকতা, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চপলতা, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ,—ইহারা সঞ্চারীভাব।

সাত্ত্বিকভাব আট প্রকার, তদ্‌যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

ইহার পরে স্থায়ীভাবেরও আট প্রকার ভেদ আছে। ইহাদের

প্রভাবেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির বহুপ্রকার লাস্য বা ক্রীড়া উপজাত হয়। স্থায়ীভাব সম্বন্ধে প্রাচীন আলঙ্কারিক ভোজরাজ, ভরত মুনির পদানুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন :—

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চাষ্টৌ স্থায়ীভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

অর্থাৎ রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়— এই আটটী স্থায়ীভাব। আমাদের এই প্রাকৃত জগতের পক্ষে স্থায়ীভাব-বিচার এইরূপ হইলেও ব্রজরসের স্থায়ীভাব বিচারে কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীমদ রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভাব উচ্যতে॥

অর্থাৎ যে ভাব, অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধভাবসমূহকে বশে আনয়ন করিয়া পরাক্রমালী রাজার ন্যায় বিরাজ করে, তাহাই স্থায়ীভাব নামে খ্যাত। এস্থলে হাস্যাদিকে অবিরুদ্ধ ভাব এবং ক্রোধাদিকে বিরুদ্ধভাব সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে সেই ভাবটী কি? ইহার উত্তরে শ্রীপাদ গোস্বামি মহোদয় বিশদ করিয়াছেন :—

স্থায়ীভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি।
মুখ্যা গৌণীচ সাদ্বেধা রসজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতা॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিই স্থায়ীভাব নামে অভিহিত। এই রতি মুখ্যা ও গৌণীভেদে দুই প্রকার। মুখ্যারতি আবার দুই প্রকার—স্বার্থা ও পরার্থা। ইহাদের প্রত্যেকে আবার পাঁচ প্রকার, যথা—শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা। শুদ্ধারও প্রকার ভেদ আছে—সামান্যা, স্বচ্ছ এবং শান্তি। শুদ্ধারতিতে অঙ্গে যে আকুঞ্চন প্রসারণ হয়, তাহাতে অঙ্গকম্পন, চক্ষু-উন্মীলনাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং স্থায়ীভাবের

শুদ্ধারতির ভাবপ্রকটনলাস্যের অভিনয় করিতে হইলে উল্লিখিত আকুঞ্চন-প্রসারণাদির অভিনয় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনীয়।

প্রীতি, সখ্য ও বাৎসল্যরূপ মুখ্যারতিতে নেত্রাদিতে যে লাস্যের উদ্গম হয়, তাহাতে নেত্রাদির ফুল্লতা, জৃম্ভণ ও উদ্‌ঘূর্ণন উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধা রতি কেবলা ও সঙ্কুলাভেদে দুই প্রকার। প্রিয়তা রতির অপর নাম মধুরা। মধুরায় কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ এবং হাস্যাদি ভাব প্রকটিত হয়।

হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জুগুপ্সা এই সাতটী স্থায়ীভাব যখন ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে—তখন ইহারাও রতি নামেই অভিহিত। কিন্তু ইহারা মুখ্যা রতি নহে—গৌণী রতি। কিন্তু হাস্য হইতে ভয় পর্য্যন্ত এই ছয়টী ভাব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্ব সম্ভবপর হয়। জুগুপ্সা বা নিন্দায় শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্ব নাই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই সকল বিষয়েব সূক্ষ্ম বিচার আছে। এস্থলে কেবল স্থায়ীভাব অঙ্গাদিতে কি কি লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাই আলোচ্য। সুতরাং স্থায়ীভাবের বিশ্লেষণ এবং উহাদের বিবিধ শ্রেণীবিভাগের বিচার সম্বন্ধে বাহুল্যবোধে এস্থলে কোন আলোচনা করা হইল না। ভাবপ্রকটন-লাস্যই এস্থলে আলোচ্য।

১। হাস্যরতিতে নেত্রের প্রকাশ, নাসা ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দন হয়।

২। বিস্ময়-রতিতে নেত্রবিস্ফার ও দেহ পুলকিত হয়।

৩। দেহের স্ফুর্ত্তিই উৎসাদ-রতির বাহ্য প্রকাশ।

৪। শোক-রতিতে মুখশোষ নিশ্বাসপতনাদি ঘটিয়া থাকে, নয়ন জলপূর্ণ হয় ও রোদনলক্ষণ প্রকাশ পায়।

৫। ক্রোধরতিতে ভ্রূকুটী ও নেত্র-লৌহিত্যাদি লক্ষণ প্রকটিত হয়।

৬। ভয়-রতিতে কম্পন ও ত্রাসের চিহ্ন মুখশোষাদি ঘটে।

৭। জুগুপ্সায় ঘৃণার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সাত্ত্বিকভাব আটটী, সঞ্চারীভাব তেত্রিশটী, এবং স্থায়ীভাব আটটী—সর্ব্বসাকল্যে উনপঞ্চাশ প্রকার ভাবে নেত্র ও মুখাদিতে যে সকল আকুঞ্চন-প্রসারণ উপস্থিত করে, তাহা ভাবলাস্য নামে অভিহিত। এই লাস্য-সমূহ দ্বারা মানসিক ভাবসমূহ প্রকটিত হয়, সুতরাং উহাকে ভাব-প্রকটন-লাস্য বলা হইয়া থাকে। এই সকল লাস্য অভিনয়ে প্রকটিত করাই অভিনয়ের প্রধানতম সৌন্দর্য্য। প্রাকৃত রসময় সঙ্গীতাদিতেও ভাব-প্রকটন-লাস্যের অভিনয় প্রদর্শন কঠোর ব্যাপার। ব্রজরসের ভাব-প্রকটন-লাস্য শিক্ষাদান করা যে কত অধিক নৈপুণ্য ও প্রেমভক্তির সাধনার প্রয়োজন, তাহা পাঠক মহোদয়গণ একবার ভাবিয়া দেখুন। সিদ্ধ প্রেমিকভক্ত শ্রীল রামরায় ভিন্ন এই ব্রজরসের ভাব-প্রকটন-লাস্যের অভিনয় শিক্ষাদান অপরের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যিনি সাক্ষাৎ বিশাখা, যিনি ব্রজরসের নিগূঢ় মর্ম্মাভিজ্ঞ, যিনি দিনযামিনী ব্রজরসে বিভাবিত সুতরাং প্রাকৃত কামের অত্যন্ত অস্পৃষ্ট, অস্পৃশ্য এবং অগোচর,—তিনি ভিন্ন এইরূপ শিক্ষাদানে আর কাহারও অধিকার থাকিতে পারে না। তাই স্বয়ং শ্রীভগবান্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন ঃ—

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাহার॥

শ্রীল রামরায় ব্রজরসে বিভাবিত হইয়া দেবদাসীদ্বয়কে এই ভাব-প্রকটন-লাস্য শিক্ষা দিতেন, এই শিক্ষাদানের সময়ে তিনি যে রামানন্দ রায় এবং ইহারা দুইজন তরুণবয়স্কা, ইহা তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। তিনি যে শিক্ষক, ইহারা যে তাঁহার ছাত্রী, এরূপ জ্ঞানও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না, বরং তিনি ইহাদিগকে ব্রজসখীদের অনুগা-প্রেমভক্তির প্রকট মূর্ত্তি বলিয়াই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তিনি "দেবদাসীদ্বয়কে দেবকার্য্য সাধনের সাধিকা বলিয়া সেবা করিতেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে ঃ—

স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ মার্জ্জন॥
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র-সংমার্জ্জন॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন॥
সেব্য-বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাস্যভাব করি আরোপণ॥

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীল রামরায় এই দুই দেবদাসীকে যদিও ভাবপ্রকটন-লাস্য শিক্ষা দিতেন, কিন্তু তিনি ইহাদিগকে ছাত্রী বলিয়া মনে করিতেন না, প্রাকৃত মানবী বলিয়াও মনে করিতেন না। তিনি ইহাদিগকে ব্রজরস-শিক্ষার সাধিকা বলিয়া সেব্যভাবে ইহাদের সেবা করিতেন। আমরা নিজের হাতে প্রতিমা গড়িয়া লই, আবার সেই প্রতিমাকে সাক্ষাৎ চিন্ময়ী বলিয়া পূজা করিয়া থাকি। শ্রীল রামরায় স্বয়ং যাঁহাদিগের হৃদয়ে ব্রজরস সঞ্চারিত করিয়া দিতেছিলেন, যাঁহাদিগকে প্রাকৃত জগতের ভাব হইতে টানিয়া লইয়া অপ্রাকৃত জগতের ভাবরসে স্বয়ং বিভাবিত করিয়াছিলেন, সেই দেবদাসীদ্বয়কে তিনি দেবীভাবে দেখিতে পাইতেন। গোলকের ভাব হৃদয়ে প্রতিফলিত না হইলে, গোলোকসুধায় হৃদয় পরিপ্লুত ও পবিত্রীকৃত না হইলে এতাদৃশ দিব্য ভাবের উদয় হয় না। এ ভাব জীবে অসম্ভব। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন:—

"এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।"

এরূপ সাধন অন্যের পক্ষে সম্ভবে না। যাঁহারা তড়িৎবিজ্ঞানে নিপুণ, তাঁহারা সদ্যঃপ্রাণনাশিনী দামিনীদাম লইয়া যথেচ্ছ খেলা করিতে পারেন, কিন্তু অপরের পক্ষে উহা ভীষণতম কৃষ্ণসর্প হইতেও ভীষণতর। সুতরাং পরম করুণাময় মহাপ্রভু জগতের সমগ্র মানুষকে সাবধান করিয়া বলিলেন, "এইরূপ কার্য্যে কেবল একমাত্র রামরায়ই অধিকারী। আমি ও

সব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি, কিছুতেই আমার আসক্তি নাই, কিন্তু আমার পক্ষেও স্ত্রীদর্শন তো দূরের কথা, উহার নাম শুনিলেও চিত্তবিকারের আশঙ্কা ঘটিতে পারে।" সুতরা অন্যে পরে কা কথা।

ফলতঃ প্রকৃতি-দর্শনে কে স্থির থাকিতে পারে? কিন্তু রামানন্দ রায়ের কার্য্য প্রকৃতই আশ্চর্য্য। তিনি পরমাসুন্দরী দুইজন তরুণবস্কা দেবদাসীর অঙ্গ-স্পর্শ করেন, তাহাদের স্নানাদি করান, নিজে তাহাদের বস্ত্র পরিধান করাইয়া দেন, কিন্তু কোনও সময়ে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তাঁহার চিত্তবিকার ঘটে না। * ইহাতে সহজেই মনে হয় রামরায়ের মন অপ্রাকৃত। তাঁহার দেহও অপ্রাকৃত। সুতরাং তাঁহার এই কার্য্য অপরের অনুসরণীয় নহে, এ অধিকার অপরের নাই—ইহা মহাপ্রভুরই শ্রীমুখের উক্তি।

এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে শ্রীল রামরায় এই লোকাতীত এবং জনসাধারণের অননুসরণীয় পথে বিচরণ করিতেন কেন? দেবদাসীদ্বয়কে ভাবপ্রকটনলাস্যাভিনয় শিক্ষা দিতেন কেন? ভক্তগণ বলিতে পারেন যে, মধুররসের অভিনয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা এবং স্বকীয় হৃদয়ে ব্রজরসের প্রবাহ বৃদ্ধি করাই এই অলৌকিক কার্য্যের উদ্দেশ্য। মহানুভাব শ্রীচরিতামৃতকারও তদীয় গ্রন্থে এইরূপ আভাস দিয়া রাখিয়াছেন যথা :—

ভাবপ্রকটনলাস্য রায় যে শিখায়।
জগন্নাথের আগে দোহে প্রকট দেখায়।

---

* বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।
কুমারসম্ভব।

অর্থাৎ বিকারের হেতু বর্ত্তমান থাকিলেও যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না তাঁহারাই ধীর।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে শ্রীল রামরায় শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে যে রসময় গান রচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল রসগীতিকে তিনি দেবদাসী-দ্বয়ের সাহায্যে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিয়াছিলেন—দেবদাসীদ্বয় তাঁহার এই মহাসাধনের সাধিকা এবং পরম সহায়স্বরূপিণী হইয়াছিলেন, তাই তিনি উঁহাদিগকে সেব্য-বুদ্ধিতে সেবা করিতেন, তাই উঁহাদের নিকটে তিনি নিজের পুরুষাভিমান বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়া ব্রজরস-সাধনার প্রসরতর পথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীল রামরায়ের এই সাধিকাসেবা ও ভাব-প্রকটন-লাস্যাভিনয়-শিক্ষায় ভক্তহৃদয়ে এইরূপ ব্যাখ্যার উদয় হওয়াই স্বাভাবিক।

সাধকগণের পক্ষে যোষিৎসঙ্গ যে অতীব অহিতকর, মহাপ্রভুর ভক্ত-মাত্রেরই তাহা সুবিদিত ছিল। ভক্তসমাজে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীল রামরায়ের যোষিৎসঙ্গের কথা উত্থাপিত হওয়া মাত্রই সকলে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

(সপ্রমাণ সন্দেহ-নিরসন।)

ইঁহাদের সন্দেহ-নিরসনের নিমিত্ত করুণাময়-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে যে সকল কথা বলিতে হইয়াছিল, তৎসকল একদিকে যেমন সর্ব্বসন্দেহ-নিরাসকর, অপরদিকে তেমনি আবার শ্রীল রামরায়ের অপ্রাকৃত ভাব ও অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহের গৌরবব্যঞ্জক। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিলেন—

নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠপাষাণসম।
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥

কিন্তু হেতুবাদীরা কেবল এই উক্তিতে বিশ্বাস করিবেন কেন? তাঁহাদের নয়নসমক্ষে শ্রীল রামরায় প্রাকৃত দেহধারী, প্রাকৃত জেহের

পক্ষে প্রাকৃত ধর্ম্ম অতি স্বাভাবিক। প্রাকৃতদেহ শত প্রকার গুণক্ষোভের অধীন, শত প্রকার কামের অধীন। কামোদ্বোধক পদার্থের সন্নিধানে কামোত্তেজনা হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। তরুণী-স্পর্শে শ্রীল রামরায়ের চিত্ত বিকৃত না হইবে কেন, এরূপ ধারণা স্থূলদর্শীদের পক্ষে স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে মহাপ্রভু বলিতেছেন, যোষিৎসঙ্গ অতি নিষিদ্ধ কিন্তু শ্রীল রামরায়ের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহার চিত্ত ও দেহ প্রাকৃতভাবে বিভাবিত নহে। তিনি যাহা করেন তাহাও জগতের অন্যান্য ভক্তগণের আচরণীয় নহে, ইহাতে কেবল তিনিই একমাত্র অধিকারী। তিনি এরূপ কেন করেন, কিরূপেই বা এ অধিকার লাভ করিলেন, তাহা তিনিই জানেন, তাঁহার অনুসরণ করা দূরের কথা, তাঁহার ব্যবহারের গূঢ়রহস্য জানিবার উপযুক্তপাত্রও জগতে নাই। তবে তাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় অধিকারীর এইরূপ যোষিৎসঙ্গ যে আদৌ দোষলেশসম্পর্ক-পরিশূন্য, শাস্ত্রবচনে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে, যথা শ্রীভাগবতে :—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

এই বচনটী শ্রীশ্রীরাসলীলার ফলশ্রুতি। শ্রীচরিতামৃতে ইহার অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস।
যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্‌রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুররস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণের সন্দেহ-নিরসন-ব্যপদেশে শ্রীল রামরায়ের ভজনগৌরব-প্রকটনের নিমিত্ত প্রসঙ্গচ্ছলে শ্রীরাসলীলা-শ্রবণের ফলশ্রুতির উল্লেখ করিলেন, অর্থাৎ যিনি শ্রদ্ধার সহিত নিরন্তর রাসলীলা শ্রবণ ও বর্ণন করেন, তাঁহার কামাদি সর্ব্ব প্রকার হৃদ্‌রোগ বিনষ্ট হয়, ত্রিগুণ-ক্ষোভ বিলুপ্ত হয়, স্থিতপ্রজ্ঞতা-প্রাপ্তি হয় এবং উজ্জ্বলরসপূর্ণ প্রেমভক্তি লাভ হয়। শ্রদ্ধার সহিত শ্রীরাসলীলা শ্রবণে প্রাকৃত কাম একবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়, হৃদয় শ্রীভগবৎপ্রেম-প্রবাহে পরিপ্লুত হয়। সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ শ্রীশ্রীমদনগোপাল যে লীলার অভিনায়ক, ভক্তিসহ সেই লীলা শ্রবণ করিলে হৃদয়ে আর প্রাকৃত কামের অধিকার থাকিতে পারে কি? সর্ব্বমাধুর্য্যের নিলয়, সর্ব্বাকর্ষণের মূলশক্তিবিলাসস্বরূপ শ্রীশ্রীরাস-লীলায় যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, প্রাকৃত জগতের সহিত একবারেই তাঁহার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তিনি এ জগতে যাহা কিছু করেন, তৎ-সকলই তদ্ভাবভাবিত। ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভব হইলেই কর্ম্মফলে আসক্তি থাকে না, আত্মা প্রসন্ন হয়; অভাববোধ ও ফলভোগ বাসনা তিরোহিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনাতেই প্রাকৃত কাম নিরস্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রাকৃত কাম বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হয়। ইহার উপরে ভগ-বত্তত্ত্বজ্ঞান। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানলাভের পর প্রাকৃত কামের প্রসঙ্গও অতি অপ্রাসঙ্গিক। শ্রীল রামরায়ের সম্বন্ধে আর কথা কি? তিনি দিবারাত্র সর্ব্বলীলার মুকুটমণি রাসলীলার অনুধ্যানে বিভোর থাকিতেন, ব্রজরসে নিরন্তর তাঁহার হৃদয় পরিপ্লুত থাকিত। তিনি দৃশ্যতঃ এ জগতে বিরাজিত থাকিলেও এ জগতের কোন ভাবেই তাঁহার চিত্ত আসক্ত থাকিত না। তাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশ।
সেই ভাবাবিষ্ট, সেই সেবে অহর্নিশ॥
তার ফল কি কহিব কহনে না যায়।

নিত্যসিদ্ধ সেই, প্রায় সিদ্ধ তাঁর কায়॥
রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন॥

শ্রীল রামরায় নিরন্তর রাস-রসে ভাবাবিষ্ট। তাঁহার চিত্ত অহর্নিশ সখীজনসুলভ কৃষ্ণ-সেবায় বিভোর। তিনি নিত্যসিদ্ধ, তাঁহার দেহও সিদ্ধ দেহতুল্য, সুতরাং প্রাকৃত দেহের বিকারাদি সে দেহের সান্নিধ্য-সংস্পর্শ করিতেও অসমর্থ। রাগানুগা ভক্তিমার্গে তিনি শ্রীভগবানের মধুরভজন করেন। সিদ্ধদেহে প্রাকৃত বিকার ঘটে না, তাঁহার সিদ্ধতুল্য দেহে এবং অপ্রাকৃত চিত্তে প্রাকৃত ভাবের উদয় হয় না। সুতরাং তিনি দেবদাসীদ্বয়কে যখন ভাবপ্রকটনলাস্য ও শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকের গান শিক্ষাদান করেন, তখন তিনি যে রামানন্দ রায়াখ্য একজন পুরুষ এ কথা একবারেই তাঁহার মনে উদিত হয় না। দেবদাসীদ্বয় যে তরুণী মানবী, এই প্রাকৃত ভাবও তাঁহার চিত্তের বিষয়ীভূত হয় না। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে যোষিৎসঙ্গের প্রসঙ্গই অসম্ভব। তাঁহার চিত্ত নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবার মধুররসে বিভাবিত, দেবদাসীদ্বয়ও সেই কৃষ্ণসেবার নায়িকা বলিয়াই শ্রীল রামরায়ের নিকট প্রতিভাত হন। সুতরাং এই অলৌকিক অপ্রাকৃত ভাবরাজ্যে প্রাকৃত নিষেধ-বিধির কথাই উঠিতে পারে না।

দেবদাসীদ্বয়ের গান ও নর্ত্তন শিক্ষা দেওয়ার সময় কোন্ প্রকার গীতিস্বরের কোন্ প্রকার অঙ্গভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদিত হইবে, কেবল ইহাই শ্রীল রামরায়ের ভাবনার বিষয় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কোন প্রকার প্রাকৃত ভাব কখনও তাঁহার চিত্তক্ষেত্রের তটান্তে সমুদিত হয় না। প্রখর সূর্য্যালোকে যেমন তমঃপ্রবেশ অসম্ভব, তদ্রূপ তাঁহার চিত্তবৃত্তির ব্রজ-রস-মাধুরী-লহরীর সমক্ষে অপ্রাকৃত ভাবোদয় তো দূরের কথা, তাঁহার ভগবন্মাধুর্য্য-রসানুভবের নিকট প্রাকৃত জগতের অস্তিত্ব-জ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং যোষিৎসঙ্গের প্রসঙ্গই এ স্থলে

অপ্রাসঙ্গিক।" শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এইরূপে মহানুভাব শ্রীল রামরায়ের অলৌকিক অপ্রাকৃত ব্যবহারের সমর্থন করিয়া স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন :—

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।

এই এক কথাতেই তিনি শ্রীল রামানন্দের অদ্বিতীয় অপ্রাকৃত ভাবের জ্ঞাপন এবং ভক্তমাত্রের প্রতিই প্রগাঢ় সাবধানতার অভিব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

ভক্তগণের সন্দেহ-নিরসনের নিমিত্ত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের একটি বাক্যমাত্রই যথেষ্ট। তিনি যদি শুধু বলিতেন, শ্রীল রামরায় অপাপবিদ্ধ, পরমসাধু, তদীয় ভক্তগণ তাহাই বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ ভাবে লোকের বিশ্বাসোৎপাদন করা সুসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। শাস্ত্র যুক্তিদ্বারা বিশ্বাসের মূল দৃঢ় করিয়া দেওয়াই তাঁহার চিরন্তনী রীতি। শ্রীপাদ সনাতনের শিক্ষায় প্রভু স্বীয় শ্রীমুখে উপদেশ করিয়াছেন :—

কৃষ্ণকথা-শ্রবণ।

শাস্ত্রে যুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী তিঁহো তারয়ে সংসার॥

শ্রীল রামরায়ের অলৌকিক ব্যবহার সম্বন্ধে কাহারও মনে যেন সন্দেহের লেশমাত্র না থাকিতে পারে, তাঁহার উচ্চতম ভজনাধিকারিত্ব সম্বন্ধে যাহাতে সকলেরই দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, দয়াময় মহাপ্রভু এই নিমিত্ত শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীল রামরায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন, এবং প্রদ্যুম্নমিশ্রের মনোবাঞ্ছা পরিপূরণের নিমিত্ত বলিলেন, "মিশ্র, আমি তোমায় কৃষ্ণকথা কি শুনাইব? আমার নিজের যখন সাধ হয়, আমি তখন রামরায়ের নিকটেই কৃষ্ণকথা শুনিয়া থাকি। কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা হইলে পুনর্ব্বার রামরায়ের নিকট যাও। তুমি আমার নাম করিয়া বলিও "তিনি আমাকে আপনার নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে পাঠাইয়াছেন।" এখনও তাঁহাকে

বহির্বাটীতেই দেখিতে পাইবে, শীঘ্র যাও, বিলম্ব করিও না।” যথা শ্রীচরিতামৃতে—

আমিও রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুন যাও তথা॥

শ্রীল রামরায় কৃষ্ণকথার সুধানিধি। নীলাচল-লীলায় যখনই কৃষ্ণ-কথার প্রসঙ্গ হইয়াছে, তখনই ভুবনপাবন লীলাগ্রন্থকারগণ শ্রীল রাম-রায়ের মধুমাখা নামের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণবিরহে আকুল হইয়া পড়িতেন, আর শ্রীল রামরায় অমনি শ্রীকৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ করিয়া তাঁহার ব্যাকুলতার বেগ প্রশমিত করিতেন। যথা অন্ত্যলীলায়—

রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহবেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥

প্রভু স্বয়ং বিদ্যানগরে শ্রীল রামরায়কে বলিয়া আসিয়াছিলেন, “রাম-রায় নীলাচলে চল, আমরা দুইজন একত্র থাকিব, আর কৃষ্ণকথা-রঙ্গে সুখে কাল অতিবাহিত করিব।” তদ্‌যথা—

তুমি আমি নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে কাল গোঙাইব কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥

প্রদ্যুম্নমিশ্র কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রভুর নিকট স্বীয় প্রার্থনা জানাইলেন। দয়াময় বিগ্রহ তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে বলিলেন—

——কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানেন তার মুখে শুনি॥

প্রদ্যুম্ন বুঝিলেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তগণের দ্বারা স্বীয় মহাত্ম্য-প্রচারের বিধান করিয়াছেন। শ্রীল রামানন্দকে তিনি কৃষ্ণকথা-বর্ণনের পূর্ণতম অধিকার প্রদান করিয়াছেন। মিশ্র মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া রায় মহাশয়ের ভবনের অভিমুখে গমন করিলেন, যাইয়া দেখিলেন, রায় মহাশয় তখনও বহিঃপ্রকোষ্ঠেই রহিয়াছেন। মিশ্রকে দেখিয়া শ্রীল রামান-

রায় সসম্ভ্রমে আসন হইতে উঠিলেন, মিশ্রকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “কি নিমিত্ত মহোদয়ের শুভাগমন, বলিতে আজ্ঞা হয়।”

মহাপ্রভুর আদেশানুসারে মিশ্র বলিলেন, “আমি শ্রীপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিব বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তিনি আপনার নিকট কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। এখন আপনি একবার কৃপা করুন।” শ্রীল রামরায় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, প্রভু যে এরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, ইহা আমার মহাভাগ্য। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রভু-আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা হেথা।
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা॥

শ্রীল রামরায় এস্থলে স্বীয় মহাভাগ্যের খ্যাপন করিয়াছেন। ইহার হেতু কি? আমাদের মনে হয় প্রথমতঃ প্রভুর আজ্ঞাপ্রাপ্তিই শ্রীরামরায় সৌভাগ্যফল বলিয়া মনে করিলেন। দ্বিতীয়তঃ দয়াময় প্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণকথা বলিবার অধিকার দান করিলেন, ইহাও সৌভাগ্যের কথা। তৃতীয়তঃ শাস্ত্রানুসারে যিনি কৃষ্ণ-কথার প্রশ্ন করেন, যিনি কৃষ্ণকথা বলেন ও যিনি শ্রবণ করেন, এই তিনজনই ভাগ্যবান্। যথা শ্রীভগবতে (১০।১।১৩) :—

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃং স্তৎপাদসলিলং যথা॥

একাদশ স্কন্ধেও লিখিত হইয়াছে—

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাতঃ আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব বিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥

এইরূপ বিবিধ কারণে শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়াই রামরায় নিজের সৌভাগ্য খ্যাপন করিলেন এবং মিশ্র মহাশয়কে লইয়া এক নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “আপনি কি ভাবের কৃষ্ণ-কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন?”

মিশ্র মহাশয় এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন, তাহা সহসা ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি শুনিয়াছিলেন, বিদ্যানগরে শ্রীল রামরায় কৃষ্ণকথা শুনাইয়া মহাপ্রভুকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। মিশ্র কৃষ্ণকথা শুনিতে গিয়াছেন; কৃষ্ণকথা কি, কৃষ্ণকথা কত ভাবের হইতে পারে, কৃষ্ণকথা-রসসাগরে কত ভাবের তরঙ্গ আছে, কত বিলাস-উল্লাস আছে,—তিনি তখনও তাহা জানিতেন না। তাঁহার মন কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, তিনি রায় মহাশয়ের নিকট মনের ভাবই প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রায় মহাশয়ের প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমতঃ তিনি কোন সদুত্তর করিতে না পারিয়া সহসা বলিলেন, "বিদ্যানগরে আপনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে যে কৃষ্ণকথা শুনাইয়াছিলেন, সেই কথা আমাকে ক্রমে ক্রমে বলুন।"

পরক্ষণে মিশ্র মহাশয়ের মনে প্রকৃত বুদ্ধির উদয় হইল। তিনি নিজেই নিজের কথার সংশোধন করিয়া বলিলেন ঃ—

অন্যের কি কথা তুমি প্রভুর উপদেষ্টা।
আমিত ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি মোর পোষ্টা॥
ভালমন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি।
দীন দে'খে কৃপা করি কহিবে আপনি॥

শ্রীল রায় মহাশয় মিশ্রের কথায় বাধা দিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "ঠাকুর এ অধমকে অত বাড়াইবেন না। প্রভুর আজ্ঞা এবং আপনারও একান্ত আগ্রহ। আমি কিছুই জানি না, তবে প্রভুর প্রেরণায় যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।" এই বলিয়া শ্রীল রামরায় কৃষ্ণকথা উত্থাপন করিলেন। মিশ্র মহাশয়কে শ্রীল রায় মহাশয় কি ভাবের কৃষ্ণকথা শুনাইয়াছিলেন, তাহার স্পষ্টতঃ কোথাও কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদ্যানগরে মহাপ্রভুকে শ্রীল রায় মহাশয় রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব এবং লীলাতত্ত্ব-বিষয়িণী বহু কথা শুনাইয়াছিলেন।

প্রথম দশ দিবস পর্য্যন্ত রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি অতিবাহিত হইত,—তথাপি সে কথার বিরাম পড়িত না। মহাপ্রভু দক্ষিণ তীর্থ-ভ্রমণের পরে আবার বিদ্যানগরে আসিয়া কৃষ্ণকথা-রস-প্রসঙ্গে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীল রামরায় সংক্ষেপতঃ ক্রমানুসারে সেই সকল রসময়ী কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণকথা সুধাসাগর-বিশেষ। উহার প্রসঙ্গ করামাত্রই রসের তরঙ্গে বক্তা ও শ্রোতার হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া উঠে। এ স্থলেও স্বয়ং রামরায় বক্তা এবং চিরপিপাসী ব্যাকুলপ্রাণ প্রদ্যুম্নমিশ্র শ্রোতা। সুতরাং কৃষ্ণকথা উত্থাপিত হওয়া মাত্রই উভয় হৃদয়ে যে রসের উত্তালতরঙ্গ উধাও হইয়া উঠিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। রায় মহাশয়ের নিভৃতকক্ষে কৃষ্ণকথা-রসার্ণবের যে তুমুল তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহার বর্ণনা আমাদের সাধ্যাতীত। যাহা ধারণায় আনিতে অসমর্থ, তাহা বর্ণনা করিব কি প্রকারে? শ্রীচরিতামৃতের ভাষা মন্ত্রশক্তিশালিনী। মন্ত্রের ক্ষমতা অসীম ও অলৌকিকী। সুতরাং আমরা এখানে উহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, যথা:—

তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিল।
কৃষ্ণকথা-রসামৃত সিন্ধু উথলিল॥
আপনি প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নহে কথা অন্ত॥
বক্তা শ্রোতা কহে শোনে দোঁহে প্রেমাবেশে।
আত্মস্মৃতি নাহি, কাঁহা জানিবে দিন শেষে।

মধুময়ী কৃষ্ণকথা একবার মর্ম্মে প্রবেশ করিলে মানুষের বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয়, হৃদয় মধুময় হইয়া উঠে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ও অন্যান্য জীবধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, আত্মা প্রেমময়ের অপ্রাকৃত প্রেমানন্দময় রাজ্যে বিচরণ করিয়া গোলোকসুধায় প্রমত্ত হয়। কৃষ্ণকথা মাদনীশক্তিশালিনী, কৃষ্ণ-কথা ভবরোগনাশিনী এবং সাক্ষাৎ প্রেমদায়িনী।

শ্রীল রায় মহাশয়ের নিভৃত কক্ষে কৃষ্ণকথারসামৃতসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত হইতে লাগিল, শ্রোতা ও বক্তার নিকট বাহ্যজগৎ বিলুপ্ত হইয়া গেল, উভয়ে এক সুধারসে বিভোর হইলেন, এদিকে বেলা তৃতীয় প্রহর গত প্রায়, কিন্তু তথাপি কথার বিরাম নাই, অথচ কোথাকার বেলা কোথায় ঢলিয়া পড়িয়াছে, উভয়ের মধ্যে একজনেরও সে জ্ঞান নাই।

শ্রীল রায় মহাশয়ের পবিচাবক উভয়ের ভাবগতি দেখিয়া আর অধিক ক্ষণ অপেক্ষা করা অসঙ্গত মনে করিয়া বলিল "বেলা অবসান প্রায়, এখনও আপনাদের স্নানাহ্নিক হইল না!" পরিচারকের কথায় উভয়ের বাহ্যজ্ঞান হইল। মিশ্র মহাশয় ব্যস্তভাবে বলিলেন, "তবে আজ এই পর্য্যন্তই থাক।" রায় মহাশয় বলিলেন, "যে আজ্ঞে।"

সে দিনের নিমিত্ত সুখময় কৃষ্ণকথাব বিরাম পড়িল, রায় মহাশয় মিশ্র মহাশয়ের সেবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মিশ্র বলিলেন, "মহানুভাব আপনি আমায় কৃষ্ণকথাসুধাপানে চিরতৃপ্ত করিয়াছেন, আমি কৃতার্থ হইলাম। আর কোন উদ্যোগ করিতে হইবে না। আপনি এখন স্নানাহার করুন।"

এই বলিয়া শ্রীপ্রত্যুম্নমিশ্র গৃহ-অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তাঁহার হৃদয় তখনও কৃষ্ণকথার রসরঙ্গে পরিষিক্ত হইতেছিল, তাঁহার কর্ণযুগলে তখনও শ্রীল রামরায়ের মধুময়ী কৃষ্ণকথার সুধাঝঙ্কার প্রবাহিত হইতে-ছিল। তিনি গোলোকে কি ভূলোকে বিচরণ করিতেছেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার সে জ্ঞান ছিল না। তিনি ধীরে ধীরে আপন ঘরে উপস্থিত হইলেন, ভাবে ভাবে স্নান করিলেন, আহাব করিলেন, তখনও শ্রীল রাম-রায়ের সুধামধুর কণ্ঠস্বরের আনন্দময় ঝঙ্কার তাঁহার কর্ণযুগলে যেন ঝলকে ঝলকে অমৃতবর্ষণ করিতেছিল।

সন্ধ্যাকালে মিশ্র মহাশয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ সন্দর্শনার্থ আগমন

করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। মিশ্র মহাশয়ের মুখখানি আজ প্রীতিপ্রফুল্ল,—হৃদয়ে যেন কতই আনন্দ বিরাজমান, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে যেন আনন্দরাশি স্থান না পাইয়া উছলিয়া পড়িতেছে। মিশ্র মহাশয়কে দেখামাত্রই মহাপ্রভু একটুকু মৃদুমধুর হাসিয়া বলিলেন, "মিশ্র, কৃষ্ণকথা শুনেছ ত ?"

শ্রীরামানন্দের প্রকৃত-স্বরূপ।

প্রভুর বাক্য পরিসমাপ্ত হইতে না হইতেই মিশ্র মহাশয় উৎসাহভরে বলিলেন, "দয়াময়, আপনি দাসকে কৃতার্থ করিয়াছেন। আমি কৃষ্ণকথা শুনিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি কৃপা করিয়া এ অধমকে কৃষ্ণকথা-সাগরে একবারে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। রামানন্দ রায় মহাশয়ের কথা বর্ণনার অতীত। শ্রীল রায় মহাশয় মানুষ নহেন, তিনি কৃষ্ণভক্তিরসের মূর্ত্তিমান্ অবতার।"

এই কথা বলিতে বলিতে মিশ্রের দেহ পুলকিত হইল, আবার যেন তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণকথা-রসসাগর উথলিয়া উঠিল। শ্রীল রামরায়ের সুধা-মধুর ভক্তিমাখা কণ্ঠস্বর, সেই কণ্ঠস্বরে রসময় কৃষ্ণকথার পীযূষ-প্রবাহ,—মিশ্র মহাশয়ের হৃদয়ে আবার যেন পূর্ণবেগে প্রবাহিত হইল। শ্রীল রামরায়ের প্রকৃত স্বরূপ,—কৃষ্ণভক্তিরসময় শ্রীমূর্ত্তি আবার শ্রীপ্রদ্যুম্ন-মিশ্রের চিত্তে লোকাতীত মাধুর্য্যে ও ঔজ্জ্বল্যে প্রকটিত হইলেন। মিশ্র মহাশয় কথা বলিতে বলিতে অমনি স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ বুঝিলেন, শ্রীল রামরায় মানুষ নহেন—তিনি নরাকারে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরসের মূর্ত্তিমান্ অবতার। প্রদ্যুম্নমিশ্রের ভাবপ্রবাহ অতর্কিতভাবে ভক্তগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। সকলেই বুঝিতে পারিলেন, শ্রীল রামরায় অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের প্রকৃত শিক্ষাগুরু। শ্রীচরিতামৃতে, শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রের উক্তিতে লিখিত হইয়াছে :—

মিশ্র কহে প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥

রামানন্দ রায় কথা কহিলে না হয়।
মনুষ্য নহে রায়—কৃষ্ণভক্তিরসময়॥

ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসময়ত্বই শ্রীল রামরায়েব স্বরূপ। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীমতী বিশাখা নবদ্বীপলীলায় কৃষ্ণভক্তিরসের পূর্ণপ্রবাহস্বরূপ শ্রীল রামরায়রূপে বিরাজিতা।* রামরায়ের সন্দর্শন আর শ্রীকৃষ্ণভক্তিরস-সন্দর্শন

---

* শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার পাত্র-পাত্রীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলার পাত্রপাত্রীগণের একত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। অন্ত্য লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সকল ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রীরাধিকার ভাবাভিব্যক্তি বলিয়াই পূজ্যপাদ গ্রন্থকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীপাদ রামানন্দরায় এই সময়ে সর্ব্বদাই শ্রীরাধাভাবনিমগ্ন মহাপ্রভুর পার্শ্বে অবস্থান করিয়া ললিতা ও বিশাখার ন্যায় তাঁহার সেবা পরিচর্য্যা ও সান্ত্বনা করিতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন :—

পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপ গোসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ॥

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীপাদ স্বরূপকে ললিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকবিকর্ণপুর কৃত গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে লিখিত আছে স্বরূপ গোস্বামী বিশাখা যথা :—

কলামশিক্ষয়দ্রাধাং যা বিশাখা ব্রজে পুরা।
সোঽদ্য স্বরূপ গোস্বামী তত্তদ্ভাববিলাসবান্॥

আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহোদয়ের অনুভবই এক্ষেত্রে অধিকতর সুসঙ্গত মনে করিয়াছি। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরই ললিতার ন্যায় রসজ্ঞ ইহাই মহানুভাব বৈষ্ণবগণের ধারণা। শ্রীপাদ রামানন্দের তথ্য অধিকতর জটিল। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রামানন্দের পিতৃদেবকে পাণ্ডু এবং তৎ পঞ্চপুত্রকে পঞ্চ পাণ্ডব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যথা :—

সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি॥

একই কথা। শ্রীল রামরায়ের শ্রীমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ—আর কৃষ্ণকথারস-সমুদ্রে নিমজ্জন একই কথা। শিষ্টশান্ত ভদ্রলোক, কিংবা শুষ্কজ্ঞানী বেদান্তী,—যিনিই একবার শ্রীরামরায়ের সহিত সরলভাবে ধর্ম্মালাপ করিতেন, তাঁহারই হৃদয় ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিত। বিষ্ণু-

---

আদি লীলাতে আরও স্পষ্টতঃ লিখিত আছে :—

আলিঙ্গন করি তারে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন॥
রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ॥
এই পঞ্চপুত্র তোমার প্রিয় পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহভেদমাত্র॥

ইহাতে জানা যায় রামানন্দকে প্রভু বাহ্যদশায় সখা বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার উল্লেখ আছে যথা :—

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য রামানন্দের শুদ্ধ সৌখ্য
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস।
গদাধর জগদানন্দ স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ
এই চারি ভাবে প্রভু বশ॥

দ্বারকার ভাবে রায় রামানন্দ অর্জ্জুন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। কবিকর্ণপুরের শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকাগ্রন্থে রায় রামানন্দকে অর্জ্জুন বলিয়া প্রথমে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রজের সখ্যরসের সহিত ঐক্য রাখার জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে ইহাকে সুবল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যথা অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ অধ্যায়ে :—

সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণ সুখের সহায়
গৌর সুখ দান হেতু তৈছে রাম রায়।

কিন্তু গম্ভীরা-লীলায় শ্রীরাম রায়ের যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে ললিতা বা বিশাখা বলিয়া মনে করাই উচিত। এ সম্বন্ধে শ্রীল কবিকর্ণপুরের মীমাংসাই [illegible] ব্যবস্থা :—

পাদোদকী পুণ্যসলিলা গঙ্গাপ্রবাহ অপেক্ষাও কৃষ্ণভক্তিরসময় শ্রীল রাম-রায়ের কৃষ্ণকথা-প্রবাহ অধিকতর পবিত্রতাপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইত। গঙ্গা নরকনিবারিণী, পবিত্রতাপ্রদায়িনী এবং বিষ্ণুভক্তিপ্রদা। কিন্তু শ্রীল রামরায়ের কৃষ্ণকথা-সুধাসরিৎ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়িত্রী। শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রের কথা শুনিয়া ভক্তবর্গ এতদিন পরে অতি উত্তমরূপে শ্রীল রামরায়ের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলেন।

প্রিয় নর্ম্মসখঃ কশ্চিৎ সোঽর্জ্জুনঃ পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ।
মিলিত্বা সমভূদ্রামানন্দ রায়ঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥
অতো রাধাকৃষ্ণভক্তিপ্রেমতত্ত্বাদিকং কৃতী।
রামানন্দো গৌরচন্দ্রং প্রত্যবর্ণয়দম্বহম্॥
ললিতেত্যাহুরেকো যত্তদেকো নানুমন্যতে।
ভবানন্দং প্রতিপ্রাহ গৌরো যত্বং পৃথাপতিঃ॥
গোপার্জ্জুনী যয়া সার্দ্ধমেকীভূয়াপি পাণ্ডবঃ।
অর্জ্জুনো যদ্‌রায় রামানন্দ ইত্যাহুরুত্তমাঃ॥
অর্জ্জুনী যাভবৎ তূর্ণং অর্জ্জুনোঽপি পাণ্ডবঃ।
ইতি পাদ্মোত্তরে খণ্ডে ব্যক্তমেব বিরাজতে॥
তস্মাদেতৎত্রয়ং রায় রামানন্দ মহাশয়ঃ।
ব্রজভক্তা সমাসেন কথ্যন্তেঽথ যথামতি॥

কেহ কেহ বলেন পাণ্ডব অর্জ্জুন ও ব্রজের নর্ম্ম সখা অর্জ্জুন এই উভয়ে মিলিয়া গৌরাঙ্গলীলায় রামানন্দরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি ব্রজলীলায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই মহাপ্রভুর নিকটে শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেমতত্ত্বাদি বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি ললিতা ছিলেন, কেহ কেহ ইহা অনুমোদন করে না। ইহারা বলেন প্রভু যখন ভবানন্দকে পাণ্ডু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তখন রায় রামানন্দ ললিতা না হইয়া বরং অর্জ্জুনী বা বিশাখা হইতে পারেন। সেই অর্জ্জুনীতে বা বিশাখায় পাণ্ডব অর্জ্জুন মিলিত হইয়াছিলেন। চিদানন্দ রাজ্যের নিয়মে ইহা যে সম্ভবপর হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ইহা প্রকাশিত আছে। সুতরাং শ্রীপাদ রায় রামানন্দ এই তিনের মিলিত মূর্ত্তি।

অতঃপরে মিশ্র মহাশয় আরও একটী কথা বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ঃ—

আর কথা রায় কহিল আমারে।
কৃষ্ণকথাবক্তা করি না জানিও মোরে॥
মোর মুখে কথা কহে আপনি গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র॥
মোর মুখে কহে কথা, করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাহার॥

শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রমহাশয় শ্রীল রামরায়ের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া যখন তাঁহার সাক্ষাতেই শতমুখে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিয়া হৃদয়ে প্রগাঢ়তম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছিলেন, তাহা শুনিয়া শ্রীল রামরায় বলিলেন, "মহাশয়, আমাকে একি বলিতেছেন, আমি কৃষ্ণকথার কি জানি? এই যে এতক্ষণ আপনি আমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিলেন, আমাকে ইহার বক্তা বলিয়া মনে করিবেন না। শ্রীগৌরচন্দ্রই আমার মুখে এই সকল রসময়ী কথা বলিয়াছেন, আমি কেবল তাঁহার কথা বলার যন্ত্রস্বরূপ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আমার মুখে প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব প্রভৃতি ব্যক্ত করিয়া জগতে প্রচার করিতেছেন,— তাঁহার লীলার এই এক গূঢ় রহস্য। সুতরাং এ সম্বন্ধে যদি কাহারও নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়, তবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুই তাহার একমাত্র পাত্র।"

রামরায় স্তুতিবাদ ভালবাসিতেন না। সত্য সরলতা বিনয় ও ন্যায়-নিষ্ঠা তাঁহার চরিত্রের প্রধান গৌরব ছিল। তাঁহার ভ্রাতা গোপীনাথ রাজসরকারের তহবিল তছরূপ করার অপরাধে যখন গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার আদেশ প্রাপ্ত হন তখন শ্রীপাদ রামরায় মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট তাঁহার ক্ষমার জন্য কোনও অনুরোধ জ্ঞাপন করেন নাই। মিশ্র মহাশয় তাঁহার স্তুতিবাদ করিলেন। ন্যায়নিষ্ঠ সরল বিনয়ী রামরায়

তৎক্ষণাৎ বলিলেন "আমার কথায় যদি কোন কৃতীত্ব থাকে, তাহা মহাপ্রভুরই প্রেরণা। উহা আমার কোন গুণের পরিচায়ক নহে।"

মিশ্র মহাশয় বুঝিলেন,—ভক্ত ও ভগবান্ একআত্ম। ভক্তহৃদয়ই শ্রীভগবানের লীলাবিহারের স্থান। ভক্তহৃদয়ে বিরাজিত থাকিয়াই শ্রীভগবান্ কথা বলেন, ধর্ম্মোপদেশ করেন। ভক্তের কথা শ্রীভগবানেরই প্রেবণা। শ্রীল রামরায় যাহা বলিলেন, তাহা বিনয়-নম্রতাব্যঞ্জক হইলেও এই বিনয়নম্র বাক্যেই মহাসত্য নিবস্তব নিহিত রহিয়াছে। মিশ্র মহাশয় শ্রীল রামরায়ের নিকট স্বীয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট আসিয়াও তাঁহাকেই এই ব্যাপারেব একমাত্র প্রযোজককর্ত্তা স্থিব করিয়া ভক্তি-উচ্ছ্বসিত চিত্তে বলিলেন :—

যে সব শুনিলুঁ কৃষ্ণ বসের সাগর।
ব্রহ্মার এ সব বস না হয় গোচর॥
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাম আমি॥

ভক্তিরসময় হৃদয়ের কেমন সরল ও সুমধুর উচ্ছ্বাস। মিশ্র মহাশয় যেন কৃষ্ণকথা-সুধারসে একবাবে গলিয়া গিয়াছেন। ভক্তবৎসল প্রভু মিশ্র মহাশয়ের মুখে শ্রীল রামরায়ের কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা কিছুই নয়। রামানন্দ বিনয়ের খনি। তিনি নিজের গুণ পরের উপর অর্পণ করিয়া নিজে তৃণাদপি সুনীচ হইয়া অপরকে মানী ও গুণবান্ করেন। মহানুভাবগণ কথনও নিজের গুণ স্বীকার করেন না, ইহা তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রভু কহে রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পর-মুণ্ডে দেন আনি॥
মহানুভাবের এইমত স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনি কহয়॥

যেমন প্রভু, তেমনই ভক্ত,—উভয়েই গুণগ্রাহী, উভয়েই স্বীয়গুণ স্বীকারে পরাঙ্মুখ। ভক্ত বলিতেছেন, "মহাপ্রভুর লীলার এই এক বিশেষত্ব যে, তিনি তাঁহার ভক্তের মুখে তত্ত্বকথা প্রকাশ করিয়া জগজ্জনকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন।" প্রভু বলিতেছেন, "আমি কিছুই জানি না। কৃষ্ণকথা শুনিতে সাধ হইলে রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিয়া কৃতার্থ হই। শ্রীরামানন্দ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা—তিনিই কৃষ্ণকথার সুধানিধি। মহানুভাবের স্বভাবই এই যে নিজে নিজের গুণ প্রকাশ করেন না; তাই তিনি নিজের গুণ অপরে আরোপ করিয়া থাকেন।"

ফলতঃ শ্রীনবদ্বীপলীলা প্রকৃতই অত্যদ্ভুত প্রেমলীলা। শ্রীভগবান্ ও ভক্তের এরূপ মাখামাখি আত্মীয়তা, ভক্তমাহাত্ম্য প্রকাশে শ্রীভগবানের এরূপ আগ্রহাতিশয়, জীবেব প্রতি এমন অদ্ভুত ঔদার্য্য ও নিরঙ্কুশ কৃপা আর কোথাও দেখা যায় না।

শ্রীমৎ প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণ উপলক্ষ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল রামরায়ের উচ্চতম ভজনাধিকারিত্বের বিবরণ ভক্তসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টতঃই পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে।
নানা ভঙ্গীতে প্রকাশি নিজ লাভ মানে॥

শ্রীল রামানন্দ দ্বারা মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্ম প্রকটন করেন ইহা অতি সত্য কথা, কিন্তু ইহার আরও একটী মহান্ উদ্দেশ্য আছে। যে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অবতরণ করিয়া লীলা-প্রকট করেন, সেই সময়ে এদেশে শুষ্কজ্ঞানী সন্ন্যাসীরা ধর্ম্মাচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হইতেন। তাঁহারা সমাজপূজ্য ব্রাহ্মণদেরও নমস্য। কিন্তু মহাপ্রভু দেখিলেন, অধিকাংশ সন্ন্যাসীই নামমাত্র সন্ন্যাসী। ইহারা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও ক্রোধাদি ষড়্‌বর্গের বশীভূত। প্রকৃত ধর্ম্মের যাহা প্রথম সোপান, এই

সকল সন্ন্যাসী তাহাতে আবোহণেও অসমর্থ, অথচ ইহারা কেবল অনর্থক সন্ন্যাসীর চিহ্নমাত্র ব্যবহার করিয়াই সমাজে সদম্ভে ও সগর্ব্বে বিচরণ করিয়া থাকে। প্রকৃত ধর্ম্ম কি, ইহারা তাহার বিন্দুমাত্রেরও অনুসন্ধান রাখে না। কিন্তু ইহারা সমাজে ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়া গণ্য। জীবশিক্ষার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, অথচ এই সন্ন্যাসিবরেণ্য মহাপ্রভু ধর্ম্মোপদেশ-প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীল রামরায়েব নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল।
"কৃষ্ণভক্তি তত্ত্ব কহ" তাঁহারে পুছিল॥
তিঁহো কহে "আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে তিঁহো নাহি হেথা॥
তোমার ঠাঁই আইলাম মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥

মহাপ্রভু জাতিতে সমাজপূজ্য ব্রাহ্মণ, আশ্রমে ব্রাহ্মণপূজ্য সন্ন্যাসী শ্রীল রামরায় জাতিতে শূদ্র, আশ্রমে গৃহস্থ,—বিষয়ী। তাঁহার নিকট প্রভু বলিতেছেন, "ব্রাহ্মণ হউন, ন্যাসী হউন, আর শূদ্র হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু। আমি সন্ন্যাসী আর তুমি শূদ্র, ইহা মনে করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিও না। আমি তোমার নিকট শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব শুনিতে আসিয়াছি। আমার এই প্রার্থনা তোমার পূর্ণ করিতেই হইবে।"

প্রিয় ভক্তপাঠক, গম্ভীর চরিত্র শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাভঙ্গী দেখুন। যে

সমাজে সন্ন্যাস-চিহ্নধারী হইলেই ধর্ম্মাচার্য্যের গুরুগৌরবময় আসনপ্রাপ্তির অধিকার বর্ত্তমান, শ্রীভগবান্ সেই সমাজে পূর্ণ বিপরীত প্রথার প্রবর্ত্তন করিলেন,—রাজাধিরাজ যেন মুষ্টিভিক্ষার নিমিত্ত পথের কাঙ্গালের নিকট ব্যাকুল ভাবে হাত বাড়াইলেন! এ লীলা অতি রহস্যময়ী, অতি নিগুঢ় ও অতি গম্ভীর।

শ্রীল রামরায় মহানুভাব দ্বারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জগতে সপ্রমাণ করিলেন যে, জাতিতে শূদ্র ও আশ্রমে গৃহস্থ হইলেও তাঁহার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক গুণ-প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকিতে পারে, এমন কি তিনি সন্ন্যাসীর ধর্ম্মোপদেষ্টৃ পদেও অভিষিক্ত হইতে পারেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়বর্গের বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীর উপদেশে॥

* * * *

সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারা নামমাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিলাস॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজরস-প্রেমলীলা।
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা॥
শ্রীচৈতন্যলীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাতে পারে যার একবিন্দু॥

শ্রীযুৎ প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথা শ্রবণচ্ছলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দ

রায় মহাশয়ের অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম-সিদ্ধির অলৌকিক অপ্রাকৃত মাহাত্ম্য-গৌরব প্রকটন করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের সুধাময়ী লীলাকথার সীমা নাই,—ইহা অপার ও অনন্ত। আমি উহার বিন্দু মাত্রও বলিতে সমর্থ হইলাম না। আত্ম-শোধনের নিমিত্ত এই রসময় চরিত্রের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া ছিলাম, এই গ্রন্থে তাহাই সঙ্কলিত হইল মাত্র। আর দুই একটী আনুসঙ্গিক কথা লিখিয়াই গ্রন্থের উপসংহার করিতেছি। করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় "গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ" গ্রন্থ প্রকাশিত হইল আরও দুই চারিবার এই প্রেমরসময় ভুবনপাবন নামোচ্চারণ করিবার আশা আছে। নচেৎ শ্রীপাদ রায় রামানন্দের রসময়লীলাবর্ণনার সৌভাগ্য এখানেই একরূপ সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরায় রামানন্দের গ্রন্থ।

শ্রীল রামানন্দ রায়ের পাণ্ডিত্য ও ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে আমরা বহুল পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিংবা উৎকলই তাঁহার জন্মভূমি ছিল, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই,—কল্পনার সাহায্যে এইরূপ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষায় বা উড়িয়া ভাষায় তাঁহার কোন গ্রন্থ আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু সে অনুসন্ধান নিষ্ফল হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার

রচিত শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ আছে বলিয়া জনশ্রুতি আছে, তাহার আলোচনা অতঃপরে করা যাইবে। শ্রীপাদরূপ গোস্বামি সঙ্কলিত পদ্যাবলী নামক গ্রন্থে যে সকল শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে, সেই গ্রন্থে রায় রামানন্দের শ্লোকও দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপরে সেই শ্লোকাদির উল্লেখ করিব। ভারতীয় সংস্কৃত পুস্তকের তালিকাকার সুবিখ্যাত জার্ম্মেণ পণ্ডিত আউফ্রেক্ট তদীয় গ্রন্থ-তালিকায় যে সকল গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে রামানন্দ রায় প্রণীত কেবল এক জগন্নাথ বল্লভ নাটকের নামই দৃষ্ট হইল। কেহ কেহ বলেন রায় রামানন্দ শান্তিশতকের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন।

খুব সম্ভবতঃ শ্রীল রামানন্দ উড়িয়া, বাঙ্গালা, আরবী, পারসী, তামিল তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তামিল ও তেলেগু ভাষা মাদ্রাজে প্রচলিত। বিজয়নগরের শাসনকর্ত্তার পক্ষে এই দুই ভাষার অভিজ্ঞতা তৎকালে একান্তই প্রয়োজন ছিল। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানদের প্রভাব-সময়ে এ দেশবাসীদিগের, বিশেষতঃ রাজকীয় কর্ম্মচারিদিগের পক্ষে আরবী ও পারসী ভাষায় জ্ঞান-লাভ অবশ্য কর্ত্তব্যতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এখন যেমন ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান বিষয়-কার্য্যে একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সময়ে আরবী ও পারসী ভাষাও সেইরূপ রাজভাষা বলিয়া সম্মানিত ও আদৃত হইত। বাঙ্গালীদের সহিত ঘনিষ্ট সংস্রব থাকার জন্য উড়িষ্যার অধিবাসীদের পক্ষে বাঙ্গালাভাষাজ্ঞানও স্বাভাবিক। রায়রামানন্দ সংস্কৃত ভাষাতেও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক ভিন্ন তাঁহার রচিত অন্য কোন গ্রন্থের সন্ধান লাভ করিতে পারি নাই। ফলতঃ নিরন্তর বিশাল সাম্রাজ্যের রাজকার্য্য ভার স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া তাঁহার গ্রন্থরচনার অবকাশ সম্ভবতঃ বড়ই অল্প ছিল।

শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকখানি কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, গ্রন্থকার

স্বীয়গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করেন নাই। তবে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভুর সহ আলাপ পরিচয়ের পূর্ব্বেই যে তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহার যুক্তি-সঙ্গত কাবণ অনুমিত হইতে পারে। মহাপ্রভুর ভক্তমাত্রেই গ্রন্থের মঙ্গলা-চবণে মহাপ্রভুব বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-নাটকে শ্রীচৈতন্য-দেবের বন্দনা নাই। ইহাতে অনুমিত হয় ১৪৩২শকের পূর্ব্বে কোনও সময়ে তিনি এই নাট্য-গীতিকা রচনা কবিযাছিলেন। শ্রীপুরীধামে বক্ষিত মাদলা পঞ্জী অনুসাবে জানা যায় ১৪২৬ হইতে ১৪৫৪ শকাব্দ পর্য্যন্ত মহাবাজ প্রতাপরুদ্র উৎকলে রাজত্ব কবেন। এই নাটক যে প্রতাপরুদ্রের প্রীতির জন্যই বচিত হয়, গ্রন্থকাব বহু স্থলে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতাপরুদ্র স্বীয় বাহুবলে মুসলমান শাসনকর্ত্তা সেকেন্দরকে পরাজিত কবিয়াছিলেন, জগন্নাথবল্লভনাটকেব প্রথমে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। সুতবাং সম্ভবতঃ ১৪২৬ শকাব্দ হইতে ১৪৩২ শকাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে এই গ্রন্থ বিবচিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যচবিতামৃত-গ্রন্থে স্থানে স্থানে এই নাটকখানির নাম উল্লেখ কবা হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নাটকগীতি অতীব আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন। যথা শ্রীচবিতামৃতে ঃ—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু বাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

এস্থলে "রায়ের নাটকগীতি" বলিয়া যে গ্রন্থের নাম করা করা হই-য়াছে, সেই গ্রন্থই—শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক। এই নাটক খানিকে গ্রন্থকার নিজেও "রামানন্দ সঙ্গীত নাটক" বলিয়া এই গ্রন্থেই অভিহিত করিয়াছেন যথা ঃ—

"পৃথ্বীশ্বরস্ত শ্রীভবানন্দরায়স্য তনুজেন শ্রীহরিচরণালঙ্কৃতমানসেন

শ্রীরামানন্দরায়েন কবিনা তৎতৎগুণালঙ্কৃতং শ্রীজগন্নাথবল্লভনামগজপতি প্রতাপরুদ্রপ্রিয়ং "রামানন্দসঙ্গীত নাটকম্" নির্মায় সমর্পিতম্।" সুতরাং "রামানন্দ সঙ্গীত নাটক"কেই শ্রীল কবিরাজ "রায়ের নাটকগীতি" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দিনরজনী যে নাটকগীতির রসমাধুর্য্য আস্বাদন করিতেন, তাহা যে শ্রীবৃন্দাবনরসমাধুর্য্যের উচ্ছ্বসিত উৎসস্বরূপ, তাহা স্পষ্টতঃই স্বতঃসিদ্ধ।

এই নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত,—প্রথম অঙ্কে পূর্ব্বরাগ, দ্বিতীয় অঙ্কে ভাবপরীক্ষা, তৃতীয় অঙ্কে ভাবপ্রকাশ, চতুর্থ অঙ্কে শ্রীরাধাভিসার, পঞ্চম অঙ্কে শ্রীরাধাসঙ্গম বর্ণিত হইয়াছে। নাটক খানি আয়তনে ক্ষুদ্র। ইহাতে নট, শ্রীকৃষ্ণ, বিদূষক ও অরিষ্টাসুর ভিন্ন অপর কোন পুরুষের উল্লেখ নাই। নারীগণের মধ্যে নটী, শ্রীমতী রাধা, পূজনীয়া মদনিকা,—ইনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলনের সহায়রূপিণী, অশোকমঞ্জরী শ্রীরাধার অনঙ্গপত্রবাহিনী—মাধবী ও শশিমুখী প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য।

কবিবর অতি অল্প উপাদানে এবং অতি অল্প কথাতেই এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে গদ্যে, পদ্যে, প্রাকৃতভাষায় ও গানে উক্তি-প্রত্যুক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গানগুলি সরস ও সুললিত, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুকারে রচিত। শ্রীগ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চৎ উদ্ধৃত করিয়া প্রেমিক পাঠকগণের নয়ন-সমক্ষে এই নাটকগীতিকার সৌন্দর্য্য-প্রকটনের প্রয়াস পাইব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, এই আশঙ্কায় সে প্রয়াস হইতে নিবৃত্ত হইলাম। রসজ্ঞ পাঠকমহোদয়গণ শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের অনুবাদসহ এই সঙ্গীত নাটক পাঠ করিবেন। আমরা এখানে কেবল যৎকিঞ্চিৎ আভাস মাত্র প্রদান করিতেছি।

প্রথমতঃ নান্দীশ্লোকে শ্রীভগবানের নৃত্য বর্ণনা করা হইয়াছে। গীতি-নাট্যে,—নর্ত্তনই নমস্কারের বস্তু।

প্রিয়তম পাঠক, বেদান্তে আনন্দ-শ্রুতির উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছেন, রস-শ্রুতির উল্লেখও দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু আনন্দলীলারস-বিগ্রহ, ভক্তের মনোবাঞ্ছা-পরিপূরণের নিমিত্ত ত্রিভঙ্গভঙ্গিমরূপে কি প্রকার ভুবন-ভুলান নৃত্য করেন, ভক্তির দর্শনশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন দর্শনে তাহার কোনও সন্ধান পাইয়াছেন কি? শ্রীল রায় মহাশয়ের এই গ্রন্থের নমস্কার-পদ্যে আনন্দরস-বিগ্রহের নৃত্যভঙ্গি-মাধুর্য্য একবার অনুভব করুন। তৎপরে "মৃদুলমলয়জপবনতরলিত চিকুরপরিগতকলাপ" শ্যামসুন্দরের শ্রীমুখকান্তি ভক্তিনয়নে সন্দর্শন করুন, দেখিবেন ভজনের নিমিত্ত আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। শ্রীল রামানন্দ তদীয় সঙ্গীত নাটকে এই মধুর মনোহর শ্রীমূর্ত্তির মাধুর্য্য প্রকটন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ তদীয় বিদূষকের নিকট যে গীতে শ্রীবৃন্দাবনের শোভা-বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীবৃন্দাবনের অতুলনীয় বৈভব ও কাব্যসম্পত্তি-শোভা অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত অলৌকিক কাব্যের নিত্য-নিকেতন,—চিরসরস, চিরমধুময়,—স্বীয় সৌন্দর্য্যগৌরবে চিরগৌরবাস্পদ। প্রেমময় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখময়ী লীলাস্থলী—শ্রীবৃন্দাবনের কাব্যসম্পদ্ ভক্তিভাবিতচিত্তে স্বতঃই প্রকটিত হন, কবির বাক্যঝঙ্কার কেবল উহার উদ্বোধকমাত্র। ফুলের হাসি, চাঁদের জ্যোৎস্না মলয়ের পবন, কোকিলের কুজন, শ্যামল কানন, আনন্দঘন প্রেমমূর্ত্তি শ্যামসুন্দর, আর আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতা আহ্লাদিনী শক্তিগণের আনন্দলীলা,—ইহাঁই শ্রীজগন্নাথ-বল্লভের নাটকের কবিত্ব সম্পদ্। শ্রীবৃন্দাবনের মৃদুলপবনাহতচঞ্চল পল্লবের নৃত্য কিরূপে ব্রজরাখালগণের হৃদয় ও অঙ্গ নাচাইয়া তুলিতে আমন্ত্রণ করে, জগন্নাথবল্লভ নাটকের প্রেমিক কবি নিভৃত বসিয়া তাহারও সন্ধান রাখেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে লিখিত আছে শ্রীমতীর নিসৃষ্টার্থা দূতী শশিমুখী কুসুম-পত্র লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শশিমুখীকে বলিলেন, "তিনি কুলবধূ। আমার সহিত তাঁহার কখনও আলাপ

পরিচয় নাই। এই অবস্থায় আমার নিকটে এরূপ পত্র লেখা অসঙ্গত ও অধর্ম্মজনক। যথা শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকে

দয়িতো দয়িতস্তস্যা বালেয়ং কুলপালিকা।
অকাণ্ডে কিমসৌ মুগ্ধে ধত্তামাচারবিপ্লবম্॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "ভদ্রে আরও দেখ তিনি কুলপালিকা, তাঁহার পক্ষে পতিই পরম দয়িত। তিনি অনর্থক আচার-বিপ্লব করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন?" এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "দূতি তুমি শ্রীমতীকে এই অধর্ম্ম কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিও।" তিনি একটি গানেও এই ভাব প্রকাশ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—"দূতি, ভাবিয়া দেখ, শশধরের প্রতি নলিনী কখনও অনুরাগিনী হয় না, যামিনী কখনও রবিকে পতি বলিয়া গ্রহণ করে না, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কুলবনিতাদিগের আচরণও তদ্রূপ। কুলবধূদিগের পক্ষে পরপুরুষে অনুরাগ পাপজনক। শশিমুখি, তুমি পদ্মমুখী শ্রীরাধিকাকে এই অনুচিত অনুরাগে প্রবৃত্ত হইতে বারণ কর। তিনি কুলবধূ হইয়া যদি কুলচরিত্রের মর্য্যাদা রক্ষা না করেন, আমরা তাঁহার এই ব্যবহারে কি মনে করিব? এই প্রবৃত্তি ভাল নয়; যাও তাঁহাকে বারণ কর।"

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসের সময়ে বনে উপনীতা ব্রজবধূদিগকে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ যেরূপ পাতিব্রাত্য ধর্ম্মের উপদেশ করিয়া ভাব পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এই নাটকের ভাব-পরীক্ষান্তেও সেই পাতিব্রাত্য-ধর্ম্মোপদেশই অতি অল্প কথায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই গানেই দ্বিতীয় অঙ্কের উপসংহার করা হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কের দৃশ্যারম্ভ এইরূপ:—শ্রীরাধা মাধবীকুঞ্জে বিষণ্ণ ভাবে উপবিষ্টা। শশিমুখী শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানসূচক অশুভ সংবাদ বলায় শ্রীমতীর মুখকমল পরিম্লান হইয়াছে। মদনিকা তাঁহার নিকট বসিয়া মৃদু মৃদু ভাবে প্রবোধ বাক্য বলিতেছেন। এই সময়ে অশোক মঞ্জরী

দূর হইতে তাঁহাদিগকে অতি মৃদু ও সতর্কভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়া আর ওদিকে অগ্রসর হইলেন না। তিনি আপন মনে বলিলেন, "উঁহারা মৃদু মৃদু ভাবে কি গোপনীয় কথা বলিতেছেন, এখন উঁহাদের নিকট যাওয়া অসঙ্গত।" তিনি এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীমতী উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গানে মনের বেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন :—

"কুলবনিতাজনধৃতমাচারং তৃণবদগণয়ং গলিতবিচারম্। ইত্যাদি।

এই গানটীতে শ্রীরাধার আক্ষেপ-অনুরাগ সূচিত হইয়াছে। শ্রীমৎ রূপগোস্বামী যখন তদীয় নাটকের "যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া" শ্লোক শ্রীরামরায়কে শুনাইতেছিলেন, শ্রীল রামরায় তখন বিস্মিত হইয়া শ্রীরূপের মুখপানে তাকাইয়াছিলেন। শ্রীরূপ শ্রীল রামরায়ের নাটক তখনও দেখেন-নাই। কিন্তু তাঁহার নাটকে এই সকল ভাবের বিকাশ এবং কাব্যের অনন্ত মাধুর্য্যময়ী বর্ণনা দেখিয়া শ্রীল রামরায় তখন বিমোহিত হইয়াছিলেন। অতঃপরে শ্রীমতী বলিতেছেন, যথা জগন্নাথবল্লভে :—

শ্রাবং শ্রাবং সুসামশ্রুতিসমিতপরব্রহ্মবংশীপ্রসূতং
দর্শং দর্শং ত্রিলোকীবরতরুণকলাকেলিলাবণ্যসারম্।
ধ্যায়ং ধ্যায়ং সমুদ্যদ্ দ্যুমণিকুমুদিনী বন্ধুরোচিঃ সরোচি
শ্চায়ং শ্রীকান্তসঙ্গং দহতি মম মনো মাং কুকূলাগ্নিদাহম্।

অর্থাৎ সখি, সামবেদের ন্যায় তাঁহার মনোহর সুস্বরময় পরব্রহ্ম বংশীরব শুনিয়া শুনিয়া, তাঁহার ত্রিলোকসুন্দর সাক্ষাৎ মদনের ন্যায় লাবণ্যসার শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া এবং এককালীন উদিত দিননাথ ও নিশানাথ-সদৃশ শোভাশালি তাঁহার ভুবনমোহন রূপ ধ্যান করিয়া করিয়া আমার মন সততই আমাকে তুষানলের ন্যায় দগ্ধ করিতেছে।"

শশিমুখী প্রবোধ দিয়া বলিলেন "প্রিয়সখি অস্থানে আগ্রহ ত্যাগ কর। দেখ, সেই অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট তোমার সম্বন্ধে যত যত কথা বলিলাম, তিনি তাহার সকল কথাতেই উপেক্ষা

করিয়া শিশুর ভাব দেখাইলেন। সুবদনে, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে আর প্রয়োজন নাই। উহা চিত্তের উৎকালিকাকুসুমবিগলিত মধুমিশ্রিত বিষ, সুতরাং অন্যত্র মনোনিবেশ কর। যথা :—

যদ্ যদ্ ব্যঞ্জিতমঞ্জনপ্রতিকৃতৌ কৃষ্ণে তদর্থং ময়া
তত্তত্তেন নিবারিতং শিশুদশাভাবপ্রকাশৈরলম্।
আস্তামুৎকলিকাপ্রসূনবিগলন্মাধ্বীকনদ্ধং বিষং
কৃষ্ণধ্যানমিতোঽন্যতঃ সুবদনে সঙ্কল্পমাকল্পয়॥

কবিবর এই স্থানে কৃষ্ণধ্যান সম্বন্ধে শ্রীরাধিকার যে অদ্ভুত ভাবের কথা লিখিয়াছেন, তাহা রসাভিজ্ঞ পাঠকগণের নিয়ত আস্বাদ্য। শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণধ্যান "প্রসূনবিগলন্মাধ্বিকনদ্ধং বিষম্।" অর্থাৎ "বিষামৃতে একত্র মিলন"। শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি মহোদয়ের নাটকে এই ভাবটী কিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাও দেখুন :—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা গর্ব্বস্থ নির্ব্বাসনো
নিস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরা স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ

শ্রীচরিতামৃতকারমহোদয় ইহার ভাবানুগত অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন।

বাহে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষুচর্ব্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেম যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

এখানেও উভয় গ্রন্থকারের ভাব-সাম্য অতি স্পষ্ট। এতাদৃশ ভাবের সমতা আমরা আকস্মিক বলিয়া মনে করি না। ইহার অন্ত-

স্তরে অবশ্যই প্রগাঢ় নিয়ম আছে। ভক্তহৃদয়বিহারী মহাপ্রভু উভয় গ্রন্থকারের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শ্রীরাধাপ্রেমের এই উচ্চতম তত্ত্ব প্রতি-ফলিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাই উভয়ে বিরহিণী শ্রীমতীর কৃষ্ণ-ধ্যানের এই অদ্ভুত বেগবান্ ভাবের সার কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপধ্যান করিতে বসিলেই বিগত সুখস্মৃতি একে একে শ্রীরাধার হৃদয়পটে সমুদিত হয়, তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে গত সুখের সুধাস্মৃতি বিমিশ্রিত। সুখের স্মৃতি আছে কিন্তু সুখের পদার্থ নাই, যাহাকে লইয়া সুখভোগ, এখন তিনি বাম—তিনি দূরতর—সুতরাং ভীষণ অসহ্য জ্বালা। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই বিষের জ্বালা পরিহারের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণধ্যান-ত্যাগও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কেননা, সেই সুখের স্মৃতি মধুময়ী,—উহা বিষামৃতে বিমিশ্রিত।

শশিমুখী ইহা জানিয়াও শ্রীমতীকে বলিলেন "সখি, মুঞ্চ অস্থানাগ্রহম্" সখি অস্থানে আগ্রহ ত্যাগ কর।" ইহার উত্তরে শ্রীমতী যে একটী পদ্যে গভীর ভাবময় প্রেমবিলাপে তদীয় চিত্তক্লেশ প্রকাশ করেন। তাদৃশ বাক্য জগতের আর কোন সাহিত্যে পরিস্ফুট হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। এস্থলে সেই শ্লোকটীর অবতারণা করা যাইতেছে। শশিমুখীর কথা শুনিয়া শ্রীমতীর নয়নকমল হইতে মণিমুক্তার মোহন-মালাবিনিন্দি অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ভাঙ্গাকণ্ঠে প্রেম গদ্‌গদ স্বরে অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন :—

> প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
> স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।
> অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
> দ্বিত্রাণ্যেব যৌবনমিদং হা হা বিধেঃ কা গতিঃ।

শ্রীচরিতামৃতের বৈষ্ণবসুখদা টীকানুগ বঙ্গানুবাদ :—সখি, হরি প্রেম-বিচ্ছেদ-জনিত পীড়া জানেন না এবং প্রেমও স্থানাস্থান জানে না। আমরা

যে দুর্ব্বলা মদনেরও সে জ্ঞান নাই। এ জগতে কেহ কাহারও অশেষ কষ্ট বুঝিতে পারে না। জীবন অস্থির, এই যৌবনও দুইদিন মাত্র স্থায়ী। সখি, বিধাতার কি এই লীলা!

পরম রসময় শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় ইহার যে সরস সুন্দর পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তাহা অতীব মধুর। রসজ্ঞ পাঠকগণ অবশ্যই তাহা আস্বাদন করিয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকের এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়া মহাপ্রভু কত দিনযামিনী হৃদয়ের কপাট উঘাড়িয়া বিলাপ করিতেন,—নয়নজলে তাঁহার বদনকমল পরিষিক্ত হইত,—ভাবের আবেগে তিনি অধীর ও আকুল হইয়া পড়িতেন, শ্রীচরিতামৃতের প্রেমিক ভক্তপাঠকগণের হৃদয়ে তাঁহার লেশাভাস এখনও অনুভবনীয়।

শ্রীকৃষ্ণের নিগ্রহে শ্রীমতী বিরহে ক্রমেই অধীরা হইয়া পড়িলেন। মদনিকা প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় সে প্রবোধ-বাক্যে স্থির হইল না। তিনি বলিলেন "সখি, চারিদিকে ভীষণ দাবানল, হরিণীর কোমল দেহ সে জ্বালা কি করিয়া সহিবে? শ্যাম জলধরের জলধারায় সে অনল-নির্ব্বাণ হইবে এই আশায় কি হরিণী প্রাণ ধারণ করিতে পারে? আর এই জীবন চলিয়া গেলে নব নীরদের পলল-ধারাতেই বা সন্তাপ-মৃতার কি লাভ হইবে?" কবি তুলসী দাসও একস্থানে লিখিয়াছেন।

এক বিন্দু জল লাগি চাতক নিতি দুঃখ পাবে।
প্রাণ গেলে সাগর মিলেত কোন্ কামনে আবে॥

এইরূপে শ্রীরাধার অনুরাগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে হইয়া উঠিল। তিনি প্রবোধবচনে আর সান্ত্বনা পাইলেন না।

মদনিকা বলিলেন, "বৎসে, স্থির হও আমি মাধবের নিকট মাধবীকে পাঠাইয়াছি। সে তোমার চিত্রফলক লইয়া মাধবের নিকট গিয়াছে।"

এই কথা বলিতে বলিতেই মাধবী আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার হস্তে চিত্র-ফলক দেখিয়া মদনিকার হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। চিত্রফলকে শ্রীকৃষ্ণ কি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা দেখিবার নিমিত্ত মদনিকা চিত্রফলক চাহিলেন। শ্রীরাধাও সলজ্জ ভাবে চিত্রফলকের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। মাধবী বলিলেন আগে পরিতোষিক চাই। এই বলিয়া ঈষৎ দেখাইয়া আবার উহা বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইলেন। এই সময়ে সুপণ্ডিতা মদনিকা সহসা উহা পাঠ করিয়া মর্ম্ম অবগত হইলেন। শশিমুখীর বিলম্ব সহিল না। তিনি বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। শশিমুখী শ্রীমতীর হস্তে চিত্রফলক প্রদান করিলেন। শ্রীমতী আনন্দবেগে তখন অধীরা। শ্রীমতীর দুঃখও যেমন প্রবলতম, সুখও তেমনি প্রবলতম। তিনি মদ-নিকার হাতে চিত্রফলক দিয়া বলিলেন,দেবি এই সকল পংক্তির অর্থ কি ? মদনিকা বলিলেন—সখি, তোমার হৃদয় জানিয়া শ্রীকৃষ্ণও তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন। কেন না প্রমাদবশতঃ প্রেমাঙ্কুর ভগ্ন হইলে আর তাহা জোড়া লাগে না।” এস্থলে শ্রীচরিতামৃতের “উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল যে দুঃখপুর” ইত্যাদি পদের মূল কোথায়, তাহারও অনুসন্ধান পাওয়া গেল।

শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জবন চিরবসন্তময়—শ্যামল লতিকার সবুজ পাতার অন্তরালে মধুময় কুসুম,—ফুলের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত, মধুলোলুপ অলিগুঞ্জনে নিকুঞ্জ নিরন্তরই মুখরিত—তাহার উপরে প্রমত্ত পিককুলের কুহুতান—এরূপ প্রাণমাতান দৃশ্যে, প্রাণমাতান গন্ধে ও প্রাণমাতান রবে কাহার চিত্ত স্থির থাকিতে পারে ? শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সরস সঙ্গম-লালসায় অধীরা হইয়া উঠিলেন, প্রাণবল্লভের নিমিত্ত প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, তিনি আকুলপ্রাণে গাহিলেন :—

“অদ্ভুতের গুঞ্জদলিকুলমতিভীষণং।
[illegible]ভূষণম্” ইত্যাদি ॥

শ্রীমতীর এই উৎকণ্ঠাময়ী গীতিকা শ্রবণ করিয়া মদনিকা আর ক্ষণার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন, যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, "সখি এই বকুলপাদোপকণ্ঠেই আমাকে দেখিতে পাইবে।"

এই স্থলে ভাবপ্রকাশ নামক তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা পতিত হইল।

অতঃপরে মদনিকা শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখখানি মলিন হইয়া গিয়াছে—শ্রীরাধাপ্রেমের তরঙ্গে তাঁহার হৃদয়ও প্রহত হইয়াছে। তিনি সহচর প্রিয়বয়স্যের সহিত অবস্থিত। এমন সময়ে মদনিকাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলে আনন্দের উজ্জ্বলরেখা দেখা দিল,—তিনি শ্রীমতীর কথা তুলিলেন। মদনিকা বলিলেন, "বৎস শ্রীমতীর কথা আর কি বলিব, তাঁহার লাবণ্য-মাত্র-শেষ।"

শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি শ্রীমতীকে যেরূপ নিগৃহীতা করিয়াছেন, যে বাক্যে তিনি শ্রীমতীর দূতিকে নিরাশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি মদনিকাকে বলিলেন "দেবী তবে কি শ্রীমতী আমার অভিলাষ হইতে প্রতিনিবৃত্তা হইলেন?" মদনিকা বলিলেন "বৎস তাহার অবস্থার কথা শোন :—

যদা নাসৌ দোষং গণয়তি গুরূণাং কুবচনে
ন বা তোষং ধত্তে সরসবচনে নর্ম্মসুহৃদাম্।
বিষাভং শ্রীখণ্ডং কলয়তি বিধুং পাবকসমং
তদাশ্বাস্তদ্বৃত্তং ত্বয়ি গদিতুমত্রাহমগমম্॥

অর্থাৎ আমি যখন দেখিলাম গুরুগণের গঞ্জনাময় বচনও তিনি দোষ বলিয়া গণ্য করিতেছেন না, নর্ম্মসখীগণের সরস বচনেও তিনি তুষ্ট হইতেছেন না, চন্দনকে তিনি বিষের মত মনে করিতেছেন, চন্দ্র তাঁহার পক্ষে অগ্নির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, তখন তাঁহার এই সকল কথা বলিবার নিমিত্তই আমি তোমার নিকট আসিলাম।"

ইহা শ্রীমতীর উৎকণ্ঠাতিশয্য ও লোকাপেক্ষাত্যাগেরই উদাহরণ।

অজয়তটের অমরকবি শ্রীল জয়দেব উৎকণ্ঠিতা শ্রীমতীর যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রেমিক ভক্ত পাঠকগণ এখানে একবার শ্রীগীত-গোবিন্দের সেই উৎকণ্ঠিতা শ্রীমতীর বিষাদ-গীতিকার কথা স্মরণ করুন। উভয় বর্ণনাতে সাদৃশ্য ও পার্থক্য যথেষ্টই দেখিতে পাইবেন। শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয় এখানে প্রথম অনুরাগের পরে শ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহ ক্লেশের বর্ণনা করিয়াছেন,—তাই এই বিরহ-ক্লেশ অতি অল্পাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীপাদ জয়দেবের রচিত গীত-গোবিন্দে শ্রীমতীর বিরহোৎকণ্ঠা-বর্ণনপাঠে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার দিব্যোন্মাদের প্রত্যেক ঘটনাই পাঠক-গণের স্মৃতির দ্বারে আমন্ত্রণ করিয়া উপস্থিত করিয়া দেয়। শ্রীপাদ জয়দেব লিখিয়াছেন :—

বহতি চ বলিত- বিলোচনজলভর-
মাননকমলমুদারং।
বিধুমিব বিকট- বিধুন্তুদদন্ত-
দলনগলিতামৃতধারম্॥

প্রিয় পাঠক, একবার এই পদটী পাঠ করুন, আর আমাদের সজলনয়ন মহাপ্রভুর মুখকমলের ধ্যান করুন;—দেখিবেন, বিরহিণী শ্রীরাধা, আর বিপ্রলম্ভরসমগ্ন শ্রীগৌরাঙ্গ একই পদার্থ, একই ভাবে এবং একই রসে উভয়ের হৃদয় পরিপ্লুত।

আরও দেখুন—

বিলিখতি রহসি কুরঙ্গ-মদেন
ভবন্তমসমশরভূতং।
প্রণমতি মকর- মধো বিনিধায়
করে চ শরং নবচূতম্॥

প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধবঃ
তব চরণে পতিতাহং।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধি-
রপি তনুতে তনুদাহম্ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে :—

ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ আকৃতি।
চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি ॥

শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীমতীর দূতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীমতীর অবস্থা বলিতেছেন :—

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্ত-
মতীব দুরাপং।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি
চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্ ॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অবস্থা বর্ণনা করিয়া শ্রীল নরহরি ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

আরে আমার গৌরকিশোর।
নাহি জানে দিবানিশি, কারণবিহীন হাসি,
মনের ভরমে পঁহু ভোর।
ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে গায়, কারে পহু কি সুধায়,
কোথায় আমার প্রাণনাথ।
ক্ষণে শীতে অঙ্গ কম্প, ক্ষণে ক্ষণে দেয় লম্ফ,
কাঁহা পাও যাও কার সাথ ॥
ক্ষণে ঊর্দ্ধবাহু করি, নাচি বলে ফিরি ফিরি,
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে আঁখিযুগ মুদে, হানাথ বলিয়া কান্দে,
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ ॥

কহে দাস নরহরি, আরে মোর গৌরহরি,
রাধার পিরীতে হৈল হেন।
ঐছন করিয়া চিতে, কলিযুগ উদ্ধারিতে,
বঞ্চিত হইনু মুঞি কেনে॥

এইরূপ ভাবাবেশ শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দে যথেষ্টই আছে। এখানে আর একটী পদ্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি
ধ্যায়ত্যুদ্ভ্রমতি প্রমীলতি পতত্যুদ্‌যাতি মূর্চ্ছত্যপি।
এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনু র্জীবেন্ন কিন্তে রসাৎ
স্বর্বৈদ্যপ্রতিম প্রসীদসি যদি ত্যক্তোঽন্যথা হস্তকঃ।

শ্রীকৃষ্ণবিরহাকুলা শ্রীমতীর এইরূপ বহুবিধ প্রবলতম ভাব শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থে যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে, অন্য কুত্রাপি উহা তাদৃশ পরিস্ফুটরূপে পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলায় শ্রীরাধার এই সকল ভাবরাশি ভক্তজন-সমক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। মহাপ্রভু শেষলীলায় চণ্ডীদাসের পদ, বিদ্যাপতির পদ, রায়ের নাটক-গীতি, কর্ণামৃত ও শ্রীগীতগোবিন্দের পদমাধুর্য্য-রসাস্বাদন করিতেন, কিন্তু তাঁহার এই লীলায় ঐ সকল গ্রন্থনিহিত রসের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা মানবীয় ভাষাতে একেবারেই প্রকাশ পাইবার নহে। তথাপি এই সকল গ্রন্থে সেই মহাভাবের প্রতিচ্ছবি কিয়ৎপরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাই মহাপ্রভু নিরন্তর রায়ের নাটক-গীতির রস আস্বাদন করিতেন। শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দের সহিত রামরায়ের রচিত গানের সাদৃশ্য পরিস্ফুট।

শ্রীমতীর বিরহাবস্থায় চন্দন ও চন্দ্রের সম্বন্ধে শ্রীল রামরায় লিখিয়াছেন :—

"বিধাতঃ শ্রীখণ্ডং কলয়তি বিধুং পাবকময়ম্"

শ্রীপাদ জয়দেবের গ্রন্থেও দেখিতে পাই :—

সরস মসৃণ মপি মলয়জ পঙ্কং
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্।

আবার অন্যত্র লিখিত হইয়াছে :—

"চেতশ্চন্দনচন্দ্রমঃ কমলিনীচিন্তাসু সংতাম্যতি"

ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরা শ্রীমতীর এই বাহ্যভাব অন্তর্নিহিত বিরহ-ক্লেশাতিশয্যেরই ক্ষীণতর নিদর্শন মাত্র। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীল রামরায়ের একটি গীত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে :—

নিরবধি নয়নসলিলভবসাদে।
পততি কৃশা পরিচলতি চ পাদে॥

অর্থাৎ শ্রীমতী বিরহাতিশয্যে এরূপ বিবশা হইয়াছেন যে একপদ চলিতেও অসমর্থা। কবিবর শ্রীজয়দেবের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়—

ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী।
পততি পদানি কিয়ন্তী বলন্তী॥

অর্থাৎ "তোমার সহিত মিলিতা হইবার আশায় তিনি যেন বলযুক্তা হইতেছেন, আবার কয়েক পদ মাত্র চলিয়াই ক্ষীণতাবশতঃ পড়িয়া যাইতেছেন।"

দেবী মদনিকা শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীমতীর এই অবস্থা বর্ণনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর ভাব-পরীক্ষার উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাইলেন, তিনি নিজেও তাঁহার জন্য যথেষ্ট ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সুতরাং আগ্রহের সহিত মদনিকাকে বলিলেন, "দেবি আপনি সত্বরে কোন উপায়ে শ্রীরাধাকে একবার এই কুঞ্জে আনয়ন করুন।"

মদনিকা আর ক্ষণার্দ্ধও অপেক্ষা না করিয়া শ্রীরাধার সমীপে যাত্রা করিলেন। এদিকে শ্রীমতীর উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়িতেছিল। রাত্রি ক্রমেই অন্ধকার হইতেছিল। কবিবর শ্রীল রামানন্দ রায় এখানে অতি কৌশলের সহিত বিরহবিধুরা শ্রীমতীর শ্রীমুখে তামসী অভিসার যাত্রার

কাল বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমতী তাঁহার প্রিয় সখী মাধবীকে বলিতেছেন :—

সখি, এই ত বনপথ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল, এখন গিরিগুহা কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না, স্থান সকল সমান দেখিতেছি, এখনও ত দেবীর আগমন হইল না। তিনি সেখানে কি করিতেছেন? হায় বিধাতা আমার প্রতি কি এতই অহিতকারী হইলেন, হায় কি কষ্ট, আমার এই অসীম দুর্গম কানন লঙ্ঘন একবারেই যে বিফল হইল।"

এই কথা বলিতে বলিতেই মদনিকা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরাধিকা তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখি, সেখানকার বৃত্তান্ত কি?" মদনিকা বলিলেন, "বিরহে যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছে।" শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখি, কিরূপ।" তখন মদনিকা বলিলেন :—

ইন্দুং নিন্দতি চন্দনং বিকিরতি প্রালম্বকং মুঞ্চতি।
প্রালেয়াৎ ত্রসতি প্রিয়ং পরিজনং নাভাষতে সংপ্রতি॥
গোবিন্দস্তব বিপ্রযোগবিধুরঃ কিং কিং ন বাচেষ্টতে
তৎকুঞ্জোদরতল্পকল্পনপরং রাধে ত্বমারাধয়॥ *

অর্থাৎ বৎসে, শ্রীকৃষ্ণ তোমার বিরহে বিধুর হইয়া কত চেষ্টাই করিতেছেন, তিনি চন্দ্র দেখিয়া তাহার নিন্দা করিতেছেন, চন্দন

---

* প্রিয় পাঠক, এখানেও শ্রীপাদ জয়দেবের সেই—

"(১) নিন্দতিচন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরং।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্॥
(২) স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্॥
(৩) ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্পলীলাশতৈ
র্ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি॥"
প্রভৃতি পদ স্মরণ করুন।

দেখিলেই উহা দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, দোদুল্যমান গলহারও দূরে ফেলাইয়া দিতেছেন, নীহার দেখিলেই তাঁহার ত্রাস উপস্থিত হইতেছে, কোন প্রিয়জনের সহিতও তিনি আলাপ করিতেছেন না, নিরন্তর কুঞ্জগৃহে শয্যা রচনা করিতেছেন। রাধে আর বিলম্ব করিও না, এখন শীঘ্র গিয়া তাঁহার সহিত মিলিতা হও।”

কবি মদনিকার মুখে এই কথার অবতারণা করিয়াই অপর দৃশ্যের নিমিত্ত পটক্ষেপ করিয়াছেন।

মদনিকাদেবী শ্রীমতী রাধিকাকে আনিবার জন্য গমন করিলেন, কিন্তু এদিকে প্রতিমুহূর্ত্তেই শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তিনি নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে বিবিধ প্রকার ভাবনার উদয় হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন আমি শ্রীমতীর অপরিচিত সম্ভবতঃ এই জন্যই হয়ত তিনি এখানে আসিতে দ্বিধা করিতেছেন। আবার মনে করিলেন তাহা হইবে কেন, যখন অপরিচিতের নিকট অনঙ্গ-পত্র লিখিলেন তখন আসিতে সন্দেহ হইবে কেন, সম্ভবতঃ সখীদের বাক্যে তাঁহার একেবারেই বিশ্বাস হয় নাই—তাই বা হইবে কেন? হইতে পারে তিনি আসিতেছেন, কিন্তু একে কৃশাঙ্গী, তাহাতে স্তনভার ও জঘনভারেই তিনি মন্থরগতিতে আসিতেছেন, তাহাতেই হয়ত বিলম্ব হইতেছে, আমার এ সঙ্কেত-কুঞ্জও অতি দূরে। রমণীরা স্বভাবতঃই ভীরু, তাহার উপরে আবার অন্ধকার, কিরূপেই বা তিনি সত্বরে আসিবেন —আবার এমনও হইতে পারে তিনি আসিতেছিলেন, অন্ধকারে নিবীড় বনের পথ ঠিক করিতে না পারিয়া পথভ্রমে অন্য পথে চলিয়া গিয়াছেন। অথবা সেই কৃশাঙ্গী কামবাণে পীড়িতা হইয়া একবারেই বিবশা হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সম্মুখভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন আকাশে চন্দ্র উদিত হইতেছে, তখন আরও নিরাশ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, প্রিয়তমা তামসী অভিসারিকার বেশে আসিতেছিলেন, হঠাৎ

চন্দ্র উদয় হওয়ায় অর্দ্ধপথে বিপদে পড়িয়াছেন, এখন তিনি না আসিতে পারিতেছেন, না যাইতে পারিতেছেন।*

শ্যামসুন্দর শ্রীমতীর বিলম্ব দেখিয়া এই প্রকার বিবিধ ভাবনা করিতেছেন, হঠাৎ এই সময়ে নূপুরধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চমকিত ভাবে চাহিয়া দেখিলেন পুরোভাগে শ্রীরাধাচন্দ্রিকার উদয় হইয়াছে।

কবিবর শ্রীল রামানন্দ রায় শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে শ্রীরাধার শুভাগমন যেরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন, সে বর্ণনাচাতুর্য্য অতীব রসময় ও প্রত্যক্ষ-দৃষ্টবৎ তদ্‌যথা :—

রাধা মাধববিহারা।
হরিমুপগচ্ছতি- মন্থরপদগতি-
লঘুলঘুতরলিতহারা॥
শঙ্কিতলজ্জিত রসভরচঞ্চল
মধুরদৃগন্ত-লবেন।

---

* শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকের শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উৎকণ্ঠাময়ী বিবিধ ভাবনা ও শ্রীগীতগোবিন্দের শ্রীমতী রাধার উৎকণ্ঠাময়ী বিবিধ ভাবনা যে একইরূপ, তৎপ্রদর্শনার্থ নিম্নে উভয় গ্রন্থ হইতেই কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

শ্রীজগন্নাথবল্লভে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

কিমেষা মত্বা মামপরিচিতভাবং বিমুখতাং
প্রযাতা বিশ্বাসং কিমু সহচরী বাচি ন গতা।
অথা ভ্রান্তা বর্ত্তন্ততিতিমির ভাজীহ বিপিনে
ন শক্তা তন্বঙ্গী স্মরশরহতা বা প্রচলিতুম্॥

শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীমতী বলিতেছেন :—

তৎ কিং কামপি কামিনীমভিসৃতঃ কিম্বা কলাকেলিভি
র্বদ্ধোবন্ধুভিরন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিমুদ্ভ্রাম্যতি।
কান্তঃ ক্লান্তমনা মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ
সঙ্কেতীকৃতমঞ্জুবঞ্জুললতা কুঞ্জেহপি যন্নাগতঃ॥

মধুমথনং প্রতি সমুপহরন্তী
কুবলয়দামরসেন ॥

সুরসিক প্রেমিকভক্ত পাঠক উল্লিখিত চারি ছত্রের প্রতি একবার ভক্তিভরে দৃষ্টিপাত করুন, দেখিতে পাইবেন শ্রীল রায় মহাশয় অতি অল্প কথায় প্রেমতত্ত্বের কি এক গূঢ়গম্ভীর ব্যাপার এই চারি ছত্রে পরিস্ফুটরূপে প্রকটন করিয়াছেন।

শ্রীরাধিকার প্রবেশমাত্রই বিদূষক ও মদনিকা প্রস্থান করিলেন। এইখানেই চতুর্থ অঙ্কের যবনিকা পতন হইল। পঞ্চম অঙ্কে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্ভোগকেলি এবং তৎপরে অরিষ্টাসুর বধের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই পাঁচ অঙ্কেই শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই সঙ্গীত নাটক হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও বিদূষকের হাস্যরসময় উক্তি-প্রত্যুক্তির একটুকু নিদর্শন উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে যথা :—

কৃষ্ণ বলিতেছেন—"সখে এই কোকিল সকলের রব কি সুমধুর।"

বিদূষক। বয়স্য তোমার বংশীরব ইহা অপেক্ষাও মধুর। তদপেক্ষা আবার আমার কণ্ঠরব আরও মধুর। তুমি বংশী বাদ্য কর, আর আমি কণ্ঠরব করি।

অমনি কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইলেন। তখন বিদূষক বলিলেন "সখে তোমার বংশীধ্বনি ত শুনিলাম। এখন একবার আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ কর।" এই বলিয়া বিদূষক বিকট চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন :—"সখে দেখেছ, কোকিলগুলি তোমার বংশীরব শুনিয়া নীরব ছিল কিন্তু আমার কণ্ঠরব শুনিয়া কে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। বংশী-রবের আর গর্ব্বের কারণ নাই।"

বিদূষকের উক্তিগুলি সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রতিভাময়ী ও হাস্যরসময়ী। ফলতঃ এই সঙ্গীত নাটকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও মধুরাদি নব রসের অফুরন্ত উৎস।

আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল গীতিপদ্যই উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াছি। গদ্যে কথোপকথন সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। এই নাটকের অনেকস্থলেই প্রাকৃতভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। বিদূষক সর্ব্বত্রই প্রাকৃতভাষী। শ্রীরাধা, মদনিকা ও মাধবীর কথোপকথন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। শ্রীরাধা কচিৎ কচিৎ প্রাকৃত ভাষাতেও কথা বলিয়াছেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় শ্রীল রামানন্দ রায় যে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে লিখিত সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষা দেখিলেই, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে যাঁহার মুখে যখন যেরূপ ভাষা ব্যবহৃত হওয়া উচিত, সর্ব্বত্রই তাদৃশী স্বাভাবিকতা সংরক্ষিত হইয়াছে—কোথাও বা বহুল সমাসনিবদ্ধ সুদীর্ঘ পদচ্ছটায় প্রাকৃতিক বৈভববর্ণনায় বক্তার অশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে, আবার কোথাও বা অতি সংক্ষেপে সরস সরল ভাষায় সরলভাবে হৃদয়ের স্বাভাবিকোক্তি প্রকটিত হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষা স্বভাবমধুরা, উহা মধুর কবি শ্রীল রামরায়ের হস্তে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকের রসমাধুর্য্য শ্রীল লোচনদাস বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদেও সুমধুর ও পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক যে বঙ্গবাসী ভক্তগণের পরম আদরের বস্তু ছিল, শ্রীল লোচন দাসের পদ্যানুবাদ দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হয়। স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভু যে নাট্যগীতির রসাস্বাদনে বিভোর থাকিতেন, সেই নাট্যগীতি যে ভক্তগণের অতীব আরাধ্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? আমরা এই স্থলে এই নাটক আলোচনার উপসংহার করিলাম।

খণ্ড সংস্কৃত পদ্য।

শ্রীল রামরায়ের কৃত অন্য কোন গ্রন্থ আছেন কি না, আমরা এখনও তাহার সন্ধান পাই নাই। শ্রী রায় রামানন্দ কৃত কতিপয় খণ্ড সংস্কৃত পদ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্য হইতে নিম্নে একটী পদ্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে। শ্রীরূপসংগৃহীত পদ্য-

বলীতে এবং কবি কর্ণপুরকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে এই পদ্যটী শ্রীল রায়কৃত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। শ্রীচরিতামৃতেও এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে তদ্‌যথা :—

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবদ্ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥

এই কবিতাটীর পাঠপদচ্ছেদ-বৈচিত্রী-অনুসারে ব্যাখার যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। *

---

* কেবল প্রথম দুই পংক্তিতেই বহুল অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পদচ্ছেদ করিয়া কয়েক প্রকার ব্যাখ্যার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি :—

১। নানোপচারকৃতপূজনম্—(১) উপচারকৃতপূজনং "নানা" অস্তি। অর্থাৎ উপচার দ্বারা পূজন বহুবিধ যথা :—রাজোপচার, অষ্টাদশোপচার, ষোড়শোপচার পঞ্চোপচার ইত্যাদি। (২) অমরকোষে নানাশব্দের আরও অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—"পৃথগ্ বিনান্তরেনর্ত্তেহিরুঙ্ নানা চ বর্জ্জনে। "নানা" শব্দে বিনা" অর্থ গ্রহণ করিলে উপচারকৃতপূজনং বিনাপি" অর্থাৎ উপচারকৃত পূজন বিনাও এইরূপ অর্থে ব্যাখ্যা হইতে পারে। ব্যাকরণে বিধান আছে, "নানা" যোগে দ্বিতীয়া হয়।

২। নানোপচারকৃতপূজন+মা+আর্ত্তবন্ধোঃ—নানোপচারৈঃ কৃতং পূজনং যয়া সা চাসৌ মা চেতি নানোপচারকৃতমা সা চ আর্ত্তাশ্চ তেষাং বন্ধুঃ তস্য। মা লক্ষ্মী :—"ইন্দিরা লোকমাতা মা ইতি কোষ প্রমাণম্।

অর্থাৎ নানা উপচার দ্বারা পূজা হয় যদ্দারা এমন যে মা (লক্ষ্মী) তাঁহার এবং আর্ত্তের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের। এই প্রকারেও ব্যাখ্যা হইতে পারে।

৩। অপিচ নানোপচারৈঃ কৃতং পূজনং যেন অর্থাৎ নানা উপচার সহ যে হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, তাদৃশ হৃদয়ও কেবল প্রেমেই সুখবিদ্রুত হয়।

১। আর্ত্তবন্ধোঃ—আর্ত্তবন্ধুর। আবার "আর্ত্তবন্ধো" এইরূপ সম্বোধন-পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। তৎস্থলে হে "আর্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ" এইরূপ বুঝিতে হইবে।

পদকল্পতরুতে রামনন্দ রায়ের ভণিতায় অনেকগুলি পদ দৃষ্ট হয়। শ্রীল রামরায় ও রামানন্দ বসু এই দুই মহোদয়ই রামানন্দ নামে অভিহিত। তবে ইনি রায়, আর তিনি বসু। শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থের সূচীতে পদকর্ত্তাদের মধ্যে রামানন্দ রায় ও রামানন্দ বসু এই উভয়ের নামই ধৃত হইয়াছে। শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী সংগ্রাহক গোলোকগত ৺ জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় কি

বাঙ্গালা পদাবলী।

২। আবার "আর্ত্তবন্ধোঃ" পদটি "নানাপোচারকৃতপূজনম্" এই পদের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে; আবার "হৃদয়" শব্দের সহিতও সম্বন্ধ হইতে পারে।

ভক্ত-হৃদয়ম্—ভক্তস্য হৃদয়ম্, ভক্ত-হৃদয়ম্। আবার ভক্ত পদটী সম্বোধন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পূজা নানা উপচারে হইতে পারে, যেমন রাজোপচারে, অষ্টাদশোপচারে, অথবা ষোড়শ উপচারে, দশ উপচারে এবং পঞ্চ উপচারে। কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বারাই যেমন খাদ্যদ্রব্য সুখকর হয়, সেইরূপ কেবল প্রেমদ্বারাই ভক্তহৃদয় সুখ বিক্রত হইয়া থাকে। প্রেমভিন্ন কেবল বাহ্য উপচার সেবা-সুখের হেতু নহে। এই নিমিত্তই অন্যান্য উপচারাদির ব্যবচ্ছেদকতার নিমিত্ত "প্রেম্নৈব" পদে "এব" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কেবল প্রেমই সেবাসুখের হেতু। প্রেমদ্বারা হৃদয় আর্দ্রীভূত হয়। কেননা মমত্বা-তিশয়যুক্ত ঘনভাবই প্রেম। মমত্বাতিশয় হইলেই চিত্ত আর্দ্র হয়।

সুখবিক্রতম্—সুখপরিপ্লুত, সুখে দ্রবীভূত। পিপাসার্ত্তের শুষ্ককণ্ঠ যেমন জলপানে আর্দ্র হয়, ভক্তহৃদয়ও সেই প্রকার প্রেমদ্বারা আর্দ্র হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-সাম্যের নিমিত্ত বিক্রত শব্দের প্রয়োগ উপযুক্তই বটে।

ক্র ধাতু গতি ও প্রাপ্তি অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সেরূপ অর্থে সুখবিক্রত অর্থ—সুখপ্রাপ্ত।

ফলতঃ ভক্তহৃদয়ে সুখোদয়ের প্রেমই একমাত্র হেতু। শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্যে ব্রহ্ম-পুরাণের একটী পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে উহা এই :—

গঙ্গাদিতীর্থেষু বসন্তি মৎস্যাঃ
দেবালয়ে পক্ষীগণাশ্চ সন্তি
ভাবোজ্ঝিতাস্তে ন ফলং লভন্তে
তীর্থাচ্চ দেবায়তনাচ্চ মুখ্যাৎ॥

প্রকারে এই উভয়ের পদাবলীর পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে একটা পার্থক্য এই দেখা যায় যে, রামানন্দ বসুর পদের ভণিতায় নামের আগে বা পরে "বসু" শব্দের ব্যবহার আছে। তাহা হইলে শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীতে রামানন্দ বসুর শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদ কেবল দুইটী মাত্র পাইতেছি।

কেবল "বসু" শব্দ ভিন্ন এই উভয়ের পদের পার্থক্যের আর কোন উপায় শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীতে অবলম্বিত হয় নাই। "রামানন্দ" ভণিতায় শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদ এই গ্রন্থে অনেক দৃষ্ট হইল। ইহার সকল গুলিই শ্রীরামানন্দ রায় কৃত কিনা, তৎসম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীতে যে দুইটী পদ রায় রামানন্দের বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেই দুইটী পদ নীলাচলবাসী রামানন্দ রায় কবিকৃত কিংবা বর্দ্ধমানের কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ বসু কৃত, তৎসম্বন্ধে পাঠক মহোদয়-গণের যেরূপ ধারণা হয়, সেইরূপই বিশ্বাস করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে

অর্থাৎ গঙ্গাদিতীর্থে মৎস্যাদি থাকে, দেবালয়েও পক্ষিগণ থাকে, কিন্তু তাহাতে মৎস্যাদির গঙ্গাবাস ফল হয় না, পাখীদেরও দেবালয়বাসের ফল হয় না। কেননা তাহারা তদ্ভাববিবর্জ্জিত। শ্রীকৃষ্ণ পূজনের ফল, শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষ—তাহার ফল প্রেম। প্রেমই সুখ। ভক্ত কবি তুলসীদাসের "নিৎ নাহনেসে হরি মিলে তো জল জন্তু হোই" ইত্যাদি এবং "মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা" ইত্যন্ত পদটী এই শ্লোকেরই বিবৃতি।

জরঠ—কর্কশ, পাণ্ডু, জরা ও কঠিন ইতি মেদিনী। কর্কশ শব্দের অর্থ কূট দৃঢ়, খরস্পর্শ, সাহসিক ইতি শব্দরত্নাকর।

শ্রীলরামরায়ের এই পদ্যটীর ব্যাখ্যা আরও বহু প্রকারে হইতে পারে। কিন্তু দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুটরূপে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে প্রেমই ভগবৎসুখ-প্রাপ্তির হেতু। যদি ক্ষুধাতৃষ্ণা না থাকে তবে বিবিধ প্রকার খাদ্যের উপচার ও সুস্বাদু পেয় প্রভৃতি থাকিলেই বা কি, আর না থাকিলেই বা কি? ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকিলেই এই সকল সুখের হেতু হয়; সেইরূপ প্রেম না থাকিলে নানাপোচার পূজনও সুখকর নহে।

আমরা দৃঢ়রূপে কোন কথা বলিতে সাহসী নহি। ফলতঃ পদে "বসু" উপাধির উল্লেখ না থাকিলেই যে "রায় রামানন্দ রচিত" বলিয়া বুঝিতে হইবে, আমরা ইহার কোন বিশিষ্ট যুক্তি পাইলাম না।

রামানন্দ রায় উৎকলবাসী ছিলেন। বাঙ্গালাভাষায় পদাবলী লিখিতে তিনি অভ্যাস করিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমরা জানিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এই সকল পদের মধ্যে অধিকাংশ পদের ভাষাই বর্দ্ধমান অঞ্চলের বাঙ্গালা ভাষা। শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয়ের রচিত "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ্যা ভেল" সুপ্রসিদ্ধ পদটী ব্রজবুলিতে লিখিত। এই সময়ে বঙ্গে ও উৎকলে ব্রজবুলিতে পদলেখার রীতি যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। সুতরাং শ্রীল রায় মহাশয় উৎকলের ভাষার পরিবর্ত্তে ব্রজবুলিতে পদ লিখিবেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু রামানন্দ রায় বর্দ্ধমান অঞ্চলের বাঙ্গালা ভাষায় পদ রচনা করিতেন কিনা, এ বিষয়ে কোন কোন পাঠকের মনে সন্দেহ হইতে পারে। বসু রামানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্ত। তিনি বাঙ্গালী, এবং বর্দ্ধমান অঞ্চলবাসী। "রামানন্দ" নাম ভণিতায় শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় যে সকল বাঙ্গালা পদ দৃষ্ট হয়, সেই সকল পদের রচয়িতা যে বসু রামানন্দ নহেন, তাহারই বা প্রমাণ কি?

তিনি হয় ত দুই একটী পদেই বসু রামানন্দ ভণিতা লিখিতেন, অবশিষ্ট পদগুলিতে "বসু" ভণিতা প্রদান করেন নাই, এরূপ অনুমান করার বিরুদ্ধেও কোন যুক্তি দেখিতে পাই না। রামানন্দ রায় মহাশয়ের প্রণীত জগন্নাথবল্লভ নাটকের সংস্কৃত পদাবলীতে কোথাও বা "রামানন্দ রায়" আবার কোথাও বা কেবল "রামানন্দ" ভণিতা দৃষ্ট হয়। সুতরাং কোন পদের ভণিতায় "বসু" শব্দ না থাকিলেই যে উহা রামানন্দ বসু কৃত নহে, এমন মনে করা যাইতে পারে না।

"দিনমণি চন্দ্রোদয়" গ্রন্থের প্রণেতা মনোহর দাস নিজকে রায়

রামানন্দের বংশজ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থে বংস পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন :—ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উৎকলবাসী ছিলেন। মনোহর দাসের ভ্রাতা কার্য্যোপলক্ষে বর্দ্ধমানে আসিয়া বসবাস করেন এবং মনোহরকেও বর্দ্ধমানে আনয়ন করেন। উভয়ে এইখানেই বসবাস করেন। দিনমণিচন্দ্রোদয়কারের সহিত রায় রামানন্দের প্রকৃত পক্ষে কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা, অথবা ইহা কেবল এই গ্রন্থ-রচয়িতার বিশিষ্ট-কুলোদ্ভবতা জ্ঞাপন নিমিত্ত প্রাচীন রুচিসঙ্গত এক প্রকার প্রয়াসবিশেষ, তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ও গোপাল উড়ে উৎকলবাসী হইয়াও বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ভাষার প্রশ্ন তুলিয়া শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয়কে এই সকল পদের রচয়িতার অধিকারিত্ব হইতে বিচ্যুত করা ও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু একটী কথা আমাদের সবিশেষ চিন্তয়িতব্য। শ্রীল রায় মহাশয় আমাদের ভক্তির সামগ্রী। কিন্তু তাই বলিয়া রামানন্দ বসুকে বঞ্চিত করিয়া রামানন্দ রায়কে বিনাপ্রমাণে কতিপয় গৌরপদাবলীর রচয়িতা বলিয়া স্থির করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

শ্রীগৌরপদাবলীতে “রামানন্দ” ভণিতায় যে সকল পদ আছে, সেই সকল পদ রামানন্দ রায় বা রামানন্দ বসু অথবা অপর কোন রামানন্দের রচিত তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সুতরাং অজ্ঞাতস্থলে পাছে বা একের কৃতিত্ব অপরের বলিয়া প্রকাশ করিয়া ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করি, এই ভয়ে আমরা শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীর পদকর্ত্তাদের পদনির্দ্দেশ-সূচক সূচীর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। রামানন্দ বসু মহাশয় শ্রীগৌরপদাবলী-রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীকারের সূচী অনুসারে আমরা ইঁহার রচিত দুইটী মাত্র পদ দেখিতে পাই। ইঁহার রচিত পদের এত অল্পতা সম্ভবপর নহে। এ সম্বন্ধে অধিক বাগ্‌বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

তিরোভাব।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গম্ভীর লীলায় শ্রীল রামরায় কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধার পার্শ্বস্থিতা বিশাখা সখীর ন্যায় শ্রীপাদ স্বরূপসহ তাঁহার সান্ত্বনা করিতেন, উভয়ে দিন যামিনী প্রভুর নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে সুধাময় কৃষ্ণ-কথা শুনাইতেন। সেই সকল কথা "গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ" সন্দর্ভে আলোচ্য। তাহাতে শ্রীল রাম রায়ের নামোল্লেখমাত্র পরিলক্ষিত হয়। উহাতে তদীয় চরিতের অপর কোন উপাদান দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি যে কিরূপ ভাবের কৃষ্ণ-কথায় মহাপ্রভুর সান্ত্বনা করিতেন, কোনও গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। এই অবস্থায় সেই সন্দর্ভে শ্রীল রাম রায়ের তিরোভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং শ্রীল রাম রায়ের চরিত-কথা এই গ্রন্থে পূর্ণরূপ আলোচিত না হইলেও এই স্থলেই তাঁহার তিরোভাব সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে।

শ্রীল কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে লিখিয়াছেন যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গমন করায় শ্রীল রামানন্দ রায় তাঁহার বিরহে প্রাণত্যাগ করিলেন যথা ঃ—

> স্থিত্বা তত্র শ্রীময়োগৌরচন্দ্রঃ
> ক্বচিৎ কালং তেন ভূয়োঽধ্বনৈব।
> কালিন্দীয়ং তীরমেব প্রতস্থে
> বিচ্ছেদার্ত্তাং স্তত্র তাং স্তান্ বিধায়॥
> রামানন্দস্তদ্বিয়োগাধিপীড়া-
> ক্ষীণ ক্ষীণ স্তত্যাজাঽসূন্ মহাত্মা।

বিচ্ছেদে স্যাদযোগ্যমেতচ্চরিত্রং
প্রেম্নস্তাবত্তাদৃশস্যাস্য নূনম্॥

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মহানুভব শ্রীল রামানন্দ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিয়োগরূপ মানসিক পীড়ায় দিন দিন পরিক্ষীণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কেননা প্রেমবিচ্ছেদের ইহাই রীতি। রসশাস্ত্রে লিখিত আছে, বিরহে যে দশ দশা উপস্থিত হয়, উহার শেষদশাই মৃত্যু। মৃত্যু-বিরহের দশমী দশা। সুতরাং কবিকর্ণপুর বর্ণিত এই প্রাণত্যাগ-ব্যাপার বা মৃত্যু কীদৃশ ব্যাপার, তাহা বিচার্য্য। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পাঠকগণের অবিদিত নহে যে মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হওয়ার পরেও শ্রীল রামরায়ের সহিত তাঁহার পুনর্ম্মিলন হয়। শ্রীল রামরায় রূপের নাটক সমালোচনা করেন, প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে উপদেশ প্রদান করেন, মহাপ্রভুর গম্ভীরা-লীলায় শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর ও শ্রীল রামরায়ই তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে সর্ব্বদা সেবা করেন। সুতরাং এই প্রাণত্যাগ কিরূপ ব্যাপার, তাহা অবশ্যই বিচার্য্য। শ্রীল কবিকর্ণপুরের এই গ্রন্থ ১৪৬৪ শাকে লিখিত হয় বলিয়া তিনি নিজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যথা :—

বেদারসাঃ শ্রুতয়ঃ ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে।
শাকে তথা খলু শুচৌ সুভগে চ মাসি॥
বারে সুধাকিরণনাম্যসিতদ্বিতীয়া-
তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুষ্য॥

অর্থাৎ চৌদ্দশত চৌষট্টি শকের আষাঢ় মাসে সোমবারে কৃষ্ণ দ্বিতীয়া তিথিতে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্তি হয়। সুতরাং মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর ৯ বৎসর যাইতে না যাইতেই এই গ্রন্থ রচিত হয়। কিন্তু শ্রীল মুরারি গুপ্ত ইহার বহুপূর্ব্বে নিজ গ্রন্থ রচনা করেন। কবিকর্ণপুর শ্রীল মুরারির

সেই গ্রন্থ দেখিয়াই এই গ্রন্থ বিরচন করেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে স্পষ্টতঃই তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তদ্‌যথা :—

আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈঃ
কেচিন্মুরারিরিতিমঙ্গলনামধেয়ৈঃ।
যদ্‌যদ্ বিলাসললিতং সমলেখি তজ্‌জ্ঞৈ
স্তত্তদ্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এবঃ॥

এখন কথা এই যে শ্রীল রামানন্দের বিনির্য্যাণ সম্বন্ধে শ্রীল মুরারি-গুপ্ত কিছু লিখিয়াছেন কি না ? শ্রীল মুরারিকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল রামরায়ের অন্তর্দ্ধানের সম্বন্ধে কোন সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাগত হওয়ার পরেও যে রামরায়ের সহিত তাঁহার পুনর্ম্মিলন হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ প্রক্রমের পঞ্চদশ সর্গে শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রভুর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ষোড়শ সর্গের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে :—

ততো গজপতিরাজা দর্শনার্থং মহাপ্রভোঃ॥
সার্ব্বভৌমং সমাহূয় রামানন্দসমন্বিতম্॥

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য লীলা সম্বন্ধেও সূত্ররূপে বর্ণনা আছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইলে পর গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব মহাপ্রভুর দর্শনে ব্যগ্র হইলেন এবং তৎপরামর্শের নিমিত্ত সার্ব্বভৌম ও রামানন্দকে আহ্বান করিলেন।

শ্রীল মুরারিকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থই যে কবিকর্ণপুরের আদ্য আলেখ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে যখন স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হওয়ার পরেও মহাপ্রভুর সহিত শ্রীল রামরায়ের অনেক কাল পর্য্যন্ত একত্র অবস্থান হইয়াছে, রাম-রায়ের নাম অনেক লীলার সহিত বিজড়িত রহিয়াছে, তখন এই প্রাণ-

ত্যাগের অর্থ,—মহাবিরহে রামরায় জীবনমৃতবৎ হইয়াছিলেন ইহাই বুঝিতে হইবে। তদ্ভিন্ন অন্য প্রকার অর্থ-সঙ্গতি করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ হস্তলিখিত আরও কয়েকখানি শ্রীল কবিকর্ণপুরকৃত এই গ্রন্থ না দেখা পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে আমরা আর কোনও ব্যাখ্যা করিতে পারি না।

এখন অপর এক কথা বিচার্য্য এই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট অবস্থাতেই শ্রীল রাম রায়ের তিরোভাব হয়, কিংবা তাঁহার অন্তর্ধানের পরে শ্রীল রায় রামানন্দ তিরোহিত হয়েন। মহাপ্রভুর প্রকট অবস্থায় রামানন্দের তিরোভাব হইলে মহাপ্রভু তাঁহার মহাপ্রস্থানের ব্যাপারে হরিদাস নির্য্যাণের ন্যায় কোন প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন এবং লীলালেখক মহাশয়গণও এই ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সুতরাং আমাদেব অনুমান হইতেছে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার পরেই কোনও সময়ে শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরের ন্যায় মহাপ্রভুর মহাবিরহে শ্রীল রামানন্দ রায়ও বিরহের শেষ অশ্রু ও শেষ দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া সহসা এই ধরাধাম হইতে অন্তর্হিত হয়েন। প্রাচীন বৈষ্ণবগণও এই অনুমান পোষণ করিয়া আসিতেছেন। ভক্তিরত্নাকরকার এই অনুমানের সমর্থক। তিনি লিখিয়াছেন :—

> হেন কালে প্রভুর অদর্শন কথা শুনি।
> অঙ্গ আছাড়িয়া রাজা (প্রতাপরুদ্র) লুটায় ধরণী॥
> শিরে করাঘাত করি হৈল অচেতন।
> রায় রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন॥

ভক্তিরত্নাকর-পাঠে আরও জানা যায় মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তিনি তখন শ্রীপাদ সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীল রায় রামানন্দের সন্দর্শন প্রাপ্ত হন। যথা ভক্তিরত্নাকর-তৃতীয় তরঙ্গে—

সবে উৎকণ্ঠিত শ্রীনিবাসেরে দেখিতে।
শ্রীনিবাস গেলা সর্ব্বভৌমের বাটীতে॥
তথায় শ্রীরায় রামানন্দের গমন।
দোহে বসি গায় গৌরচন্দ্র-গুণ-গুণ॥
মহাশোক-সমুদ্রে ভাসয়ে দুই জনে।
শ্রীনিবাসে দেখি সুখ উপজিল মনে॥

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের অতি অল্প দিবস পরেই শ্রীনিবাস শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। তখনও শোকের ঘনকৃষ্ণবিষাদ ছায়ায় সমগ্র পুরীক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন। বোধ হয় ইহার অল্প দিন পরেই শ্রীরায় রামানন্দ অপ্রকট হইয়াছিলেন।

মুরলী বিলাস নামক এক খানি গ্রন্থের গ্রন্থকারও উক্ত মতের পোষক। এই গ্রন্থে লিখিত আছে বংশীবদনের পৌত্র রামাই মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া শ্রীল রাম রায়ের দর্শন পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন যথা :—

তবে মিশ্র লঞা গেল রায়ের সদন।
রায় বসি সদা ভাবেন চৈতন্য চরণ॥
বিরহে আকুল অঙ্গ নিতান্ত দুর্ব্বল।
কভু কিছু ভক্ষণ করয়ে মাত্র জল॥

এই সকল কথায় জানা যায় যে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরে শ্রীরামানন্দের তিরোধান হইয়াছিল। ১৪৫৫ শাকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অন্তর্হিত হয়েন। রায় রামানন্দকে সম্ভবতঃ এই ভীষণ বিরহ দীর্ঘকাল সহ্য করিতে হয় নাই। ১৪৫৫ বা ১৪৫৬ শাকেই হয়ত রামানন্দের তিরোভাব ঘটে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে পঞ্জিকাতে মহাপ্রভুর পারিষদগণের

ও ভক্তগণের অনেকেরই আবির্ভাব ও তিরোভাবের দিন সূচিত হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি মহাপ্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ পারিষদ সেই রায় রামানন্দের আবির্ভাব ও তিরোভাব দিনের কোন উল্লেখ নাই,—সেই পুণ্যদিনের স্মরণ ও মহোৎসব-বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত নাই, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। প্রেমরসবিগ্রহ শ্রীপাদ রামানন্দ রায় মহাশয়ের স্মরণ-মহোৎসবের কোন সময় নির্দ্ধারণ করা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য।

উপসংহার।

——:*:——

হিত্বা যো বিপুলাং হরিপ্রেমবশাৎ নির্ব্বিঘ্নরাজ্য-শ্রিয়ম্
শ্রীগৌরাঙ্গ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দৈকনিষ্ঠোঽভবৎ।
রাধাকৃষ্ণকথা-রসামৃতনিধিঃ প্রেমোজ্জ্বলদ্বিগ্রহঃ
রামানন্দসমাহ্বয়ো রসিকরাট্ রায়ঃ সদা সেব্যতাম্ ॥

শাকে কালগুণদ্বিপেন্দুবিমিতে সপ্তাশ্বকে বাসরে।
যা তে ভাস্বতি রৌহিণেয়ভবনে পূর্ব্বে চতুর্থ্যাস্তিথৌ।
দোরাত্রীশমিতে সমাপ্যত ইদং বত্নান্ময়া পুস্তকং।
নাম্না শ্রীরসিকাদিমোহন মহীদেবোত্মজেনাদরাৎ ॥

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

—:*:—

অপরাপর গ্রন্থের কথা।

শ্রীল রামানন্দ রায় সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতই তাহার প্রধান অবলম্বন। অন্যান্য কোন কোন গ্রন্থ হইতে যতটুকু প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেই টুকুই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু তদ্ব্যতীত আরও কয়েকখানি গ্রন্থে রায় মহাশয়ের পরিচয় এবং কিছু কিছু কথা লিখিত হইয়াছে। শ্রীল রামরায় সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, এক স্থানে সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিলে যাঁহারা ভবিষ্যতে এই রসময় চরিত প্রণয়ন করিবেন, উপাদান সংগ্রহ-ব্যাপার তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইবে এইরূপ মনে করিয়া আমরা অপ্রামাণিক ও প্রামাণিক,—আধুনিক ও প্রাচীন যে কোন গ্রন্থে শ্রীল রামরায়ের কথা পাইয়াছি, তন্মধ্যে এই গ্রন্থে যে সকল পুস্তকের অভিপ্রায় গৃহীত হয় নাই এই পরিশিষ্টে সেই সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। শ্রীল লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল পাঠে জানা যায়, রায় রামানন্দ যখন আপন নিভৃত গৃহে বসিয়া নিত্যকৃষ্ণ পূজা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি কৃষ্ণধ্যানে অচিন্ত্যপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব গৌরাঙ্গরূপ দর্শন করেন, তিনি পুনশ্চ কৃষ্ণধ্যানে প্রবৃত্ত হয়েন, আবার সেই কষিত কনককান্তি-বিনিন্দিত শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। তিনি বিস্মিত হইয়া আবার তাঁহার নিত্যধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণধ্যানে চিত্ত দৃঢ় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সেই নিরুদ্ধ চিত্ত আবার সেই মহাবলবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর প্রোজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হইলেন। রামরায় স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন সেই

ভুবনমোহন ধ্যানদৃষ্ট মহাপুরুষ স্বশরীরে তাঁহার পুরোভাগে বিরাজমান। প্রহরিগণের নিষেধ বাধা না মানিয়া ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভক্ত-হৃদ্-বিহারী শ্রীশ্রীগৌরহরি সহসাই রামরায়ের অন্তঃপুরে তাঁহার সেই নিভৃত ধ্যান-মন্দিরে পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে দর্শনদান করেন। সাক্ষাৎ দর্শনদানের পূর্ব্বে রামরায়ের ধ্যানের সময় তদীয় চিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গরূপ প্রকটন অতি অদ্ভুত ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ। চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে মহাপ্রভু কাঞ্চিনগরে রামরায়ের সহিত মিলিত হন। কাঞ্চিনগরটী গোদাবরী-তটবর্ত্তী বলিয়াই লোচন দাসের বর্ণনায় জানা যায়। শ্রীপাদ মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ হইতেই শ্রীলোচন দাস রামানন্দ-মিলনের উক্ত অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমুরারি গুপ্ত মহাশয়ও কুঞ্চিনগরেই রামানন্দ মিলনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

২। ভজন নির্ণয় নামে এক থানি গ্রন্থ কতিপয় বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরে বিরচিত হইয়াছে বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় কর্ত্তব্যে শ্রীল রামরায়ের কথা আছে। উহাতে সবিশেষ কোন নূতন তত্ত্ব নাই। এই গ্রন্থেও রামরায়কে বিশাখা ও স্বরূপ দামোদরকে ললিতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহাতে একটি নূতন বিষয় আছে। ইনি লিখিয়াছেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য রাঘবেন্দ্র পুরী শ্রীরামা-নন্দ রায়ের গুরু, যথা :—

মাধবপুরীর শিষ্য রাঘবেন্দ্রপুরী।
তার শিষ্য রামানন্দ প্রেম-অধিকারী॥

এই কথার পোষকতা অপর কোন বিখ্যাত প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

৩। জয়ানন্দ মিশ্রের চৈতন্যমঙ্গল নামক একখানি গ্রন্থ কতিপয় বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতেও রামানন্দের উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত রামরায় সমুজ্জ্বল অলৌকিক দেবমূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়াছেন, এমন কি তিনি স্বয়ং মহাপ্রভুরও উপদেষ্টৃরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। জয়ানন্দ মিশ্র তদীয় চৈতন্যমঙ্গলে সেই রামানন্দের অতি শোচনীয় দুরবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, উহার একটুকু নিদর্শন এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এই গ্রন্থে পুরীতেই রামানন্দ-মিলনের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রামানন্দ রায় যে অতি প্রধান রাজা ছিলেন এই গ্রন্থকার তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। রাজা রামানন্দ রায়ের স্বর্ণ সিংহাসন, হস্তী, অশ্ব, পতাকা, পরিচ্ছদ, বাদ্যভাণ্ড ও রাজকীয় ঠাটের বিপুল বর্ণনা এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে শ্রীপাদ রামরায়ের আধ্যাত্মিক চরিত্র একবারেই বিকৃত করা হইয়াছে যথা :—

গন্ধে আমোদিত দশ দিক্ সিন্ধুতটে।
রায় রামানন্দ আইলা প্রভুর নিকটে॥
তা দেখিয়া হাসিল চৈতন্য দয়ানিধি।
রায় রামানন্দে এত বিড়ম্বিল বিধি॥
হিঙ্গুলিয়া ত্রিশূলে বসিতে কত সুখ।
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্যে হৈয়াছে বৈমুখ॥

* * * *

শূকর কুটীরে তুমি হৈয়াছ বিভোর।
হেন দেহে না পাইলে বৈষ্ণবের ক্রোড়॥
হেন চক্ষে না দেখিলে শ্রীজগন্নাথ।
জগন্নাথের সেবায় না কবিলে জোড়হাথ॥

*রূপ বহু তিরস্কার করিয়া মহাপ্রভু শ্রীপাদ রায় রামানন্দকে ধর্ম্মো-

পদেশ প্রদান করেন। এই গ্রন্থখানির নাম বৈষ্ণবসমাজ অবিদিত ও অনাদৃত। ইহাতে বহুল অবাস্তব সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও ভক্তিচিত্তক্লেশকর অলীক কথার উল্লেখ আছে।

৪। রস-তত্ত্ব-সার নামে বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিশেষের একখানি হস্ত লিখিত গ্রন্থ আছে। উহা অমুদ্রিত। লেখক এই গ্রন্থখানিকে স্বরূপ দামোদরের কড়চা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার নানা ভাবে এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন—কোথাও লিখিয়াছেন—এখানি স্বরূপ দামোদরের কড়চা, আবার কোথাও লিখিয়াছেন, মূল কড়চা সংস্কৃতে বিরচিত, এ খানি তদবলম্বনে লিখিত। যাহা হউক, এ গ্রন্থখানি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গ্রন্থ নহে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনেক পরে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। ইহাতে রায় রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথন আছে। উহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিকৃত অনুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহাতে কোন নূতন কথা নাই, কিন্তু বহু স্থানে সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা ও আছে। যদিও এই গ্রন্থের রামানন্দ-মিলন-পরিচ্ছেদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ারের প্রতিধ্বনিমাত্র, কিন্তু ইহার স্থানে স্থানে মূল গ্রন্থের বাক্য, ভাব ও মহান্ উদ্দেশ্য শোচনীয়রূপে বিকৃত করা হইয়াছে। সম্প্রদায়বিশেষের গ্রন্থকার-গণ মহাপ্রভুর, তাঁহার পারিষদগণের এবং প্রধান প্রধান ভক্তগণের চরিত্র ও ভজনমুদ্রাদি যেরূপ বিকৃত ও দোষাবহরূপে বর্ণিত করিয়াছেন, এ গ্রন্থেও সেই সকল ভাব যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

এতদ্ব্যতীত মুরলী বিলাস ও গোবিন্দদাসের কড়চা প্রভৃতি গ্রন্থেও রামানন্দের শিক্ষাদির উল্লেখ আছে। কিন্তু এই সকল গ্রন্থ অত্যন্ত আধুনিক এবং উহাদের বর্ণনা শ্রীচরিতামৃতেরই ক্ষীণ প্রতি-ধ্বনি মাত্র।

রামানন্দ কি শূদ্র বর্ণোদ্ভব ?

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বর্ণনায় রায় রামানন্দকে শূদ্র বলিয়াই জানা যায়। কিন্তু রায় মহাশয় শূদ্র ছিলেন কি না ইহা বিচার্য্য। রামরায় উড়িষ্যার রাজা বলিয়াই খ্যাত ছিলেন। রায় শব্দটী ক্ষত্রিয় বর্ণেই ব্যবহৃত হইত। বিদ্যানগরের বুক্ক রাজবংশ ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইঁহাদের যে বংশাবলী আছে তাহা "রায়বংশাবলী নামে খ্যাত। উড়িষ্যার রাজগণ ক্ষত্রিয়। প্রতাপরুদ্রও ক্ষত্রিয় ছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও উড়িষ্যায় যে সকল প্রাচীন রাজবংশ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ক্ষত্রিয়। রায় ভবানন্দ শূদ্র বা করণ ছিলেন, এমন মনে হয় না। শ্রীল লোচনদাস কৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পাঠে জানা যায় রায় ভবানন্দও রাজা ছিলেন এই গ্রন্থে রামানন্দকে কুঞ্জিনগরের রাজপুত্র বলা হইয়াছে যথা—

প্রভু কহে রাজপুত্রে জানাহ বচন।

এই গ্রন্থপাঠে আরও জানা যায় রামানন্দের একাধিক রাণী ছিলেন, যথা :—

রাণীগণ দেখে কান্দে আনন্দিত মনে।
সন্ন্যাসীর বেশে ফিরে রাধার রমণে॥

বিদ্যানগরের রাজবংশের অনেক রাজারই একাধিক রাণী ছিলেন। এই প্রথা তৎকালে রাজবংশের সম্মানরূপে গণ্য হইত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও রায় রামানন্দকে রাজাখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে। ক্ষত্রিয়োচিত বিবিধ কার্য্যের ভার যে তাঁহার উপরে অর্পিত ছিল, যুদ্ধাদি ব্যাপারের জন্য যে অগণ্য সৈন্য, হস্তী, অশ্ব ও বিবিধ সমর সজ্জা তাঁহার পরিচালনায় নিযুক্ত থাকিত, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ উক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল বিবরণ পাঠে স্পষ্টতঃই মনে

হয় রাজা শ্রীরামানন্দ রায় ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু শ্রীচরিতামৃতে একাধিক স্থানে তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

অনেকেই মনে করেন এই সময়ে বাঙ্গালীরা ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অপর কোন বর্ণের সংবাদ রাখিতেন না। সুবিখ্যাত বাচস্পতি মিশ্রেরও এইরূপ ধারণা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্বে স্পষ্টতঃই লিখিত আছে :—

যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব তে॥

এমন কি বৈদ্যপণ্ডিত ভরত মল্লিক স্বকৃত চন্দ্রপ্রভা নাম্নী বৈদ্যকুল পঞ্জিকাতেও লিখিয়াছেন :—এবমম্বষ্ঠাদীনামপি কলৌ শূদ্রত্বমিতি স্বস্ব গ্রন্থেষু বাচস্পতি মিশ্রাদিভি স্তথা শুদ্ধিতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণাপ্যুক্তম্।

ফলতঃ এই সময়ে এ দেশবাসিগণের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের অস্তিত্ব-ধারণা একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয়ও এই সুপ্রচলিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া রায় রামানন্দকেও শূদ্র বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। রায় রামানন্দ পরম ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি নিজ গ্রন্থ জগন্নাথ বল্লভ নাটকে নিজের নামের পরে শূদ্রত্বব্যঞ্জক দাস উপাধি সংযোজন করেন নাই। উক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকারের আত্ম-পরিচয় স্থলে এবং গানসমূহের ভণিতায় রায় উপাধিই দৃষ্ট হয়। দক্ষিণাত্যের ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের রায় উপাধি ঐতিহাসিক সত্য। সম্ভবতঃ রায় ভবানন্দের পূর্ব্ব পুরুষ দাক্ষিণাত্য হইতেই উড়িষ্যায় আগমন করেন। রায় রামানন্দ বিজয়নগরের সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় রায় বংশসম্ভূত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বিজয়নগরের রায় বংশ অতি প্রাচীন। ধনে, মানে, কুল-গৌরবে, বিদ্যা বুদ্ধি ও যশঃ-সৌরভে ইহারা বহুকাল স্বীয়বংশগৌরব রক্ষা করেন। সুপ্রসিদ্ধ রায় রামানন্দ যে এই প্রাচীন প্রখ্যাতনামা বংশের কুল-গৌরব ইহাই যুক্তিযুক্ত অনুমান।

বিদ্যানগর সাম্রাজ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয়কে মহারাজ প্রতাপ রুদ্র রাজমহেন্দ্রীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নবম পরিচ্ছেদে অন্ত্যলীলার নবমে মহারাজপ্রতাপ রুদ্র বলিতেছেন :—

রাজমহীন্দ্রের রাজা কৈনু রামরায়।
যে খাইল, যেবা দিল, নাহি তার দায়॥

এই রাজমহেন্দ্রী স্থানটী এখনও বর্ত্তমান। রাজমহেন্দ্রী গোদাবরী তটে অবস্থিতা। কিন্তু মহাপ্রভুর দক্ষিণযাত্রার সময়ে শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়া গিয়াছিলেন :—

রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে।

ফলতঃ এই সময়ে বিদ্যানগর এক বিপুল সাম্রাজ্য ছিল। কুমারিকা অন্তরীপ হইতে বঙ্গের সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী পর্য্যন্ত এই বিশাল সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইত। আবদুল রজক নামক পারস্য রাজদূত বিদ্যানগর-সাম্রাজ্যের এইরূপ সীমা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন বিদ্যা-নগরের উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত তিন মাসের পথ। প্রতিদিন ২০ মাইল হিসাবে ভ্রমণ করিয়া তিন মাসে ১৮০০ মাইল পথ ভ্রমণ করা যায়। আবদুল রজকের কথা অতিরঞ্জনদুষ্ট বলিয়া মনে হয় না। বিদ্যানগরই এই বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নগর দাক্ষি-ণাত্যে তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণতটবর্ত্তী। দক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাসে বিদ্যানগর অতীব বিখ্যাত ও সমৃদ্ধিশালী স্থান। ইহার প্রাচীন নাম বিজয়নগর। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষসম্পাদক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-

নাথ বসু মহাশয় এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী বিশ্বকোষের জন্য লিখিতে আমার উপরে ভারার্পণ করেন, বিশ্বকোষের সেই প্রবন্ধ হইতে বিদ্যানগরে সমৃদ্ধি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পংক্তি নিচয় উদ্ধৃত হইল—

"বিদ্যারণ্য মাধবাচার্য্যের নামানুসারে প্রাচীন বিজয়নগর বিদ্যানগর নামে অভিহিত। মাধবাচার্য্য বিজয়নগরের রাজাদের গুরু রাজনীতিক উপদেষ্টা ও মন্ত্রী ছিলেন। বিজয়নগরের ধ্বংসাবিশেষের উপর মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য সুবিপুল অভিনব নগর সংস্থাপিত করেন। তিনি এই বিপুল রাজধানীর সংস্থাপয়িত সুতরাং তদীয় উপাধি অনুসারে এই নগর "বিদ্যানগর" নামে অভিহিত হয়। সেই সময় হইতেই এই বিশাল সাম্রাজ্যের আয়তন, অর্থ-গৌরব ও রাজবৈভব দিন দিন প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহার বিশাল বৈভবের কথা শুনিয়া পারস্য ও ইয়োরোপ প্রভৃতি স্থানের পর্য্যটকগণ এই মহানগর-সন্দর্শনার্থ আগমন করেন। বিদ্যানগরের তৎকালিক বৈভব বাস্তবিকই বর্ণনাতীত। গগনভেদী গিরিমালার ন্যায় সুদৃঢ় দুর্গমালা, কবিকল্পিত ইন্দ্রপুরী বিনিন্দিত বিপুল বৈভবান্বিত বহুমূল্য ভোগবিলাসোপকরণদ্রব্যাদিপূর্ণ নিরুপম শোভাময় শত শত রাজপ্রাসাদ, নগরবক্ষঃপ্রবাহিণী বহুল জল-প্রবাহিকা, শত শত দেব মন্দির, অগণ্য শিক্ষার্থিসঙ্কুল বিদ্যালয়সমূহ, মহামূল্য বিবিধ দ্রব্যপরিপূর্ণ অগণ্য পণ্যবীথিকা, বিলাসিজনসেব্য সুরম্য প্রমোদ ভবন, চিরহরিৎ শোভাময় লতামণ্ডপ, সুবিপুল পুষ্পোদ্যান, কোমল-কমলকুসুমকহ্লারপূর্ণ শত শত সরোবর, সৌধশ্রেণী মধ্যবর্ত্তী সরল ও সুদীর্ঘ রাজপথ, বহুসংখ্যক সুবিপুল সিংহশালা, হস্তিশালা, অশ্বশালা, গ্রীষ্মাবাস, ফলোদ্যান, মন্ত্রভবন, সভামণ্ডপ, ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতি নাগরীয় বৈভবে এই সময়ে বিদ্যানগর জগতের প্রধানতম নগররূপে পরিণত হইয়াছিল। কৃষ্ণ-দেব রায়লুর সময়ে একশত চল্লিশ বর্গমাইল পরিমিত ভূখণ্ডের উপর

এই সুবিশাল নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার সর্ব্বত্রই ঘনলোক-সন্নিধান পরিলক্ষিত হইত। সুদূর দেশাগত বণিকমণ্ডলী ও রাজপ্রতিনিধিগণ বিদ্যানগরে আসিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য পরিচালন করিতেন। সেনাবিভাগে অনবরত সহস্র সহস্র লোক নিযুক্ত থাকিত। বিদ্যানগরের সহস্র সহস্র শিল্প এই সময়ে সমগ্র জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। স্থাপত্যবিদ্যা, কলবিদ্যা, অস্ত্র নির্ম্মাণ বিদ্যা, বহুপ্রকার শিল্প বিদ্যা, হস্তী অশ্বাদি শিক্ষাদান বিদ্যা, সমরবিদ্যা, বেদাধ্যয়ন, যাজনিক শাস্ত্রাধ্যয়ন, প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার সর্ব্বপ্রকার উপাদান পূর্ণরূপে বিদ্যানগরে পরিলক্ষিত হইত। কৃষ্ণদেব রায়লুর রাজত্বকালে বিদ্যানগর অতুলনীয় সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন বিদ্যানগরে ১০০০০০ পদাতি, ৩০০০০ অশ্বারোহী ও ৪০০০ গজারোহী সৈন্য বিবিধ সমর-সম্ভারসহ কেবল রাজধানী সংরক্ষণার্থই নিযুক্ত থাকিত। রাজার দেহ রক্ষার্থে ৬০০০ সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়তই রাজার সঙ্গে অবস্থান করিত। ২০০০০ পান্ধী রাজকার্য্যের জন্য নিরন্তর নিযুক্ত থাকিত। রাজার নিজ ব্যবহার জন্য এক সহস্র অতি উচ্চ ও সম্পুষ্ট অশ্ব সততই অশ্বশালার শোভা সম্বর্দ্ধন করিত। ঐতিহাসিক ও কতিপয় পর্য্যটক বিদ্যানগর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে :—

This new city originally went under the name of Vijayanagar or Bijanagar, and was subsequently revived into still grander proportions by the Sage Vidyaranya after his own name of Vidyanagara. It grew rapidly in extent, wealth and magnificence, tlll it became one of the largest—if not the largest city—in the world. It attracted many foreign travellers by its fabulous stories and descriptions of wealth, splendour and power. It

seems to have extended into one huge city of fortifications, palaces, water canals, temples, colleges, richly carved and decorated pavilions, bazaars, places of enjoyment, stables for elephants and horses, summer residences, smiling fruit gardens, council chambers, audience halls, public courts and offices. From north to south, on both the banks of the Thungabhadra or from Basavapatnam to Nagalapur, the favourite residence of Krishna Deva Raya (modern Hospet) the extreme length of Vijayanagar was about 14 miles, while from east to west with the Thungabhadra in the middle, the extreme breadth was about 10 miles. This huge area, of about 140 square miles, was fully crowded with traders, consuls, ambassadors, military officers, wrestlers, singers, artisans, musicians, masons, dancers, smiths, priests, foreign, adventurers, temple worshippers, engineers, trainers of horses and elephants. players of all descriptions, dancing girls and their numerous admirers and followers, poets and their pupils, bodyguards and palanquin-bearers, manufacturers, workmen of all grades, Governors and Viceroys, and those vast crowds of humanity whose business was to pander to the tastes of the royalty and nobiiity and whose number alone would have given a very respectable population to any of our modern flourishing cities. "The city is declared," says Mr. R. Sewell, "by a succession of European visitors in the fifteenth and sixteenth centuries, to have been marvellous for its size and prosperity,—a city with which for richness and magnificence no known Western Capital could compare."

Nicolo, an Italian traveller, who visited Vijayanagar in A. D. 1420, or 1421 thus begins his description :—
"The great city of Bizengalia (Bijanagar) is situated near very steep mountains. The circumference of the city is 60 miles—its walls are carried up to the mountains and enclose the valleys at their foot—so that its extent is thereby increased. In this city there are estimated to be 90,000 men fit to bear arms. . . .
Their King is more powerful than all the other Kings of India.

Abdur Razzak visited this city in A. D. 1443. and his description is graphic and interesting :—"The Prince of Bijanagar has in his dominions 300 ports, each of which is equal to Calicut and on terra firma his territories comprises a space of three months journey. The troops amount in number to 11 lakhs." . . .

"The city of Bijanagar is such that the pupil of the eye has never seen a place like it, and the ear of intelligence has never been informed that there existed anything to equal it in the world."

Nuniz, a Portuguese traveller, remarks :—"Kishna Deva Raya marched to the seige and battle of Raichur with 703,000 foot, 32,600 horse and 551 elephants." Paes another Portuguese traveller, who was present at the Court of Krishna Deva Raya, significantly observes :— "Now I desire you to know that this King has continual ly a million fighting troops, in which are included 35 000 cavalry in armour. All these are in his pay and he has these troops always ready to be despatched to any quarter, whenever such may be necessary.

Duarte Barbosa, who visited the kingdom of Vijaya-nagar between 1514 and who was present at the great city describes it thus :—"It is very populous—the King has in this place very large and handsome palaces with numerous courts—there are also in this city many other palaces of great lords . . . . and the streets and squares are very wide—they are constantly filled with an innumerable crowd of all nations and creeds—there is an infinite trade in this city . . . . The King keeps at all times 900 elephants, and more than 20,000 horse The King has more than 100,000 men—both horse and foot to whome he gives pay." Nuniz says that the "King has continually—in the capital—50,000 paid soldiers, amongst whom are 6,000 spearmen and shield-bearers and 3,000 men to look after the elephants in the stables. He has 1,600 grooms who attend to his horses and has also 300 horse trainers, and 2,000 artificers. . . . . There are always at the Court where the King is 20,000 litters and palanquins."

Cesar Frederic, the medieval traveller, says "that he had seen many courts, but never anything to compare with it." In Ferishta's "Mahomedan Power in Southern India" Vol. II., P. 358, he significantly observes "the ancestors of Krishna Deva Raya had possessed this kingdoom for 700 years. During this period the treasure they accumulated was so grert as to equal those of all the Kings of the earth."

Castanheda visited India just at the close of Krishna Deva Raya's reign (about 1529), and states " that the Infantry of Vijayanagara were countless, ... that

the country was thickly populated, and that the King kept up at his own cost an establishment of 100,000 horses and 4,000 elephants."

The Rayas seem to have kept in the city itself for its immediate purposes of defence and protection 100,000 infantry, 30,000 cavalry and about 4,000 elephants, with a suitable number of guns and artillery officers. The king's special bodyguard consisted of 6,000 well trained, well-mounted and richly-dressed horsemen. There were about 1,000 horses in the Royal stables for the Raya's personal use.

Thousand artisans, smiths washermen and workers were permanently attached to the palace establishment to look after the palace-work and necessary repairs. Numberless male servants had their allotted work in and around the palace precincts. About 200 cooks were on the list of the King's personal establishment.

About 200 Governors, Viceroys, Military Commandants, and their representatives were in the city from different parts of the Empire, and their retainers, body-guards, troops, camp-followers, and othet menial servants must certainly have been more than 100,000 souls. There were a large number of torch-bearers, as each noble had to be preceded by five, seven, nine or eleven men while the king employed 100 or 150 to go before him. A military population of 150,000 men in the capital meant at least treble that number of grooms, grass-cutters, ferriers, servants, and members of their families. The colleges contained the best literary men of the age from the different parts of India, and they

were teemed with students eager to learn and more eager to earn money. Great facilities seem to been afforded by the Rayas of Vijayanagar for trading purposes, and the exports the imports of this imperial city were on a correspondingly large scale. It is alleged on good authority, that there were 4,000 large, well-built and important temples in the city, and what must have been the number of the smaller fanes which were erected to satisfy the religious faith of this huge population? There were 20,000 palanquins and litters always ready with the King, and the number of their bearers must have been more than 200,000 people. Making similar attempts to calculate the population of this grand city, 30,00,000 (thirty lacs) would not be considered as an exaggerated figure to represent the huge population which was contained within the city proper and its immediate suburbs. All foreign travellers testify to the fact, that they found enormous wealth in the city and that the display of jewels was simply dazzling and unrivalled.

For nearly three centuries the city of Vijayanagar grew rapidly in wealth and importance, and was talked of, as the most splendid city in the world, by all those who had the fortune to visit it personally.